অধ্যাপক গোলাম আযম

জীবনে যা দেখলাম

দ্বিতীয় খন্ড

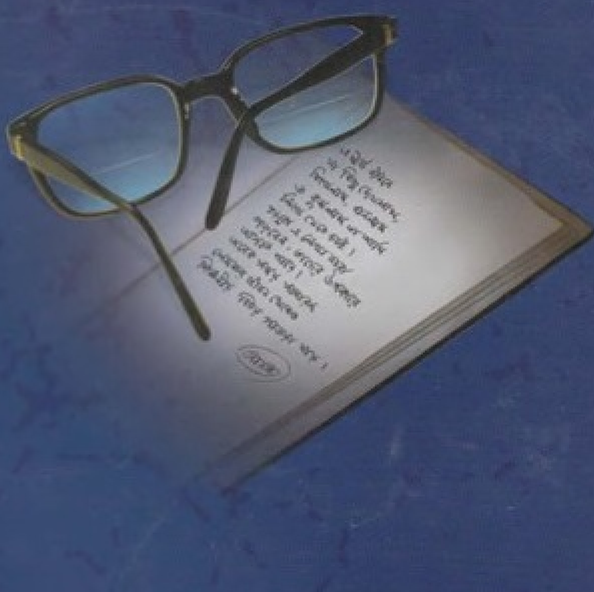

জীবনে যা দেখলাম

দ্বিতীয় খণ্ড

(১৯৫২-১৯৬২)

অধ্যাপক গোলাম আযম

জীবনে যা দেখলাম
দ্বিতীয় খণ্ড

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

সপ্তম : ডিসেম্বর ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০২

জীবনে যা দেখলাম (দ্বিতীয় খণ্ড) ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক : মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ৫১,৫১/এ রিসোর্সফুল পল্টন সিটি, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ স্বত্ব : লেখক ❖ প্রচ্ছদ : দি ডিজাইনার, বাংবাজার, ঢাকা ❖ মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।
e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র
৫১,৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
৪২৩ ওয়ারলেস রেল গেট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : একশত ষাট টাকা মাত্র

ISBN 984 8285 04 0

দ্বিতীয় খণ্ড সম্পর্কে

'জীবনে যা দেখলাম' প্রথম খণ্ডে ১৯৩০ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত পৌঁছলাম।

দৈনিক সংগ্রামে প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার এক কিস্তি করে প্রকাশিত হয়। ২০০১ সালের ২৬ জানুয়ারিতে প্রথম কিস্তি ছাপা হয়। ২০০১ সালের ডিসেম্বরে ৪৮ কিস্তি লেখা নিয়ে পুস্তকাকারে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ২০০২-এর জুন মাসে এর পুনর্মুদ্রণ হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হচ্ছে। এ খণ্ডে ৪৯ থেকে ৯০ কিস্তি লেখা রয়েছে।

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, শেষ পর্যন্ত কত খণ্ড হবে? এ বিষয়ে সঠিক ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়। লেখা অব্যাহত রয়েছে। বেঁচে থাকলে এবং লেখা জারি রাখতে পারলে আড়াইশ' পৃষ্ঠার বইয়ের পরিমাণ রেডি হলেই ইনশা-আল্লাহ তৃতীয় খণ্ড বের হবে।

পত্রিকায় কোন কিস্তি প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই প্রকাশক তা কম্পোজ করে রাখেন, যাতে এক খণ্ড পরিমাণ সংগ্রহ হবার সাথে সাথেই পুস্তকাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

১৯৬৩ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ৪০ বছরে যা দেখলাম তা লিখতে পারলে আরও কয়েক খণ্ড হয়ে যেতে পারে।

আমার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট তাদের আন্তরিক দোয়া চাই, যাতে ৮০ বছরের জীবনে যা দেখলাম তা লিখে রেখে যেতে পারি। আরও দোয়া চাই, যেন এমনভাবে লিখতে পারি, যা শিক্ষণীয় বলে গণ্য হয়।

গোলাম আযম
২৬ ডিসেম্বর, ২০০২

সূচিপত্র

বৃহত্তর পারিবারিক বৈঠক/১৫
বৈঠকের আসল উদ্দেশ্য/১৫
মাওলানা কাযী গোলাম কবিরের বংশধর/১৬
২৮ ডিসেম্বরের জমায়েত/১৬
এক অঘটন ঘটে গেলো/১৭
জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহবার্ষিকী/১৮
অনুষ্ঠানের উপসংহার/১৯
বেসরকারি কলেজ টিচার্স এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা সম্মেলন/২০
অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী স্বভাব/২০
কলেজ টিচার্স এসোসিয়েশন গঠনে কর্মব্যস্ততা/২২
কলেজ শিক্ষক সম্মেলনের সুফল/২৩
ইসলামিক কালচারেল কনফারেন্স/২৫
গানটির আবেদন/২৬
ইসলামী নেতৃত্ব-সংকট/২৬
নেতৃত্ব সংকটের সমাধান/২৭
কার্জন হলের সম্মেলনের বিবরণ/২৮
হায়রে মৃত্যু/৩০
মৃত্যুই সবচাইতে বেশি নিশ্চিত/৩০
সাকুর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া/৩১
আমার ভাইটি সাথীহারা হয়ে গেলো/৩২
বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী হারানো/৩৩
প্রৌঢ় বয়সে বিয়ে/৩৪
সাকুর সুন্দর মৃত্যু/৩৪
তমদ্দুন মজলিসের ক্যাম্প/৩৬
দু'সংগঠন মিলে পূর্ণ ইসলাম/৩৬
ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব/৩৭
তমদ্দুন মজলিসকে এখনো ভালোবাসি/৩৯
কুষ্টিয়া শহরে তমদ্দুন মজলিসের সম্মেলন ও জনসভা/৪১
তমদ্দুন মজলিসের সিলেট সম্মেলন/৪১
অধ্যক্ষ আবুল কাসেম/৪২
তমদ্দুন মজলিস আরো সক্রিয় হোক/৪৩
আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত ছিলাম না/৪৩
কেন মুসলিম লীগ পছন্দ করলাম না/৪৪

মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব/৪৪
বইটির সারকথা/৪৫
রাজনৈতিক দলে যোগদানের প্রশ্ন/৪৬
জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত/৪৭
সাক্ষাতের প্রতিক্রিয়া/৪৯
জামায়াতে ইসলামীর গাইবান্ধা সম্মেলন/৫১
সম্মেলনের জনসভায়/৫১
জনসভায় ছাত্রদের কারণে বিব্রতবোধ করলাম/৫৩
জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক/৫৩
একটি উল্লেখযোগ্য রাত/৫৪
শায়খ আমীনুদ্দীনের ভূমিকা/৫৬
জামায়াতে যোগদানের পর/৫৭
সংগঠন পদ্ধতির প্রাথমিক শিক্ষা/৫৭
তাবলীগ ও তমদ্দুনের দায়িত্ব/৫৭
রংপুরে সংগঠন শুরু/৫৮
সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু হলো৫৯
দারসে কুরআনের প্রতিক্রিয়া/৬০
তাফহীমুল কুরআন অধ্যয়ন শুরু করলাম/৬১
ভাষা শেখার আনন্দ/৬২
মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী বিরোধী বইয়ের হামলা/৬৩
জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করায় আব্বার প্রতিক্রিয়া/৬৫
ঢাকায় আব্বার মুখোমুখি/৬৭
একটি মহৌষধি দারস/৬৯
আমার দাদী ও আমার আম্মার কথা/৭০
মহিলারা নীরব কর্মী/৭০
আমার আম্মা/৭১
আমার দাদী/৭১
দাদী ও আম্মার আদর/৭২
দাদীর ইন্তিকাল/৭৩
আম্মার ইন্তিকাল/৭৩
দাদা-দাদীর শেখানো সখ/৭৫
আমার বড় চাচা/৭৫
চান্দিনা থেকে নওগাঁ ফেরত/৭৭
রংপুরে পারিবারিক জীবন শুরু/৭৭
আমার দাদী-শাশুড়ি/৭৮
রংপুর জেলে এক মাস/৭৯

তাম্বুল সেবন/৮১
পিতা হবার উপক্রম/৮৩
সৃষ্টিধারা অব্যাহত রাখার কৌশল/৮৪
প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো/৮৫
ছেলের নাম রাখা/৮৫
নতুন অতিথির সাথে সাক্ষাৎ/৮৬
সন্তানসহ স্ত্রীর সাথে রাত্রিযাপন/৮৭
এক বিশেষ বেদনাবোধ/৮৭
সুখ-দুঃখ কাকে বলে?/৮৯
জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে আব্বার মনোভাবে পরিবর্তন/৮৯
আবার গ্রেপ্তার ও মুক্তির পর করাচী গমন/৯০
তাবলীগের নেতাদের সাথে বৈঠক/৯১
আব্বার সম্পূর্ণ পরিবর্তন/৯২
আরো দু'ছেলের জন্ম/৯২
সন্তানদের নাম রাখার নীতি/৯৩
আব্বার পরিবারে কম বয়সে মৃত্যু/৯৪
১৯৫৪ সালের নির্বাচন/৯৫
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন/৯৬
কেন্দ্রীয় শাসন/৯৮
এনএম খানের শাসনকাল/৯৯
প্রথম দফার কর্মসূচি/৯৯
দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি/১০০
দ্বিতীয় দফা গ্রেপ্তার/১০১
আমার গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়া/১০৩
ছাত্রদের আন্দোলনে আমার প্রতিক্রিয়া/১০৪
ছাত্রদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতার কারণ/১০৫
আমার সিদ্ধান্ত/১০৫
রংপুর জেলে বামপন্থী নেতাদের তৎপরতা/১০৬
মার্চ মাসে জামায়াতের রুকন হলাম/১০৭
জেল থেকে মুক্তি/১০৮
নতুন সাংগঠনিক জীবন শুরু/১০৯
আমার পশ্চিম-পাকিস্তান সফর/১১১
পশ্চিম-পাকিস্তানে পৌঁছলাম/১১১
কেন্দ্রীয় মেহমানখানায় পৌঁছলাম/১১২
মাওলানা মওদূদীর সান্নিধ্যে/১১৩
মাওলানার সাথে বৈঠক/১১৪

লাহোরে এক সপ্তাহ/১১৫
গণ-পরিষদের পরিচয়/১১৭
নতুন সরকার গঠন/১১৭
আবার সরকার পরিবর্তন/১১৮
রাওলপিণ্ডি রওনা/১১৯
মারী রওনা/১১৯
মারীতে আমাদের তৎপরতা/১২০
মারীতে রাজনীতির চিত্র/১২২
মারী থেকে বিদায়/১২৩
রাওয়ালপিণ্ডিতে তিন দিন/১২৪
করাচীতে আমার কর্মতৎপরতা/১২৫
গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হলো/১২৭
করাচীতে টীমের তৎপরতা/১২৭
লবীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা/১২৮
একটি বিশেষ উপলব্ধি/১৩০
এ প্রয়োজন এতদিনে পূরণ হলো/১৩০
আল্লাহর আইন মানে কী/১৩১
রংপুর কলেজ থেকে অপ্রত্যাশিত চিঠি/১৩২
করাচীতে জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলন/১৩৩
মাওলানা মওদূদীর সাথে দীর্ঘ একান্ত সাক্ষাৎ/১৩৪
আমার প্রথম প্রশ্ন/১৩৫
আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন/১৩৭
আমার তৃতীয় প্রশ্ন/১৩৭
জামায়াতের সম্মেলনের দুটো অনুষ্ঠান/১৩৮
জামায়াতের রুকন সম্মেলন/১৩৯
করাচীতে অবস্থান/১৪০
জামায়াতের করাচী সম্মেলন উপলক্ষে মজলিসে শূরায় পূর্ব-পাকিস্তান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ/১৪১
ঢাকা প্রত্যাবর্তন/১৪২
প্রথম প্রাদেশিক আমীর নির্বাচন/১৪৩
মাওলানা মওদূদীর ঢাকা আগমনের প্রস্তুতি/১৪৩
মাওলানার ঢাকা আগমন/১৪৪
মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খান/১৪৬
মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী/১৪৬
পূর্ব-পাকিস্তানে মাওলানার একচিল্লা (৪০ দিন)/১৪৭
ঢাকায় মাওলানার অবস্থান/১৪৮

মাওলানার সফরসূচি ও কৃতকাজ/১৪৮
মাওলানার আলোচ্য বিষয়/১৪৯
ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন/১৫০
মাওলানার সাংগঠনিক কার্যক্রম/১৫০
ঢাকায় মাওলানার সর্বশেষ প্রোগ্রাম/১৫১
মাওলানার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগে/১৫২
মাওলানা যা দিয়ে গেলেন/১৫৩
যুক্তফ্রন্ট বিযুক্ত হলো/১৫৪
কেন্দ্রে তিন কুচক্রী/১৫৪
গভর্নর জেনারেলের গলায় মালা পরানোর প্রতিযোগিতা/১৫৪
শাসনতন্ত্র রচনায় সংকট/১৫৫
নতুন গণপরিষদ/১৫৬
শাসনতন্ত্রের বাস্তবায়ন/১৫৭
আওয়ামী মুসলিম লীগের আদর্শিক পরিবর্তন/১৫৭
আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে মৌলিক পরিবর্তন/১৫৯
যুক্ত ও পৃথক নির্বাচন/১৬০
কংগ্রেস ও হিন্দু দলগুলো কেনো যুক্ত নির্বাচন দাবি করলো?/১৬০
যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন এনেছে/১৬২
পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির সংযোজন/১৬২
পশ্চিম-পাকিস্তানে বিশেষ ধরনের রাজনীতি/১৬৫
এ কথার বাস্তব উদাহরণ/১৬৬
প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর আকস্মিক বিদায়/১৬৭
পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক চিত্র/১৬৭
অবিভক্ত বঙ্গদেশের রাজনীতি/১৬৮
রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মুসলিম লীগ/১৭০
১৯৫৪ এর পর/১৭২
স্বাধীন বাংলাদেশ/১৭২
বর্তমানে বাংলাদেশে রাজনৈতিক শক্তি/১৭২
বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তি/১৭৩
বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তি/১৭৭
রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি'র মূল্যায়ন/১৭৮
প্রচলিত রাজনৈতিক দল গঠনের পদ্ধতি/১৭৯
রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য/১৮১
চারদলীয় জোট সরকারের ভাব-মর্যাদা/১৮১
সেনাবাহিনীসহ যৌথ অভিযান/১৮২
বাংলাদেশে ইসলামী শক্তি/১৮৩

আলেম সমাজ ও রাজনীতি/১৮৪
ইসলামী শক্তির মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজন/১৮৬
মাওলানা মওদূদীর সফরের পর/১৮৭
রাজনৈতিক যোগযোগ/১৮৮
তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি/১৯০
মাওলানা ভাসানীর দলত্যাগ ও নতুন দল গঠন/১৯২
আওয়ামী লীগ সরকারের ইসলামবিরোধী পরিকল্পনা/১৯৩
শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও সমালোচনা/১৯৪
চিন্তাধারা গ্রন্থে সমালোচনার কিঞ্চিৎ আভাস/১৯৫
আলোচনার ধারা/১৯৫
কমিশনের ঐ মন্তব্যের প্রতিবাদ/১৯৫
শিক্ষার পুনর্গঠন সম্পর্কে আমাদের পরামর্শ/১৯৬
মাদরাসা অঙ্গনে আলোড়ন/১৯৭
বেসরকারি শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন/১৯৭
পূর্ব-পাকিস্তানে বার বার মন্ত্রিসভার নাটকীয় পরিবর্তন/১৯৮
শাহেদ আলী হত্যা/১৯৮
৭ অক্টোবর সামরিক অভ্যুত্থান/১৯৯
জামায়াতের সাংগঠনিক তৎপরতা/২০০
জনসভায় প্রশ্নোত্তর পর্ব/২০১
আবদুল খালেক সাহেবের সাথে বিতর্ক/২০২
জামায়াতের কর্মী সম্মেলন/২০৩
অস্বাভাবিক পদোন্নতি কল্যাণকর নয়/২০৫
সংগঠক মাওলানা মওদূদী/২০৭
একই ব্যক্তি একসঙ্গে চিন্তাবিদ ও সংগঠক হওয়া বিরল/২০৮
সংগঠনের গুরুত্ব/২১০
সংগঠনের অভাবেই ইসলাম শক্তিহীন/২১১
মাওলানা আজাদ ও সংগঠন/২১২
জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার মতপার্থক্য/২১৩
মাছিগোট রুকন সম্মেলন/২১৫
সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন/২১৬
সম্মেলনের তৃতীয় দিন/২১৭
পুনরায় আমীরে জামায়াতের দায়িত্বে মাওলানা/২১৭
সম্মেলনের পর/২১৮
দু'তিন মাস পরের ঘটনা/২১৯
মাওলানা ইসলাহীর কথা/২২০
ডা. আসরার আহমদ সম্পর্কে/২২১

বাংলাদেশের উদাহরণ/২২২
মাছিগোট সম্মেলনের পর/২২৩
মগজে তালা লেগে গেলো/২২৩
ঢাকা এসে দেখলাম/২২৪
বেকার অবস্থায় বাড়িতে বন্দি/২২৬
ডা. নূরুল ইসলামের চেম্বারে/২২৭
হাসপাতালে ভর্তি/২২৮
চিকিৎসার এক বছর পর/২২৯
জনমনে সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়া/২৩০
মীর জাফরের বিদায়/২৩১
তিন মাস পর/২৩২
৩ দফা কর্মসূচি চালু/২৩৩
দশ দিন ব্যাপী তারবিয়াতী ক্যাম্প/২৩৫
তারবিয়াতী শিবিরের কর্মসূচি/২৩৫
রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত দশ দিনের শিক্ষাশিবির/২৩৬
চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও পুনর্গঠন/২৩৭
কার্জন হলে সীরাত সম্মেলন/২৩৮
সম্মেলনের নাম কী হবে/২৩৯
কার্জন হলের কর্মসূচি/২৩৯
দেশব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত/২৪১
মজলিসে তামীরে মিল্লাত প্রতিষ্ঠা/২৪১
ছাত্র অঙ্গনে ইসলামী আন্দোলন/২৪২
ঢাকায় ইসলামী সেমিনার/২৪২
সেমিনার উপলক্ষে তারবিয়াতী প্রোগ্রাম/২৪৩
সেমিনারের কর্মসূচি/২৪৪
সেমিনারে পেশকৃত বক্তৃতা ও বক্তা/২৪৪
সেমিনারে পেশকৃত দারসে কুরআন ও হাদীস/২৪৫
জেলা ও মহকুমা শহরে সেমিনার অভিযান/২৪৫
ইসলামী আন্দোলনে সেমিনার অভিযানের বিরাট অবদান/২৪৬
সামরিক শাসন প্রত্যাহারের সূচনা/২৪৮
নতুন শাসনতন্ত্র ও নতুন পার্লামেন্ট/২৪৮
২৮ এপ্রিল (১৯৬২)-এর নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর অংশগ্রহণ/২৪৯
বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নির্বাচন বিধি/২৫০
জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন/২৫০
আইয়ূব খানের একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন/২৫১
আইয়ূব খান ক্ষমতায় মযবুত হয়ে বসলেন/২৫২

ঢাকায় আমার কর্মব্যস্ততা/২৫৩
১৯৬০ সালে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব/২৫৩
বিয়ে উপলক্ষে আমার বক্তব্য/২৫৪
একটি বিয়ের ঘটনা/২৫৫
ঈদুল ফিতরে ইমামতী/২৫৬
মুসাফাহা ও মুয়ানাকা/২৫৭
ঈদের ইমামতিতে সঙ্কট/২৫৮
নয় নেতার শাসনতন্ত্র আন্দোলন/২৬০
শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পশ্চিম-পাকিস্তানে সফর/২৬১
শহীদ সোহরাওয়ার্দী সর্বপ্রথম মাওলানা মওদূদীর নিকট কেন গেলেন/২৬৩
জামায়াতে ইসলামীর পুনর্জীবন/২৬৩
হাজী বশীরের আকর্ষণীয় অফার/২৬৪
হাজী বশীরকে শেষ সিদ্ধান্ত জানালাম/২৬৫
আমার ভাই-বোনদের কথা/২৬৬
আমার বোনদের লেখাপড়া/২৬৭
আমাদের বিয়ের ব্যাপারে আব্বার নীতি/২৬৮
আমাদের পরিবারে মৃত্যু/২৭০
আমার ভাই-বোনদের বর্তমান অবস্থা/২৭০
আমি আজকাল কী করছি/২৭১
ভাইদের দীনী অবস্থা/২৭২
আমার সন্তানদের কথা/২৭২
ফ্যামিলি নেইম/২৭৪
আসল নাম ও ডাক নাম/২৭৫
নামের শুদ্ধ উচ্চারণ/২৭৫
আমার ছেলেদের লেখাপড়া/২৭৬
স্বাধীন বাংলাদেশে আমার ছেলেদের নিরাপত্তা সঙ্কট/২৭৮
ছেলেদের সঙ্কট নিরসন/২৭৯
বর্তমানে ছেলেদের অবস্থান/২৮১
ছেলেদের বিয়ে/২৮২
নাতি-নাতনীদের কথা/২৮৪
একটি বড় আফসোস/২৮৫
ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কার কদর বেশি/২৮৬
পরিবারে ছোট শিশুর মূল্যায়ন/২৮৭

৪৯.

বৃহত্তর পারিবারিক বৈঠক

২৮ ডিসেম্বর (২০০১ সাল) আমার আব্বা মরহুম মাওলানা কাযী গোলাম কবিরের ছেলে, মেয়ে, বৌ-মা ও জামাতা, নাতি ও নাত-বৌ, নাতনী ও নাতনীদের স্বামী এবং তাদের সন্তানাদির এক জমায়েত হয়ে গেলো। খুব শর্ট নোটিশে হওয়ায় সবাই শরীক হতে পারেনি। যারা বিদেশে আছে তাদের মধ্যে আমার মেঝো বৌ-মা এবং তার দু'মেয়ে এক ছেলে বেড়াতে আশায় উপস্থিত ছিলো। যারা ঢাকার বাইরে তাদেরকে ডাকা হয়নি। এমনকি যারা ঢাকা মহানগরীতে থাকে তাদের সবাইকেও খবর দেওয়া যায়নি।

৮/১০ বছর আগে মাঝে মাঝে এ রকম বৈঠক করা হতো, তাদেরকে দীনের দিক দিয়ে অগ্রসর করা এবং পারস্পরিক খোঁজ-খবর নেবার জন্য। আমার আব্বার সন্তানদের মধ্যে আমি সবার বড় হিসেবে এ ব্যাপারে আমার দায়িত্বই বেশি বলে অনুভব করি। আব্বাও এ দায়িত্ব পালনের তাগিদ দিয়ে গেছেন। এ দায়িত্ব বিভিন্নভাবে পালন করলেও সবাইকে একত্র করে কোন অনুষ্ঠান এতোদিন করা হয়নি।

আমার চতুর্থ ছেলে মেজর আযমী ঈদুল ফিতরের ছুটি উপলক্ষে সপরিবারে বাড়িতে আসলো। সে-ই এ জমায়েতের প্রস্তাব করলো। আমি সম্মতি দিয়ে আমার বাড়িতেই এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করার দায়িত্ব তাকেই দিলাম।

বৈঠকের আসল উদ্দেশ্য

রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, "তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের অধীনস্থদের দায়িত্বশীল।" এ হাদীস অনুযায়ী আমরা যদি পরবর্তী বংশধরদেরকে আল্লাহর পথে অগ্রসর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করি, তাহলে আল্লাহর দরবারে দোষী সাব্যস্ত হবো। রাসূল (স) সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যদি কেউ সন্তানদেরকে সৎকর্মশীল হিসেবে গড়তে পারে তাহলে তার মৃত্যুর পর সন্তানদের নেক আমলের সওয়াব তার আমলনামায়ও যোগ হতে থাকবে। দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর আমার ছেলেরা যদি আল্লাহ তাআলার নিকট চোখের পানি ফেলে আমার জন্য দোয়া করার যোগ্য না থাকে তাহলে মুসলিম পিতা হিসেবে আমি ব্যর্থ বলে সাব্যস্ত হবো।

আমাকে ছেলেরা বর্তমানে ব্যবহারের জন্য বা খাবার জন্য বিভিন্ন জিনিস দেয়। মৃত্যুর পর তারা আর কী দিতে পারবে? এর জওয়াব হাদীসে পাওয়া যায়। রাসূল (স) বলেছেন, "জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতের জন্য উপহার হলো তাদের জন্য গোনাহ্ মাফ চাওয়া।" বিভিন্নভাবে মৃতের নিকট সওয়াব পৌঁছাবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু গোনাহ্ মাফ না হলে এ সওয়াব আসলে কোন কাজে আসবে না। তাই মৃতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো তাদের যাবতীয় গোনাহ্ মাফ করার জন্য দোয়া করতে থাকা এবং কিয়ামত পর্যন্ত কবরের আযাব থেকে হেফাযতের দোয়া চাইতে থাকা।

আমরা সন্তানদের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের কল্যাণের জন্য সবকিছুই করার চেষ্টা করি। কিন্তু তাদের আখিরাতের অনন্তকালের জীবনে সাফল্যের গুরুত্ব কমই দিয়ে থাকি। এ উদ্দেশ্যে পারিবারিক বৈঠক অত্যন্ত জরুরি। মাঝে মাঝে বৃহত্তর পারিবারিক সমাবেশ করাও প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যেই সেদিন আমাদের ঐ জমায়েতের ব্যবস্থা হয়। ঐ দিন সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, মাঝে মাঝে এ জাতীয় অনুষ্ঠান করা হবে।

মাওলানা কাযী গোলাম কবিরের বংশধর

আমার আব্বা মাওলানা কাযী গোলাম কবিরের ৪ ছেলে ও ৫ মেয়ে। আল্লাহর রহমতে আমরা ৪ ভাই-ই জীবিত। বোনদের মধ্যে একজন বিয়ের বয়সেই মারা গেছে এবং আর একজন ৫ সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেছে। বাকি তিন বোনের মধ্যে ২ জন ঢাকায় এবং ১ জন মোমেনশাহীতে আছে। আমি সবার বড়। আমার ৬ ছেলে, কোন মেয়ে নেই। আপনার ছেলে-পেলে কয়জন, জিজ্ঞেস করলে বলি আমার সব ছেলে, পেলে নেই। বাংলাদেশে নিযুক্ত প্রথম সৌদি রাষ্ট্রদূত শায়খ ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল খতীব মন্তব্য করেছিলেন, "You may be father of six sons but as you have no daughter, you are not full father, you are half father."

পূর্ণ-পিতা ও অর্ধ-পিতার পরিভাষা এর আগে শুনিনি। আমার ৬ ছেলে বিয়ে করিয়ে ৬টি মেয়ে যোগাড় করলাম। ৬ ছেলের ৫ জনই ফুল ফাদার এবং একজন ২ মেয়ের পিতা হিসেবে হাফ ফাদার। আল্লাহ আমাকে মেয়ে দেননি বটে, কিন্তু ১২ নাতনী দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছেন। ৫ ছেলের ঘরে ৭ নাতি মিলে ২০০২ সাল পর্যন্ত আমি ১৯ জনের দাদা।

আমার দ্বিতীয় ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্যামের ২ ছেলে, যার ১ ছেলের ঘরে ৩ নাতি, অন্য ছেলের ঘরে ৩ নাতনী এবং একমাত্র মেয়ের ঘরে ২ নাতি। এরা সবাই এখনও হাফ ফাদার ও মাদার। ভবিষ্যতে কী হবে আল্লাহ জানেন।

আমার তৃতীয় ভাই ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মুকাররামের একমাত্র ছেলের ঘরে ২ নাতনী ও ১ নাতি। তার ৩ মেয়ের ঘরে ৩ নাতি ও ২ নাতনী।

আমার চতুর্থ ভাই ইঞ্জিনিয়ার ড. এম মাহদীউয্যামানের ১ ছেলে ও ৪ মেয়ে। ছেলের ঘরে ২ নাতি, বড় মেয়ের ঘরে ১ ছেলে, দ্বিতীয় মেয়ের সম্প্রতি বিয়ে হলো। ছোট ২ মেয়ে অবিবাহিতা।

সাধারণত ছেলে ও মেয়ে, ছেলেদের স্ত্রী ও সন্তান এবং নাতিদের স্ত্রী ও সন্তানকেই বংশধর গণ্য করা হয়। কন্যা ও জামাতাদের সন্তান বংশের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে হিসেবে কোলের শিশুসহ আব্বার বংশধরদের সংখ্যা এ পর্যন্ত মোট ৭১ জন। আব্বার ২ কন্যার মৃত্যুর পর জীবিতদের সংখ্যা ৬৯ জন।

২৮ ডিসেম্বরের জমায়েত

ঢাকায় অবস্থানরত ৩ ভাই, ২ বোন, ছোট ভগ্নিপতি মাওলানা কাযী সৈয়দ শরীয়তুল্লাহ, ভাইদের কন্যা ও জামাতা এবং তাদের সন্তানরা, ভাগ্নে ও ভাগ্নির

পরিবার মিলে মোট ৪৭ জন সেদিন সমবেত হয়। আমাদের এক ভগ্নির ছেলে ৭ম শ্রেণীর ছাত্র মুবীনের কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এক ভাতিজীর ছেলে কেজি টু-এর ছাত্র ফাওয়াযও তিলাওয়াত করতে উদ্বুদ্ধ হলো। এক ভাগ্নের কন্যা ১ম শ্রেণীর ছাত্রী মুসতাহসিনা এগিয়ে এসে মাইক হাতে নিয়ে কালেমা তাইয়েবা শুনালো। শুদ্ধ উচ্চারণ শুনে আমরা খুশি হলাম। লক্ষ্য করলাম যে, এ জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করলে ছোট বয়সেই অনেক লোকের সামনেও বলার হিম্মত সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানটি আমার চেম্বারেই হয়। আমি আমার চেয়ারে বসা এবং পুরুষরা সবাই আমার সামনে বসলো। সাথের দু'কামরায় মহিলাদের বসার ব্যবস্থা হলো। কোন ঘোষণা ছাড়াই আমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হলো। অনুষ্ঠানের প্রস্তাবক মেজর আমান আযমীকে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলার দায়িত্ব দিলাম। সে মাঝে মাঝে তার দাদার বংশধরদের সমাবেশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করলো। সবাইকে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশের সুযোগ দিলাম। কয়েকজন এর সমর্থনে বক্তব্য রাখার পর সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয়ে গেলো।

এক অঘটন ঘটে গেলো

এ অনুষ্ঠানের জন্য পূর্বে কোন এজেন্ডা তৈরি করা হয়নি। একসাথে সবার খাওয়ার কথা। মহিলারা নিজ নিজ বাড়ি থেকে বিভিন্ন রকম তৈরি খাবার নিয়ে এলো। পিকনিক খাবার পরিবেশ সৃষ্টি হলো। রাত ৯টা বেজে যাচ্ছে, খাওয়ার পর ছোট ছেলে-মেয়েসহ বাড়ি ফিরতে যাতে বেশি রাত না হয় সে জন্য আমি অল্প কিছু নসীহতমূলক কথা বলার জন্য মাইক চাইলাম।

হঠাৎ ডা. গোলাম মুয়ায্যামের বড় ছেলে সোহায়েল বিশেষ বক্তব্য রাখবে বলে ঘোষণা করা হলো। সবাই ঔৎসুক্যের সাথে তার দিকে তাকালো। সে বলল, "ঘটনাক্রমে আজকের দিনটির এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মহিলাদের পক্ষ থেকে একটি বড় কেক আনা হয়েছে। ৫০টি ছোট ছোট ফুল কেকের উপর সাজানো রয়েছে।" আমাকে লক্ষ্য করে বললো, "বড় চাচার জীবনে পঞ্চাশের আজ এক বিরাট তাৎপর্য রয়েছে। এ বিষয়ে তিনি কোন ধারণা রাখেন কি-না?"

আমি বিস্ময়ের সাথে ও অসহায়ভাবে বললাম, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, এমন কিছুই আমার ধারণায় আসছে না।"

আমার ছোট দু'ভাই মুয়ায্যাম ও মুকাররামের উৎফুল্ল চেহারা দেখে বুঝা গেলো যে, তারাও এ সম্পর্কে অবগত। অন্যরা বিষয়টা জানে বলে মনে হলো না। এ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সোহায়েল বিজ্ঞের ভঙ্গিতে ৫০-এর তাৎপর্য সম্পর্কে সবাইকে অবগত করলো। সে বললো, "আজ বড় চাচার বিয়ের ৫০তম বর্ষপূর্তি।"

আমি জন্মবার্ষিকী, বিবাহবার্ষিকী জাতীয় অনুষ্ঠান কোন সময়ই করি না। আমাদের বংশে কেউ কেউ করে। যারা করে তারা আমার মনোভাব জানে বলে জন্মবার্ষিকী

অনুষ্ঠানে আমাকে দাওয়াতও দেয় না। অথচ সেদিন আমার বাড়িতে এসে আমার বিয়ের ৫০তম বার্ষিকী পালন করে ফেললো। তাই এটাকে একটি 'অঘটন' হিসেবেই উল্লেখ করলাম।

পরে জানতে পেরেছি যে, এর মূল ষড়যন্ত্রকারী হলো আমার তৃতীয় ভাইয়ের স্ত্রী। ঘটনাক্রমে তারও বিয়ে হয় ২৮ ডিসেম্বর এবং সে দিন তাদের বিয়ের ৪৩তম বার্ষিকী। আমার তৃতীয় ভাইটিও আমার মতোই বেরসিক। সেও বার্ষিকী জাতীয় অনুষ্ঠান করে না। কিন্তু তার স্ত্রীর পরিকল্পনা সম্পর্কে সে জানতো কি-না বলতে পারি না। ঐ দিন সকাল ১০টায় আমি ও আমার স্ত্রী পত্রিকা পড়ছিলাম। হঠাৎ তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের বিয়ের আজ পঞ্চাশ বছর হলো।" আমি শুনে মুচকি হাসলাম। তিনিও তার ২য় জা'র ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোন আভাস পেয়েছিলেন কিনা জিজ্ঞেস করিনি। আরও জানতে পারলাম যে, এ সমাবেশের আসল প্রস্তাবক আমার তৃতীয় ভাইয়ের স্ত্রী।

জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহবার্ষিকী

যারা গণ্যমান্য ও খ্যাতিসম্পন্ন তাদের জন্ম ও মৃত্যুদিবস পালন করা হয় এবং পত্রিকায় ছবিসহ খবরও প্রকাশিত হয়। তাদের কথা আলাদা। কিন্তু প্রায় সকল সচ্ছল পরিবারেই এসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এ সব অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে দাওয়াত করে আনা হয়।

জন্মদিবসে বিশেষভাবে প্রস্তুত কেক কাটা হয় এবং আমন্ত্রিতদেরকে আপ্যায়ন করা হয়। নিমন্ত্রিতরা উপহারও নিয়ে আসে। এটাকে আমি ধনীদের বিলাসিতা মনে করি। এ সব অনুষ্ঠানে গরীব আত্মীয়দের কোন স্থান নেই। তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় না; দিলেও উপহার দিতে অক্ষম বলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় না। সচ্ছল পরিবারের সবার জন্মবার্ষিকীই যদি এভাবে পালন করা হয়, তাহলে কত লোকের কত সময়ের অপচয় হতে পারে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। অর্থের অপচয়ের উল্লেখ না-ই বা করলাম। অপচয় করার মতো অর্থ যাদের আছে তারাই এসব করে।

আমি কখনো আমার ছেলেদের জন্মবার্ষিকী পালন করিনি। আমার ছেলেরা বিদেশে তাদের সন্তানদের জন্মদিবস পালন করে কি-না জানি না। বড় ছেলে মামুন তা করে না বলে জানি। ছোট ছেলে সালমান আমার সাথে থাকে বলে এতোটুকু জানি যে, ওর ৬ বছর বয়সী বড় মেয়ের জন্মদিনে চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যেয়ে খায় এবং বাপ-মায়ের জন্যও খাবার নিয়ে আসে। এটুকু অনাড়ম্বর দিবস পালনে আমি আপত্তি করিনি। আমার নাতনীটি যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে, সেখানেও শিক্ষিকারা জন্মদিবসের গুরুত্ব দেয় বলে সে নিজেও এ বিষয়ে সচেতন।

ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারে পিতা ও মাতার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। এটা আসলে পিতামাতার জন্য দোয়ার অনুষ্ঠান। কিন্তু দোয়া না বলে বলা হয় মিলাদ। রাসূল (স)-এর জন্মদিবসটি মিলাদ নামে খ্যাত। আরবে ১২ই রবিউল আউয়ালকে ঈদে মিলাদুন্নবী বলা হলেও তারা এ নিয়ে কোন অনুষ্ঠান করে না। সৌদি আরব,

কুয়েত, আরব আমিরাত প্রভৃতি দেশে আমাদের দেশের মতো 'মিলাদ শরীফ' বলে কোন অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই।

আমাদের দেশে মিলাদের প্রচলন এতো ব্যাপক যে, নতুন বাড়ি, দোকান, সংগঠন ইত্যাদির উদ্বোধন উপলক্ষে মিলাদ করা হয়। এমনকি সিনেমা হল শুরু উপলক্ষেও মিলাদ হয়। সবচাইতে হাস্যকর ব্যাপার হলো, মৃত্যুদিবস পালনের অনুষ্ঠানকেও মিলাদ বলা হয়। অথচ মিলাদ শব্দের অর্থ হলো জন্মদিবস।

আমাদের দেশে বিভিন্ন উপলক্ষে সবাই আল্লাহর নিকট দোয়া করার উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে। এটা অবশ্যই প্রশংসনীয় রেওয়াজ। এ উদ্দেশ্যে যে মাহফিল করা হয় তা আসলেই দোয়ার মাহফিল। এটাকে মিলাদ মাহফিল বলা অর্থহীন। কেউ বলতে পারেন যে, এ সব মাহফিলে রাসূল (স)-এর জন্মকালের কথা উল্লেখ করা হয় বলেই মিলাদ নামটা চালু হয়েছে। আজকাল আলেমগণ এসব মাহফিলে কুরআন ও হাদীস থেকে দীনের শিক্ষাই আলোচনা করেন। তাই মিলাদ নাম দেওয়া প্রাসঙ্গিক নয়। বিশেষভাবে মৃত্যুবার্ষিকীতে তো নয়ই।

বিবাহবার্ষিকী পালনও ধনীদের আর এক বিলাসিতা। জীবনের বৃহত্তর ও মহত্তর উদ্দেশ্যে যারা কর্মতৎপর, তাদের এ জাতীয় বিলাসিতার অবকাশ ও অবসর নেই। বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েক বছর এটা দাম্পত্য সম্পর্কে আনন্দের নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে; কিন্তু পরিণত বয়সেও এর কোন গুরুত্ব তারাই দিতে পারে, যাদের অবসর জীবনে করার মতো কোন কাজ নেই। এ ছাড়া যদি কোন দম্পতি সত্যিই আনন্দ উপভোগ করেন, তাহলে আমার মতো কাঠখোট্টা লোকের আপত্তিতে তাদের কিছুই আসে যায় না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, জীবনটা বড়ই মূল্যবান। এমন কাজেই সময়, শ্রম, অর্থ ও আবেগ নিয়োগ করা উচিত, যা সমাজ ও মানুষের কল্যাণে আসে।

অনুষ্ঠানের উপসংহার

আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ৫/৭ মিনিট আমার পক্ষ থেকে উপদেশমূলক বক্তব্য পেশ করার পর আমাদের সবার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ, পরলোকগত মুরুব্বীদের জন্য মাগফিরাত, দেশের ও বিশ্ব-মুসলিমের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য দোয়া করা হয়।

উপদেশমূলক বক্তব্যের মূল কথা ছিলো, আখিরাতকেন্দ্রিক জীবন-যাপনের গুরুত্ব। "রাব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুনইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানা" অর্থ হলো দুনিয়ায় এমনভাবে জীবন-যাপনের কামনা, যার ফলে আখিরাতে হাসানা লাভ করা যায়। এর অর্থ এটা নয় যে, দুনিয়ার সব মজা এবং আখিরাতের সব সুখ-সুবিধা। আখিরাতের সাফল্যকে জীবনের টার্গেট হিসেবে গ্রহণ করলে দুনিয়ার জীবনে যা করা প্রয়োজন, তা করার তাওফীক লাভ করাই হলো দুনিয়ার হাসানা। রাসূল (স) বলেছেন, "বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি, যে আত্মসমালোচনা করে এবং যে কাজই করে এর ফল আখিরাতে কী পাওয়া যাবে সে হিসাব করেই করে।"

৫০.

বেসরকারি কলেজ টিচার্স এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা সম্মেলন

১৯৫২ সালের শেষ দিকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের উদ্যোগে 'পূর্ব-পাকিস্তান কলেজ টিচার্স এসোসিয়েশন' গঠনের উদ্দেশ্যে এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তখন ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন জনাব আখতার হামিদ খান। তিনি ব্রিটিশ আমলে আইসিএস অফিসার ছিলেন। খাকসার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা এনায়েত উল্লাহ্ খান মাশরেকীর জামাতা ছিলেন। নওগাঁ কলেজের আরবীর অধ্যাপক ছিলেন আমার শ্বশুর সাহেব। তাঁর কাছে শুনেছি যে, নওগাঁ মহকুমার এসডিও থাকাকালে আখতার হামিদ খান নিয়মিত জামে মসজিদে জামাআতে নামায আদায় করতেন। মসজিদে ধুলাবালি দেখে নিজেই একদিন ঝাড়ু দিলেন। লজ্জিত হয়ে মসজিদের খাদিম তার হাত থেকে ঝাড়ু নিতে চাইলে তিনি দিলেন না। নিজেই ঝাড়ু দেওয়ার কাজ শেষ করলেন। এরপর ঐ মসজিদে আর ধুলাবালি দেখা যায়নি।

কুমিল্লা কোটবাড়িতে BARD (Bangladesh Academy for Rural Development বা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী) নামক যে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে তা আখতার হামিদ খানেরই কীর্তি। তাঁর সাথে আমার সর্বশেষ দেখা ১৯৭২ সালে ইসলামাবাদ গভর্নমেন্ট হোস্টেলে।

কলেজ টিচার্স এসোসিয়েশন গঠনের উদ্দেশ্যে প্রতিটি কলেজ থেকে দু'জন অধ্যাপক প্রতিনিধিকে যোগদানের দাওয়াত দেওয়া হয়। রংপুর কলেজ টিচারদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি ও অধ্যাপক কলীমুদ্দীন আহমদ (দর্শন) কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পৌছলাম। শীতকালীন ছুটির অবকাশে কলেজ ক্যাম্পাসেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। সে সময়কার ২০টি জেলা শহরের ডিগ্রি কলেজসমূহের প্রতিনিধি ছাড়াও বেশ কতক মহকুমা শহরের কলেজ থেকেও প্রতিনিধি এলেন। তখন কলেজের সংখ্যা খুব বেশি ছিলো না। সর্বমোট কতজন ডেলিগেট সম্মেলনে যোগ দিলেন তা মনে নেই, তবে পঞ্চাশের কম ছিলো না বলেই মনে পড়ে। দু'দিন একসাথে থাকা, খাওয়া, অধিবেশনে আলোচনা ইত্যাদির সুযোগে প্রায় সবার সাথে ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করি। নতুন লোকের সাথে পরিচয় করা আমার অভ্যাস। এ অভ্যাস আমার আজীবন উপকারে লেগেছে।

অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী স্বভাব

সমাজে দু'রকম মানুষ দেখা যায়। কিছু লোক কারো সাথে নিজের উদ্যোগে কথা বলে না। কেউ কথা বলতে চাইলে যত কম কথায় জওয়াব দেওয়া যায়, তা-ই করে। এদেরকে ইংরেজিতে Introvert বলে। এরা মিশুক নয়। আন্দোলন ও সংগঠনের জন্য এ জাতীয় লোক খুব-একটা উপযোগী নয়। কিছু লোক স্বভাবগতভাবেই মিশুক। তাদেরকে Extrovert বা বহির্মুখী বলা হয়। এটা আসলেই স্বভাবজাত অবস্থা।

তাবলীগে দীন ও ইকামাতে দীনের দাওয়াত হোক, অথবা রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের দাওয়াত হোক—এ জাতীয় দায়িত্ব পালনের জন্য বহির্মুখী স্বভাবের লোকই প্রয়োজন। জনগণকে সংগঠিত করার দায়িত্ব পালনের জন্য এ জাতীয় লোকই সফল হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যেখানে যখনই কোন মানুষের সংস্পর্শে আশার সুযোগ হয় তখন সেখানেই গায়ে পড়ে তার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতে পারলেই তো দাওয়াত পেশ করার সুযোগ পাওয়া সম্ভব। যারা মুখচোরা তারা দাওয়াত সম্প্রসারণের যোগ্য হবে কেমন করে? এ জাতীয় লোক সংগঠনে সক্রিয় হলে ধীরে ধীরে তার স্বভাব কিছু বদলাতে পারে বটে, কিন্তু এরা নেতৃত্বের দায়িত্বে এগুতে পারে না।

আল্লাহ্ তাআলা আমাকে জন্মগতভাবেই বহির্মুখী স্বভাব দান করেছেন বলে তাঁর প্রতি শুকরিয়া জানাই। বড়াইল জুনিয়র মাদ্‌রাসার ছাত্র থাকাকালে এক শিক্ষক আমাকে 'আলাপী' নামেই ডাকতেন। প্রথম ক্লাস তিনিই নিতেন। এসেই দেখতেন যে, আমি কথা বলছি, আর অন্য কয়জন আমার কথা শুনছে। রোজই এ অবস্থা দেখে একদিন তিনি মন্তব্য করলেন, "তুমি কি আলাপ না করে থাকতেই পারো না?" তিনি আমাকে ভর্ৎসনার সুরে এ কথা বলেননি বলে মনে মনে খুশিই হলাম। তিনি আদরের সুরেই আমাকে 'আলাপী' নামে ডাকতেন।

আমার এ স্বভাবের কারণে প্লেনে দেশে ও বিদেশে যারাই আমার পাশের আসনে থাকে তাদের সাথে পরিচয় না করে থাকতে পারি না। কোন বিয়ে বা ওয়ালীমার খাবার টেবিলে যাদের সাথে বসার সুযোগ পাই, তাদের পরিচয় নেবার চেষ্টা করি। কিছুক্ষণ একসাথে বসা অবস্থায় যাদের সাথে সরাসরি দেখা হয় তাদের পরিচয় না জানা পর্যন্ত আমি অস্বস্তি বোধ করি। আমাদের মহল্লার মসজিদে শুধু নামাযের জন্য অন্য মহল্লার লোক সাধারণত আসে না। একমাত্র জুমআর নামাযে আমার খুৎবা শুনবার জন্য বেশ দূর থেকেও লোক আসে। যে রাস্তাটির পাশে এ মসজিদ অবস্থিত তা একদিকে বন্ধ (Blind Road) বলে চলাচলের জন্য এ রাস্তায় গাড়ি আসে না। বাইরের কোন গাড়ি এ মহল্লায় কারো বাসায় বা কাযী অফিসে এলে তাদের মধ্যে যারা জামায়াতে নামায আদায় করায় অভ্যস্ত, তারাই মসজিদে আসেন। মসজিদে নতুন কোন চেহারা দেখলে সুযোগ পেলে তার পরিচয় নিই।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, আমি যার পরিচয় নেবার জন্য হাত মিলালাম তিনিও আমার পরিচয় জানতে চাইবেন। কিন্তু কিছু এমন লোকও আমি পেয়েছি, যারা নিজের পরিচয়টুকু দেবার পর আমার পরিচয় নেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। এ অস্বাভাবিক আচরণ তারাই করতে পারেন, যারা হয় ভয়ঙ্কর অহঙ্কারী, আর না হয় সাংঘাতিক অন্তর্মুখী। তবে আমাকে যারা ব্যক্তিগতভাবে চিনেন তাদের কথা আলাদা।

এককালে সাংগঠনিক সফরে ট্রেনে সারাদেশ সফর করেছি। সাথে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে বহু বই-পুস্তক রাখতাম। ইন্টারক্লাসে চলাই আমি বেশি

পছন্দ করতাম। বেশি সংখ্যায় শিক্ষিত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত লোক সেখানেই পাওয়া যায়। এ দেশের লোকেরা যেখানেই বসে, চুপচাপ থাকতে পারে না; আলাপ-সালাপে পরিবেশ সরগরম করে তুলে। লন্ডনে দেখলাম এর সম্পূর্ণ বিপরীত। গাড়িতে বা বাসে একসাথে বসে আছে, কারো সাথে কেউ কথা বলছে না। বেশি সংখ্যক লোকের হাতেই বই বা পত্রিকা, বসে বসে পড়ছে। টিউবে (মাটির নিচের ট্রেন) ভিড় হলে অনেককেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এতো লোক একসাথে, অথচ হৈ চৈ তো দূরের কথা, কথা-বার্তায় মশগুলও দেখা যায় না। এটাই ঐ দেশের লোকের স্বভাব।

আমি দেশে ট্রেনে চলার কথা বলছিলাম। সফরে বই পড়ে সময় কাটাবার বিরাট সুযোগ। কর্মজীবনে তো ছাত্রজীবনের মতো নির্দিষ্ট সময় নিয়ে পড়ার টেবিলে বসা সম্ভব হয় না। বই সাথে রাখলে যখনি সময় পাওয়া যায় পড়ার সুযোগ নেওয়া সম্ভব। ট্রেনে বই পড়ার সময় যাতে অন্য যাত্রীদের কথাবার্তার কারণে আমার মনোযোগে ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্য সবার হাতেই বই তুলে দিতে চেষ্টা করতাম। এতে তারা আলাপ-সালাপ বন্ধ করে বইয়ের দিকে মন দিতো। আমি লক্ষ্য রাখতাম যে, কে কে মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছে। দেখা যেতো, কয়েক মিনিটের মধ্যেই কিছু লোক বই হাতে রেখেই ঘুমে ঝিমুচ্ছে। ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে প্রায় সবাই হয় ঘুমাচ্ছে আর না হয় বই বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছে। সামান্য কয়েকজনকেই হয়তো দেখা যেতো বইপড়া অব্যাহত রেখেছে। আমি এ কয়জনের নাম-ঠিকানা যোগাড় করে সেখানকার দায়িত্বশীলকে পাঠাতাম যোগাযোগ করার জন্য। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বই কিনেও নিতো। বেশি আগ্রহী মনে হলে বিনা মূল্যেও বই দিতাম। বিক্রয়ের জন্য যথেষ্ট বই সঙ্গে রাখতাম।

কলেজ টিচার্স এসোসিয়েশন গঠনে কর্মব্যস্ততা

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে আগত কলেজ-শিক্ষক প্রতিনিধিদের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে তুলবার প্রসঙ্গ নিয়ে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী প্রবণতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে কতকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই অনেক কথা বলে ফেললাম।

ডেলিগেটদের প্রথম অধিবেশনে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আখতার হামিদ খানই সভাপতিত্ব করলেন। সংগঠন করার পক্ষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়। গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটিতে আমাকে শামিল করা হলো। কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন কুমিল্লা কলেজেরই ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক আসহাবুদ্দীন আহমদ।

সম্মেলনের আহ্বায়ক কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল আখতার হামিদ খান ও সেক্রেটারি ছিলেন ঐ কলেজেরই ইতিহাস বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক। দু'দিনের মধ্যে দেড় দিন অবিরাম বৈঠক। আলোচনা ও বিতর্কের পর সংগঠন কায়েম হয়ে গেলো। সর্বশেষ ডেলিগেট অধিবেশনে প্রিন্সিপ্যাল আখতার হামিদ খান বিদায়ী বক্তব্য পেশ করেন। তার বক্তৃতা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও উপদেশমূলক ছিলো।

বলাবাহুল্য, শুধু তার বক্তৃতাই নয়, সম্মেলনের গোটা কার্যক্রম ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। আখতার হামিদ খান সবশেষে একটু রসিকতা করে বললেন, "Let me make a prophecy, I have marked the role of Professor Ashabuddin Ahmad and Professor Ghulam Azam during the sessions of this conference. I think teaching profession will not be able to bind them for long, they will prefer political career.

তার এ ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের দু'জনের বেলায়ই সত্যে পরিণত হয়। অধ্যাপক আসহাবুদ্দীন আহমদ কমিউনিস্ট পার্টির আন্ডার গ্রাউন্ড নেতা ছিলেন। কয়েক বছর আগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমি মাত্র আড়াই বছর পরই জামায়াতে ইসলামীর সার্বক্ষণিক দায়িত্ব নিয়ে অধ্যাপনার জীবনে ইতি টানতে বাধ্য হলাম।

সম্মেলনের শেষ দিন বিকেলে কুমিল্লা টাউন হল ময়দানে প্রিন্সিপ্যাল আখতার হামিদ খানের সভাপতিত্বে এক সুধী সম্মেলন হয়। তিনি এ সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন। ভাষণটি মুদ্রণ করে সুধীদের মধ্যে বিলি করা হয়। সুধীগণের মধ্যে ইংরেজি ভাষার আজীবন শিক্ষক আমার আত্মীয় জনাব আবদুস সুবহান উপস্থিত ছিলেন। তিনি ৩০ বছর চৌদ্দগ্রাম থানার চিওড়া হাইস্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। তার বড় ছেলে ডা. আবু আহমদ আবদুল হাই আখুন্দ আমার ভগ্নিপতি। আমি তালই সাহেবের অত্যন্ত স্নেহভাজন পুত্রা ছিলাম। তিনি আমার সাথে ইংরেজিতে পত্র-বিনিময় করতেন। চমৎকার ইংরেজি লিখতেন। আখতার হামিদ খানের ইংরেজি উদ্বোধনী ভাষণটির মুদ্রিত কপি হাতে নিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন, "ইংরেজি ভাষার শিক্ষক হিসেবে এ ভাষণের দু'টো গুণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। একটি হলো ছোট ছোট বাক্য, অপরটি হলো সহজবোধ্য ভাষা। জটিল বাক্য ও কঠিন ভাষা প্রশংসনীয় নয়।"

১৯৫৭ সালে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া তোফাইল মুহাম্মদের কুমিল্লায় সফর উপলক্ষে কুমিল্লার ঐ কলেজে এক ছাত্র-শিক্ষক-সুধীসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আখতার হামিদ খান এতে সভাপতিত্ব করেন। মিয়া সাহেব উর্দুতে বক্তৃতা দিলেন, আমি বাংলায় অনুবাদ করলাম। সভাপতি ইংরেজিতে ভাষণ দিলেন। আলোচ্য বিষয় ছিলো ইসলামী শাসনতন্ত্র। আখতার হামিদ খান খুবই সাহসী, উদার ও ডাইনামিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

কলেজ শিক্ষক সম্মেলনের সুফল

উক্ত সম্মেলনে কলেজ টিচার্স এসোসিয়েশন গঠিত হলেও এ সংগঠন তেমন কর্মতৎপরতার পরিচয় দিতে পারেনি। যারা দায়িত্বশীল হলেন, তারা সময় দিতে পারেননি। সংগঠন গড়া অত্যন্ত কঠিন। দায়িত্বশীলগণকে ব্যাপক সফর করতে হয়। কিছু লোক অবিরাম কর্মতৎপর না থাকলে সংগঠনের সম্প্রসারণ তো দূরের কথা, এর অস্তিত্বই টিকে থাকে না। স্বাভাবিক কারণেই এ সংগঠন স্থবির হয়ে যায়।

কিন্তু এ সম্মেলন উপলক্ষে বহু কলেজের অধ্যাপকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠায়, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের কলেজগুলোতে আমি তমদ্দুন মজলিসের দাওয়াত নিয়ে সুফল পেয়েছি। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ, বগুড়া আযীযুল হক কলেজ, দিনাজপুর কলেজ প্রভৃতিতে গেলে পূর্ব-পরিচিত অধ্যাপকগণের সহযোগিতায় কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সভাপতিত্বে ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে আমার বক্তব্য রাখা ও প্রশ্নের জওয়াব দেবার সুযোগ হয়েছে।

তখনো কলেজের পরিবেশে ইংরেজি ভাষারই পূর্ণ প্রভাব ছিলো। তাই আমাকে ইংরেজিতে বক্তব্য রাখতে হয়। আমার আলোচ্য বিষয় ছিলো, 'Location of Sovereignty' (সার্বভৌমত্বের অবস্থান)। বিষয়টা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের। আমি এ বিষয়েই অধ্যাপনা করছি। এ বিষয়টা তখন আমার সবচেয়ে প্রিয়। প্রফেসর লাস্কির বই-এর জোরালো যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করলাম যে, বাস্তবে রাষ্ট্রের কোন সংস্থাই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী নয়। সার্বভৌমত্ব এমন একটি ধারণা, যার বৈশিষ্ট্যগুলো কোন রাষ্ট্রপ্রধান, পার্লামেন্ট বা জনগণের মধ্যে পাওয়া যায় না। লাস্কি তো ঘোষণা করে দিলেন, Sovereignty is Absent; কিন্তু এতে এতো বড় বিষয়টার মীমাংসা হয়ে যায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে Characteristics of sovereignty হিসেবে যেসব পয়েন্ট স্বীকৃত আছে, তা মানুষের মধ্যে বাস্তবে আছে বলে প্রামাণ করা সম্ভব নয়; তাই বলে সার্বভৌমত্বের ধারণাটাই অনুপস্থিত নয়। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলে স্বীকার না করলে Location of Sovereignty সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব নয়।

আমি বিভিন্ন কলেজে এ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার পর শ্রোতাদের প্রশ্নের সন্তোষজনক জওয়াব দেবার মতো জ্ঞান মাওলানা মওদূদীর 'পলিটিকেল থিওরী অব ইসলাম' বইটি থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। তমদ্দুন মজলিসের এ বিপ্লবী দাওয়াত পৌঁছাবার মধ্যে আমি অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করতাম। তমদ্দুন মজলিসের নাম ও পরিচিতি এভাবেই উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে প্রফেসর লাস্কির সিদ্ধান্ত Location of Sovereignty-র যে সমস্যা রয়েছে এর কোন সমাধান নয়। Sovereignty is Absent বলে তিনি যে ফায়সালা দিলেন এর একটা উপমা দেওয়া যায়। যেমন এক রোগীর চিকিৎসায় অনেক ডাক্তার ব্যর্থ হবার পর এক ডাক্তার এমন এক ইনজেকশন দিলেন যে, রোগী মারাই গেলো। তখন গৌরবের সাথে ঐ ডাক্তার দাবি করলো যে, এখন আর কোন রোগই নেই। লাশের তো কোন রোগ থাকে না। তাই ডাক্তারের দাবি সঠিক।

চিন্তাবিদ, গবেষক ও সাধকদের মধ্যে যারা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন, তাদের ভুল করার সম্ভাবনা অবশ্যই রয়েছে। ডিভাইন গাইডেন্সের যারা ধার ধারে না তারা কোন সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে এক চরম থেকে অন্য চরমে গিয়ে পৌঁছে। তারা ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থার নাগাল পায় না।

হবস, লক ও রুশোর মতো সমাজবিজ্ঞানীরা সরকারকে শুধু ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্ব দিয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে এমন সমাজ ব্যবস্থার ফর্মুলা দিলেন, যার ফলে অর্থনীতিতে চরম পুঁজিবাদ ও রাজনীতিতে স্থবিরতা সৃষ্টি হলো। পুঁজিবাদী অর্থনীতির শোষণ থেকে মুক্তির দোহাই দিয়ে কার্ল মার্কস ও তার মতো সমাজবিজ্ঞানীরা যে সমাধান দিলেন, তাতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার কায়েম হলো এবং জনগণ অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক দাসত্বের শিকার হতে বাধ্য হলো।

ব্যক্তির স্বার্থ ও সামষ্টিক স্বার্থের সমন্বয়মূলক এবং ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে আল্লাহর দেওয়া বিধানের নিকটই ফিরে আসতে হবে। একমাত্র তিনিই নিরপেক্ষ ও সর্বজ্ঞানী। সকল পক্ষের হক যথাযথভাবে সংরক্ষণের বিধানই তিনি দিয়েছেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল (স) ঐ বিধান বাস্তবে কায়েম করে সে কথাই প্রমাণ করে গেছেন।

৫১.

ইসলামিক কালচারেল কনফারেন্স

১৯৫২ সালের মাঝামাঝি তমদ্দুন মজলিসে যোগদানের পর আমি উৎসাহের সাথে এর দাওয়াত ছড়াচ্ছিলাম। অক্টোবর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিখ্যাত কার্জন হলে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে 'ইসলামিক কালচারাল কনফারেন্স'-এ যোগদানের সুযোগ পেলাম।

১৭ অক্টোবর থেকে তিন দিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে তমদ্দুন মজলিসের সভাপতি দর্শনের অধ্যাপক দেওয়ান মুহাম্মদ আযরফ সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন লাহোরের দৈনিক তাসনীম পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা নাসরুল্লাহ খান আযীয।

তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি অধ্যাপক আবুল কাসেম আমাকে দায়িত্ব দিলেন ২০৫ নং নওয়াবপুর রোড থেকে লাহোর থেকে আগত মেহমানকে সম্মেলনস্থলে আনার জন্য। নওয়াবপুর রোডের ঐ ঠিকানায় জামায়াতে ইসলামীর অফিস ছিলো। আমি তাঁকে কার্জন হলে নিয়ে গেলাম ও উদ্বোধনের অল্প সময় পরই তাকে নওয়াবপুর রোডে দিয়ে এলাম।

তিনি উর্দু ভাষায় সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন। তাবলীগ জামায়াতে দিল্লি ও বিজনোরে চিল্লা দেবার সময় উর্দু শেখা শুরু হলেও ঐ উর্দু ভাষণ ভালভাবে বুঝতে পারিনি। অবশ্য ইসলামী আন্দোলনের জযবা বোধ করেছি। উদ্বোধনী বক্তব্যের পর কবি ফররুখ আহমদ রচিত একটি গান হারমোনিয়ামযোগে পরিবেশন করা হয়। গানটি কোরাসে গাওয়া হয়। গানের প্রথম কলিটি এখনও মনে আছে; "জামায়াত হয়েছে খাড়া, আজ শুধু ইমামত চাই।"

গানটির আবেদন

এ গানের আবেদন আমি ইসলামী আন্দোলনের জীবনে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি। মুসলিম জনতা ইসলামের বিজয় ও কুরআনের শাসন চায়। গোটা বিশ্বে যোগ্য ইসলামী নেতৃত্বের অভাবেই আল্লাহর দীন কায়েম হতে বিলম্ব হচ্ছে। যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলাই ইসলামী আন্দোলনের প্রধান দায়িত্ব। মুসলিম নামধারী ইসলামের দুশমনদের দ্বারা জনগণ বিভ্রান্ত হচ্ছে—এ কথা সত্যি। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জনগণ যাদেরকে ইসলামের পতাকাবাহী বলে জানে, তারা সবাই ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত ও সক্রিয় নন। তারা খেদমতে দীনের মহান দায়িত্ব পালন করছেন বটে, কিন্তু বাতিলের মোকাবিলায় দীনে হক প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে নেতৃত্বের কঠিন দায়িত্ব গ্রহণে সবাই এগিয়ে আসছেন না। যদি মসজিদের ইমামগণ, মাদ্‌রাসার উস্তাদগণ, খানকার পীরগণ, তাবলীগের মুবাল্লিগগণ এবং ওয়ায়েযগণ সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধভাবে ইকামাতে দীনের আন্দোলনে সক্রিয় হন, তাহলে বাতিল শক্তি পালাবার পথও খুঁজে পাবে না। আজ বাতিল শক্তি সর্বত্র বিজয়ী হয়ে দাপট দেখাতে সক্ষম হচ্ছে। দীনের খাদিমগণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের ময়দান বাতিলের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন বলেই এ দশার সৃষ্টি হয়েছে। আমি ঐ গানটির মধ্যে এ আবেদনই উপলব্ধি করি।

১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের কয়েক মাস পর রমযানের ছুটিতে ঢাকায় এলে ২০৫ নং নওয়াবপুর রোডে জামায়াতের অফিসে শিক্ষা-শিবিরে যোগদান করি। তখন জানতে পারলাম যে, ১৯৫২ সালে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার ৬ সদস্যবিশিষ্ট এক টীম জামায়াতের পক্ষ থেকে ইকামাতে দীনের দাওয়াত দেবার উদ্দেশ্যে পূর্ব-পাকিস্তানে এসেছিলেন। মাওলানা নাসরুল্লাহ্ খান আযীয ঐ টীমের একজন বলে বুঝতে পারলাম।

ইসলামী নেতৃত্ব-সংকট

ইকামাতে দীনের আন্দোলনে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমি উপলব্ধি করেছি যে, নেতৃত্ব দেবার যোগ্য লোক সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য। আল্লাহ্ তাআলা নেতা মার্কা লোক কমই সৃষ্টি করেছেন। নেতৃত্বের মৌলিক গুণাবলি জন্মগতভাবেই হাসিল হয়। রাসূল (স) ইরশাদ করেন, "মানব সমাজটা সোনা-রুপার খনির মতো। তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে শ্রেষ্ঠ, তারাই ইসলাম কবুলের পরেও শ্রেষ্ঠ, যখন তারা দীনের জ্ঞানী হয়।"

এ হাদীসের উপমাটি খুবই চমৎকার। খনিতে স্বর্ণ ও রৌপ্য ভেজাল মিশ্রিত থাকে। খনি থেকে আহরণ করার পর যখন ভেজালমুক্ত করা হয় তখন খাঁটি সোনা ও খাঁটি রুপাতে পরিণত হয়। কিন্তু যেটা জন্মগতভাবেই সোনা সেটাই খাঁটি সোনা হয়, রুপাকে সোনায় পরিণত করা যায় না।

মানব সমাজকে সোনা ও রুপার খনির সাথে তুলনা করে রাসূল (স) এ মহাসত্যই প্রকাশ করলেন যে, যারা মানবিক গুণাবলিতে সমৃদ্ধ তারা জন্মগতভাবেই সমাজে শ্রেষ্ঠ। এ জাতীয় লোক যখন ইসলাম গ্রহণ করে দীনের যথার্থ জ্ঞানার্জন করে, তখন তারাই সমাজে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করে। অর্থাৎ নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন লোক জন্মগতভাবেই নেতৃত্বের মৌলিক গুণের অধিকারী হয়। যাদের মধ্যে এ জাতীয় গুণ নেই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে বলেই ঐ সব মৌলিক গুণের অধিকারী হয়ে যায় না।

মৌলিক মানবীয় গুণ ও নেতৃত্বের যোগ্যতার অধিকারী হিসেবে রাসূল (স) দু'জন ওমরের অন্তত একজন যেনো ঈমান আনে—এ জন্য দোয়া করেছিলেন। ওমর বিন খাত্তাব ও ওমর বিন হিশাম ছিলেন ঐ দু'জন ব্যক্তি। আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-এর দোয়া ওমর বিন খাত্তাবের পক্ষে কবুল করলেন। অপর ওমর ইসলামের চরম দুশমনি করায় আবূ জাহল নামে কুখ্যাত হয়ে গেলো। ইসলামের বিপরীত হলো জাহিলিয়াত, এর মানে মূর্খতা। আবূ জাহল মানে মূর্খতার পিতা, অর্থাৎ চরম মূর্খ।

রেল বিভাগ কয়েকটি মাত্র ইঞ্জিন যোগাড় করে, কিন্তু বহু বগি কিনে, যাতে একটি ইঞ্জিন অনেক বগিকে টেনে নিতে পারে। আল্লাহ তাআলাও সমাজে ইঞ্জিন মার্কা লোক কমই বানান। ঘোড়া ও গাধা দেখতে প্রায় একই রকম; কিন্তু যোগ্যতায় বিরাট পার্থক্য । আল্লাহ যাকে গাধা হিসেবে পয়দা করেন, তাকে হাজারো ট্রেনিং দিলেও সে ঘোড়ায় পরিণত হবে না। ট্রেনিং-এর ফলে একটু চালু গাধা হতে পারে মাত্র।

ইসলামী আন্দোলনে ইঞ্জিন মার্কা বা ঘোড়া মার্কা লোক কমই আসে। কারণ যাদের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা থাকে তারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালেই আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ বাছাই করে নেয়। সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগই তারা তালাশ করে। আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে রওনা হবার পর তারা ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পেলেও এমনকি ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন করা ফরয বলে উপলব্ধি করা সত্ত্বেও এ পথে এগুতে হিম্মত করে না। কারণ এ পথ হলো আত্মত্যাগ ও বিপদসংকুল পথ। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ সম্পূর্ণ বিপরীত জযবার ধারক। এ কারণেই নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন লোক এ পথে আসতে চায় না। এ পথে বাতিলের সাথে সংঘাত অনিবার্য। জেল, জুলুম, হামলা ও বহু রকম আপদ-বিপদ এ পথের নিত্যসাথী।

নেতৃত্ব-সংকটের সমাধান

এ নেতৃত্ব-সংকট থেকে ইসলামী আন্দোলনকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই মাওলানা মওদূদী (র) ছাত্রদের পৃথক সংগঠন কায়েম করার ব্যবস্থা করেন এবং ছাত্র হিসেবে ভাল ফল করার সাথে সাথে মন-মগজ ও চরিত্রে খাঁটি মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠার পরামর্শ দেন। ঐ মহান উদ্দেশ্যে এ দেশেও ইসলামী ছাত্র সংগঠন কায়েম হয়।

আমার বাধ্যতামূলক নির্বাসন জীবনের ৬ বছর লন্ডনে থাকাকালে প্রতিবছর হজ্জের সময় জামায়াতের দায়িত্বশীলদের সাথে মক্কা শরীফে সাক্ষাৎ হতো এবং দেশের

অবস্থা পর্যালোচনা করে সে অনুযায়ী কর্মসূচি সম্পর্কে পরামর্শ হতো। ১৯৭৭ সালে ছাত্র সংগঠনের ঐ সময়কার দায়িত্বশীল আবু নাসেরের সাথে মক্কা শরীফে আলোচনা হয়। আমি তাকে পরামর্শ দিলাম যে, হাইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে ক্লাস সিক্স থেকেই মেধাবী ছাত্রদেরকে টার্গেট করে সংগঠনভুক্ত করা প্রয়োজন। কলেজ ও ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে পৌঁছে গেলে এ জাতীয় ছেলেদের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, এমনকি পেশা বাছাইও কিছুটা হয়। তাই স্কুল জীবনেই মেধাবী ছেলেদেরকে ইসলামী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

পাকিস্তান আমল থেকেই ইসলামী ছাত্র সংগঠন থাকায় ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার যোগ্য লোক তৈরি হওয়া সম্ভব হয়েছে। ২০০১ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর হিসেবে যিনি নির্বাচিত হলেন, তিনি ছাত্রজীবনে প্রাদেশিক নেতা হওয়ার পর দু'বছর নিখিল পাকিস্তান ছাত্র সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী একটানা ৪ কার্যকালে মোট ১২ বছর জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতৃত্বে আমি, জনাব আব্বাস আলী খান (র), জনাব শামসুর রহমান, মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ ও মরহুম আবদুল খালেক ছাত্র সংগঠনের ফসল ছিলাম না। আমরা যখন ছাত্র তখন ইসলামী ছাত্র সংগঠন ছিলোই না। আল্লাহর ফযলে বর্তমান সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ ইসলামী ছাত্রশিবিরেরই তৈরি। ক্লাস সেভেনের ছাত্র থাকাকালীন সে ছাত্র সংগঠনে সক্রিয় হয়। তখন থেকে আমি তাকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনি। পাঁচজন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেলদের ৪ জনই ছাত্র সংগঠনের তৈরি। ছাত্র জীবনটাই ফরমেটিভ পিরিয়ড। জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এ সময়েই নির্ধারিত হয়। এ সময়ই মন-মানসিকতা নির্দিষ্ট খাতে গড়ে উঠে। তাই যারা ছাত্রজীবনে ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় হয়, তারাই পরবর্তী জীবনে বড় দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করে। আমি আশা করি ইসলামী ছাত্রশিবিরের মাধ্যমে নেতৃত্বের শূন্যতা দূর হতে থাকবে।

কার্জন হলের সম্মেলনের বিবরণ

১৭ অক্টোবর (১৯৫২) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর তিনটি প্রধান অধিবেশন হয়। সাহিত্য অধিবেশনে অধ্যাপক কাযী মুতাহার হোসেন (পরে ডক্টর) সভাপতিত্ব করেন। লোক-সংস্কৃতি অধিবেশনে অধ্যাপক মনসুরুদ্দীন এবং সমাজবিজ্ঞান অধিবেশনে লাহোরের মাযহারুদ্দীন সিদ্দিকী সভাপতিত্ব করেন।

এ সব অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন অধ্যাপক মূল্যবান ভাষণ দেন। ঐ সব ভাষণ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়ে সম্মেলনেই বিলি হয়। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজবিজ্ঞানের এ সব অধিবেশনে যারা বক্তব্য পেশ করেন, তারা ইসলামী আদর্শকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে তুলে ধরেন। তখনও এ সব বিষয়ে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি রচিত হয়নি। তাই বলতে গেলে ঐ সব বক্তব্য নতুন

গবেষণারই পরিচয় বহন করে। এ কারণেই ঐ সম্মেলন বিশ্ববিদ্যালয় ও সুধী মহলে বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করে।

ঐ সম্মেলন উপলক্ষে বর্তমান পুরানো ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে একটি উন্মুক্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কে সভাপতিত্ব করলেন তা আমার স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে পারলাম না। বর্তমানে দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক জনাব হাসান ইকবাল ঐ জনসভা পরিচালনা করেছিলেন। তিনিও সভাপতির নামটা স্মরণ করতে পারলেন না। আমিও এ জনসভায় অন্যতম বক্তা ছিলাম।

পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, তমদ্দুন মজলিসের রাজনৈতিক চিন্তাধারা আমি প্রশান্ত মনে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছি। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই যে কালেমায়ে তাইয়েবার মর্মকথা তা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছি। কিন্তু ইসলামের অর্থনৈতিক মতবাদ হিসেবে কোন সুস্পষ্ট ধারণা তমদ্দুন মজলিসে থাকাকালে আমি পাইনি। সমাজবিজ্ঞান অধিবেশনে মীর শামসুল হুদার ভাষণ আমার চিন্তায় সমস্যাই সৃষ্টি করলো। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত তাঁর ভাষণটির শিরোনাম ছিলো Allah + Marxiam = Islamic Economy. এ দ্বারা স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হলো যে, মার্কস-এর অর্থনৈতিক মতবাদকে ইসলামী বলে গ্রহণ করা যায়। মার্কস নাস্তিক ছিলেন। তার মতবাদের নাস্তিকতাকে বর্জন করলেই চলে। ঐ অধিবেশনের সভাপতি জনাব মাজহারুদ্দীন সিদ্দিকীর লেখা Economic System of Islam বই ১৯৫৬ সালে পড়ে কিছু আলো পেয়েছিলাম। কিন্তু তখনই জানতে পারলাম যে, তিনি Socialistic Economy-কেই ইসলামী বলে মনে করছেন। এ কথা জানার পর তার ঐ বইটির আবেদনও আর অবশিষ্ট রইলো না।

আমি আরো জানতে পারলাম, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধির মতো বিপ্লবী আলেমও রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়ায় চলে যান এবং সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করেন। তিনি কিশোর বয়সে শিখ থেকে মুসলিম হন এবং মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন করে বড় আলেম হিসেবে স্বীকৃতি পান। এ থেকে বুঝা গেলো যে, ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় এ জাতীয় উন্নতমানের মুসলিমগণও পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেছেন।

দীর্ঘকাল থেকে বিশ্বে পুঁজিবাদের একচেটিয়া প্রাধান্যের ফলে মানব সমাজে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান বেড়েই চললো। শিল্প বিপ্লবের পর এর মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেলো। অল্পসংখ্যক শোষকের কর্তৃত্ব কায়েম হলো এবং জনগণ শোষণের শিকার হয়ে পড়লো। কার্লমার্কস পুঁজিবাদের কবল থেকে জনগণের মুক্তির জন্য সমাজতন্ত্রের যে সমাধান দিলেন, তা লেলিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় কায়েম হবার পর সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্বে চিন্তার রাজ্যে বিরাট এক বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে গেলো।

পুঁজিবাদ সবার নিকটই ঘৃণ্য। এমনকি পুঁজিবাদী নামে কেউ পরিচিত হতেও চায় না। পুঁজিবাদী শব্দটি রীতিমতো গালিতে পরিণত হয়েছে।

যারা ইসলামে বিশ্বাসী তাদের পক্ষে পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে ঘৃণা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় পুঁজিবাদের একমাত্র বিকল্প হিসেবে কেউ কেউ সমাজতন্ত্রকে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করলেও ইসলামের প্রতি বিশ্বাস হারাননি।

মাওলানা আকরাম খানের মতো ইসলামী চিন্তাবিদও ব্যাংকের সুদকে বৈধ বলে স্বীকার করা প্রয়োজন মনে করেছেন। অথচ পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিই হলো সুদ।

৫২.

হায়রে মৃত্যু

গত ১১ জানুয়ারিতে প্রকাশিত ৪৯ কিস্তিতে "বৃহত্তর পারিবারিক বৈঠক" শিরোনামে লেখায় আমার পঞ্চাশতম বিবাহবার্ষিকী পালনকে "এক অঘটন ঘটে গেলো" বলে উল্লেখ করেছি। গত ২৮ ডিসেম্বর (২০০১) ঐ পারিবারিক বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। আমার ও আমার স্ত্রীর অজান্তে গোপনে বিবাহ-বার্ষিকী পালনের ব্যাপারটিকে আমি রসিকতা করে 'ষড়যন্ত্র' বলে অভিহিত করেছিলাম। যে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে ঐ ষড়যন্ত্রকে সফল করেছিলো সে আমার তৃতীয় ভাই ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মুকাররামের স্ত্রী বলেও উল্লেখ করেছিলাম। তার আসল নাম সাকিনা খাতুন। 'সাকু' নামেই সবার নিকট পরিচিত।

এ মহিলাটি আমাদের বৃহত্তর পরিবারে সবচাইতে প্রাণবন্ত ছিলো। আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা, সবার খোঁজ-খবর নেওয়া, আপদে-বিপদে ও আনন্দ-খুশিতে সবার সাথে শরীক হওয়া তার অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিলো। গত ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত আব্বার বংশধরদের সমাবেশটিকে সে যে কৌশলের সাথে নির্দোষ আনন্দময় করে তুলেছিলো তা সবাই তৃপ্তির সাথে উপভোগ করেছে।

ঐ অনুষ্ঠানের সুখস্মৃতি আমাদের মধ্যে তাজা থাকতে থাকতেই ২৬ জানুয়ারি ঐ সজীবপ্রাণ মহিলা আপনজনদের মধ্যে বসা অবস্থায় হঠাৎ পাশে বসা তার বড় মেয়ে ফওজিয়ার গায়ে ঢলে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। হায়রে মৃত্যু!

মৃত্যুই সবচাইতে বেশি নিশ্চিত

মৃত্যুর মতো নিশ্চিত আর কিছু নেই। কখন, কোথায়, কীভাবে, কোন্ বয়সে, কী অবস্থায় কার মৃত্যু হবে তা কেউ জানে না। অথচ সবচেয়ে নিশ্চিত এ মৃত্যুকে আমরা প্রায় সব সময়ই ভুলে থাকি। আমরা জীবনে কতকিছু করার পরিকল্পনা করে থাকি। অথচ অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর জন্য মানসিক প্রস্তুতির কথা খেয়ালে রাখি না। এটা আল্লাহ তাআলার এক বিরাট মেহেরবানী যে, আমরা মৃত্যু অনিবার্য জেনেও তা ভুলে থাকি। তা না হলে সকল কর্মতৎপরতা বন্ধ করে মৃত্যুর প্রহর গুনতে গুনতে জীবনটা শেষ করে দিতে বাধ্য হতাম। আল্লাহ্ ও রাসূল (স) মৃত্যুকে স্মরণে রাখার তাগিদ অবশ্যই দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য ভিন্ন। পরকালে আল্লাহর নিকট দুনিয়ার

জীবনের যে হিসাব দিতে হবে, সে কথা স্মরণ রেখে যেন আমরা চলি, সে উদ্দেশ্যেই মৃত্যুকে স্মরণ করতে বলা হয়েছে। রাসূল (স) বলেছেন, "বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি, যে আত্মসমালোচনা করে এবং প্রতিটি কাজ করার সময় এ হিসাব করে যে, মৃত্যুর পর এর ফল কী পাওয়া যাবে।" দুনিয়ায় কী পাওয়া যাবে, মানুষ সাধারণত এ হিসাবই করে থাকে। "নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক"— এ চিন্তা বুদ্ধিমানের পরিচায়ক নয়। প্রত্যেক কাজেরই শুধু তাৎক্ষণিক লাভ দেখাটা বোকামি। মৃত্যুর পর আমার কাজের কী প্রতিদান পাবো সে হিসাব করে কাজ করলে বিবেকের বিরুদ্ধে চলা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। মানুষ দুনিয়ার লাভটা শুধু হিসাব করে বলেই অপরাধে লিপ্ত হয়।

সাকুর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া

আলহামদু লিল্লাহ! মৃতের স্বামী ও ছেলে-মেয়েরা কোন রকম অধৈর্যের পরিচয় দেয়নি। ঈমানের দাবি অনুযায়ী তারা আল্লাহর এ সিদ্ধান্তকে যেভাবে গ্রহণ করা কর্তব্য, সেভাবেই গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। কান্নাকাটিতে কেউ শরীআতের সীমা লঙ্ঘন করেনি।

দূর ও নিকটের সকল আত্মীয়ের নিকট সাকু যে এতো প্রিয় ছিলো, তা আমার এমনভাবে জানা ছিলো না। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এ বিষয়ে যে প্রতিক্রিয়া দেখলাম তাতে সাকুকে হারাবার বেদনা সবাই গভীরভাবে অনুভব করেছে বলে উপলব্ধি করলাম। এমন মৃত্যুই সার্থক। কেউ দুনিয়া থেকে বিদায় হলে তার অভাব যে পরিমাণ অনুভূত হয়, তার জীবন সে পরিমাণই সার্থক। সাকু যে নিকট ও দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও পরিচিত মহলে এতো জনপ্রিয় ছিলো তা আমাদের অনেকেরই জানা ছিলো না। এমনকি তাঁর স্বামী ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মুকাররামও বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছে যে, এমন কতক লোকও তার জন্য অঝোরে কেঁদেছে যাদেরকে আমি চিনিও না। সত্যি সাকু খুবই ভাগ্যবতী। যত লোক তার তিরোধানে ব্যথিত হয়েছে, তাদের দোয়া অবশ্যই সে পাচ্ছে ও পেতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

সাকু সম্পর্কে সবাই বলছে যে, সে সবারই কল্যাণ কামনা করতো, কারো বিরুদ্ধে সামান্যতম বিদ্বেষও পোষণ করতো না। তার কথায় ও ব্যবহারে কেউ অসন্তুষ্ট হতো না। এরই নাম সুন্দর চরিত্র। রাসূল (স) বলেছেন, "যার চরিত্র যত সুন্দর তার ঈমান তত পূর্ণ।" এ জাতীয় মানুষের জন্য পরিচিত সবার অন্তর থেকেই স্বতঃস্ফূর্ত দোয়া বের হয়।

সাকুর মৃত্যুতে আমার স্ত্রী এতো বেদনা বোধ করেছে যে, সন্ধ্যায় মৃত্যুর পর ঐ বাড়িতে মধ্যরাত পর্যন্ত অবিরাম কেঁদেছে। সারারাত ঘুমাতে পারেনি। শেষ রাতে এলার্ম বাজলেও ঘুম হয়নি বলে এলার্ম বন্ধ করে শুয়ে থাকলো। সাড়ে পাঁচটায় ফজরের আযানের পর অস্থির হয়ে বলল, "আমাকে একটু ফুঁ দিন, আমার বুক ধড়ফড় করছে। আমি দোয়া পড়ে কয়েকবার ফুঁ দিলাম। সে রাতে ঠিকমতো খেতে পারেনি। সকালে নাশতাও করতে চায়নি।

সাকুর সাথে আমার স্ত্রীর সম্পর্ক ছিলো আপন ছোট বোনের মতো। আমাদের বাড়ির এক বাড়ি পরই ওদের বাড়ি। ঘন ঘন যাতায়াত করতো। আমাকে আপন বড় ভাইয়ের চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা করতো। প্রায়ই খাবার জন্য এটা ওটা পাঠাতো। আমার স্ত্রীর অবস্থা দেখে আমি অনুভব করলাম যে, সে তার ঘনিষ্ঠতম বান্ধবী ও একান্ত আপনজনকে হারাবার গভীর যাতনা বোধ করছে।

আত্মীয়-স্বজনের জন্য সাকুর এতো মায়া-মমতা ছিলো যে, তার মৃত্যু সবাইকে শোকাতুর করেছে। আমার তৃতীয় বৌ-মা নাহার ১৯৯৬ সালে বিদেশে যাবার পূর্ব পর্যন্ত এখানে থাকাকালে সাকু ও তার মেয়েদের সাথে এতো সময় কাটাতো যে, সে ওর মৃত্যুর খবর পেয়ে ম্যানচেস্টার থেকে ফোনে ওর ননদদের সাথে কান্নার প্রাবল্যে ঠিকমতো কথা বলতেই পারলো না। ম্যানচেস্টার থেকে আমার চার ছেলে ও বৌ-মা'রা সবাই ঐ বাড়িতে ফোন করে তাদের আবেগ প্রকাশ করেছে। আমার ভাই ও সাকু ম্যানচেস্টারে আমার ছেলেদের বাসায় গত ১৯৯৮ সালে বেড়িয়ে আসায় তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়ে যায়। তারা দেশে ফিরে এসে তাদের গভীর মহব্বতের কথা অত্যন্ত খুশি হয়ে আমাদেরকে বলেছে।

আমার ভাইটি সাথীহারা হয়ে গেলো

আমার ভাইয়ের বয়স এখন (২০০২) ৭২ বছর এবং সাকুর বয়স ৬৪ বছর। ওদের বিয়ে হয় ১৯৫৮ সালে। আমরা ৪ ভাই। এ ভাইটি তৃতীয়। আমার চেয়ে ৭ বছরের ছোট। আমার বিয়ের ৭ বছর পর ওর বিয়ে হয়। ঘটনাক্রমে আমাদের দু'জনের বিয়েই ২৮ ডিসেম্বরে হয়।

রাসূল (স) ইরশাদ করেন, "আমার উম্মতের বয়স ৬০ থেকে ৭০ বছর হবে। এর চেয়ে বেশি বয়স খুব কম লোকই পাবে।" সে হিসেবে সাকুর মৃত্যুকে অকালমৃত্যু বলা যায় না। আসলে কারো মৃত্যুকেই অকাল বলা উচিত নয়। আল্লাহ যার মৃত্যু যখন নির্ধারণ করেন, সেটাই তার মৃত্যুকাল। অল্প বয়সে মারা গেলে আমরা অকালমৃত্যু বলে থাকি। এ ভাষায় বলাটা সঠিক নয়। এতে আল্লাহর প্রতি দোষারোপ করা হয়ে যায় যে, সময় হবার আগেই মৃত্যু দেওয়া হলো। কম বয়সে মারা গেছে বলে আফসোস করায় কোন দোষ নেই; কিন্তু অকালমৃত্যু বলা চলে না।

সাকু তার চেয়ে বেশি বয়সের অনেক মুরব্বীর জানাযা ও দোয়া পেলো। ওর জন্য তো এটি বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। কোন কোন মহিলা স্বামীর আগে নিজের মৃত্যু কামনা করে থাকে, যাতে স্বামীর দোয়া পেতে পারে। সাকুর বিদায় হয়ে যাবার দুঃখের চেয়ে আমার বেশি দুঃখ আমার সাথীহারা ভাইটির জন্য। আমাদের ৪ ভাইয়ের মধ্যে স্বাস্থ্যের দিক থেকে এ ভাইটি সবচেয়ে দুর্বল। ১৯৮০ সালে সে কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অবসরগ্রহণ করেছে। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানিতে কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেছে। গত দু'বছর থেকে সে সম্পূর্ণ অবসর।

সাকু তার স্বামীর সার্বক্ষণিক সাথী তো ছিলোই, উপরন্তু সবদিক দিয়ে এতোটা খেদমত করতো যে, মুকাররাম সব ব্যাপারেই সাকুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে গেলো। খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করতো। এটা আর একটু খান, এটা তো খাননি, এত কম খেলে কেমন করে চলবে ইত্যাদি বলে খাওয়াতো। বাইরে গেলে কোন্ জামাটা পরবে তাও সাকু বাছাই করে দিতো। এভাবে ২৪ ঘণ্টা তার দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করতো। সাকুর দাফনের পরের দিন বেলা ২টায় মুকাররামের বাড়িতেই আমি তার সাথে খেলাম। সে একজন শিশুর চেয়েও কম পরিমাণের ভাত নিয়ে ছোট্ট ছোট্ট লুকমা বানাচ্ছিল। খাবার দিকে মনোযোগ নেই। আমার সাথে অবিরাম কথা বলছে। আমি তাগিদ দিলাম যে, আগে খাওয়াটা শেষ কর। আমার খাওয়া হয়ে যাচ্ছে, তোমার খাওয়া মোটেই হচ্ছে না। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, "যদি ও এতো যত্ন না করতো তাহলে আমি ওর অভাব এতোটা বোধ করতাম না। ওর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করায় অভ্যস্ত না হলে ভাল হতো।"

আমি পরামর্শ দিয়েছি যে, এখন তুমি দয়াময় আল্লাহ্ তাআলাকে সাথী হিসেবে অনুভব করার চেষ্টা করো। আমি দোয়া করছি, আল্লাহ্ তাআলা যেন তোমার সাথী হয়ে যান। কতক এমন দোয়া বেশি করে করার পরামর্শ দিয়েছি, যা তাকে আল্লাহর নৈকট্য অনুভব করতে সাহায্য করবে।

বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী হারানো

৬০ থেকে ৭৫ বছর বয়সে যারা স্ত্রী হারিয়েছেন এমন কতক আত্মীয়, বন্ধু ও পরিচিত লোকের অবস্থা অবগত হওয়ার পর আমি এ মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছি যে, "শৈশবে পিতা মারা গেলে যে এতীম হয় তা সবাই জানে; কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী মারা গেলেও যে এতীম হয়, সে কথা সবাই উপলব্ধি করে না।"

স্ত্রী হলো জীবনসাথী। তাই স্ত্রী মারা গেলে বেশি বয়সেও মানুষ আবার বিয়ে করতে বাধ্য হয়। স্বামী-সন্তান রেখে মারা গেলে বিধবা স্ত্রী সন্তানদের মায়ায় আবার বিয়ে বসতে চায় না।

আমার জেঠস অধ্যাপিকা যাকিয়া খাতুন মাত্র ২৪ বছর বয়সে বিধবা হয়ে গেলেন।

দু'বছর ও ৫ মাসের দু'টো ছেলের স্বার্থ বিবেচনা করে গোটা জীবনটাই কুরবানী করলেন। তাঁর এ কুরবানী ব্যর্থ হয়নি। তাঁর দু'টো ছেলেই সবদিক দিয়ে তাঁর গৌরবের পাত্র। বিধবা হবার সময় যাদের বয়স ৪০ পার হয়ে যায়, তারা নিঃসন্তান হলেও আর বিয়ে বসতে আগ্রহী থাকেন না। অবশ্য নিরাশ্রয় হলে বাধ্য হয়ে আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

আমার আব্বার ইন্তিকালের ১৫ বছর পর আম্মার ইন্তিকাল হয়। আম্মার খেদমতের কোন ত্রুটি হয়নি। আম্মা জীবনসাথীকে হারালেও নিঃসঙ্গ হয়ে যাননি। পুত্র-কন্যা, বৌ-মা ও নাতি-নাতনী পরিবেষ্টিত অবস্থায় খুশিই ছিলেন। শেষ বয়সে দু'বছর যখন শয্যাগত ছিলেন তখন বাড়ির লোকদের সেবা ছাড়াও সব সময় সাথে থাকার জন্য

খেদমতের যোগ্য একটি কাজের মেয়ে রেখে দেওয়ায় কোন অসুবিধা হয়নি।

কিন্তু আমার শাশুড়ির ইন্তিকালের পর শ্বশুর সাহেবের ১৫ বছরের সাথীহারা জীবন দেখে আমার খুবই মায়া লাগতো। পুরুষের শেষ বয়সে, বিশেষ করে বিছানায় পড়ে গেলে, যে খেদমতের প্রয়োজন হয়, তা একমাত্র স্ত্রীকে দিয়েই স্বাভাবিক হয়। তাই আমার ভাইটি ৭২ বছর বয়সে সাথীহারা হওয়ায় তার জন্য এত মায়া লাগছে যা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

আমার দাদা ও আব্বা দোয়া করতেন, যেন শেষ বয়সে স্ত্রীর খেদমত থেকে মাহরূম না হন। আল্লাহ তাআলা তাদের দোয়া কবুল করেছেন। আমি ও আমার ছোট ভাই ডা. মুয়ায্যাম এ দোয়াই করছি।

প্রৌঢ় বয়সে বিয়ে

৫০ থেকে ৬৫ বছর বয়সটাকে সাধারণত প্রৌঢ় বয়স মনে করা হয়। ৭০ হয়ে গেলে বৃদ্ধ বয়স নিশ্চিত হয়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ৭০ বছর বয়স হয়ে গেলে চেহারা ও চামড়ায় বার্ধক্যের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠে। স্বাস্থ্য খারাপ থাকলে তো ৫০ বছর বয়সেই বৃদ্ধ হয়ে যায়।

আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত মহলে প্রৌঢ় বয়সে যারা স্ত্রী হারিয়েছেন তাদের মধ্যে যারাই বিয়ে করতে চেয়েছেন তাদের সন্তানরা এর বিরোধিতা করেছে। ফলে বিয়ের পর সন্তানদের থেকে আলাদা বাড়িতে থাকা সমীচীন মনে করেছেন। সন্তানদের সম্মতি নিয়ে বিয়ে করলেও তারা নতুন মাকে অন্তর থেকে মেনে নিতে পারে না। এর ব্যতিক্রম কমই দেখা যায়।

সন্তানরা এটা উপলব্ধি করে না যে, তাদের পিতার জীবনসঙ্গিনী প্রয়োজন। তাদের তো এ বয়সের কোন অভিজ্ঞতা নেই। প্রৌঢ় বয়সের পিতাকে বিয়ে করাবার জন্য পিতার দরদি সন্তানদেরই উদ্যোগ নেওয়া উচিত। বিয়ের প্রয়োজন অথচ সন্তানরা এতে রাজি নয়, এমন পরিস্থিতি পিতার জন্য চরম মানসিক যাতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সন্তানরা মন্তব্য করে, "এক বছর না যেতেই আব্বা কেমন করে আম্মাকে ভুলে গেলেন?" তাদের আম্মা তো একজনই। তারা মাকে ভুলতেই পারে না। কিন্তু তাদের পিতার তো একাধিক স্ত্রী হতেই পারে। আবার বিয়ে করতে চায় বলেই প্রথম স্ত্রীকে ভুলে গেছে মনে করা অযৌক্তিক। রাসূল (স) সবচেয়ে বেশি স্মরণ করতেন তাঁর প্রথমা স্ত্রীকে অথচ তিনি এরপরও অনেক বিয়ে করেছেন।

সাকুর সুন্দর মৃত্যু

সাকুর মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত ও শোকাতুর হওয়া সত্ত্বেও তার সুন্দর মৃত্যু আমাদের জন্য বিরাট সান্ত্বনার বিষয়।

রাসূল (স) দু'রকম মৃত্যু থেকে আশ্রয় চেয়েছেন। হঠাৎ মৃত্যু এবং দীর্ঘদিন বিছানায় পড়ে থেকে মৃত্যু। এ দু'রকম মৃত্যু থেকে সবারই আল্লাহর দরবারে পানাহ

চাওয়া উচিত। হঠাৎ মৃত্যু হলে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নেবার সুযোগ পাওয়া যায় না। আত্মীয়-স্বজনও অনেক বেশি মনোকষ্ট ভোগ করে। বিশেষ করে মৃতের দেনা-পাওনা সম্পর্কে কাউকে কিছু বলে যাওয়া সম্ভব হয় না। আর দীর্ঘদিন শয্যাগত থাকলে রোগীর কষ্ট তো ভোগ করতে হয়ই, উপরন্তু গোটা পরিবারই অচল হয়ে পড়ে।

সাকু প্রায়ই বলতো যে, আল্লাহ যেন তাকে বেশিদিন বিছানায় ফেলে না রাখেন। তার এ দোয়া কবুল হয়েছে। তার মৃত্যু একেবারে হঠাৎ করেও হয়নি। তার স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিলো। সামান্য ব্লাড প্রেসার ছাড়া বড় কোন রোগ ছিলো না। ১৯৯৭ সালে তার বড় মেয়ে ফওজিয়ার সারা দেহে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছে বলে আমেরিকা থেকে খবর আসলো। সাকুর একমাত্র ছেলে সালেহর স্ত্রী রিপা ফওজিয়ার বাড়িতে বেড়াতে গেলো। রিপা পেরেশান হয়ে ওর আম্মাকে (সালেহ'র শাশুড়িকে) ফোনে খবর দিলো। তিনি হঠাৎ করে চরম অস্থিরতা প্রকাশ করে সাকুকে খবরটা দেবার সাথে সাথে সাকু বুকে আচমকা এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো। এরপর থেকেই হার্ট প্রবলেম শুরু হয়। আল্লাহর অসীম দয়ায় ফওজিয়া মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এলো। লাশের খাটিয়া এবং কাফনের কাপড় হাসপাতালে রেডি রাখা হয়েছিলো।

হার্টের চিকিৎসার জন্য দু'বার সাকু ভারতেও গিয়েছে। বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শেটি অপারেশনের প্রয়োজন নেই বলার পর কয়েক বছর ভালই ছিলো। মৃত্যুর মাত্র ২ সপ্তাহ পূর্বে প্রচণ্ড ব্যথা হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ২ বারে বেশ কয়দিন ইন্টেনসিভ কেয়ারে থাকার পর ডাক্তার এ কথা বলে বাড়িতে আসার অনুমতি দেয় যে, "আপনার হার্ট শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ কাজ করছে। খুব ধীরে হাঁটবেন, কথা যতটা সম্ভব আস্তে বলবেন।" এ দু'টোই তার অভ্যাসের বিপরীত। সে বলতো যে, এভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ?

মৃত্যুর ঘণ্টাখানেক আগে আসরের সালাত আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করার পর নিজের বিছানায়ই দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলো। তার অসুখের খবর পেয়ে ফওজিয়া পাঁচ দিন আগে আমেরিকা থেকে আসার পর সব সময় মায়ের কাছেই থাকতো। সে তার মায়ের ডানপাশে গা-ঘেঁষে বসলো। বিছানায় সাকুর বড় বোন হাসিনা (ডা. মুয়াযযামের স্ত্রী), তাদের খালাত বোন ও ক'জন ভাগ্নী বসা। সাকু সবার কথা শুনছে। কখনো মুচকি হাসছে, কখনো খুব আস্তে কথা বলছে। সুন্দর একটা পরিবেশ সবাই উপভোগ করছে। হঠাৎ সাকু ডান দিকে কাত হয়ে ফওজিয়ার উপর ঢলে পড়লো। চোখ দু'টো বড় হয়ে গেলো। গলায় সামান্য একটু আওয়াজ শুনা গেলো। ব্যস। সবাই জোরে জোরে কালেমা তাইয়েবা উচ্চারণ করতে লাগলো। কানের কাছে কালেমা শুনানো হলো। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সবার সামনে বিদায় হয়ে গেলো।

কী সুন্দর মৃত্যু। দীর্ঘদিন বিছানায় পড়ে কষ্ট পেলো না। পরিবারের কারো বহুদিন সেবা নেবার দরকার হলো না। মানসিক অপ্রস্তুত অবস্থায়ও হঠাৎ মৃত্যু হলো না।

অবশ্য এ মৃত্যু আমাদের বৃহত্তর পরিবারে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। '৮৮ সালে আম্মা ইন্তিকাল করলেন সবচেয়ে বৃদ্ধা অবস্থায়। এরপর এটাই প্রথম মৃত্যু হলো এমন একজনের, যার চেয়ে বয়সে বড় আমরা বেশ কয়েকজন বেঁচে আছি। সে যেনো আমাদেরকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হবার তাগিদ দিয়ে গেলো।

৫৩.

তমদ্দুন মজলিসের ক্যাম্প

১৯৫৩ সালের রমযান মাসে চুয়াডাঙ্গা শহরে একটি হাইস্কুলে ১৫ দিনের ট্রেনিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ফকীর মুহাম্মদ নামক স্থানীয় এক সচ্ছল ব্যক্তি এর আয়োজন করেন। কয়েকজন ছাত্রসহ মোট ৩১ জন ১৫ দিন একসাথে ছিলাম। তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি অধ্যাপক আবুল কাসেমই এর পরিচালক ছিলেন। যারা শরীক ছিলেন তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম মনে পড়ছে। অধ্যাপক আব্দুল গফুর, অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার (কুষ্টিয়া), অধ্যাপক মুহম্মদ ইয়াকুব (কুষ্টিয়া—আইএ-তে আমার সহপাঠী) ও ছাত্রশক্তির সভাপতি ফরমানুল্লাহ খান।

ঐ ট্রেনিং ক্যাম্পে অধ্যাপক আবুল কাসেমই প্রধান আলোচক ছিলেন। স্রষ্টা, সৃষ্টিজগৎ ও মানুষ সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিসমৃদ্ধ বক্তব্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আলোচনার দায়িত্ব আমার উপর ছিলো। এভাবে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তি পালনের পর প্রতিটি বিষয়েই প্রশ্ন করা ও আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হতো।

এ জাতীয় ট্রেনিং ক্যাম্পে আমি অত্যন্ত উৎসাহবোধ করেছি। আমি উপলব্ধি করেছি যে, ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে লোক তৈরি করতে হলে এ জাতীয় শিক্ষা-শিবির খুবই জরুরি। ইসলাম যে সমাজ-বিপ্লবের আন্দোলন, তা সর্বপ্রথম তমদ্দুন মজলিসেই জেনেছি। ইতঃপূর্বে 'ইসলামী আন্দোলন' পরিভাষা কোথাও শুনিনি। ইসলাম যে শুধু ধর্ম নয়, তা তখন উপলব্ধি করলাম। তাবলীগ জামায়াতকে ইসলামের ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে এবং তমদ্দুন মজলিসকে ইসলামী আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করে এ উভয় সংগঠনেই যুগপৎ কাজ করছিলাম। রংপুরে এ দু'টোরই প্রধান দায়িত্বশীল হিসেবে আমি যথার্থ ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেছি।

দু'সংগঠন মিলে পূর্ণ ইসলাম

তাবলীগ জামায়াতে মন-প্রাণ সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়ে পূর্ণ ধর্মীয় আবেগের সাথেই কাজ করছিলাম। তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে বুঝার ফলে এতেও আন্তরিকতার সাথে আত্মনিয়োগ করলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, তমদ্দুন মজলিসে ধর্মীয় দিকটায় তাবলীগের মতো গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

চুয়াডাঙ্গা ক্যাম্পে ৩১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে আমরা মাত্র ৮/১০ জন রোযা রাখতাম এবং তারাবীর নামায আদায় করতাম। এর মধ্যে নেতৃস্থানীয় সবাই ছিলেন। অন্যরা মুসাফির হিসেবে রোযা না রাখা জায়েয মনে করতেন। অথচ আমরা ১৫ দিন সেখানে ছিলাম বলে মুসাফির হিসেবে গণ্য হতে পারি না। বেশ কয়েকজনের মধ্যে নামাযের ব্যাপারেও অবহেলা লক্ষ্য করেছি। নেতাদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করা হতো না।

ধর্মীয় দিকের গুরুত্ব কম বলেই আমি শুধু তমদ্দুন মজলিসে কাজ করা যথেষ্ট মনে করতে পারিনি। একই সাথে তাবলীগ জামায়াতে সক্রিয় থাকাও প্রয়োজন মনে করেছি। এভাবে দু'সংগঠন মিলে আমার জীবনে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার চেষ্টা করতে থাকলাম। ধর্মীয় দিক দিয়ে তমদ্দুন মজলিসে কম গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে কাসেম ভাইয়ের নিকট অভিযোগ করতাম। তিনি ধর্মীয় বিষয়ে চাপ দেওয়া সঠিক মনে করতেন না। ক্রমে ক্রমে সবাই সংশোধন হয়ে যাবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এ বিষয়ে তাঁর সাথে আমি বিতর্ক করলেও তাঁকে বলতাম, "আমি তমদ্দুন মজলিস ছেড়ে যাবো না। এ জাতীয় কোন সংগঠন আমার জানা নেই, যেখানে ইসলামের সকল দিকেই গুরুত্ব দেয়। তাই মজলিস ছেড়ে কোথায় যাবো?" অধ্যাপক ইয়াকুব ও অধ্যাপক আবদুস সাত্তারের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করে আমরা একমত হলাম যে, তমদ্দুন মজলিসেই আমরা থাকবো।

ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব

তমদ্দুন মজলিসের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলসহ যাদের সাথে ১৫ দিন কাটালাম তাদের সম্পর্কে আমার ধারণা হলো যে, এরা আন্তরিকভাবেই ইসলামকে ভালোবাসেন এবং আল্লাহ, রাসূল (স) ও কুরআনের প্রতি সবারই মযবুত ঈমান রয়েছে। তারা ইসলামকে জানার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী। অধ্যয়নের জন্য ইসলামী সাহিত্যের বড়ই অভাব ছিলো বলে আমার মতো তারাও ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। বিশেষভাবে ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা খুবই অস্পষ্ট রয়ে গেলো বলে আমি অস্বস্তিবোধ করছিলাম।

সমাজতন্ত্রের দু'টো মূলনীতি ইসলামে আছে বলে আমাদের ধারণা ছিলো ঃ

১. ব্যক্তি-মালিকানাই পুঁজিবাদী শোষণের মূল। তাই ইসলামে ব্যক্তি-মালিকানা থাকা স্বাভাবিক নয়। কারণ শোষণের মতো জঘন্য বিধান ইসলামে থাকতে পারে না। "লিল্লাহি মা ফীস্‌সামাওয়াতি ওয়াল আরদি," আয়াতটি ব্যক্তি-মালিকানার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা বলে আমরা বিশ্বাস করতাম। ঐ আয়াতটির অর্থ হলো, "আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, এ সবের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর।"

২. শ্রমই (Labour) উৎপাদনের একমাত্র উপাদান (factor) বলে আমরা ধারণা করতাম। পুঁজির বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষ সৃষ্টি করার জন্যই সমাজতন্ত্রে পুঁজিকে Factor of Production বলে স্বীকার করা হয় না। এ মূলনীতির পক্ষে "লাইসা

লিল ইনসানি ইল্লা মা সাআ," আয়াতটি আমরা প্রয়োগ করতাম। এর অর্থ হলো, "শ্রম ছাড়া মানুষের জন্য কিছুই নেই।" অর্থাৎ একমাত্র শ্রমই উৎপাদনের উপাদান এবং যে শ্রম দেবে না সম্পদে তার কোন অধিকার নেই।

১৯৫৪ সালের এপ্রিলে আমি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর ১৯৫৬ সালে গিয়ে ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পেলাম।

১৯৫৬ সালের জানুয়ারিতে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী সর্বপ্রথম পূর্ব-পাকিস্তানে আসেন। তিনি ২০৫ নং নওয়াবপুর রোডস্থ জামায়াতে ইসলামীর অফিসেই অবস্থান করছিলেন। তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা কাসেম ভাই মাওলানার সাথে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে বললেন। আমি অবিলম্বে ব্যবস্থা করলাম এবং সাক্ষাতের সময় উপস্থিত রইলাম।

কাসেম ভাই প্রথমে "লাইসা লিল ইনসানি ইল্লা মা সাআ" আয়াতটি উল্লেখ করে শ্রমকে উৎপাদনের একমাত্র উপাদান হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। মাওলানা অত্যন্ত দরদভরা ভাষায় বললেন, "আরে ভাই! এ আয়াতটি কুরআনে যত জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে, সর্বত্রই আখিরাতের প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে। আখিরাতে প্রত্যেকেই একমাত্র তাই পাবে, যা সে নিজে অর্জন করেছে। একজনের দোষের বোঝা অন্যের উপর যেমন চাপানো হবে না, তেমনি নিজে নেক আমল না করলে অন্যের আমল দ্বারা কেউ পার পাবে না। এ নীতি দুনিয়ায় প্রয়োগ করলে শিশু, বৃদ্ধ ও কর্মে অক্ষম কোন মানুষই সামান্য সম্পদও পেতে পারে না। তাদের কোন অধিকারই থাকে না। অথচ আল্লাহ্ তাআলা তাদের হক গুরুত্বের সাথে নির্ধারণ করেছেন।"

এরপর কাসেম ভাই "লিল্লাহি মা ফিস্‌সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদি" আয়াত উদ্ধৃত করে ব্যক্তি-মালিকানা ইসলামে নেই বলে অভিমত প্রকাশ করলেন। মাওলানা বললেন, "কুরআনে তো স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীদের মালিকানা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ইসলামে সম্পদের ব্যক্তি-মালিকানা আল্লাহরই সিদ্ধান্ত। "লিল্লাহি মা ফিস্‌সামাওয়াতি ওয়াল আরদি" আয়াতটির সঠিক অর্থ না জানার ফলে ব্যক্তি-মালিকানা সম্পর্কে ভুল ধারণা হতে পারে। আল্লাহর মালিকানা নিরঙ্কুশ। মানুষের মালিকানা আল্লাহ্ তাআলার বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষকে ঐ আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে যে, তোমরা সম্পদের এমন নিরঙ্কুশ মালিক নও যে, স্বেচ্ছাচারী হয়ে যেমন খুশি তেমনিভাবে সম্পদকে ব্যবহার করতে পারো। সম্পদের আসল মালিক আল্লাহ্ এবং তিনিই তোমাকে সম্পদ দান করেন। সম্পদের উপার্জন ও ব্যয়ের ব্যাপারে তিনি যে বিধি-বিধান দিয়েছেন তা মেনে চলা মানুষের কর্তব্য। ঐ সব বিধি অমান্য করার কারণেই পুঁজিবাদ কায়েম হয়েছে এবং জনগণ শোষণের শিকার হতে বাধ্য হয়েছে।"

আমি মাওলানা মওদূদীকে তমদ্দুন মজলিস ও অধ্যাপক আবুল কাসেম সম্পর্কে

পূর্বেই ধারণা দিয়েছিলাম বলে মাওলানা কাসেম ভাইকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন। শিক্ষিত যুবকদেরকে ইসলামী আন্দোলনের দিকে ডাকার উদ্যোগ নেওয়ায় মাওলানা কাসেম ভাইকে মুবারকবাদ জানালেন। ১৯৫২ সালের অক্টোবরে কার্জন হলে তমদ্দুন মজলিসের সম্মেলন উদ্বোধন করার জন্য জামায়াত নেতা ও লাহোরের তাসনীম পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা নাসরুল্লাহ খান অযীযকে অতিথি হিসেবে দাওয়াত দেওয়ার কথা জেনে মাওলানা মওদূদী কাসেম ভাইয়ের প্রতি শুকরিয়া জানালেন।

তমদ্দুন মজলিসকে এখনো ভালোবাসি

আমি তমদ্দুন মজলিস থেকে পদত্যাগ করে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করলেও কখনো তমদ্দুন মজলিস সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য করিনি। আমার ইসলামী আন্দোলনের জীবনে তমদ্দুন মজলিসের অবদান একাধিক বইতে অকপটে স্বীকার করেছি। এখনো আমি তমদ্দুন মজলিসকে ভালোবাসি।

জামায়াতে ইসলামীর বাইরে যে ক'জনকে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে ভালোবাসি তাদের মধ্যে গফুর ভাই (মজলিসের সেক্রেটারি অধ্যাপক আবদুল গফুর) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত ২৮ জানুয়ারি (২০০২) গফুর ভাই আমার বাড়িতে আসায় খুবই আনন্দিত হয়েছি। ১৯৫২ থেকে আমাদের বন্ধুত্বের এখন ৫০ বছর পূর্ণ হলো। অনেক দিন থেকে তার আসার কথা ছিলো। গত বছরের শুরুতে গফুর ভাই প্রস্তাব করলেন যে, শাহেদ ভাইকে নিয়ে তিনি আমার বাড়িতে আসবেন। পুরনো তিন বন্ধু প্রাণ খুলে আলাপ করবো এবং একসাথে ডাল-ভাত খাবো। শাহেদ ভাই (অধ্যাপক শাহেদ আলী) অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে আশা পূরণ হলো না।

সেদিন গফুর ভাইয়ের সাথে দু'ঘণ্টা একান্তে আলাপ হলো। আমার ভাবি ও তাদের ছেলে-মেয়েদের খবর নিলাম। আমাদের আলোচ্য বিষয় যা হওয়া স্বাভাবিক সেসব সম্পর্কেই মতবিনিময় হলো। দুপুর বারটায় তাঁর চলে যাবার কথা থাকায় ডাল-ভাতের বদলে সামান্য নাশতা-পানি (চা-নাশতা নয়) খেয়েই বিদায় নিলেন।

আমার লেখা কতক বই আগেও তাঁকে দিয়েছিলাম। সেদিন আমার লেখা সকল বই তাঁর সামনে হাজির করলাম। যে কয়টি তাঁর কাছে আছে তা বাদে সব বই-ই তিনি মেহেরবানী করে সাগ্রহে নিলেন।

আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এমনকি আমার ২৪ ঘণ্টার নিয়মিত রুটিন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন। এতে আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসার পরশ বোধ করলাম। এ ভালোবাসা অকৃত্রিম। আমাকে তিনি ভালোবাসার ঋণে আবদ্ধ করে গেলেন। বিদায়কালে বললাম, "অন্তরঙ্গ বন্ধুর আগমনে যে কত খুশি হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আপনার মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যা খুব বেশি নয়।"

আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি যে, কেউ যদি নিত্য ব্যবহারের কোন জিনিস দেয় এবং তা ব্যবহার করা হয়, তাহলে ঐ জিনিসটা যে দিলো, ব্যবহার করার সময়

তার কথা অবশ্যই মনে পড়বে। জিনিসটা টাকার অংকে মূল্যবান না হলেও নিত্য ব্যবহারে থাকার মতো জিনিস হলে স্মরণ পড়বেই। আমি গফুর ভাইকে সামান্য একটা জিনিস দিয়ে আমাকে স্মরণে রাখার ব্যবস্থা নিলাম। তিনি যদি এটা ব্যবহারে রাখেন তাহলে অবশ্যই আমার উদ্দেশ্য সফল হবে। আতরসহ খুব ছোট্ট সুন্দর একটা শিশি তাঁকে দিয়ে অনুরোধ করলাম যে, সবসময় পকেটে রাখবেন। নামাযে যাবার সময় যদি তিনি পকেট থেকে নিয়ে ব্যবহার করেন তাহলে এ ক্ষুদ্র শিশিটিই তাঁকে আমার কথা মনে করিয়ে দেবে। আমার দেওয়া আতরটুকু ফুরিয়ে গেলে আবার আতর রিফিল করে নিলেও ঐ শিশিটি আমার স্মরণ হয়ে থাকবে।

আমি এ পর্যন্ত বহু মূল্যবান ব্রিফকেস উপহার পেয়েছি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যত ব্রিফকেস পেয়েছি সবই অন্যকে দান করে দিয়েছি। ৯ বছর আগে জাপান থেকে সম্পর্কে আমার এক নাত-জামাই এবং ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় খুরশিদ আলম বিভিন্ন জিনিসে ভর্তি একটা ব্রিফকেস পাঠালো। ওটা আমার এতো পছন্দ হয়েছে যে, পুরনো হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ওটাই ব্যবহার করছি। দেশে হোক আর বিদেশে হোক, সফরে বের হলেই ওটা আমার নিত্যসাথী। যখনি ওটা চোখে পড়ে খুরশিদের কথা মনে হয়। এতে লেখা আছে "London-England." ১৯৯৯ সালে কয়েকজনকে দিয়ে লন্ডনে তালাশ করিয়েছি, পাওয়া গেলো না। ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসের শুরুতে আমি জাপান গেলাম। খুরশিদকে বললাম, সে টোকিও শহর তন্ন তন্ন করে তালাশ করেও পেলো না। পুরনো হওয়া সত্ত্বেও খুব যত্নসহকারে ব্যবহার করছি, প্রয়োজন হলে মেরামত করছি। তবু এটাই একমাত্র পছন্দের। পছন্দের ব্যাপারটা আলাদা। পছন্দ যার যার। আমার পছন্দ বলেই অন্যদেরও একই জিনিস পছন্দ হওয়া জরুরি নয়।

আমার আর এক আত্মীয় ইঞ্জিনিয়ার গোলাম সারওয়ার রাশিয়া থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে আসবার সময় আমার জন্য দু'টো জিনিস নিয়ে এলো। তখনো আত্মীয় হয়নি। ইসলামী আন্দোলনের সাথী হিসেবেই মহব্বত করে ব্যবহারের দু'টো জিনিস এনেছে। একটা হলো, সফরে ব্যবহারোপযোগী একটা ব্যাগ, যার মধ্যে কাপড়-চোপড় ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস রাখা যায়। দেশে সফরে বের হলে এটা অবশ্যই সাথে নিতে হয়। আর একটি হলো, খাবার গরম রাখার জন্য টিফিন কেরিয়ার। রমযান ছাড়া অন্য মাসে রোযা রাখতে হলে এটাতে খাবার রেখে শেষ রাতে খাই। এ দু'টো ব্যবহার করার সময় স্বাভাবিকভাবেই সারওয়ারের কথা মনে হয়।

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের নায়েবে আমীর প্রফেসর খুরশীদ আহমদ ১৯৯১ সালের বন্যার সময় রিলিফ নিয়ে ঢাকায় আসেন। তিনি আমাকে একটা চমৎকার মাফলার দিয়ে গেছেন। এ মুহূর্তেও সেটা আমার গলায় আছে। আমি এটা পরে আছি। শীতকাল এলেই এটা বের করতে হয়। আর ব্যবহার করার সময় অবশ্যই তাঁর কথা মনে হয়।

আমার এক দূর-সম্পর্কের চাচাতো ভাই আইয়ূব, এলিফ্যান্ট রোডে জুতার দোকানের মালিক। সে প্রতি বছরই আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে সেন্ডেল উপহার দেয়। সেন্ডেল পরার সময় ওর কথা অবশ্যই মনে আসে। দাম দিতে চাইলেও নিতে চায় না। ঘরে ও বাইরে ওর দেওয়া সেন্ডেল পরার সময় ওর কথা স্মরণ হয়।

৫৪.

কুষ্টিয়া শহরে তমদ্দুন মজলিসের সম্মেলন ও জনসভা

আমি প্রায় সমান গুরুত্ব দিয়েই তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসের দায়িত্ব পালন করছিলাম। তবে তাবলীগ জামায়াতের যেমন সাপ্তাহিক নিয়মিত কর্মসূচি ছিলো তমদ্দুন মজলিসের তেমন সাংগঠনিক কার্যক্রম ছিলো না। একবার তাবলীগী চিল্লায় থাকাকালে তমদ্দুন মজলিসের 'হযরত ওমর (রা) দিবস' পালনের পোস্টারও সাথে নিয়ে বিলি করেছি।

১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি কুষ্টিয়া শহরে তমদ্দুন মজলিসের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিনব্যাপী সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে উন্মুক্ত অধিবেশন হিসেবে জনসভার আয়োজন হয়। ঠিক ঐ সময়ই লাহোরে মার্শাল ল' কোর্ট কর্তৃক মাওলানা মওদূদীকে ফাঁসির হুকুম দেবার খবর পেয়ে উক্ত জনসভায়ই এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ও ঐ হুকুম প্রত্যাহারের দাবিতে প্রস্তাব পাস করা হয়।

ঐ জনসভায় সিলেটের মাওলানা শাখাওয়াতুল আম্বিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যে বিপ্লবী বক্তব্য পেশ করেন, তাতে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। তিনি পুঁজিবাদীদের দাপট প্রদর্শনের উদাহরণ হিসেবে সূরা ইউসুফে বর্ণিত কারূনের ধনভাণ্ডারের চাবি বহনের জন্য যে ৭০ জন বলিষ্ঠ ব্যক্তির প্রয়োজন হতো তা উদ্ধৃত করে জনসভায় আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে ফাঁসির হুকুমের প্রতিবাদে ঢাকায় কিছু করার জন্য তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম সংগঠক জনাব হাসান ইকবাল ও মাওলানা শাখাওয়াতুল আম্বিয়া কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন। তখন পর্যন্তও ঢাকায় জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন দানা বাঁধেনি। তারা ঢাকায় এসে মাওলানা আবদুর রহীমের সাথে যোগাযোগ করে মাওলানা মওদূদীর মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে কিছু কর্মসূচি পালন করেন।

তমদ্দুন মজলিসের সিলেট সম্মেলন

১৯৫৩ সালে সিলেটেও তমদ্দুন মজলিসের দু'দিনব্যাপী এক সম্মেলন হয়। সম্মেলনের পর অধ্যাপক দেওয়ান মুহাম্মদ আযরফের সভাপতিত্বে সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় দায়িত্বশীলদের বৈঠক হয়। এ বৈঠকে সংগঠনের সেক্রেটারি হিসেবে অধ্যাপক আবদুল গফুর সংগঠনের কেন্দ্রীয় রিপোর্ট পেশ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আমার কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করলেন, "অধ্যাপক গোলাম

আযম উত্তরবঙ্গে তমদ্দুন মজলিসের দাওয়াত ব্যাপকভাবে পৌঁছিয়েছেন বটে, কিন্তু সে তুলনায় সংগঠন তেমন বিস্তার লাভ করেনি।"

এ মন্তব্য থেকে আমি উপলব্ধি করলাম যে, সংগঠক হিসেবে আমাকে আরো তৎপর হতে হবে। উক্ত মন্তব্যে আমার মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি; বরং সংগঠনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল হিসেবে তিনি তার পবিত্র দায়িত্বই পালন করেছেন বলে মনে করেছি।

জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক সহকারী সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে অধ্যাপক আবদুল গফুরের সাথে আলাপের সুযোগে বললাম, "গফুর ভাই, সিলেট সম্মেলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক বৈঠকে আপনি যে মন্তব্য করেছিলেন, সে বিষয়ে আমার কৈফিয়ত আছে। জামায়াতে ইসলামীতে এসে সংগঠনের যে টেকনিক্যাল জ্ঞান অর্জন করেছি তা আপনারা শেখাননি।" গফুর ভাইয়ের সাথে সাম্প্রতিক সাক্ষাতে এ কথাটি উল্লেখ করলে তিনিও স্মরণে রেখেছেন জেনে খুব ভালো লাগলো।

অধ্যক্ষ আবুল কাসেম

পঞ্চাশের দশকেই অধ্যাপক আবুল কাসেম তমদ্দুন মজলিসের সেক্রেটারির দায়িত্ব ও সাপ্তাহিক সৈনিকের সম্পদনার গুরুভার অধ্যাপক আবদুল গফুরের উপর অর্পণ করে বাংলা কলেজ কায়েম ও উচ্চশিক্ষার পাঠ্যবই বাংলায় রচনা করায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে বখশীবাজারে অবস্থিত নবকুমার স্কুলেই বাংলা কলেজের সূচনা হয়। মিরপুরে অবস্থিত বর্তমানে বাংলা কলেজটি অধ্যক্ষ আবুল কাসেমেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। এ কলেজের মাধ্যমেই তিনি অধ্যাপক থেকে অধ্যক্ষ পদবিতে উন্নীত হন। বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষার উপযোগী বিজ্ঞানের বই অনুবাদ ও রচনায় তাঁর বিরাট অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

এক সময় কাসেম ভাই ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃতের ভূমিকা পালন করলেন। অথচ বাংলা কলেজ স্থাপনকে তিনি প্রাধান্য দেওয়ায় আমার মনে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো। কারণ তাঁকে আমি ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসেবে ভালোবাসতাম এবং আল্লাহর অস্বিত্ব ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আমার নিকট আকর্ষণীয় ছিলো।

বর্তমান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পূর্বে 'ইসলামী একাডেমী' নামে সরকারি সাহায্যপুষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান ছিলো। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা জনাব আবুল হাশেম তখন একাডেমীর প্রধান ছিলেন। তিনি ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমাকে দাওয়াত দিলেন। যেয়ে দেখলাম, সেখানে অধ্যাপক আবুল কাসেম, ঢাকা আলিয়া মাদরাসার অধ্যাপক মাওলানা আবদুর রাহমান কাশগরী ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক ডিজি ঘাদানী সদস্য মাওলানা আবদুল আউয়াল আমন্ত্রিতদের মধ্যে শামিল রয়েছেন। অধ্যাপক আবুল

কাসেমের আলোচনা আমার নিকট খুবই পছন্দনীয় মনে হলো। তাই তাঁর মতো ব্যক্তির ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে অনুপস্থিত থাকা আমার নিকট যথার্থ মনে হয়নি। এ বিষয়ে তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়াও সমীচীন মনে করিনি।

তমদ্দুন মজলিস আরো সক্রিয় হোক

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ইসলামবিরোধী এতো সংগঠন আছে যে, এদের মোকাবিলায় ইসলামী সংগঠন খুবই নগণ্যসংখ্যক রয়েছে। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, বিগত দুই দশকে শিল্প, সাহিত্য, গান, নাটক ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছুসংখ্যক এমন সংগঠন গড়ে উঠেছে, যারা ইসলামকে মূল আদর্শ ও লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে তমদ্দুন মজলিস এ দেশে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসেবে তমদ্দুন মজলিস ঐতিহাসিক মর্যাদার অধিকারী। তাই তমদ্দুন মজলিসের এ ময়দানে আরো অগ্রণী ভূমিকা পালনের প্রয়োজন রয়েছে। আমি মজলিসের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কর্মবীর জনাব এ জেড এম শামসুল আলম ও সেক্রেটারি অধ্যাপক আবদুল গফুরের উপর আস্থা রাখি, মজলিসকে তারা আরো এগিয়ে নেবেন।

আমি কামনা করি যে, ইসলামী আদর্শের ধারক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠুক এবং ঘাদানীদের নেতৃত্বে পরিচালিত তথাকথিত সাংস্কৃতিক জোটের অপসংস্কৃতির কুপ্রভাব থেকে দেশবাসীকে রক্ষার কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করুক।

আমি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত ছিলাম না

আমি রংপুরে তাবলীগ জামায়াতের আমীর ও তমদ্দুন মজলিসের প্রধান দায়িত্বশীল ছিলাম। তখনো জামায়াতে ইসলামী নামে কোন সংগঠন আছে বলে জানতাম না। তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে মাওলানা মওদূদীর লেখা ইংরেজিতে অনূদিত 'The Process of Islamic Revolution' ও 'Political theory of Islam' বই দুটি এবং 'একমাত্র ধর্ম' নামে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত বইটি পড়ে লেখকের চিন্তাধারায় অবশ্যই প্রভাবান্বিত হয়েছি। কিন্তু ঐ কয়টি বই থেকে কোন সংগঠনের ধারণা সৃষ্টি হয়নি।

আমি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কিত হইনি। খেলাফতে রাব্বানী পার্টির নেতা হিসেবে জনাব আবুল হাশেম রংপুর সফরে গেলে তার জনসভার ব্যবস্থা করে দিলাম। কিন্তু তার দলে যোগদান করিনি। পাকিস্তান আন্দোলনের ছাত্র-কর্মী হিসেবে আমি জনাব আবুল হাশেমের বক্তৃতার ভক্ত ছিলাম বলে তার মতো নেতার এটুকু খেদমত করা কর্তব্য মনে করেছি।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে আমার যে পরিচিতি ছিলো এর ফলে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আমাকে টানার সম্ভাবনা তো ছিলোই। সর্বপ্রথম মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে আহ্বান পেলাম। তখন জনাব মশিউর রহমান যাদু মিয়া রংপুর জেলা মুসলিম লীগের

নেতা। তিনি একজন এডভোকেটকে আমার নিকট পাঠালেন। তিনি যোগ্যতার সাথেই দাওয়াত দিলেন। বললেন, "আপনি ছাত্রজীবনে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। আপনি মুসলিম জাতীয়তা ও ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী। মুসলিম লীগের নেতৃত্বেই পাকিস্তান কায়েম হয়। তাই মুসলিম লীগে আপনার মতো নেতার বড়ই প্রয়োজন। আপনি সম্মতি দিলে যাদু মিয়া সাব আপনার সাথে সাক্ষাৎ করবেন।"

কেন মুসলিম লীগ পছন্দ করলাম না

মুসলিম লীগ সরকার কেন্দ্রে ও প্রদেশে ইসলামী আদর্শের সাথে যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করলো তাতে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আমি বিক্ষুব্ধ তো ছিলামই, তদুপরি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে তাদের আচরণ ঐ ক্ষোভকে আরো তীব্রতর করে দিলো। তাছাড়া মাওলানা মওদূদীর 'Process of Islamic Revolution' বইটি পড়ে আমি নিশ্চিত হলাম যে, মুসলিম লীগ দ্বারা আর যাই হোক ইসলামের সামান্য খেদমতও আশা করা যায় না। জনাব যাদু মিয়ার পক্ষ থেকে যিনি এসেছিলেন তাকে এ কথা বলে বিদায় করলাম যে, "আমি কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করার সিদ্ধান্ত এখনো নিইনি।"

তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসে সক্রিয় থাকায় আমি এমন কোন রাজনৈতিক দলে যোগদানের জন্য মানসিক দিক দিয়ে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, যে দলকে ইসলামী হিসেবে গণ্য করা যায় না। মাওলানা মওদূদীর উপর্যুক্ত বইটি আমাকে ইসলামী রাজনৈতিক দলের এমন স্পষ্ট ধারণা দিয়েছে, সে মাপের কোন দল আছে বলে আমার মনে হয়নি।

মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব

১৯৪০ সালের ১২ মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে শেরে বাংলা ফজলুল হকের পেশকৃত যে প্রস্তাবটি পাস হয়, তা 'লাহোর প্রস্তাব' নামে খ্যাত। উক্ত প্রস্তাবে ভারতীয় মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের থেকে পৃথক একটি জাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ভারতের যেসব প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি ঐ সব এলাকায় মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র কায়েমের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

গান্ধী ও নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের দাবি ছিলো যে, ভারতবাসী হিন্দু-মুসলিম এক জাতি এবং ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির পর গোটা ভারত একটি বিরাট স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। তারা চেয়েছিলো ছলে-বলে-কৌশলে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের প্রভুত্ব কায়েম করতে। মুসলিম লীগ এই চক্রান্ত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য Two Nation Theory (দ্বি-জাতিতত্ত্ব)-এর ভিত্তিতে মুসলমানদের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি করে। এ থিওরির দাবি হলো, ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে মুসলিমগণ পৃথক এক জাতি, যারা স্বাধীন পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করবে। তা না হলে

ইংরেজদের গোলামি থেকে মুক্তি পেলেও মুসলমানদেরকে হিন্দুদের অধীনস্থ থাকতে বাধ্য হতে হবে। এটাই লাহোর প্রস্তাবের মর্মকথা।

১৯৩৯ সালে মাওলনা মওদূদী ভারতীয় যুক্ত জাতীয়তার বিরুদ্ধে মুসলিমদের পৃথক জাতীয়তার পক্ষে 'ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ' নামে যে পুস্তক রচনা করেন, তা মুসলিম লীগের টু-নেশন থিওরির পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

মুসলীম লীগের নেতাগণ ব্যাপকভাবে এ বইটি প্রচার করেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তান আন্দোলনের বড় কেন্দ্র ছিলো। মাওলানার ঐ বইটি ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী আলীগড়ে মাওলানার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। ফলে ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে মাওলানাকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে কায়েম হয়' এ বিষয়ে বক্তৃতার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়। মাওলানার ঐ বক্তৃতাটিই "Process of Islamic Revolution" নামে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়।

বইটির সারকথা

মাওলানা ঐ বক্তৃতায় ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও রাসূল (স) কী পদ্ধতিতে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন তা ব্যাখ্যা করার পর লাহোর প্রস্তাবের প্রতি ইঙ্গিত করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এটা অন্তত খুশির বিষয় যে, মুসলমানদেরকে একটি আদর্শবাদী জাতি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে এবং ভারতকে বিভক্ত করে পৃথক একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য যে ধরনের সাংগঠনিক পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার এবং যেসব প্রস্তুতি প্রয়োজন তার কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

এর ফলে মুসলিমদের একটি পৃথক রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেলেও রাষ্ট্রটি মোটেই ইসলামী হবে না। তিনি বলেন, আমার ভবিষ্যদ্বাণী দেবার কোন যোগ্যতা নেই। কিন্তু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেমন বলা যায় যে, লেবু গাছে আম হতে পারে না, তেমনি যাদের নেতৃত্বে মুসলিম রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলন চলছে তাদের হাতে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হতে পারে না। তাদের দ্বারা শুধু একটি মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র কায়েম হতে পারে।

তিনি আরও অগ্রসর হয়ে বলেন, এ রাষ্ট্রটি কায়েম হওয়ার পর যাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালিত হবে, তারা এটাকে কিছুতেই ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে দেবে না। কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী আন্দোলনকে দমন করার জন্য জেলে দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করতে পারে। কিন্তু এ জাতীয় রাষ্ট্রে ইসলামী আন্দোলনের অপরাধে ফাঁসি দিতেও পরওয়া করবে না।

এটা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এ কথা বলার মাত্র ১৩ বছর পর ১৯৫৩ সালে মাওলানা মওদূদীকে এক অজুহাতে সামরিক আদালতে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েমের পর গণপরিষদে একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে ইসলামী

শাসনতন্ত্রের সূচনা করার দাবি জানাবার অপরাধে মাওলানা মওদূদীকে '৪৮ সালের মার্চ মাসেই গ্রেপ্তার করা হয়। গণপরিষদে ইসলামী শাসনতন্ত্রের সমর্থকদের চাপে ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ 'আদর্শ প্রস্তাব' পাস হবার মাধ্যমে মাওলানার ঐ দাবি পূরণ হয়। অথচ তখনো মাওলানা কারাগারেই আবদ্ধ ছিলেন।

মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের এসব আচরণে ইসলামপন্থী মানুষ বিক্ষুব্ধ ছিলেন। তাই মুসলিম লীগে যোগদান করার মতো রুচি আমার হয়নি।

আমার জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের ব্যাপারটা বড়ই চমকপ্রদ। এমন একটা ঘটনা ঘটে গেলো, যা আমার বা আর কারো পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটেনি। এটাকে আমি আল্লাহর এক বিশেষ মেহেরবানী হিসেবে গণ্য করি।

৫৫.

রাজনৈতিক দলে যোগদানের প্রশ্ন

আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক থাকায় এবং ভাষা-আন্দোলনে রংপুরে যে ভূমিকা পালন করেছি তাতে কেউ আমাকে রাজনীতিক মনে করা অস্বাভাবিক নয়। আমি তখনো কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করিনি বলে আমার নিকট বিভিন্ন দল থেকে দাওয়াত আসারই কথা। মুসলীম লীগ থেকে দাওয়াত এলো, যা কবুল করতে পারলাম না। সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

বিবাহযোগ্য মেয়ের সম্বন্ধ কোথাও চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত যেমন বিয়ের প্রস্তাব আসতেই থাকে, তেমনি রাজনৈতিক মহল থেকে আমার নিকটও দাওয়াত আসতে থাকলো। কিন্তু শুধু রাজনীতি করার উদ্দেশ্যে যে আমি কোন দলে যেতে পারি না, সে কথা তারা বুঝবে কী করে?

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে যারা আমার সহযোদ্ধা ছিলো তাদের মধ্যে সুফি মুতাহার হোসেন নামে এক যুবক আমার নিকট ধরনা দিতে লাগলো একটি দলে যোগদান করার জন্য। এর ছোট এক ভাই আমার ছাত্র ছিলো এবং তাদের পিতার সাথেও আমার পরিচয় ছিলো। তাই মুতাহার সম্পর্কে আমার ধারণা খারাপ ছিলো না। তখনো ঐ দলটি তেমন উল্লেখযোগ্য বলে মনে করতাম না। তবে দলটির নেতার নাম পাকিস্তান আন্দোলনের সময় থেকেই জানতাম বলে বিবেচনাযোগ্য মনে করলাম।

দলটির নাম 'গণতন্ত্রী দল' এবং নেতার নাম মাহমুদ আলী। মাওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানী যখন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি তখন মাহমুদ আলী ছিলেন প্রাদেশিক সেক্রেটারি। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় সবচেয়ে কম বয়সের প্রাদেশিক নেতা হিসেবে তার সুনাম থাকায় এ নামটির প্রতি একটু আকর্ষণ ছিলো।

'গণতন্ত্রী দল' সম্পর্কে তেমন কোন ধারণাই আমার ছিলো না। নাম থেকে তো স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গণতন্ত্রই এ দলের আদর্শ। নেতা সম্পর্কেও সুধারণা ছিলো।

তাছাড়া মুতাহারের সাথে ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা থাকায় আমি গণতন্ত্রী দলের রংপুর শাখার আহ্বায়কের দায়িত্ব নিলাম। আমার নাম ব্যবহার করে মুতাহার সাংগঠনিক কাজ চালাতে থাকলো। সম্ভবত ১৯৫৩ সালেরই শেষ দিকে জনাব মাহমুদ আলী রংপুর সফরে এলেন। রংপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড হলে আমার সভাপতিত্বে গণতন্ত্রী দলের সুধী-সমাবেশ শুরু হলো। মাহমুদ আলী প্রধান অতিথি। মুতাহারই সভা পরিচালনা করলো।

উক্ত সমাবেশে যারা বক্তব্য রাখলেন, তারা গণতন্ত্রের বদলে সমাজতন্ত্রেরই গুণগান করলেন। অথচ সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্রের কোন স্থানই নেই। প্রধান অতিথি অবশ্য গণতন্ত্রের পক্ষেই জোরালো বক্তব্য রাখলেন; কিন্তু সমাজতন্ত্র ছাড়া জনগণ গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করতে পারে না বলে মন্তব্য করলেন।

সভাপতি হিসেবে আমি অত্যন্ত বিব্রতবোধ করলাম। স্পষ্ট উপলব্ধি করলাম যে, এদের সাথে আমার চলা সম্ভব নয়। সভাপতির ভাষণে আমি সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলা সমীচীন মনে করলাম না। আমি গণতন্ত্রের গুরুত্বই তুলে ধরলাম। তবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিষয়টাকেও বলিষ্ঠ যুক্তিসহকারে পেশ করলাম।

সভাশেষে জনাব মাহমুদ আলীকে কলেজ কম্পাউন্ডে আমার বাসায় দাওয়াত দিলাম। তিনি মেহেরবানী করে গেলেন। আমি তার হাতেই গণতন্ত্রী দলের সদস্য পদ থেকে পদত্যাগপত্র তুলে দিলাম। তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমি তার দলের যোগ্য নই।

জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত

আমার নিকট জামায়াতে ইসলামীর কোন লোক কখনো যোগাযোগ করেনি। রংপুরে এর কোন সংগঠন ছিলো না। এ নামে কোন সংগঠন আছে বলেও আমার জানা ছিলো না। আল্লাহরই অপার মহিমা যে, তিনি আমাকে অলৌকিকভাবেই পথ দেখালেন। অর্থাৎ ঘটনাক্রমে আমার ইচ্ছা ও চেষ্টা ছাড়াই এবং জামায়াতের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ ছাড়াই জামায়াতের দাওয়াত পেয়ে গেলাম। ঘটনাটি রীতিমতো চমকপ্রদ।

ঢাকা থেকে তাবলীগের কেন্দ্রীয় নেতা ইঞ্জিনিয়ার মুকীত ভাইয়ের চিঠি পেলাম। তিনি লিখলেন যে, ঢাকা থেকে পায়দল এক জামায়াত উত্তরবঙ্গে যাচ্ছে। অর্থাৎ তারা কোন যানবাহনে নয়; হেঁটে পথে পথে স্থানে স্থানে অবস্থান করে অমুক তারিখে গাইবান্ধার বড় মসজিদে পৌঁছবেন। আমি যেন রংপুর থেকে এক জামায়াত নিয়ে সেখানে তাদের সাথে মিলিত হই। এ নির্দেশ মোতাবেক আমি নির্দিষ্ট দিনে পৌঁছলাম। ঐ মসজিদটি ছিলো দোতলা। দিনটি ছিলো শুক্রবার। ঢাকা থেকে আগত তাবলীগী ভাইদের সাথে পরিচয় হলো। তারা জানালেন যে, মসজিদের ইমাম ও মসজিদ কমিটির সভাপতির সাথে তারা যোগাযোগ করেছেন এবং জুমআর পর আমাকে বক্তব্য রাখার জন্য সুযোগ দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

জুমআর ফরয নামাযের পর কমিটির সভাপতি ঘোষণা করলেন যে, সবাই সুন্নাত নামাযের পর বসবেন। তাবলীগ জামায়াতের পক্ষ থেকে অধ্যাপক গোলাম আযম ও জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে মাওলানা আবদুল খালেক বক্তব্য রাখবেন। আমি অত্যন্ত উৎসুক হলাম। জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য শুনবার সুযোগ পেয়ে খুশি হলাম।

সভাপতি প্রথমে আমাকে বক্তৃতা দেবার সুযোগ দিলেন। আমি তাবলীগ জামায়াতের ৬টি উসূল পেশ করে যথারীতি ঢাকা থেকে আগত জামায়াতের সাথে তাবলীগী সফরে শরীক হবার দাওয়াত দিলাম। কে কে ১, ২ বা ৩ দিনের জন্য শরীক হতে পারেন, সে বিষয়ে কথা বলার সুযোগ রইলো না। সভাপতি জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে মাওলানা আবদুল খালেককে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানালেন। তিনি কালেমায়ে তাইয়েবার বিপ্লবী দাওয়াত পেশ করলেন এবং আল্লাহর প্রভুত্ব ও নবী (স)-এর নেতৃত্বের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের আহ্বান জানালেন।

তিনি বক্তৃতা শেষ করেই আমার সাথে হাত মিলালেন এবং পরিচয় নিলেন। দেখা গেলো যে, আমরা একই মহকুমার অধিবাসী। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার (তখনও মহকুমাই ছিলো) কসবা থানার আখাউড়ার নিকটতম দেবগ্রামে তার বাড়ি। আর নবীনগর থানার বীরগাঁও আমার বাড়ি। এভাবে একটু ঘনিষ্ঠতাবোধ সৃষ্টি হলো। তিনি এক রকম জোর করেই আমাকে সাথে নিয়ে গেলেন। তাবলীগের ভাইদের থেকে ছুটি নিয়ে আমি তার সাথে গেলাম।

তিনি জামায়াতে ইসলামীর অফিসে নিয়ে গেলেন। অফিসটি একটি বাড়ির বৈঠকখানায় অবস্থিত হলেও অফিস হিসেবেই সাজানো। ঘরটি টিনের। চারদিকে বেড়ায় আরবী ও উর্দুতে ছাপানো বেশ কয়টি বড় ও কতক ছোট পোস্টার সাঁটানো রয়েছে। এক পাশে একটি চৌকিতে বিছানা পাতানো এবং এর পাশেই ছোট একটি টেবিল ও একটি চেয়ার। জানা গেলো, তিনি ঐ বিছানায় ঘুমান এবং ঐ টেবিলে পড়েন। আর প্রশস্ত বৈঠকখানায় সাপ্তাহিক কর্মী বৈঠক বসে। পোস্টারগুলোতে কুরআনের আয়াত ও উর্দু তরজমা বড় বড় সুন্দর অক্ষরে লেখা রয়েছে।

মাদুর পাতা মেঝেতে একটি চাদর বিছিয়ে আবদুল খালেক সাহেব আমাকে নিয়ে বসলেন। মিনিট দশেক কথা বলেই উর্দুতে লেখা দু'টো চটি বই দিয়ে বিদায় করলেন। বিদায়ের সময় একটি প্রশ্ন ছুড়ে মারলেন। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বললেন, "ইসলাম শুধু ধর্ম নয় এবং রাসূল (স) শুধু ধর্মনেতা ছিলেন না; ইসলাম আল্লাহর দেওয়া পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। রাসূল (স) ২৩ বছর পর্যন্ত যা করেছেন এর সবটুকুই ইসলাম। তিনি মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামের সব বিধান বাস্তবে চালু করে দেখান। রাসূলের জীবন থেকে শুধু ধর্মীয় বিধানটুকু গ্রহণ করলে ইসলামের একটি অংশ মাত্র পালন করা হয়। রাসূলের সবটুকু জীবন মিলেই পরিপূর্ণ ইসলাম।

একমাত্র ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাই মানুষকে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি দিতে সক্ষম। কিন্তু মানুষের মনগড়া সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও বাহক কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারীরা তাদের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, শোষণ ও সুবিধা ভোগ করার জন্য নবীদের বিরোধিতা করেছে।

জামায়াতে ইসলামী কুরআনের আইনের ভিত্তিতে দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রকে গড়তে চায় বলেই সরকার জামায়াতের এতো বিরোধী। এক বছর আগে সরকার মাওলানা মওদূদীকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিলো। যারা জামায়াতে কাজ করছে তারা জেল ও ফাঁসির পরওয়া করে না।

আপনাকে মাওলানা মওদূদীর লেখা দুটো চটি বই দিচ্ছি। এ বইগুলো এখনো বাংলায় অনূদিত হয়নি বলে উর্দু বই-ই দিলাম। বই দুটো পড়বেন এবং একটি প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করবেন। প্রশ্নটি হলো, "আপনি যে জামায়াতে কাজ করছেন, সে জামায়াত যদি রাসূলের ইসলামই কায়েম করতে চায়, তাহলে দেশের অনৈসলামী সরকার ঐ জামায়াতের বিরোধিতা কেন করে না?"

সাক্ষাতের প্রতিক্রিয়া

তমদ্দুন মজলিসে ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াতের ধারণা পেয়েছিলাম বলে আবদুল খালেক সাহেবের প্রশ্নটি আমাকে ভাবনার সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো। যে দুটো বই দিলেন এর একটির নাম 'বানাও আওর বিগাড়'। বাংলায় নাম দেওয়া হয়েছে 'ভাঙা ও গড়া'। দ্বিতীয় বইটির নাম 'হেদায়াত'। বাংলায়ও এ নামেই বইটি প্রকাশিত।

তাবলীগী ভাইদের সাথে মিলবার জন্য মসজিদে ফিরে গেলাম। তারা আমার অপেক্ষায় তখনো খাননি। তাদের সাথে ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত থেকে আমরা যে কয়জন রংপুর থেকে এসেছিলাম, তারা ট্রেনে ফিরে গেলাম। ট্রেনে পয়লা বইটি পড়া শুরু করলাম। তাবলীগ জামায়াতে শরীক হওয়ার পর থেকে উর্দু শেখার ও পড়ার যে সুযোগ পেয়েছিলাম এর ফলে বইটি রংপুর পৌঁছা পর্যন্ত পড়ে ফেললাম। তাবলীগের উর্দু বইয়ের তুলনায় ঐ বইটির ভাষা একটু কঠিন মনে হলেও এবং সব শব্দের অর্থ না বুঝা সত্ত্বেও বক্তব্যের বিষয় পরিষ্কারভাবেই অনুধাবন করতে সক্ষম হলাম।

মনে হলো, এ বইটি আমাকে তাবলীগ জামায়াত থেকে টেনে বের করে নিয়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করাতে চায়। সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনায় আল্লাহ তাআলা কী ভূমিকা পালন করেন, সে বিষয়ে বইটিতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেলো। মাওলানা মওদূদীর 'Process of Islamic Revolution' বইটির বক্তব্য এ বইটির মর্মকথার সাথে মিলে আমাকে অস্থির করে তুললো।

তাছাড়া ঐ মারাত্মক প্রশ্নটির যত জওয়াব তালাশ করেছি, কোনটাই যুক্তির কষ্টিপাথরে টিকলো না। এ অস্থিরতা নিয়েই আমার পাশের বাসায় গেলাম। উর্দু ও ফার্সি ভাষার অধ্যাপক মাওলানা সাইয়েদ ইসহাক আহমদ বয়সে আমার বেশ

সিনিয়র হলেও তাকে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ মনে করতাম। তাকে ঐ বইটি পড়তে দিয়ে বললাম যে, জামায়াতে ইসলামী নামে ইসলামী আন্দোলনের নতুন এক সংগঠনের পরিচয় জানলাম। বইটি পড়ার পর আপনার সাথে আলোচনা করবো। গাইবান্ধা থেকে ফিরে এসে রাতেই বইটি তাকে দিয়ে এলাম। তখন রাত ১০টা।

সকালে নাশতার পর অপর বইটি নিয়ে পড়তে বসলাম। অধ্যাপক ইসহাক সাহেব এসে বেশ আবেগের সাথে প্রথমেই বললেন, এ বই কোথায় পেলেন? আমি তো রাতেই পড়ে ফেললাম। বইটির বক্তব্য রাতে আমাকে ঠিকমতো ঘুমাতে দেয়নি। আরো কোন বই থাকলে দিন। আমি তার সাথে ঐ প্রশ্নটি সম্পর্কেও আলোচনা করলাম। হেদায়াত বইটি তিনি আমার পড়ার আগেই নিয়ে গেলেন।

তখন ১৯৫৪ সালের মার্চ মাস। কলেজ বন্ধ ছিলো। বন্ধ না থাকলে আমার জন্য বিরাট সমস্যা হতো। মানসিক অস্থিরতার দরুন খাওয়া ও ঘুম স্বাভাবিক ছিলো না। এদ্দিন এতো একনিষ্ঠভাবে তাবলীগ জামায়াতে সক্রিয় ছিলাম। এটা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে কি না তা স্থির করা কঠিন মনে হলো। মনের ভেতর তোলপাড় চললো। বিশেষ করে দীনের ব্যাপরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বড়ই জটিল ব্যাপার। আখিরাতের সাফল্য ও ব্যর্থতা এর সাথে সরাসরি জড়িত বলে বেশ পেরেশানির মধ্যে দিন কাটছিলো। অধ্যাপক ইসহাকের সাথে আলোচনা করলে জামায়াতে ইসলামীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। তিনি আমার এ অস্থিরতার মধ্যে নিজে সুস্থির হয়ে গেলেন, দেখে বিস্মিত হলাম। অবশ্য তাকে কোন কিছু ত্যাগ করতে হচ্ছে না বলে হয়তো সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার চেয়ে তার জন্য সহজ হয়ে থাকতে পারে।

অধ্যাপক ইসহাক হেদায়াত বইটি পড়ে মন্তব্য করলেন যে, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের এমন চমৎকার ধারণা ইতঃপূর্বে পাইনি। আমি বইটি পড়ে আল্লাহর দরবারেই ধরনা দিতে থাকলাম, যাতে তিনি আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেন।

ঐ সময় আমার স্ত্রী ও ছোট ছোট দুটো ছেলে আমার শ্বশুর বাড়িতে থাকায় এবং কলেজ বন্ধ থাকায় রাতদিন একই চিন্তা-ভাবনা নিয়ে মত্ত ছিলাম। গাইবান্ধায় গিয়ে জনাব আবদুল খালেকের সাথে আলোচনা করবো ভাবছিলাম। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এমন বিব্রত অবস্থায় ইতঃপূর্বে কখনো পড়েছি বলে মনে পড়ে না। দু'সপ্তাহ এভাবেই কাটলো।

আবদুল খালেক সাহেবের এক চিঠি পেয়ে উৎসাহ বোধ করলাম। তিনি জানালেন যে, গাইবান্ধা মিউনিসিপ্যাল পার্কে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে ঢাকা থেকে নেতৃবৃন্দ আসবেন। আমি যেন অবশ্যই এতে উপস্থিত হই। আমি তো গাইবান্ধা যাবার কথা বিবেচনা করছিলামই। সম্মেলন হলে জামায়াতকে আরো ভালোভাবে জানার সুযোগ হবে। মনে কিছুটা স্থিরতা বোধ করলাম ও যাবার দিন গুনতে থাকলাম।

৫৬.

জামায়াতে ইসলামীর গাইবান্ধা সম্মেলন

১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাস। জনাব আবদুল খালেকের দাওয়াতপত্র পাওয়ার পর আমার অস্থির মনে কিছুটা সান্ত্বনা পেয়ে সম্মেলনের অপেক্ষায় ছিলাম। সকালের ট্রেনেই যাওয়ার ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু ঢাকা থেকে তাবলীগের আমীর মাওলানা আবদুল আযীয দুপুরে রংপুর পৌঁছার কথা। তাবলীগে তিনিই আমার প্রথম ও প্রধান উস্তাদ। রংপুরে আমি তাবলীগের আমীর। বিরাট সমস্যায় পড়লাম। আমাকে তো গাইবান্ধা যেতেই হবে। সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার ছোট ভাই মাহদীকে (রংপুর কলেজে আইএসসির ছাত্র) রংপুর রেলস্টেশন থেকে মাওলানা সাহেবকে তাবলীগের কেন্দ্রীয় মসজিদে পৌঁছাবার দায়িত্ব দিয়ে আমি গাইবান্ধা চলে যাবো।

রংপুর রেলস্টেশনে ঢাকা-দিনাজপুর আপ ও ডাউন ট্রেন দুটি দুপুর ১টা থেকে দেড়টার মধ্যে ক্রসিং করে। ঢাকা থেকে আসা ট্রেন আগে পৌঁছে এবং আগেই ছেড়ে যায়। আমি মাওলানা সাহেবকে ট্রেন থেকে অবতরণের সময় অভ্যর্থনা জানিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে গাইবান্ধা চলে যাচ্ছি বলে জানালাম। মাহদী তাঁকে মাহিগঞ্জ মসজিদে নিয়ে যাবে বলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ঢাকাগামী ট্রেনে উঠার জন্য বিদায় নিলাম। মাওলানা সাহেব বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছু জিজ্ঞেস করার মতো মনোভাবও তাঁর ছিলো না। এটাই স্বাভাবিক পরিস্থিতি ছিলো। তাঁর সাথে আমার যে মহব্বতের সম্পর্ক ছিলো তাতে তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে, আমি এমন আচরণ করতে পারি। তাঁর আসার খবর জেনেও এভাবে আমি অন্য কোন কাজে চলে যেতে পারি, তা তাঁর পক্ষে বিশ্বাস করা অসম্ভব ছিলো। ক্ষমা প্রার্থনা করে বিদায় নেওয়ার চেয়ে বেশি সময়ও হাতে ছিলো না।

আমার ভাই থেকে তিনি জানতে পারলেন যে, আমি গাইবান্ধায় জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে যোগদান করার উদ্দেশ্যে গিয়েছি। আমি পরে জানতে পেরেছি যে, তিনি রংপুর থেকে লাহোরে তাবলীগে চিল্লারত আমার আব্বাকে চিঠি লিখে জানালেন যে, আমি নাকি কাদিয়ানী জামায়াত থেকেও অধিকতর গুমরাহ এক জামায়াতে শরীক হয়ে গেছি।

সম্মেলনের জনসভায়

গাইবান্ধা রেলস্টেশন থেকে জনাব আবদুল খালেক আমাকে যথাস্থানে নিয়ে গেলেন। ঢাকা থেকে আগত মেহমানগণ সেখানেই ছিলেন। তাদের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ তখন ছিলো না। খাওয়ার পর তারা বিশ্রাম করছিলেন। বিকেল তিনটা থেকে জনসভার প্রস্তুতিতে অন্য সবাই ব্যস্ত। খাবার পর পাশের এক বাড়িতে আমার বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা করা হলো। আসরের নামাযের পর ঐ বাড়ির একজন আমাকে মিউনিসিপ্যাল পার্কের জনসভায় নিয়ে গেলো। পার্কের এক বেঞ্চে আমি বসে বক্তৃতা শুনতে থাকলাম।

মাগরিব পর্যন্ত তিনজন বক্তব্য রাখলেন। জনাব আবদুল খালেক বাংলায় এবং অপর দু'জন উর্দুতে বক্তৃতা করলেন। তাদের একজন ঢাকা শহরের আমীর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির তরুণ অধ্যাপক মুহাম্মদ ওয়ায়ের। অপরজন জামায়াতের উত্তরবঙ্গের সংগঠক জনাব আসাদ গিলানী। সভাপতি ও প্রধান অতিথি মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম মাগরিবের পর দীর্ঘ বক্তৃতা পেশ করলেন। তিনি পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক জামায়াতের সেক্রেটারি বলে জানলাম।

মাগরিবের নামাযের সময় রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যয়নরত বেশকিছু ছাত্র আমার সাথে দেখা করলো। এর মধ্যে কয়েকজন সরাসরি আমার ছাত্র। নামাযের পর পূর্বের বেঞ্চেই যেয়ে বসলাম। ইতোমধ্যে রংপুরে ছাত্রদের প্রায় ২০/২৫ জন আমার আশপাশে জড়ো হয়ে গেলো। কলেজে নামাযের ঘরে যোহরের সময় ইসলাম সম্পর্কে নিয়মিত আলোচনা করতাম বলে আমি ইসলাম প্রচারক হিসেবে ছাত্রদের মধ্যে পরিচিত ছিলাম। গাইবান্ধা কলেজ তখন একেবারেই নতুন। তখনকার কলেজে পড়ুয়া, বিশেষ করে ডিগ্রি ক্লাসের ছাত্ররা বেশির ভাগই রংপুরে পড়তো।

আমি খুব মনোযোগ দিয়ে সবার বক্তৃতাই শুনছিলাম। উর্দুতে দেওয়া বক্তৃতার সব শব্দ না বুঝলেও ভাব স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি। তাছাড়া উর্দু বক্তৃতার সারকথা বাংলায় আবদুল খালেক সাহেব শুনিয়ে দিলেন। মাওলানা আবদুর রহীমের দীর্ঘ বক্তৃতা তৃপ্তির সাথেই শুনলাম। তিনি কালেমা তাইয়েবার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন। সবার বক্তৃতার সারকথা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। তাঁরা বললেন ঃ

"গোটা সৃষ্টিজগতে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম আছে। আল্লাহ নিজেই সকল সৃষ্টির উপর তাঁর বিধান কায়েম করেন। মানবসমাজের জন্য নবীর মাধ্যমে যে জীবন-বিধান পাঠিয়েছেন তা কায়েম করার দায়িত্ব মানুষের উপর দেওয়া হয়েছে। নবী এবং নবীর প্রতি যারা ঈমান আনে তাদের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব যারা পালন করেন তারাই আল্লাহর খলীফার মর্যাদা পান। আর এ জন্যই মানুষকে পয়দা করা হয়েছে।"

"ইসলাম মানব জীবনের জন্য পরিপূর্ণ বিধান। কিন্তু বর্তমানে মুসলমানরাও ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে পালন করে। তাই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ময়দানে আল্লাহর বিধান চালু নেই। এ কারণে মানুষ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ভোগ করছে।"

"দেশকে এ মুসিবত থেকে উদ্ধার করতে হলে জামায়াতবদ্ধ হয়ে আল্লাহর প্রভুত্ব ও রাসূলের নেতৃত্বের ভিত্তিতে সমাজের সকল ক্ষেত্রে খোদাভীরু লোকদের শাসন কায়েম করতে হবে। জামায়াতে ইসলামী এ উদ্দেশ্যেই কাজ করছে। রাসূল (স) সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এ দায়িত্ব পালন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। যারা এ কাজ করতে আগ্রহী তাদেরকে জামায়াতে ইসলামীতে শরীক হবার জন্য আহ্বান জানাই।"

বক্তব্য শুনে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের তাগিদ অন্তরে অনুভব করলেও তাবলীগ জামায়াত ত্যাগ করা সঠিক হবে কিনা সে খটকা তখনও রয়েই গেলো।

জনসভায় ছাত্রদের কারণে বিব্রতবোধ করলাম

মাওলানা আবদুর রহীমের বক্তৃতা চলাকালে এক সময় জনাব আবদুল খালেক মাইকে ঘোষণা করলেন, "রংপুর কলেজের অধ্যাপক গোলাম আযমকে বক্তৃতা করার সুযোগ দেবার জন্য তাঁর ছাত্রদের পক্ষ থেকে দাবি জানিয়ে বেশ কয়টি স্লিপ পাঠানো হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত এ সভা সমাপ্ত হবার পর এ মাইকেই তিনি বক্তৃতা করবেন।" ঘোষণা শুনে আমি অত্যন্ত বিব্রত ও লজ্জাবোধ করলাম। কারণ কেউ মনে করতে পারে যে, আমি ছাত্রদেরকে দিয়ে চাপ সৃষ্টি করেছি। যা হোক, যথাসময়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করে মঞ্চ থেকে সবাই নেমে গেলেন। আমি মঞ্চে উঠে প্রথমেই বললাম, "এখানে জামায়াতে ইসলামীর জনসভা হচ্ছিল। জামায়াতের বাইরের কাউকে বক্তৃতার সুযোগ দেবার দাবি জানানো মোটেই উচিত হয়নি। আমি জামায়াতের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শুনবার উদ্দেশ্যেই রংপুর থেকে এসেছি। এখানে আমার বক্তৃতা করার কোন কথাই ছিলো না এবং আমি সে উদ্দেশ্যে আসিওনি। এটা জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীলগণের মহানুভবতা যে, ছাত্রদের অযৌক্তিক দাবি মেনে নিয়ে তাদের মাইকে বক্তৃতা দেবার সুযোগ দিলেন। আমি তাদের এ উদারতার জন্য আন্তরিক শুকরিয়া জানাই।

এটুকু ভূমিকার পর ১৫ মিনিট আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রেখে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের সারকথা উল্লেখ করে এ জামায়াতে যোগদান করা কর্তব্য বলে আমি সবাইকে আহ্বান জানালাম।

জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক

এশার নামায ও খাওয়া-দাওয়ার পর রাত সাড়ে ১০টায় আবদুল খালেক সাহেব আমাকে নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচয় করালেন। মাওলানা আবদুর রহীম ও অধ্যাপক মুহাম্মদ ওযায়ের আমার সাথে বসলেন। আবদুল খালেক সাহেব উপস্থিত ছিলেন। আসাদ গিলানী সাহেব খুব ক্লান্ত বলে বিশ্রাম করতে চলে গেলেন। বগুড়া থেকে আগত শায়খ আমীনুদ্দীনও উপস্থিত ছিলেন।

আমার ধারণা ছিলো যে, পূর্ব-পাকিস্তানের দায়িত্বশীল হিসেবে মাওলানা আবদুর রহীমই আমার সাথে কথা বলবেন। কিন্তু দেখা গেলো, অধ্যাপক ওযায়ের অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন এবং আমার সাথে কথা বলা শুরু করলেন। আবদুল খালেক সাহেব আমাকে রংপুরে তাবলীগ জামায়াতের আমীর হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। সম্ভবত ব্যবস্থাপনার ব্যস্ততার কারণে চলে যেতে বাধ্য হলেন। আমি তাঁর উপস্থিতি কামনা করছিলাম। এক মাস আগে তিনি আমাকে যে দু'টো বই দিলেন এবং একটি প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা করতে বললেন এর প্রতিক্রিয়া কী তা তিনি জানতে চাইবেন বলে আশা করেছিলাম।

আমি তাবলীগ জামায়াতের আমীর– এ পরিচয়ের সূত্র ধরে অধ্যাপক ওযায়ের ভয়ানক আক্রমণাত্মক ভাষায় তাবলীগ জামায়াতের দাওয়াত ও কর্মসূচির বিরুদ্ধে

অবিরাম বলতে থাকলেন। এ জামায়াত ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে পেশ করে জনগণকে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে ইসলামের চরম ক্ষতি করছে। এ জাতীয় আরও বেশকিছু কথা বলে আমাকে এমন কতক প্রশ্ন করলেন, যার কোন জওয়াব আমার নিকট ছিলো না।

গত এক মাসে আমার মন জামায়াতের দিকে আকৃষ্ট না হলে এবং তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম সম্পর্কে ধারণা না জন্মালে এবং মাওলানা মওদূদীর লেখা তমদ্দুন থেকে পাওয়া দু'টো ইংরেজি বই এবং খালেক সাহেবের দেওয়া দু'টো উর্দু বই পড়া না থাকলে অধ্যাপক ওয়ায়েরের বক্তব্য আমার মনে জামায়াতের প্রতি বিদ্বেষই সৃষ্টি করতো। আমি তো অনেকখানি কাছেই চলে এসেছিলাম। তিনি আমার মনের অবস্থা কিছুই জানেন না। অথচ এভাবে চরম হামলা চালালেন। তার বক্তব্যকে আমি হিকমতের সম্পূর্ণ খেলাফ মনে করেও সঠিক বলে উপলব্ধি করলাম। আমি পরে এক সময় আবদুল খালেক সাহেবের নিকট অভিযোগ করেছি যে, অধ্যাপক ওয়ায়ের হিকমত ও মাওয়েযাতুল হাসানার সম্পূর্ণ খেলাফ কাজ করেছেন। আমি তাঁর কথায় জামায়াতে যোগদান করতাম না; বরং জামায়াত থেকে আরও দূরেই চলে যেতাম। আবদুল খালেক সাহেব অধ্যাপক ওয়ায়েরকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি নাকি মন্তব্য করেছেন, "তাবলীগের লোক অন্ধ হয়ে থাকে। তাদেরকে বুঝানো যায় না। আমার অভিজ্ঞতা এটাই। তাই আমি মনের ঝাল মিটিয়ে বলেছি। তিনি তাবলীগ বাদ দিয়ে জামায়াতে ইসলামীতে আসবেন না বলে ধরে নিয়েই আমি কথা বলেছি।"

রাত প্রায় সাড়ে ১১টায় এ বৈঠক শেষ হলো। তখন মাওলানা আবদুর রহীম তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বসা আছেন। শায়খ আমীনুদ্দীন আমার হাত ধরে সাথে নিয়ে এক কামরায় ঢুকলেন। সেখানে দুটো চৌকিতে বিছানা করা রয়েছে। তিনি আমাকে এক বিছানায় শুবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

একটি উল্লেখযোগ্য রাত

ঐ রাতটি আমার জীবনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে রাতেই আল্লাহ তাআলা আমাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেন। এ সিদ্ধান্ত আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

শায়খ আমীনুদ্দীন বেশ বয়স্ক লোক। উর্দুভাষী হলেও বাংলা বুঝেন। আমি তার সাথে উর্দুতেই আলাপ করলাম। অধ্যাপক ওয়ায়ের উর্দু ও ইংরেজি মিলিয়ে কথা বলেছেন। আক্রমণাত্মক কথাগুলো বেশির ভাগ ইংরেজিতেই বলেছেন। শায়খ আমীনুদ্দীনের সাথে পরিচয় হলো। তিনি বিহারের অধিবাসী। কোলকাতায়ই বেশি থাকতেন। ৪৭-এর দেশ বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে এসে বগুড়ায় বসবাস করতেন। কথাবার্তায় তিনি খুবই মিষ্টভাষী ও হাসিমুখী। রাত ১২টায় দু'জনই শুয়ে পড়লাম।

১০/১৫ মিনিট পরই শায়খ সাহেব ঘুমিয়ে পড়লেন। নাক ডাকার আওয়াজ শুনলাম। আমার মনে বিরাট তোলপাড়। ঘুম আসার কোন লক্ষণই নেই। জামায়াতে

ইসলামীতে যোগদানের প্রচণ্ড আগ্রহ সত্ত্বেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি না। অধ্যাপক ওযায়েরের আক্রমণাত্মক কথাগুলো তাবলীগ জামায়াত ত্যাগ করার জন্য সহায়ক হলেও তাবলীগ জামায়াতের সাথীদের ও বড় বড় আলেমদের মহব্বত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দিচ্ছিলো। তমদ্দুন মজলিস ত্যাগ করা কঠিন মনে হয়নি। কারণ জামায়াতে ইসলামীতে তমদ্দুনের দাওয়াত পূর্ণমাত্রায়ই রয়েছে। কিন্তু তাবলীগ জামায়াতে যে ধর্মীয় জযবাবোধ করতাম এর আকর্ষণ ত্যাগ করা কঠিন মনে হলো। রাত তিনটা পর্যন্তও যখন ঘুম এলো না তখন উঠে ওযূ করে তাহাজ্জুদ পড়তে শুরু করলাম। ঘণ্টাখানেক নামায পড়ার পর অস্থিরচিত্তে দোয়া করতে থাকলাম।

দোয়া মানে তো আল্লাহর সাথে কথা বলা। আমি আমার মাবূদের সাথে মনে মনে কথা বলে তৃপ্তিবোধ করি না। বিশেষ করে শেষ রাতে দোয়া করতে আওয়াজ না করলে মজা পাই না। আরবী দোয়া হোক বা বাংলায় দোয়া হোক, উচ্চারণ করেই দোয়া করি। সাধারণত এমন আওয়াজ হয় যে, কাছে কেউ থাকলে শুনতে পায়। সে রাতে আমার মানসিক অস্থিরতার কারণে দোয়ার সময় আওয়াজ একটু উঁচু হবারই কথা। ঘরে আরও একজন আছেন সে হুঁশও হয়তো তখন ছিলো না। অত্যন্ত আবেগের সাথে দীর্ঘ সময় আল্লাহর দরবারে ধরনা দিয়ে রইলাম। দোয়ার ভাষা এখনও ভুলিনি। কারণ ওটা আমার জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণ ছিলো।

"হে আল্লাহ! তুমিই একমাত্র হেদায়াতের মালিক। ইসলামের নামেই এতো মত ও এতো পথ সৃষ্টি হয়েছে যে, সর্বদিক দিয়ে সঠিক পথ চেনা আমার অসাধ্য। আমি খুবই তৃপ্তির সাথে তাবলীগ জামায়াতে কাজ করছিলাম। তমদ্দুন মজলিসে যোগদান করার পর তাবলীগকে যথেষ্ট মনে না করলেও এর আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারছি না। জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছে। আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। তুমিই আমার দিলের মালিক। আমি তোমার নিকটই আত্মসমর্পণ করছি। আমাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে দাও। আমার মনের অস্থিরতা দূর করে দাও।"

এসব কথা বারবার উচ্চারণ করে প্রায় ঘণ্টাখানেক আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করলাম। ফজরের আযান পর্যন্ত এ অবস্থায়ই কাটলো। আযানের পর শায়খ আমীনুদ্দীন ঘুম থেকে উঠে ওযূ করে আমাকে হাত ধরে জায়নামায থেকে তুলে রীতিমতো জড়িয়ে ধরে সেখানে নিয়ে গেলেন, যেখানে ফজরের নামাযের জামাআত হবার কথা। মাওলানা আবদুর রহীম ইমামতি করলেন। কেরাআত শুনতে বেশ ভালোই লাগলো। মোনাজাতের পর শায়খ আমীনুদ্দীন আমাকে ধরে মাওলানা আবদুর রহীমের কাছে নিয়ে বসালেন। আবদুল খালেক সাহেব একটি কাগজ শায়খ আমীনুদ্দীনের হাতে দিলেন। তিনি ঐ কাগজটি ও একটি কলম আমার হাতে দিলেন। আমি কাগজটিতে লেখা কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলাম। আর বেশ কয়জন আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। কেউ কোন কথা না বলে চুপচাপ বসে আছেন।

ঐ কাগজটি জামায়াতে ইসলামীর মুত্তাফিক ফরম ছিলো। বর্তমানে বলা হয় সহযোগী সদস্য ফরম। ফরমটিতে লেখা কথাগুলোর সবই পছন্দ হলো। কোন কথার সাথে ভিন্নমত পোষণের মনোভাব টের পেলাম না। তাই নীরবে ফরমটি পূরণ করে দস্তখত করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শায়খ আমীনুদ্দীন মাওলানা আবদুর রহীমকে দোয়া করতে অনুরোধ করলেন। মাওলানা দোয়া করতে থাকাকালেই শায়খ আমীনুদ্দীন আবেগের সাথে উর্দুতে দোয়া করতে লাগলেন। তিনি দোয়া করলেন, যেন ইসলামী আন্দোলনে আল্লাহ আমাকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের জন্য তাওফীক দান করেন। মাওলানার দোয়াতে কোন আবেগ ছিলো না। শায়খ সাহেবের দোয়া আমার মধ্যেও আবেগ সৃষ্টি করলো।

দোয়ার পর মনে এমন প্রশান্তিবোধ করলাম, যা প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই। প্রায় মাসাধিককালের মানসিক অস্থিরতার সামান্য চিহ্নও অবশিষ্ট রইলো না। সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না বলে যে পেরেশানী ছিলো তা দূর হয়ে গেলো। শায়খ সাহেব আবেগের সাথেই সর্বপ্রথম আলিঙ্গন করলেন। এরপর আবদুল খালেক সাহেবও আবেগের সাথে বুক মিলালেন। মাওলানা আবদুর রহীমসহ উপস্থিত সবাই কোলাকুলি করে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

শায়খ আমীনুদ্দীনের ভূমিকা

শায়খ আমীনুদ্দীন আমার হাত ধরে ঐ কামরায় নিয়ে গেলেন, যেখানে আমরা দু'জন দু'চৌকিতে ছিলাম। তিনি ফরম সংগ্রহ করে আমার সামনে এভাবে পেশ না করলে হয়তো জামায়াতে যোগদানের প্রক্রিয়া আরও বিলম্বিত হতো। তিনি কেন এ ভূমিকা পালন করলেন তা তিনিই আমাকে তখন বললেন ঃ

"আপনি যখন কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে শেষ রাতে দোয়া করছিলেন তখন আপনার আওয়াজ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আল্লাহর দরবারে আপনার এভাবে ধরনা দেবার সময় জেগে যাওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছা করেই শুয়ে রইলাম। আমি উঠলে আপনার দোয়ায় ব্যাঘাত ঘটবার আশঙ্কায় চুপচাপ শুয়ে শুয়ে আপনার দোয়া কবুল হবার জন্য আমিও দোয়া করতে লাগলাম। আপনার দোয়ার কথাগুলো আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। আমি তখনি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ফজরের পর আপনার সামনে ফরমটা পেশ করবো। আমার ইয়াকীন ছিলো যে, আপনার যে মানসিক অবস্থা তাতে ফরমটা দেখলেই আপনি পূরণ করবেন। তাই আবদুল খালেক সাহেব থেকে ফরমটা চেয়ে নিলাম।

মাওলানা আবদুর রহীম তো আপনার অবস্থা জানতেন না। তাই দোয়াতে তার মধ্যে আবেগ থাকার কথা নয়। কিন্তু আমি দোয়ায় ঐভাবে অংশগ্রহণ না করে থাকতে পারলাম না।"

শায়খ সাহেবের কথা শুনে তৃপ্তিবোধ করা সত্ত্বেও কিছুটা লজ্জিত হলাম যে, আবেগের কারণে জোরে আওয়াজ করে দোয়া করতে গিয়ে তাঁর ঘুমে ব্যাঘাত ঘটালাম।

জামায়াতে যোগদানের পর

জামায়াতে যোগদান করার ঘটনাটি আমার জীবনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে সন-তারিখও মনে আছে। ১৯৫৪ সালের ২২ এপ্রিল, মঙ্গলবার। দিনটি আরও এক কারণে আমার নিকট গুরুত্বপূর্ণ। আমার জন্মদিন মঙ্গলবার। ঐ দিন আমার দীনী জীবনের নতুন করে জন্মদিন। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে মাসাধিককালের ভোগান্তি পোহাবার পর আল্লাহ তাআলা ঐদিন আমাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার তাওফীক দিলেন।

সিদ্ধান্তহীনতা যে মানুষের জীবনে কত বড় যাতনা এর কোন ধারণা ইতঃপূর্বে ছিলো না। এ সমস্যার সমাধান হিসেবেই রাসূল (স) ইস্তেখারার ব্যবস্থা দিয়েছেন। দু'রাকাআত নফল নামায পড়ে ইস্তেখারার দোয়াটি বুঝে পড়ার পর গভীর আন্তরিকতা নিয়ে আল্লাহ তাআলার দিকে মনকে ধাবিত করে মনস্থির করার জন্য ঘুমিয়ে পড়তে হয়। স্বপ্নে যদি স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহলে তো সবচেয়ে সহজেই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়। যদি তা না হয় তাহলে কয়েকদিন ঐ নিয়মে নামায ও দোয়া করার পর মন যেদিকে বেশি সায় দেয় আল্লাহর উপর ভরসা করে সেটাই করা উচিত।

আমি এ পদ্ধতি অবলম্বন না করলেও শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারেই ধরনা দিলাম।

সংগঠন পদ্ধতির প্রাথমিক শিক্ষা

জনাব আবদুল খালেক আরও একদিন গাইবান্ধায় থাকতে বললেন। কেন্দ্রীয় মেহমানদের বিদায় করা ও সম্মেলনের সমাপনী কিছু ব্যাপারে তিনি সারাদিন ব্যস্ত রইলেন। সন্ধ্যার পর তিনি আমাকে নিয়ে বসলেন। রংপুরের সংগঠনের প্রাথমিক ইউনিট কায়েমের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কতক কাগজপত্র এবং সংগঠন পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দিলেন। তিনি বললেন, সংগঠন পদ্ধতি হচ্ছে টেকনিক্যাল বিষয়। এটা শুধু লেখা পড়ে বা মুখে শুনে সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় না। তাই তিনি প্রতি শুক্রবার রংপুর যাবেন এবং ইউনিট বৈঠকে যোগদান করবেন। আমি নতুন সংগঠন গড়ার প্রেরণা নিয়ে পরদিন সকালের ট্রেনে রংপুর ফিরে গেলাম।

তাবলীগ ও তমদ্দুনের দায়িত্ব

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার পর গাইবান্ধা থাকা অবস্থায়ই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, তাবলীগ জামায়াতের আমীরের দায়িত্ব অন্য কারো উপর অর্পণ করে এবং তমদ্দুন মজলিসের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে আমি একনিষ্ঠভাবে শুধু জামায়াতে ইসলামীর কাজেই আত্মনিয়োগ করবো। দু'বছর তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসের কাজ যুগপৎভাবে করতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। দুটো সংগঠনের দায়িত্ব এক ব্যক্তির পক্ষে পালন করা সহজ নয়। একটির কর্মসূচির সাথে অপরটির কর্মসূচির পার্থক্য থাকেই। তাই সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু আমি দীন-ইসলামের ধর্মীয়

দিকটি তাবলীগ জামায়াতে সন্তোষজনক মনে করায় এবং তমদ্দুন মজলিসের কাজ অপরিহার্য মনে করায় উভয় সংগঠন মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম চর্চা করতে বাধ্য হলাম। জামায়াতে ইসলামীতে একই সাথে ইসলামের সব দিকের চর্চার সুযোগ পেয়ে ঐ দুই সংগঠনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়াই সঙ্গত মনে করলাম।

গাইবান্ধা থেকেই তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা কাসেম ভাইকে নিম্ন মর্মে চিঠি লিখলাম ঃ

"পরম শ্রদ্ধেয় কাসেম ভাই,

আন্তরিক ভালোবাসা ও সালাম জানাই। আপনি জানেন যে, আমি তমদ্দুন মজলিসে যোগদানের আগে তাবলীগ জামায়াতে কয়েক বছর কাজ করেছি। তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াতের সন্ধান পাওয়া সত্ত্বেও আমি কেন তাবলীগ জামায়াতে জড়িত থাকতে বাধ্য ছিলাম তা আপনি জানেন।

আপনাকে আমি এ কথা জানানো কর্তব্য মনে করছি যে, আজই আমি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছি। গত এক মাস এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পর আজ সিদ্ধান্ত নিলাম। আপনার নিকট আমি তমদ্দুন মজলিসের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাই। আশা করি আপনি রংপুরে অন্য কাউকে এ দায়িত্ব দেবার ব্যবস্থা করবেন।"

আমি রংপুরে ফিরে গিয়ে পরবর্তী শুক্রবার তাবলীগ জামায়াতের সাপ্তাহিক ইজতিমায় আমার সকল তাবলীগী ভাইদের নিকট খোলা মনে বক্তব্য রাখলাম। বললাম ঃ

"আমি এমন এক জামায়াতে যোগদান করেছি, যার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হলে তাবলীগ জামায়াতের আমীরের দায়িত্ব আপনাদের মধ্য থেকে কাউকে গ্রহণ করতে হবে। উভয় দায়িত্ব পালন করা আমার জন্য অসম্ভব।"

বুঝতে পারলাম যে, তাঁরা এ বিষয়ে আগে থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত। কারণ প্রাদেশিক আমীর মাওলানা আবদুল আযীয গত সাপ্তাহিক ইজতিমায় তাদেরকে অবহিত করে গেছেন। তখন তারা যার উপর দায়িত্ব দেবার জন্য একমত হলেন তার ব্যাপারে মাওলানা আবদুল আযীয সম্মতি দিয়ে গেছেন বলে জানালেন। আমার তাবলীগী সাথীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অল্প দিনের মধ্যেই জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। আমি তাদের কাউকেই তাবলীগ জামায়াত ত্যাগ করে চলে আসবার জন্য সামান্য ইঙ্গিতও দিইনি।

রংপুরে সংগঠন শুরু

রংপুরে অল্পদিনের মধ্যেই দুটো ইউনিট কায়েম করা হলো। একটি কলেজ ক্যাম্পাসে অপরটি শহরে। কলেজ ইউনিটের নাযেমের দায়িত্ব আমার উপর পড়লো এবং শহর ইউনিটের দায়িত্ব কেরামতিয়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আলী আহমদ রিযভী নিলেন।

চারজন অধ্যাপক ফরম পূরণ করে মুত্তাফিক (সহযোগী সদস্য) হলেন। অধ্যাপক

সাইয়েদ মুহাম্মদ ইসহাক তো মাওলানা মওদূদীর দুটো বই পড়ে মনের দিক দিয়ে আগেই তৈরি ছিলেন। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাংলার অধ্যাপক জমীরুদ্দীন আহমদ, অংকের অধ্যাপক আবুল খায়ের এবং ইসলামের ইতিহাসের অধ্যাপক গোলাম রসূল (পরবর্তীকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর) সংগঠনে যোগদান করলেন।

আর শহরে মাওলানা আলী আহমদ রিযভী তাঁর মসজিদের কয়েকজন মুসল্লীকে সংগঠনভুক্ত করতে সক্ষম হলেন। জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত পেয়ে রিযভী সাহেব গভীর আবেগের সাথে বললেন ঃ

"প্রফেসর সাহেব! আপনাকে ১৯৫০ সাল থেকেই চিনি। তাবলীগ জামায়াতের কাজে এ মসজিদে বহুবার এসেছেন। আমি সেদিকে মোটেই আকৃষ্ট হইনি। আমি মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর ছাত্র। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে যে প্রেরণা পেয়েছিলাম তার ফলে এমনি একটি সংগঠন মনে মনে তালাশ করছিলাম। এতোদিনে আমার সে কামনা পূরণ হলো।"

সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু হলো

পরবর্তী শুক্রবার সকালের ট্রেনেই জনাব আবদুল খালেক এলেন। তাঁকে স্টেশন থেকে আমি কলেজ ক্যাম্পাসে আমার বাসায় নিয়ে এলাম। দুটো ইউনিট কায়েম হয়ে গেছে শুনে তিনি খুবই উৎসাহিত হলেন। তাঁরই পরামর্শে প্রথমে উভয় ইউনিটের বৈঠক একসাথে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। কলেজ ইউনিটের সবাই কেরামতিয়া মসজিদে গিয়ে মাগরিবের নামায পড়লাম। নামাযের পর ইমাম সাহেব সবাইকে তাফসীর শুনবার দাওয়াত দিলেন। অনেকেই বসলেন।

জনাব আবদুল খালেক কুরআন মাজীদকে সঠিকভাবে বুঝবার উপায় হিসেবে এমন চমৎকার কিছু কথা বললেন, যা আমাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছে। তমদ্দুন মজলিসে যোগদানের পর আমি আল্লামা ইউসুফ আলীর ইংরেজিতে লেখা 'দি হোলি কুরআন' এবং আবদুল হাকীম ও আলী হাসানের বাংলা তাফসীর বছরখানেক ঘাঁটাঘাঁটি করে কুরআন বুঝবার চেষ্টা করলাম। মনে হলো, কুরআন বুঝবার যোগ্যতা অর্জন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই এ প্রচেষ্টা ত্যাগ করলাম।

কিন্তু আবদুল খালেক সাহেবের বক্তব্য শুনে মনে হলো যে, কুরআন বুঝা সম্ভব। পরপর তিন শুক্রবার তিনি কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিলেন। সাথে সাথে সূরা ফাতেহা ও সূরা বাকারার প্রথম রুকুর তাফসীর পেশ করলেন। সাধারণ মুসল্লী শ্রোতাগণ তার দারসে কতটুকু উৎসাহ পেয়েছেন জানি না। আবদুল খালেক সাহেবের আসল টার্গেট তারা নয়, সংগঠনভুক্তদেরকে কুরআন বুঝবার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করাই তাঁর উদ্দেশ্য বলে তিনি আমাকে পরে জানিয়েছেন।

কুরআন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হলো ঃ

আরবী ভাষার কোন বড় পণ্ডিতও যদি একটি গ্রন্থ হিসেবে কুরআনকে বুঝতে চেষ্টা

করে তবু তিনি সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন না। কুরআনকে বুঝতে হলে প্রথমে জানতে হবে, যার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে তাঁকে কোন্ দায়িত্ব দিয়ে রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে। মানব সমাজকে ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সামষ্টিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দেওয়া একমাত্র বিশুদ্ধ, নির্ভুল ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধান চালু করে দুনিয়ার জীবনে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির পথে পরিচালনা করাই রাসূল (স)-এর দায়িত্ব ছিলো।

এ বিরাট দায়িত্ব তিনি ২৩ বছর বাস্তবে পালন করেন। এ দায়িত্ব পালনকালে যখন যতটুকু হেদায়াত প্রয়োজন তা জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-এর নিকট আবৃত্তি করে শুনাতেন। এসবের সমষ্টিই হলো গ্রন্থাকারে সংকলিত ৩০ পারার কুরআন। আল্লাহ তাআলা এক সাথে লিখিত গ্রন্থ হিসেবে কুরআন নাযিল করেননি।

ফলে নবী করীম (স) শেষ ২৩ বছরে যা করেছেন ও বলেছেন এর সবটুকুই কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা।

তাঁর ৪০ বছর বয়সে হেরাগুহায় প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার পর থেকে ৬৩ বছর বয়সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পূর্ব পর্যন্ত এ দীর্ঘ ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে কুরআনের আয়াতগুলোকে শুধু আরবী ভাষার পাণ্ডিত্য নিয়ে অধ্যয়ন করলে কুরআনের আসল মর্ম বুঝা কিছুতেই সম্ভব হবে না। কুরআন ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার গাইড বুক। আন্দোলন থেকে আলাদা করে কুরআন বুঝা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

রাসূল (স) আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার যে সফল আন্দোলন করেছেন ঐ জাতীয় আন্দোলনে যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তারাই কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে সক্ষম। কারণ আন্দোলন করতে গিয়ে তাদেরকেও ঐসব ঘাঁটি, সমস্যা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, যার সমাধান কুরআনে পেশ করা হয়েছে। তখন মনে হবে যে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো যেন তাদের জন্যই নাযিল হয়েছে। এভাবেই কুরআন ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদদের নিকট তার মর্মবাণী সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

দারসে কুরআনের প্রতিক্রিয়া

আমরা যে কয়জন সংগঠনে শামিল ছিলাম তাদের সবাই তিন শুক্রবারে তিনটি দারস শুনে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হই। মসজিদের অন্যান্য মুসল্লীদের কয়েকজনও উৎসাহিত হয়ে সংগঠনে যোগদান করেন। মাওলানা আলী আহমদ রিযভী খুব আবেগী লোক ছিলেন। তিনি আবেগের সাথেই মন্তব্য করলেন যে, "এদ্দিনে কুরআন বুঝবার উপায় জানা গেলো।"

আবদুল খালেক সাহেব প্রতি শুক্রবার ঢাকা মেইলে দুপুরে এসে আমার বাসায় খাওয়া ও বিশ্রাম করতেন। মাগরিবের পূর্বে তাকে নিয়ে শহরে কেরামতিয়া জামে মসজিদে পৌঁছতাম। ইশার নামাযের পর কলেজে ফিরে আসতাম। আমার বাসায় রাত যাপন করে সকালের গাড়িতেই গাইবান্ধায় ফিরে যেতেন।

আমার বাসায় থাকাকালে তিনি আমার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করতেন, সংগঠন পদ্ধতি সম্পর্কেও আমাকে বিস্তারিত অবহিত করার চেষ্টা করতেন।

তৃতীয় শুক্রবার রাতে আমার বাসায় জনাব আবদুল খালেকের সাথে আলাপ করতে গিয়ে আমি অস্বাভাবিক আচরণ করে বসলাম। তাঁর বক্তব্য রাখার পদ্ধতি, শব্দ চয়ন এবং যুক্তির বলিষ্ঠতায় আমি তাঁর ভক্ত হয়ে উঠছিলাম। বিশেষ করে কুরআন বুঝবার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর আলোচনা ও দারসে আমি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়ি। এক বছর কুরআন বুঝবার চেষ্টা করে নিরাশ হয়ে কুরআন বুঝা অত্যন্ত কঠিন মনে করে সে চেষ্টা ক্ষান্ত করলাম। কিন্তু তিনি এমন চমৎকার পদ্ধতি কোথায় পেলেন, যাতে 'কুরআন বুঝা সহজ' বলে মনে হচ্ছে, এটা আমার মনে বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখা দিলো।

আমি তাঁর হাত ধরে সিরিয়াস মুহূর্তে প্রশ্ন করলাম ঃ

"আপনার উপর ইলহাম হয় কিনা তা জানতে চাই।" তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন, "এমন প্রশ্ন কেন আপনার মনে জাগলো?" আমি জওয়াবে উপরের কথাগুলো তাঁকে শুনালাম। তিনি বিষয়টিকে হালকা করার উদ্দেশ্যে হেসে বললেন, "এতে আমার কোন কেরামতি নেই। মাওলানা মওদূদীর তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' থেকে এ সব কথা শিখেছি।"

আমি অভিযোগের সুরে বললাম, "আমাকে এ তাফসীর এদ্দিন দিলেন না কেন?"

তিনি বললেন, এ তাফসীর উর্দু ভাষায় রচিত। এখনও এর অনুবাদ বের হয়নি।

কুরআন অধ্যয়নের আগ্রহাতিশয্যে আমি দাবি জানালাম, "আগামী শুক্রবার আমার জন্য তা নিয়ে আসবেন।"

তাবলীগ জামায়াতের মাধ্যমে যতটুকু উর্দু শিখেছিলাম তা তাফসীর পড়ার জন্য যথেষ্ট হবে না মনে করে আমি রংপুর কলেজের উর্দু ভাষার অধ্যাপক মাহফুজুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করলাম। তার সাথে চুক্তি হলো যে, আমাকে তিনি উর্দু শেখায় সাহায্য করবেন এবং আমি তাঁকে বাংলা শিখতে সহায়তা করবো। অধ্যাপক মাহফুজুর রহমানের বাড়ি বিহারে। তিনি রাঁচি সরকারি কলেজে উর্দু পড়াতেন। অপশন দিয়ে পাকিস্তানে এসে রংপুর কলেজে যোগদান করেছেন।

তাফহীমুল কুরআন অধ্যয়ন শুরু করলাম

পরবর্তী শুক্রবার আবদুল খালেক সাহেব তাফহীমুল কুরআন প্রথম খণ্ড নিয়ে এলেন। পরামর্শ দিলেন, "ভূমিকাটি প্রথম আয়ত্ত করুন।" ভাষা বেশ কঠিন মনে হলো। যেসব শব্দ না বুঝলে বক্তব্য স্পষ্ট হয় না সে শব্দগুলো উর্দুর অধ্যাপক থেকে শিখতে হলো। আমার জীবনে শেখার নেশা চেপে বসলো। আব্বার চাপে ছাত্রজীবনে আরবী পড়তে বাধ্য হয়েছিলাম বলে উর্দু শেখায় তা বিরাট সহায়ক

মনে হলো। বহু আরবী শব্দ উর্দুতে যে রূপলাভ করেছে তা উর্দুর অধ্যাপক থেকে বুঝে নিলাম।

তাফহীমুল কুরআনের দীর্ঘ ভূমিকা হজম করতে বেশ পরিশ্রম করতে হলো। ভাষার বোঝা ভাবের আকর্ষণে হালকা হয়ে আসলো। বুঝতে পারলাম যে, সঠিক পদ্ধতি জানা থাকলে সব কাজই সহজ হয়। কুরআন বুঝবার এ টেকনিক আগে জানা থাকলে কুরআন অধ্যয়ন কঠিন মনে করে আমাকে সে প্রচেষ্টাই ত্যাগ করতে হতো না।

ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ যেন কুরআন অধ্যয়ন কঠিন মনে করে আমার মতো হতাশ না হয়, সে উদ্দেশ্যে পরবর্তী সময়ে আমি তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকার আলোকে 'কুরআন বুঝা সহজ' শিরোনামে একটি বই লেখা কর্তব্য মনে করলাম। এ বইটি প্রকাশিত হবার পর আমি এ মনে করে তৃপ্তি বোধ করেছি যে, আমি কুরআন অধ্যয়ন ত্যাগ করে যে গোনাহ্ করেছিলাম এর কিছুটা কাফ্ফারা হয়তো তা দ্বারা আদায় হবে।

ভাষা শেখার আনন্দ

কয়েক মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে উর্দু ভাষা আয়ত্ত হলো বলে অনুভব করলাম। একটা ভাষা শিখতে পারা যে কত বড় সাফল্যময় আনন্দ ও মানসিক তৃপ্তিবোধের বিষয়, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এ কথা জেনে আরও উৎসাহ্ বোধ করলাম যে, বিগত দু'শ বছরে আরবী ভাষায় ইসলামের সকল মূল্যবান সাহিত্য উর্দু ভাষায় অনূদিত হওয়ায় এ ভাষার সাহায্যে ইসলামের সবদিক সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জন সম্ভব।

আমার নিকট উর্দুর তুলনায় আরবী ভাষা বেশ কঠিন মনে হয়েছে। যতটুকু পরিশ্রম করে উর্দু ভাষা আয়ত্ত করতে পেরেছি, আরবী ভাষা আয়ত্ত করতে এর চেয়ে অনেক বেশি শ্রম ও সময় প্রয়োজন।

আফসোস যে, আমি আরবী ভাষা পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে সক্ষম হইনি। ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সময় ও শ্রম দিতে পারলাম না। '৭২ থেকে '৭৮ সাল পর্যন্ত আমার বাধ্যতামূলক নির্বাসন জীবনে এ প্রচেষ্টা চালাবার সুযোগ নেওয়া সম্ভব ছিলো। কিন্তু ঐ সময় আমি এতো রকম সমস্যায় জর্জরিত ছিলাম যে, এ সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারিনি। এ অনুতাপ নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে।

ইসলামী আন্দোলনের উচ্চ দায়িত্বশীলদের জন্য আরবী ও ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা অপরিহার্য। বিশেষ করে আরবদের নিকট আরবীতে বক্তব্য রাখতে না পারলে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া যায় না। বিশ্বের অনেক অনারব দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের মধ্যেও আরবীতে বক্তৃতা করার লোকের অভাব নেই। আমাদের উচ্চ দায়িত্বশীলদের মধ্যে ইংরেজিতে বক্তৃতা করার লোক আছে। আরবীতে বক্তৃতার লোকের অভাব দূর করা প্রয়োজন।

মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী বিরোধী বইয়ের হামলা

আমি তাফহীমুল কুরআনের মাধ্যমে কুরআন বুঝবার তৃপ্তি পেয়ে ক্ষুধার্তের মতো অবিরাম অধ্যয়নে লেগে গেলাম। ৬ মাসের অধ্যয়নে আমার অন্তরে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর প্রতি গভীর মহব্বত অনুভব করলাম। ঐ সময় মাওলানা জেলে ছিলেন। ফাঁসির আদেশ পরিবর্তন করে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

তাফসীর অধ্যয়নকালে মাঝে মাঝে আবেগাপ্লুত হয়ে, পড়া মুলতবি করে তাঁর মুক্তির জন্য দোয়া করতাম। বিশেষ করে যেসব আয়াতের মর্ম পূর্বে বুঝবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি বা অতৃপ্ত রয়েছি সে সবের তাফসীর পড়ে এমন উৎসাহ বোধ করতাম যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই দিল থেকে দোয়া বের হতো।

১৯৫৫ সালের জানুয়ারিতে শীতকালীন ছুটির পর রংপুর ফিরে এসে ডাকে প্রেরিত কতক বই পেলাম। দিল্লী ও করাচী থেকে প্রেরিত বইগুলো সবই উর্দুতে লেখা। ঔৎসুক্য নিয়ে পড়া শুরু করলাম। দেখলাম সবগুলো বই-ই মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ফতোয়া। এর কোনটা দেওবন্দ থেকে, কোনটা সাহারানপুর থেকে এবং কোনটা করাচী থেকে প্রকাশিত।

আমি বুঝতে পারলাম যে, তাবলীগ জামায়াতের এ দেশীয় আমীর, আমার মহব্বতের তাবলীগী উস্তাদ মাওলানা আবদুল আযীযের প্রচেষ্টায়ই এ সব বই আমার নিকট পৌঁছেছে। করাচী ও দিল্লীর কেউ আমার নাম-ঠিকানা জানার কথা নয়। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন বলেই আমাকে 'গোমরাহী' থেকে ফিরাবার নেক উদ্দেশ্যেই তা করেছেন। তিনি আন্তরিকতার সাথে ধারণা পোষণ করতেন যে, জামায়াতে ইসলামী কাদিয়ানী ফেরকার চেয়েও বেশি পথভ্রষ্ট।

ফতোয়াদাতাদের নাম দেখে প্রথমে ঘাবড়ে গেলাম। বড় আলেম হিসেবে শ্রদ্ধা করতাম এমন লোকের নামও তাতে ছিলো। ইতোমধ্যে যদি মাওলানা মওদূদীর মহব্বতে গ্রেপ্তার না হতাম তাহলে আমার মধ্যে এ সব ফতোয়ার প্রতিক্রিয়া কেমন হতো জানি না। কিন্তু নামকরা আলেমের ফতোয়া বলেই অন্ধভাবে তা মেনে নিলাম না। অবশ্য এ সিদ্ধান্ত নেওয়া কর্তব্য মনে করলাম যে, এ সব ফতোয়া ভালোভাবে পড়বো।

পড়ার পর মাওলানা মওদূদীর লেখা যেসব বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে, সে বইগুলো জনাব আবদুল খালেকের সহযোগিতায় লাহোর থেকে আনালাম। আমি এ সব ফতোয়ার এটুকু অবদান স্বীকার করি যে, আমি এক বছরের মধ্যে মাওলানা মওদূদীর এতো বই হয়তো পড়তে বাধ্য হতাম না। এ ব্যাপক অধ্যয়ন আমাকে একদিকে যেমন ইসলামের বহু দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছে, অপরদিকে সমালোচকদের বক্তব্য থেকেও আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি।

নিম্নে তা উল্লেখ করছি ঃ

১. কোন কোন লেখকের সমালোচনায় মোটেই বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি। নিরপেক্ষ হয়ে যুক্তি দেখিয়ে মাওলানার কোন কোন বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। এর দ্বারা আমি এ শিক্ষা পেলাম যে, মাওলানা মওদূদীকে সম্পূর্ণ নির্ভুল মনে করে অন্ধভাবে তার সব কথা গ্রহণ করা উচিত নয়। নবী ছাড়া কেউ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করেই তাঁর লেখা পড়তে হবে।

২. কতক লেখকের ভাষা বিদ্বেষপূর্ণ। যুক্তি দিয়ে ভুল ধরিয়ে দেবার পরিবর্তে পাঠকদেরকে বিভ্রান্ত করাই তাদের উদ্দেশ্য। এর জন্য তারা নিম্নোক্ত তিন ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছেন ঃ

ক. মাওলানার লেখা থেকে উদ্ধৃত করার সময় কোথাও পূর্বের কথা বাদ দিয়ে বা পরের বাক্য উল্লেখ না করে শুধু ঐ অংশটুকু তুলে আনা হয়েছে, যা যে কেউ পড়লেই আপত্তিকর মনে করবে।

খ. কোথাও কোথাও মাওলানার কথার সাথে এমন শব্দ শুরুতে বা শেষে যোগ করা হয়েছে, যা মাওলানার বক্তব্যকে বিকৃত করে দিয়েছে।

গ. কোথাও এমন কোন বাক্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা অন্য লোকের বক্তব্য হিসেবে মাওলানার বইতে তিনি উদ্ধৃত করে এর তীব্র সমালোচনা করেছেন। অথচ ঐ বাক্যটি মাওলানার বইতে থাকার কারণে তা মাওলানার লেখা হিসেবে দেখানো হয়েছে।

৩. একজন লেখক এমন পেলাম যিনি বিদ্বেষ পোষণ করেন না বটে; কিন্তু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের যে তাৎপর্য মাওলানা মওদূদী পেশ করেছেন এর সাথে তিনি একমত নন। আমার ধারণা হলো যে, তিনি ইসলামকে 'ধর্ম' হিসেবে বিশ্বাস করেন। ইসলাম যে একটি বিপ্লবী আন্দোলন তা মনে করেন না।

যা হোক, বিরোধীদের লেখা বই থেকে আমি নিম্নরূপে উপকৃত হয়েছি ঃ

১. এ বইগুলো আমাকে মাওলানা মওদূদীর বহু বই অল্প সময়ের মধ্যে পড়তে বাধ্য করেছে। এ সময়ের মধ্যে এত বই স্বাভাবিকভাবে পড়া হতো না। এতে ইসলামী আন্দোলন, সংগঠন ও ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হয়েছে।

২. মহব্বত ও আবেগের তাড়নায় যেন মাওলানা মওদূদীর সকল মতামত ও বক্তব্যকে নির্ভুল মনে করে না বসি, সেদিকে আমাকে সচেতন থাকতে ঐ বইগুলো সাহায্য করেছে। কুরআন ও হাদীসের যুক্তি ব্যতীত কোন কথা যেন শুধু মাওলানার বক্তব্য বলে দলীল হিসেবে গ্রহণ না করি, সে বিষয়ে আমাকে সাবধান থাকতে উপদেশ দিয়েছে।

৩. ইখলাসের সাথে সংশোধনের নিয়তে সমালোচনার ভাষা কেমন এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি ও বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে লেখার ভাষায় পার্থক্য উপলব্ধি করতে সক্ষম

হয়েছি। দ্বিতীয় প্রকার লেখার বক্তব্য উপেক্ষা করা ও প্রথম প্রকার লেখার যুক্তি বিবেচনা করার কৌশল এ বইগুলো থেকে শিখেছি।

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করায় আব্বার প্রতিক্রিয়া

আব্বার সাথে তাবলীগ জামায়াতের আমীর মাওলানা আবদুল আযীযের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। আগেই উল্লেখ করেছি যে, আব্বাই আমাকে নারিন্দার এক মসজিদে নিয়ে মাওলানার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তখন থেকেই আমি তাবলীগ জামায়াতে কাজ শুরু করি। ১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে আমার এমএ পরীক্ষার দু'মাস পূর্বে এ সম্পর্কের সূচনা হয়।

১৯৫৪ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি আমি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করি। মে মাসের শেষ সপ্তাহে হঠাৎ আব্বা বিনা-খবরে রংপুর এসে গেলেন। ইতঃপূর্বে কয়েকবার আব্বাকে অনুরোধ করে, এমনকি ভাড়ার টাকা মানি-অর্ডার করে পাঠিয়েও তাঁকে রংপুরে বেরিয়ে যেতে রাজি করাতে সক্ষম হইনি। অথচ এভাবে তিনি হঠাৎ করে চলে আসায় আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। আমার জানা ছিলো যে, আব্বা তিন চিল্লার (৪ মাস) জন্য দিল্লী হয়ে লাহোর গেছেন।

আব্বা দুপুর একটায় ঢাকা মেইলে রংপুর স্টেশন থেকে রিকশায় কলেজ কম্পাউন্ডে আমার বাসায় প্রায় দেড়টায় পৌঁছলেন। তখন যোহর নামায শেষ করেছি। খাবার জন্য তৈরি হচ্ছি। আব্বাকে রিকশা থেকে নামিয়ে ঘরে নিয়ে গেলাম। অন্য কোন ভূমিকা ছাড়াই আব্বা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন ঃ

"তুমি আমার আগে তিন চিল্লা দিয়েছো। তাবলীগের নেতাদের মধ্যে গণ্য হবার পর তাবলীগ ছেড়ে দিলে কেন জানতে চাই। তুমি বংশের বড় ছেলে। তোমার উপর আমার বড় আশা-ভরসা। আখিরাতে নাজাতের আশা নিয়ে তোমাকে তাবলীগের সাথে পরিচয় করালাম। তাবলীগে এতোটা এগিয়ে যাবার পর কী কারণে তা ছেড়ে অন্য জামায়াতে গেলে তা জানতে চাই।"

আমি আব্বাকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললাম ঃ

"আব্বা, আপনি গোসল ও নামায সেরে খেয়ে নিন। এরপর ধীরে-সুস্থে কথা বলা যাবে।" তাঁর রাগের ভাব কমলো এবং খাবার পর আলোচনা শুরু হলো। আমিই কথা শুরু করলাম। বললাম ঃ

"আব্বা, আপনার ছেলে বিপথে চলে যায়নি। ছোট সময় থেকে আপনি আমাকে গড়ে তুলেছেন। আমি তাবলীগে কয়েক বছর কাজ করে যা শিখেছি তা আজীবন আমার কাজে লাগবে। আমি বহু চিন্তা-ভাবনা করেই জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছি। এ জামায়াত সম্পর্কে আমি আগে কিছুই জানতাম না। আপনি এ সম্বন্ধে জানার পর বুঝতে পারবেন, এটা সঠিক পথ কিনা।"

তিনি আগের চেয়েও বেশি রাগান্বিত হয়ে বললেন ঃ

"আমি তা জানতে ও বুঝতে চাই না। তুমি ঐ সব ছাড়ো। আবার তাবলীগে কাজ

করো।" অত্যন্ত পেরেশান হয়ে আব্বাকে বললাম ঃ

"আব্বা, জীবনে কোন দিন কোন বিষয়ে আপনার সাথে তর্ক করতে সাহস করিনি। আপনার চোখের দিকে চেয়ে কখনো আপনার কোন কথায় আপত্তি করিনি। কিন্তু আজ এমন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, যেখানে কুরআন-হাদীসের আলোকে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যে দীনের আকর্ষণে তাবলীগ জামায়াতে কাজ করেছি, সে দীনের টানেই জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছি।"

অত্যন্ত রাগতস্বরে তিনি বললেন ঃ

"মাওলানা আবদুল আযীয কি কিছুই বুঝেন না? তিনি আমাকে কেন লিখলেন যে, আপনার ছেলে কাদিয়ানী ফেরকা থেকেও অধিকতর গোমরাহ্ জামায়াতে যোগদান করেছে। এ চিঠি পেয়ে আমি তাবলীগের চিল্লা বাদ দিয়ে দেশে ফিরে এসেছি। ঢাকাতে পৌছার পরদিনই রওনা হয়েছি। আমার যে কী পেরেশানী তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।"

এ কথা শুনে আব্বার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কেঁদে ফেললাম। ছেলে কাদিয়ানীর চেয়েও খারাপ পথে চলে গেছে, এ কথা কোন বিশ্বস্ত আলেমের কাছে জানার পর পিতার পেরেশানীর সীমা থাকতে পারে না। আব্বা আমার কল্যাণ চান বলেই এমন অস্থির হয়ে গেছেন। তাঁর চেহারায় চরম বিষণ্নতা লক্ষ্য করে আমার এত মায়া লাগলো যে, আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

আমার কান্নায় আব্বা ধারণা করলেন যে, আমি ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে কাঁদছি। তাই তিনিও আমাকে আলিঙ্গন করে কাঁদতে লাগলেন। সে এক ভয়ানক বিব্রতকর অবস্থা। কিছুক্ষণ পর দু'জনই কিছুটা শান্ত হয়ে বসলাম। আব্বা বড় আশা নিয়ে আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেনো তাবলীগ জামায়াতে ফিরে আশার কথা এখনই আমার মুখে শুনতে চান।

আব্বাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে বললাম ঃ

"আব্বা, দীনের ব্যাপারে ধীরে-সুস্থে ভালোভাবে ভেবে-চিন্তেই সিদ্ধান্তে পৌছা দরকার। জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে আপনার সঠিক ধারণা যাতে হয়, সে জন্য আমি কিছু বই আপনাকে দিতে চাই। মাওলানা আবদুল আযীয এ বিষয়ে না জানার কারণেই আপনাকে চিঠি লিখে পেরেশানীতে ফেলেছেন।"

তিনি আবার রাগ করে বললেন ঃ

"মাওলানা আবদুল আযীযকে আমি চিনি। তিনি না জেনে এমন কথা লিখতে পারেন না। আমি আর কোন কথা শুনতে চাই না। তোমাকে তাবলীগ জামায়াতে ফিরে আসতে হবে।" ইতঃপূর্বে আমি কখনো এতোবড় সংকটে পড়িনি। যে আব্বাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে এসেছি, যার কোন অযৌক্তিক আদেশ পর্যন্ত কখনো অমান্য করিনি, যার সামনে কোন অপরাধের কৈফিয়ত দেবার সাহসও

পাইনি, যার অসন্তুষ্টির ভয়ে তাঁর মর্জির খেলাফ কখনো চলিনি, আজ সে মহান আব্বার সাথে বিতর্ক করতে বাধ্য হয়ে চরম বিব্রতবোধ করলাম। কয়েক মিনিট মাথা নত করে চুপ হয়ে রইলাম। তিনি না বুঝে অন্যায় চাপ প্রয়োগ করছেন, এ কথা উপলব্ধি করে অসহায়ের মতো চোখ তুলে আব্বার দিকে তাকিয়ে আছি। তখন আমার চোখ থেকে অবিরাম পানি পড়ছে।

যে ছেলে কোনদিন সামান্য অবাধ্য হয়নি, আজ সে তার সিদ্ধান্তে এতোটা দৃঢ় ও অটল দেখে তিনিও বিব্রতবোধ করলেন। আমার অবস্থা দেখে হয়তো মায়াও লাগলো। নরম সুরে কাঁদো কাঁদো অবস্থায় বললেন ঃ

"দুনিয়ায় তুমি আমার সন্তানদের পথপ্রদর্শক হবে এবং আখিরাতে তোমার উসীলায় মুক্তি পাবো, এ আশা নিয়ে বেঁচে আছি। তোমাকে আল্লাহর পথে অগ্রসর দেখে আল্লাহর দরবারে হাজির হবো মনে করে সান্ত্বনা বোধ করছিলাম। তুমি কোন ভ্রান্ত পথে যেতে পারো, এমন আশঙ্কা আমি কখনো করিনি। তোমার জন্য তোমার দাদা দোয়া করে গেছেন এবং অনেক আশা নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। কী পেরেশানী আমি ভোগ করছি তা তোমাকে বুঝাতে পারবো না।

আব্বা থামলেন এবং তাঁর চোখে পানি বইতে থাকলো। আমি তাঁর দু'পা জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে বললাম ঃ

"আব্বা, আমি দুনিয়ার সামান্য স্বার্থেও এ সিদ্ধান্ত নেইনি। ইসলাম সম্পর্কে এমন ব্যাপক ধারণা পূর্বে পাইনি। কুরআনের এমন প্রাণ মাতানো ব্যাখ্যাও ইতঃপূর্বে শুনিনি। আমি নিশ্চিত যে, আপনি কয়েকটি বই পড়লেই সঠিক ধারণায় পৌঁছবেন। আমি কয়েকটি বই আপনাকে দিচ্ছি। সপ্তাহখানেক পরই গ্রীষ্ম ও রমযান মিলে দু'মাসের ছুটিতে ঢাকায় থাকবো ইনশা-আল্লাহ। তখন বিস্তর আলোচনার সময় পাওয়া যাবে।

আব্বার চেহারার দিকে তাকিয়ে মনে হলো যে, আপাতত সংকট কেটে গেলো। পরদিন আব্বা ঢাকা ফিরে গেলেন। আবদুল খালেক সাহেব যে দু'টো বই সর্বপ্রথম দিয়েছিলেন, সে দু'টোর সাথে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর 'দাওয়াতে দীন কে তারীকে কার' (দীনের দাওয়াতের পদ্ধতি) বইটিও দিয়ে দিলাম।

ঢাকায় আব্বার মুখোমুখি

আমার আশা ছিলো যে, ঢাকা যেয়ে আব্বাকে অনুকূল পাবো। কিন্তু আব্বার চেহারা দেখে বুঝলাম, সংকট মোটেই কাটেনি। আমি জানতাম যে, ইসলামী আন্দোলনের পথে বাধা আসবেই। কিন্তু এমন স্থান থেকে বাধা আসবে তা কল্পনাও করিনি। যে তিনটা বই পড়তে দিয়েছিলাম এর কোন সুফল দেখতে পেলাম না। আলোচনার সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। প্রথম সুযোগেই অনুভব করলাম যে, ইসলাহী সাহেবের বইটি দেওয়া মস্তবড় ভুল হয়েছে। এ বইটির প্রথম চ্যাপটারেই তাবলীগ জামায়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ রয়েছে। তাই বই এর বাকি অংশ তিনি

পড়েনইনি। কোন ধর্মীয় কাজের সমালোচনা করতে হলে হিকমতের সাথে এবং দরদি মন নিয়ে করা উচিত, যাতে সংশ্লিষ্ট লোকেরা বিবেচনাযোগ্য মনে করে।

মাওলানা ইসলাহীর সমালোচনায় দরদ ও হিকমতের কোনটাই ছিলো না। আব্বা যখন বিরক্তির সাথে বইটি ফেরত দিলেন, প্রথম পরিচ্ছদটা পড়েই আব্বার প্রতিক্রিয়ার কারণ বুঝতে পারলাম। তিনি লিখেছেন ঃ

"তাবলীগের নামে এক হাস্যকর পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে। একদল লোক ডেক-ডেকচি ও বিছানাপত্র মাথায় ও কাঁধে নিয়ে সারি বেঁধে তাবলীগে যায়। এ আজব পদ্ধতি তারা কোথায় পেলো? সাহাবায়ে কেরাম কি এভাবে দীনের তাবলীগ করেছেন?"

তাবলীগ জামায়াতের বিরুদ্ধে এ ধরনের বিদ্রূপের ভাষায় সমালোচনা পড়ে আব্বার মনে স্বাভাবিকভাবেই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর ফলে অন্য দুটো বই থেকেও কোন ভালো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি। আব্বা মন্তব্য করলেন ঃ

"তুমি আর মওদূদীই শুধু বুঝ, আর কেউ বুঝে না। তাবলীগ জামায়াতের কাজ একেবারেই তুচ্ছ?"

আলোচনায় বসার চেষ্টা করলাম। আমার ছোট ভাই ডা. গোলাম মোয়ায্যামও উপস্থিত ছিলো। আব্বা কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। আমি কুরআনের যুক্তি দ্বারা সন্তোষজনক জওয়াব দিলাম। ইতোমধ্যে তিনি জামায়াতের রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছেন, এর ভিত্তিতে সমালোচনামূলক কিছু কথা বললেন। আমি প্রতিটি কথার এমন জওয়াব দিতে থাকলাম, যা আমার ভাইকেও আকৃষ্ট করতে লাগলো। আমার যুক্তিপূর্ণ জওয়াবের পর আব্বা সন্তুষ্ট হওয়ার বদলে রাগ করে বললেন ঃ "তোমরা ছাড়া আর সবাই তাহলে ভুল পথে আছে?"

পিতা ও সন্তানের সম্পর্কটাই এমন যে, কোন বিষয়ে বিতর্ক হলে সন্তানের নিকট পিতার পরাজয় স্বীকার করা মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে অসম্ভব। পিতা যা বলবে সন্তানকে তা মেনে নিতে হবে। এটাই পিতার মর্যাদার দাবি। সন্তানের যুক্তির নিকট পিতার নতি স্বীকার করা অবাস্তব। যে পথে আমি চলছি এটা সঠিক নয় প্রমাণ করার মতো কোন যুক্তিই আব্বার কাছে ছিলো না। অথচ তিনি মনে করছেন যে, আমি ভ্রান্ত পথে আছি। আমি যুক্তি দিয়ে সঠিক পথে চলছি বলে প্রমাণ করছি। যত বিনয়ের সাথেই আমি যুক্তি-প্রমাণ পেশ করি ততই আব্বার বিরক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। আমি চরম বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম।

আমার ছোট ভাইয়ের একটি চমৎকার কথা পরিবেশটা হঠাৎ করেই অনেকটা শান্ত করতে সক্ষম হলো। সে বললো ঃ

"আব্বা, আমার কাছে এটা খুবই ভালো লাগছে যে, বহু পরিবারে পিতা-পুত্র ও ভাই ভাই সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া করে। আর আমাদের বাড়িতে আল্লাহর দীন নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। এতে আমি অনেক কথা শিখবার সুযোগ পেয়েছি। আপনারা দু'জনই

ইসলাম সম্পর্কে আরও পড়াশোনা করে এভাবে আলোচনা করলে আমার শেখার সুযোগ আরও বেড়ে যাবে।

অনেক ভেবে-চিন্তে আব্বাকে আরও একটি উর্দু বই দিলাম। আর এক আলোচনার সময় তিনি ঐ বই-এর বিরূপ সমালোচনা করলেন। আমি এর জওয়াব দিলাম। আমার ভাই আমার যুক্তি সমর্থন করে আব্বাকে সুন্দরভাবে বুঝাবার চেষ্টা করলো। বুঝতে পারলাম যে, নিরপেক্ষ মন নিয়ে না পড়লে আল্লাহর কিতাবেও ভুল আবিষ্কার করা যায়। এরপর আমি কোন বই পড়তে দেওয়া সমীচীন মনে করলাম না।

একটি মহৌষধি দারস

কলেজের ছুটি ঢাকায়ই কাটালাম। তাই ঢাকা শহর সংগঠনের সাথে যুক্ত হলাম। সাপ্তাহিক বৈঠকে ২০৫ নং নওয়াবপুর রোডের জামায়াত অফিসে যোগদান করলাম। দারসে কুরআন পেশ করলেন জামায়াতের রুকন মাওলানা ক্বারী জলীল আশরাফ। তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় কেরাআতের শিক্ষক। সূরা লুকমান থেকে হযরত লুকমান (আ) তাঁর ছেলেদেরকে যেসব মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন, সে অংশের দারস দিলেন। গোটা দারসটিই আমার নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হলো। বিশেষ করে দীনের ব্যাপারে পিতার সাথে বিরোধ সৃষ্টি হলে এ সমস্যার সমাধান কিভাবে করতে হয়, সে অংশটুকু আমার প্রাণে গেঁথে গেলো। মনে হলো, যেনো আমার সমস্যার সমাধানের জন্যই ঐ আয়াত কয়টি নাযিল হলো। ইতঃপূর্বে এ সব আয়াত কতবার তিলাওয়াত করেছি। আজ সে আয়াতগুলো যেভাবে আমাকে পথ দেখালো, পূর্বে এভাবে কখনো বুঝিনি।

সাহাবায়ে কেরামের সময় ইসলামী আন্দোলনে যোগদানকারীদের মধ্যে যাদের পিতামাতা বিরোধিতা করেছে তাঁদের জন্য এখানে যেসব হেদায়াত দেওয়া হয়েছে, দারসের মাধ্যমে এর চমৎকার ব্যাখ্যা আমার অস্থির চিত্তে পরম স্বস্তি দান করলো। অনুভব করলাম, এভাবেই ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় হলে কুরআনের আসল মর্ম বুঝে আসে। কারণ কুরআন যে আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে, ঐ আন্দোলনে যারা শরীক হয় তাদেরকে ঐ সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, যে সবের মোকাবিলা সেকালে করতে হয়েছে। অনুরূপ পরিস্থিতি হাজির হলে কী করা উচিত তা কুরআন সহজভাবে তুলে ধরে। তাই ঐ দারসটি আমার জন্য মহৌষধ হিসেবে মনে হলো।

দারসের শিক্ষা অনুযায়ী আব্বার সাথে আচরণ শুরু করলাম। তিনি যা মন্তব্য করেন এর কোন জওয়াব দিলে বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয় বলে আমি চুপ করে যেতাম। তাঁর দুনিয়াবী সকল কাজে আমি বেশি করে সহযোগিতা করতে লাগলাম। তাঁর কাছে বেশি সময় কাটাতাম এবং ব্যক্তিগত খেদমতে লেগে থাকতাম।

আমার ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করলাম যে, আমি তাঁকে নিজে কোন বই পড়তে দেবো না। যাতে তিনি নিরপেক্ষ মন নিয়ে বই পড়েন সে ব্যবস্থা করতে হবে।

আমার ভাই আব্বাকে বই পড়াতে সক্ষম হলো। তার হিকমত কাজে লাগলো।

সে বললো ঃ

"আব্বা, ভাই সাহেব ইসলাম সম্পর্কে যেসব বই পড়ে একদিকে এগুচ্ছেন, সেসব বই উর্দুতে বলে আমার পক্ষে পড়া দুঃসাধ্য। আমি বুঝবোই বা কতটুকু? আপনি আলেম হিসেবে ঐ বইগুলো পড়লে সঠিক যাচাই করতে পারবেন এবং আমি আপনার কাছ থেকে বুঝে নিতে পারবো। তিনি তাঁর জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে এগুচ্ছেন। ঐ বইগুলো না পড়ে তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত না হওয়াই ভালো। তাঁর চরিত্র আগেও ভালো ছিলো, এখন আরও উন্নত। তাঁর আচরণও আকর্ষণীয়। তিনি না বুঝে অন্ধের মতো ভ্রান্তপথে যাবার মানুষ নন। আব্বা, আপনি ধৈর্যের সাথে বইগুলো দেখুন।"

আমার ভাই সফল হলো। আমার কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়ে পড়াতে শুরু করলো। আপাতত সমস্যার সাময়িক সমাধান হওয়ায় আমি অনেকটা স্বস্তি বোধ করলাম।

৫৯.

আমার দাদী ও আমার আম্মার কথা

গত ০৭.০৩.০২ তারিখে বিমানে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলাম। এক সহযাত্রী সালাম দিলেন। হাত মিলায়ে পরিচয় জানতে চাইলাম। নামের কার্ড দিলেন। তাতে লেখা লায়ন ফিরোযুর রাহমান, এফআর গ্রুপ কোম্পানিসমূহের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। জানা গেলো, আমরা দু'জন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার লোক। আমি রসিকতা করে জেলাত ভাই বলি। তিনি বললেন,

"বাইতুল মুকাররম থেকে আপনার লেখা 'জীবনে যা দেখলাম' কিনে নিয়ে পড়েছি। আপনার দাদার কথা খুব লিখেছেন; কিন্তু দাদীর কথা তো কিছুই লিখেননি।" এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য শুকরিয়া জানালাম এবং শিগ্‌গিরই লিখবার সিদ্ধান্ত নিলাম। মনে মনে নিজকে অপরাধী মনে করলাম। আরও খেয়াল করলাম যে, আম্মার কথাও তেমন লেখা হয়নি। অথচ পিতার চেয়ে মায়ের হক তিন গুণ বেশি বলে হাদীস থেকে প্রমাণিত।

মহিলারা নীরব কর্মী

আমার জীবন গড়ার ব্যাপারে আব্বা ও দাদার অবদান উল্লেখ করেছি। কিন্তু আম্মা ও দাদীর কোন আলোচনাই করিনি। তাঁদের স্নেহ-মমতা, আদর-যত্ন, লালন-পালন আমার যে বয়সে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে, তা আমার স্মৃতির ঊর্ধ্বে। আমি আব্বা ও দাদার ঐ সময়কার কথাই লিখেছি, যা আমার মনে আছে। শিশুকালের যে বয়সের কথা কিছুই মনে নেই, সে সময়ই তো আম্মা বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাই সে কথা লেখার বিষয় নয়, শুধু অনুভব করার।

সাধারণত বিভিন্ন পেশায় পুরুষরাই বাড়ির বাইরে কর্মব্যস্ত থাকে এবং বাড়ির

যাবতীয় দায়িত্ব নারীরাই পালন করে। তাদের কর্মতৎপরতাকে পেশা হিসেবে গণ্য করা হয় না। তারা শুধু গৃহবধূ (House-wife)। পুরুষের সাপ্তাহিক ছুটি আছে; নারীর কোন ছুটি নেই। সেদিন তাদের কাজ আরও বেড়ে যায়। তারা বাড়ি সামলানোর দায়িত্ব পালন করে বলেই পুরুষরা নিশ্চিন্তে বাইরের দায়িত্ব পালন করতে পারে। বাইরে থেকে বাড়িতে এসে পুরুষরা যে সেবা-যত্ন ও বিশ্রামের তৃপ্তিবোধ করে এর সবটুকু নারীর অবদান। অথচ তাদের সার্বক্ষণিক কর্মব্যস্ততার মূল্যায়ন কমই করা হয়। শুধু পুরুষই যেনো মহাকর্মী। নারীদের কর্ম হিসাবের মধ্যেই গণ্য নয়। অথচ তারাই সবচেয়ে বেশি সময় কর্মব্যস্ত থাকে। তারা সর্বক্ষণ নীরব কর্মী। অথচ তাদের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। তাদের জন্য আল্লাহর দেওয়া মর্যাদা সঠিক স্বীকৃতি পায় না।

আমার আম্মা

আমার আম্মা সাইয়েদা আশরাফুন নিসা ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত শহরেই ছিলেন। গ্রামীণ জীবনের প্রথমদিকে খুব অসুবিধা বোধ করলেও দাদীর পরম সহানুভূতির ফলে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন। বিয়ের ১৫ বছর পর আব্বা চান্দিনায় বদলি হবার ফলে কিছুটা শহুরে জীবন ফিরে পেলেন। আরও ১৭ বছর পর ঢাকায় বদলি হলে আম্মা পূর্ণ শহুরে জীবন লাভ করেন। কিন্তু কোন সময় তাঁর মুখে সামান্য অসন্তোষের কথা শুনিনি। সকল অবস্থায় আম্মাকে একই রকম মন-মেজাযে পেয়েছি। কোন সময় আম্মার ধমক খেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

আম্মার সন্তানদের মধ্যে আমি সবার বড়। আমার পৌনে দু'বছরের ছোট ডা. গোলাম মুয়ায্যাম এবং ওর আড়াই বছরের ছোট আমার প্রথম বোন শামসুন নাহার। যে বয়সের কথা মনে আছে, সে বয়সে আম্মার সাথে এক বিছানায় ঘুমিয়েছি বলে মনে পড়ে না। ঢাকায় মামার বাড়িতে বেড়াতে গেলে এক বিছানায় শুয়েও আম্মা থেকে দূরেই ঘুমাতে হতো। আমার ছোট ভাই-বোনরাই আম্মার কাছে ঘুমাতো।

আমার দাদী

আমার দাদী সাইয়েদা যোবায়দা খাতুন বর্তমান নরসিংদী জেলার রায়পুর থানার চরমধুয়ার সাইয়েদ বাড়ির সন্তান। আমি ও আমার ছোট ভাই একই সাথে সকালে মসজিদে কুরআন পড়তে যেতাম ও ১০টায় স্কুলে যেতাম। রাতে আমরা দু'ভাই দাদীর দু'পাশে ঘুমাতাম। দাদা বাইরের ঘরেই ঘুমাতেন। একজন খাদেম সব সময় দাদার পাশে থাকতো। ভেতরের ঘরে একই বিছানায় দাদীর সাথে আমরা দু'ভাই থাকতাম। শীতের সময় তিনজন একই মোটা কাঁথা গায়ে দিতাম। এখনও মনে পড়ে যে, গরমের সময় দাদীর হাতে বাঁশের বেত দিয়ে তৈরি পাখা থাকতো, যা তিনি ঘুরাতে থাকতেন। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেলেও দাদীর হাতের পাখা ঘুরতেই দেখতাম। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, দাদী! আপনি ঘুমান না? বললেন, অভ্যাস হয়ে গেছে, ঘুমেও হাত চলে। এভাবেই দাদীর সেবা ভোগ করেছি।

দাদীর বড় নাতি হিসেবে তাঁর সাথেই বেশি সময় থাকার সুযোগ পেতাম। বাইরের ঘরে দাদা ও বাড়ির ভেতরে দাদী আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। আমার ভাই একটু অসুস্থ হলেই আম্মার কাছে চলে যেতো। আমি সব অবস্থায়ই দাদীকে কাছে পেতাম।

আমাদের গ্রামের কয়েক বাড়ি উত্তরে দাদার পুরাতন একটা বাড়ি ছিলো, সেখানে কোন ঘর ছিলো না। কয়েকবার আগুনে এ বাড়িটি পুড়ে যাবার পর দাদা বাড়িটি পৃথক জায়গায় করেন। পুরানা বাড়িটিতে আম ও জাম গাছ ছিলো। খালি জায়গাই বেশি ছিলো। দাদী সেখানে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, শিম ইত্যাদির গাছ লাগাতেন এবং নিয়মিত যত্ন নিতেন। আমি এ কাজে দাদীর নিত্য সাথী থাকায় এ সব সবজির চাষ করা আমার সখে পরিণত হয়। মগবাজারের জায়গায় বিল্ডিং হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি দাদীর শেখানো বিদ্যা প্রয়োগ করতাম। দাদার সাথে আম-কাঁঠালের বাগান করা শিখেছিলাম। মগবাজারে আব্বা এক কাঠা জায়গা পারিবারিক গোরস্থান হিসেবে রেখেছেন। সেটুকু জায়গায় আমি ফলের গাছ লাগাবার সখ (Hobby) মিটাই।

দাদী ও আম্মার আদর

আম্মার আদর টের পেতাম বাস্তব কাজে। দাদীর শুধু কাজেই নয় কথায়ও স্নেহ-মমতা ঝড়ে পড়তো। গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর না করলে দাদীর যেনো তৃপ্তি হতো না।

১৯৩৮ সালে কুমিল্লায় ক্লাস সেভেনে ভর্তি হবার পর দাদীর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলাম। আমি কুমিল্লায় লজিং থাকি। ছুটি হলে চান্দিনায় আব্বা-আম্মার কাছে যাই। দাদী থাকেন বীরগাঁও। আব্বার ছোট ভাই, আমার বড় চাচা বীরগাঁও প্রাইমারি স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। দাদী তাঁর সাথেই থাকতেন। আমার তৃতীয় ও চতুর্থ ভাই প্রাইমারি শিক্ষা ঐ চাচার অভিভাবকত্বেই পেয়েছে। ওরা দাদীর স্নেহেই বড় হয়েছে।

বড় চাচা গ্রীষ্মের ছুটিতে আমাদের বাগানের আমসহ দাদীকে নিয়ে চান্দিনায় বেড়াতে আসতেন। চান্দিনায় আমাদের বাসায় প্রচুর কাঁঠাল হতো। চাচা কয়েকদিন বেড়িয়ে কাঁঠাল নিয়ে বীরগাঁও ফিরে যেতেন। গ্রীষ্মের গোটা ছুটিতে আমরা ছোটকালের মতোই দাদীকে কাছে পেতাম। দাদীর আদরের ধরন তখনও বদলায়নি। আমি দাদীর আদর আগের মতোই উপভোগ করতাম। এভাবেই দাদীকে বছরের মধ্যে মাস দেড়েক কাছে পেয়ে সারা বছরের আদর একসাথে উসুল করে নিতাম।

আমি তো ছোট বয়সেই শিক্ষকদের কাছ থেকে 'আলাপী' উপাধি পেয়েছিলাম। যখন আইএ পড়ি তখন এ দিক দিয়ে আরও ইঁচড়েপাকা হবারই কথা। চান্দিনায় দাদীকে হাসির গল্প পড়ে শুনালে রস বোধ করতেন। কথাবার্তায়ও দাদীর সাথে হাসি-কৌতুক করতাম। দাদী আম্মাকে বলতেন, তোমার এ ছেলেকে বিয়ে করাবার সময় দাদী ও নানী-শাশুড়ি দেখে করাবে। আমার পরম স্নেহময়ী দাদীর ঐ কথা আল্লাহ তাআলা দোয়া হিসেবে কবুল করে নিলেন বলে আমার বিয়ের পর উপলব্ধি

করলাম। কারণ আমি দাদী-শাশুড়ি ও নানী-শাশুড়ি উভয়কেই পেয়েছিলাম।

দাদীর ইন্তিকাল

১৯৩৬ সালে দাদার ইন্তিকাল হয় আমার চোখের সামনে। এর ১৪ বছর পর ১৯৫০ সালে দাদীর ইন্তিকালের খবরটুকুও যথাসময়ে পাইনি। আমার এমএ পরীক্ষা চলছে বলে আব্বা আমাকে এ দুঃখের খবরটি দেননি। দাদীর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণেই আব্বা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে আমাকে পরে জানালেন। পরীক্ষা দিয়ে চান্দিনায় গেলাম। এ খবরটি দেবার জন্য আব্বা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। রীতিমতো একটি ভূমিকা দিয়ে সান্ত্বনা দেবার ব্যবস্থা করে খবরটি যখন পরিবেশন করলেন তখন আমি হতভম্ব হয়ে আব্বার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার চোখে পানি এলো না। আমি কেমন যেনো হয়ে গেলাম। আর কোন দিন মায়াময় দাদীর আদরের পরশ পাবো না, তাঁর হাসিমুখ আর দেখবো না, তাঁর স্নেহভরা কথা আর শুনতে পাবো না। এ সব চিন্তায় আমার চোখের পানি যেনো শুকিয়ে গেলো।

আমার এ অবস্থা দেখে আব্বার চোখে পানি এলো। আমি আব্বার কোলে মুখ রেখে কিছুক্ষণ কেঁদে মনটা হালকা হলো বলে বোধ করলাম।

মানুষ দুনিয়া থেকে চলে যায়; থেকে যায় স্মৃতি। স্নেহ-মমতা এক অদ্ভুত অনুভূতি, যা দুঃখময় পার্থিব জীবনে শান্তির পরশ বুলায়। স্নেহময় মুরব্বী দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর স্নেহধন্য যারা, তাদের গভীর আবেগ প্রকাশ করার জন্য ভালোবাসার মহান স্রষ্টা চমৎকার উপায় শিক্ষা দিয়েছেন। যাদের মমতা ও যত্নে আমরা ছোট থেকে বড় হয়েছি তাদের জন্য আল্লাহ দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, "রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা।" অর্থাৎ হে প্রভু! তারা যেমন ছোট বয়সে আমার উপর রহম করেছেন, আপনিও তাদের প্রতি তেমনি রহম করুন।"

আমি দাদা-দাদী ও আব্বা-আম্মার জন্য এ দোয়া করে সান্ত্বনাবোধ করি যে, আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন এ দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি দয়া করে তা কবুল করবেন।

আম্মার ইন্তিকাল

আব্বা ১৯৭৩ সালে আমার বাধ্যতামূলক নির্বাসনকালে (১৯ ফেব্রুয়ারি) ইন্তিকাল করেন। এর ১৫ বছর পর ১৯৮৮ সালে অক্টোবর মাসে আম্মার ইন্তিকাল হয়। ১৯৭৮-এর জুলাই মাসে বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে আমাকে জন্মভূমিতে আসতে হয়। ১৯৭৬ সালে আমার তৃতীয় ভাই ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মুকাররামের সাথে আম্মা হজ্জ করতে গেলে পাঁচ বছর পর আম্মার সাথে দেখা হয়।

আমার অনুপস্থিতিকালে আম্মা আমার ছোট দু'ভাইয়ের বাড়িতেই পালাক্রমে থাকতেন। আমি দেশে ফিরে আসার পরও আম্মা তাদের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। ভাইদের বিল্ডিং থাকায় আম্মা সেখানেই আরাম বেশি পাবেন বলে

আমার টিনের ঘরে আম্মাকে এনে কষ্ট দেওয়া সমীচীন মনে করিনি। ইন্তিকালের দু'বছর পূর্বে যখন তিনি শয্যাগত হয়ে পড়লেন, তখন আমি পেরেশান হলাম। আমি বড় ছেলে, অথচ আম্মাকে খেদমত করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকার অনুভূতি তীব্র হয়ে উঠলো। আম্মার শেষ জীবনে যথাসাধ্য খেদমত করার জয্‌বা নিয়ে আম্মাকে আমার টিনের ঘরে নিয়ে এলাম। মগবাজারে জমি কেনার সময় আব্বা এ ঘরটিসহ-ই কিনেছিলেন এবং আব্বার সন্তানদের মধ্যে জমি বণ্টন করার সময় ঐ ঘরটি আমার অংশে রাখলেন।

আল্লাহর রহমতে আম্মার বড় ধরনের কোন অসুখ ছিলো না। বার্ধক্যজনিত কারণেই তিনি শয্যাগত হয়ে পড়েন। মায়ের যতো খেদমতই করা হোক, কোনভাবেই মায়ের হক আদায় শেষ হয় না। হাদীসে উল্লিখিত একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে খুবই উপযোগী।

এক ইয়ামানী ব্যক্তি রাসূল (স)-এর নিকট এসে বর্ণনা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার পঙ্গু মাকে পিঠে নিয়ে ইয়ামান থেকে মক্কায় এনে হজ্জ করিয়েছি। চলাচলে সম্পূর্ণ অক্ষম বলে তাকে পিঠে নিয়েই তাওয়াফ, সায়ী, মীনা, আরাফাত ইত্যাদি করেছি। মায়ের প্রতি আমার যা হক, তা কি আদায় হয়েছে? রাসূল (স) জওয়াবে বললেন, "না, মায়ের হক আদায় হয়নি। কারণ, তোমার শৈশবে মা যখন তোমাকে কোলে নিয়ে সেবাযত্ন করতো তখন সাথে সাথে প্রাণ ভরে তোমার হায়াতের জন্য দোয়া করতো। তোমার মাকে পিঠে নিয়ে চলার সময় তোমার মায়ের হায়াত বৃদ্ধির দোয়া তুমি করোনি।"

আম্মার ইন্তিকালের পর এক জুমআর খুৎবায় মায়ের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে এ হাদীসটি উল্লেখ করতে গিয়ে আবেগে আমি কাবু হয়ে গেলাম। রাসূল (স) এ মহা সত্য কথাটি এমন চমৎকারভাবে প্রকাশ করলেন, যা আমার অন্তর স্পর্শ করলো। খুৎবা দেবার সময় অকপটে আমি স্বীকার করলাম যে, শয্যাগত অবস্থায় যখন ইন্তিকালের কয়েক মাস আগে আম্মার পিঠে ঘা হয়ে গেলো এবং তাঁর কষ্ট বেড়ে গেলো, এরপর আম্মার হায়াত দারাজ করার জন্য আর দোয়া করতে পারিনি। তাঁর কষ্ট দীর্ঘায়িত হোক তা কারোই কামনা হয়নি। সত্যি মায়ের হক কখনো আদায় করে শেষ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ তাআলার অন্তরে যে রহম রয়েছে এর একশ ভাগের একভাগ মাত্র সকল প্রাণীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। আম্মা ও দাদীর দিলে আল্লাহর দেওয়া ঐ রহমের যে পরিমাণ কণা রয়েছে এরই প্রকাশ যদি আমাকে আচ্ছন্ন করে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তাআলার রহমের শুকরিয়া আদায় করার সাধ্য কার? দাদা-দাদী, আব্বা-আম্মা, চাচা-চাচী, ফুফু-ফুফা, (নানা-নানীকে দেখিনি) মামা-মামী, খালা-খালুদের স্নেহ-মমতা তাদের দিলে আল্লাহই তো দিলেন। তাই সকল প্রশংসা তাঁরই। সকল শুকরিয়া তো তাঁরই জন্য। তাদের সবার জন্য যেনো দোয়া করতে কখনো ভুলে না যাই।

আব্বার তৈরি মসজিদটির এক পাশেই আব্বা ও আম্মার কবর। মসজিদে যাবার সময় কবরের পাশ দিয়েই যেতে হয়। এ মসজিদের প্রথম খতীব আমার ভগ্নিপতি মাওলানা আলাউদ্দিন আল আযহারীর কবরও এর পাশেই। আমার ভাই গোলাম মুকাররামের স্ত্রীর কবর আম্মার কবরের সাথেই। মসজিদে আসা-যাবার সময় কবরবাসীদের সালাম দিতে ও দোয়া করতে খুব ভালো লাগে।

দাদা-দাদীর শেখানো সখ

বাগান করার সখ আমার বড়ই প্রিয়। আগের মতো নিজের হাতে করতে পারি না। অন্যদের দিয়ে করিয়ে নেই। সৌভাগ্যবশত এ কাজ সুন্দরভাবে করতে পারে এমন একজন লোক ১২ বছর থেকে আমার এটেনডেন্ট হিসেবে আছে। তার নাম সেলীম। শুদ্ধ উচ্চারণে সালীম বলা উচিত। কিন্তু সেলীম নামেই সে পরিচিত। যেমন, কুরআনের বিশুদ্ধ শব্দ হলো 'সাজদা'। কিন্তু আমরা সিজদা বলি। সেলীম কৃষিকার্যে অভিজ্ঞ হওয়ায় এবং তার মতো লোক আমার এটেনডেন্ট হওয়ায় আমি ৮ তলার উপর ছাদে চমৎকার বাগান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। সেখানে কাযী পেয়ারা, এলাচি লেবু ও কাগজী লেবু বাগানের বিশেষ আকর্ষণ। হাসনাহেনা ও বেলী ফুলই ফুলের মধ্যে প্রধান। রাজ-বরই ও কুমিল্লার বরই আমার খুবই প্রিয়। বিল্ডিং নির্মাণ করতে গিয়ে দুটো প্রিয় বরই গাছ কেটে ফেলতে হয়েছে। ছাদে একটা আস্ত ড্রামে বরই গাছ তুলবার চেষ্টা করছি। এপ্রিল মাসেই কলম করার সময়। দেখি এ প্রচেষ্টা সফল হয় কিনা। টঙ্গীস্থ দারুল ইসলাম ট্রাস্ট আবাসিক এলাকায় বসবাসরত জামায়াতের রুকন জনাব ফারূকুয যামান কলম করে দেবার দায়িত্ব নেওয়ায় আমি এ দুঃসাহস করলাম।

আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে বারবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও গোলাপ ফুলের চাষ করিনি। আজকাল ভয়ানক লাল বিরাট বিরাট গোলাপ ফুলেও গন্ধ নেই বলে আমি উৎসাহ পাচ্ছি না। তা না হলে গোলাপই তো ফুলের রাণী। ঐ ফুলের গাছ যোগাড়ের চেষ্টায় আছি, যে ফুলে গন্ধ পাওয়া যায়। এর জন্য জায়গা ঠিক করে রেখেছি। ছাদের বাগানে ভালো জাতের মরিচের চাষও করি, যা ভাতের সাথে কাঁচা খেতে ভালো লাগে। ফজরের পর স্ত্রীসহ ছাদে কিছুক্ষণ হাঁটি। বাগানের মাঝে হাঁটার সাথে সাথে গাছের দৃশ্যও প্রাণে সজীবতা দান করে। গাছের জন্যও কম আদর লাগে না। গাছ থেকে ফল বা ফুল তুলতে এমন আনন্দ ও তৃপ্তি বোধ হয়, যা বাজার থেকে কেনার মধ্যে হতে পারে না।

আমার বড় চাচা

আমার বড় চাচা জনাব গোলাম কিবরিয়া একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন। ৮৪ বছর বয়সে '৮৪ সালের ২২ জানুয়ারি তিনি ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। তিনিও আব্বার সাথে ১৯২১ সালে এনট্রান্স পাস করেন। দাদার চেহারার সাথে তাঁর চেহারার বেশ মিল ছিলো। দৈহিক গঠন পুলিশ বা সেনাবাহিনীতে যাবার উপযোগী ছিলো।

সেনাবাহিনীতে যাবার কোন সুযোগই তখন ছিলো না। চাকরির তালাশে কোলকাতা গেলেন। পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর বা দারোগা হিসেবে পুলিশ বিভাগে যোগদানের অনুমতি চেয়ে দাদাকে চিঠি লিখলেন। সেকালে দারোগাদের এমন দাপট ছিলো যে, এ দেশী কোন মুসলমান এর চেয়ে বড় পদের চাকরি কল্পনাও করতে পারতো না। গল্প প্রচলিত আছে যে, এক বয়স্কা মহিলা জেলা প্রশাসকের নিকট আশাতীত উপকার পেয়ে তাকে দোয়া দিলেন "বাবা, আল্লাহ্ তোমাকে দারোগা বানিয়ে দিন।"

দাদা কিছুতেই দারোগার চাকরি নেবার অনুমতি দিলেন না। চাকরির তালাশে কয়েক বছর কোলকাতায় কাটাবার পর ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন এবং প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। তিনি নবীনগর থানার বিভিন্ন স্কুলে যোগ্যতা ও সুনামের সাথে হেড মাস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং শেষ দিকে নিজ গ্রামের স্কুলে বেশ কয় বছর শিক্ষকতা করার পর অবসর গ্রহণ করেন।

বড় চাচা আব্বাকে তাঁর বড় ভাই হিসেবে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। দাদা ইন্তিকালের পূর্বে যে অসীয়তনামা লেখান, তা বড় চাচার হাতেই লেখা ছিলো। তাতে তাঁর ছেলেদেরকে হাদীস অনুযায়ী নসীহত হিসেবে বড় ভাইকে পিতার স্থলাভিষিক্ত মনে করে মান্য করার নির্দেশ দেন। বড় চাচা এ নসীহত বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেন। আব্বাও এ চাচার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতেন এবং যতদিন চাচা বেঁচে ছিলেন ততদিন দাদার রেখে যাওয়া সব জমি ও আব্বার কেনা আরো কিছু জমি তাকে ভোগ করার সুযোগ দান করেন।

আমাদের গ্রামের সুলতান মিয়া নামে চাচারই এক বিশ্বস্ত ছাত্রকে সকল জমি দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। সে এখনো নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করছে। গ্রামের রেশতায় আমাকে সে চাচা ডাকে। দাদা জমিজমা সংক্রান্ত অসীয়তে তাঁর বড় নাতি হিসেবে আমাকে তাঁর ছেলেদের সমপরিমাণ জমি দান করেন। কিন্তু বড় চাচা যদ্দিন বেঁচে ছিলেন, আমি আমার ভাগের জমির কোন ফসল বা টাকা দাবি করিনি। চাচার মতো নেক লোকের দোয়া আমার কাম্য ছিলো। আব্বার ভাগের জমি ও আমার অংশের জমি এখনো সুলতান মিয়ার তদারকীতেই আছে। সে-ই বর্গাচাষীদেরকে এক বছরের জন্য ভোগ করার সুযোগ দেয় এবং এ বাবদ কিছু টাকা আমি পাই। চাচা আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তা ভাষায় প্রকাশও করতেন। তাঁর ভাতিজা হিসেবে তিনি আমার ব্যাপারে গর্ববোধ করতেন এবং অন্যদের নিকট তা প্রকাশ করতেন।

তিনি একাধিকবার জমিজমা সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলেছেন যে, আমি বিব্রতবোধ করেছি। তিনি বলেছেন যে, তোমার ও ভাই সাহেবের জমিগুলো আমি এতোদিন থেকে ভোগ করছি। তোমাদেরকে কিছুই দিতে পারিনি বলে আমি তোমাদের নিকট লজ্জিত। বিব্রত কণ্ঠে চাচাকে জওয়াবে যা বলার বলে এ বিষয়ে যেনো আর কখনো

না বলেন সে জন্য অনুরোধ করলাম। আর দোয়া চাইলাম।

তাঁর ইন্তিকালের সময় আমি সাংগঠনিক সফরে জামালপুর ছিলাম। ফোনে খবর পেয়ে রাতেই রওনা হয়ে শেষ রাতে ঢাকা ফিরে এসে পরদিন সকালে তাঁর জানাযা শেষে আবার জামালপুর চলে যাই। তার অসীয়ত অনুযায়ী আমাকেই জানাযা পড়াতে হয়। আমাকে তিনি ছেলের চেয়ে বেশি স্নেহ করতেন, আমিও আব্বার ইন্তিকালের পর তাঁকে পিতৃস্থানীয়ই পেয়েছি।

৬০.

চান্দিনা থেকে নওগাঁ ফেরত

১৯৫১ সালের ২৮ ডিসেম্বর আমার বিয়ে হলো। বরযাত্রী চান্দিনায় নববধূ নিয়ে ফিরে গেলো। নববধূর সাথে তার ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে ২/১ জনের যাওয়ার প্রথা রয়েছে। আমার স্ত্রীর সাথে তাঁর নানী এলেন। নানী-শাশুড়ী পেয়ে আমি মহাখুশি। আলাপ-সালাপে তিনি যে পটীয়সী তা বিয়ের দিন রুসুমাতের সময়ই টের পেলাম। সঙ্গে ৪ শালা সাহেবদের মধ্যে দ্বিতীয় জন 'আকরাম' এবং আমার স্ত্রীর মামাতো বোনের কিশোরী মেয়ে 'হেনা' এসেছিলো। আলাপী নানী-শাশুড়িকে পাওয়ায় তার সাথে আমার আলাপ খুব জমতো।

আব্বার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি ওয়ালীমার অনুষ্ঠান করতে পারলেন না। চান্দিনায় না থেকে আব্বা যদি ঢাকা থাকতেন তাহলে হয়তো করতে পারতেন। অবশ্য আমার শ্বশুর-পক্ষের আত্মীয়-স্বজনও তখন ঢাকায় ছিলেন না। সাধারণত নববধূ শ্বশুর বাড়ি গেলে ২/৩ দিন পরই ওয়ালীমার পর আবার পিত্রালয়ে ফিরে যায়। আব্বা ওয়ালীমা করতে পারছেন না বলে আমার শ্বশুর সাহেবকে জানালেন যে ৭/৮ দিন পর যেনো তিনি এসে নিয়ে যান। আম্মা তো পুত্রবধূকে পেয়ে মহাখুশি। দাদী থাকলে যে কত খুশি হতেন সে কথা উল্লেখ করে আম্মা আফসোস করলেন।

আমার শ্বশুর সাহেব যথাসময়ে চান্দিনা পৌঁছলেন। পরদিনই আমাকেসহ সবাইকে নিয়ে নওগাঁ রওনা হলেন। নওগাঁয় দুদিন থেকে আমি স্ত্রীকে এ কথা বলে রংপুর গেলাম যে, বাসায় সপরিবারে থাকার মতো মোটামুটি ব্যবস্থা করেই নিতে আসবো।

রংপুরে পারিবারিক জীবন শুরু

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি নওগাঁ থেকে আমার স্ত্রীকে নিয়ে রংপুরে পৌঁছলাম। কলেজ কম্পাউন্ডে ভাইস প্রিন্সিপালের জন্য বরাদ্দ কোয়ার্টারটি তখন খালি থাকায় আমাকে অস্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি দেওয়া হলো। সে সময় কলেজে কোন ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন না। এ বাসাটিতে বেশ কয়টি কামরা থাকলেও কোন আসবাবপত্র ছিলো না। কোন রকমে থাকার জন্য যতটুকু না হলেই নয় ততটুকুর ব্যবস্থা করে স্ত্রীকে নিয়ে এলাম। সাথে এলেন আমার দাদী-শাশুড়ি।

বাসায় আবদুল জলিল নামের একটি কাজের ছেলে বিয়ের আগে থেকেই ছিলো।

ছেলেটি খুবই সহজ-সরল, বিশ্বস্ত ও কর্মঠ ছিলো। ওকে আমিই রান্না শিখিয়েছিলাম। স্কুল-জীবনে আমি যখন স্কাউটে ছিলাম তখন রান্নার জন্য কুকিং ব্যাজ পেয়েছিলাম। ঐ উপলক্ষেই রান্না শিখেছিলাম। এটা কর্মজীবনে কাজে লেগেছে। আমার বাসায় নতুন কাজের ছেলে এসে রান্না শেখার পর ভালো বেতনে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু জলিল তা করেনি। সে আমাকে এমন আন্তরিকতার সাথে আব্বা ডাকতো যে, আমিও ওকে ছেলের মতো আদর করতে বাধ্য হই। এমন আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টির কৃতিত্ব ওরই, আমার নয়। আমি ১৯৫৫ সালে রংপুর ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত সে আমার বাসায়ই ছিলো। জামায়াতের সাংগঠনিক সফরে রংপুরে গেলে ওর খোঁজ নিতাম। সেও খবর পেলে দেখা করতে আসতো।

আবদুল জলিলের মতো একটি কাজের ছেলে পাওয়ায় রংপুরে আমার পারিবারিক জীবন সুন্দরভাবেই কেটেছে। সেসব রকম কাজই হাসিমুখে করতো। এমন খালেস খেদমতের বদলা টাকায় শোধ করা যায় না।

আমার দাদী-শাশুড়ি

আমার দাদী-শাশুড়ি বেশ বৃদ্ধা হলেও তাঁর মযবুত ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের কারণে সবার উপর তাঁর কার্যকর প্রভাব ছিলো। আমার শ্বশুর সাহেব বাল্যকালে পিতৃহারা হবার পর তাঁর মাতাই পিতা-মাতার উভয় দায়িত্ব পালন করেন। পরিবারে তাঁর কর্তৃত্ব সবাই মেনে চলতো। আমার শ্বশুর সাহেব বাল্যকালের মতোই আজীবন তাঁর মায়ের কর্তৃত্বকে আল্লাহর মহা-নিয়ামত হিসেবে গণ্য করেছেন এবং মায়ের শাসন করার অধিকারকে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছেন।

সেই মহীয়সী নারীর ভিন্নরূপ দেখলাম আমার বাসায়। তাঁর স্নেহের উষ্ণতা এখনও আমি অনুভব করি। তাঁর অতি আদরের নাতনীর দুলা হিসেবে এমন স্নেহ আমার পাওনা বলেই মনে হয়েছে। তাঁর আন্তরিক স্নেহ আমাদের দাম্পত্য জীবনে অনাবিল মধুরতা দান করেছে।

আমাদের পাশের কামরায় তিনি থাকতেন। তাঁর কামরা থেকে জর্দার চমৎকার সুগন্ধ ভেসে আসতো। তিনি যেখান দিয়ে হেঁটে যেতেন সেখানেই সুগন্ধ ছড়িয়ে যেতো। দাঁত না থাকায় তিনি হামান দিস্তায় পান-সুপারি থেতলিয়ে নিয়ে খেতেন। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সৌখিন ছিলেন। এমন সুগন্ধি জর্দা কোথায় পান জানতে চাইলাম। জানা গেলো যে, তাঁর জামাতা মুসলিম লীগ নেতা ও পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্য মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী আল কুরাইশী ভারতের লক্ষ্ণৌ থেকে ঐ জর্দা আনিয়ে তাঁর শাশুড়িকে দিতেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ড. এমএ বারীর পিতা। সে হিসেবে আমার পরম স্নেহপরায়ণ দাদী-শাশুড়ি ড. এমএ বারীর আপন নানী।

আমার পান খাওয়ার অভ্যাস ছিলো না। অত্যন্ত আকর্ষণীয় মধুর পদ্ধতিতে তিনি আমাকে পান খাওয়া শেখালেন। নিজের হাতে পানের দুটো খিলি তৈরি করে একটা

আমার হাতে এবং অন্যটি তাঁর আদরের নাতনীর হাতে দিতেন। আমাদের দু'জনকে পাশাপাশি বসিয়ে তিনি আমাদের সামনে বসতেন। তাঁর নির্দেশে তাঁর নাতনীর হাতের খিলি আমার মুখে তুলে দিতো এবং আমার হাতের খিলি তাঁর নাতনীর মুখে তুলে দিতাম। তাঁর নির্দেশ পালন করে আমরা তৃপ্তিবোধ করতাম। এমন সুন্দর নাটকীয় ভঙ্গিতে তিনি তাম্বুল সেবনের মহড়া দিতেন যে, আমরা দু'জন চরম অনুগত নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতাম।

প্রায় দু'সপ্তাহ রোজ এক বা দু'বার আমাদের পান খেতে দিয়ে গল্প করতেন। তাঁর সামনেই পর্ণ-চর্বণ সমাপ্ত করার নির্দেশ ছিলো। দু'একদিন পর আমাকে রূপালি রঙের জর্দার দু'একটি দানাও পানের সাথে খেতে দিলেন। মুখে একটু বিস্বাদ মনে হলেও এর সুগন্ধের আকর্ষণে জর্দা খাওয়াও শুরু করলাম। তাঁর নাতনীর এটা সহ্য হতো না বলে আগেই জানতেন। এভাবে আমার জর্দা দিয়ে পান খাওয়ার বদভ্যাস হয়ে গেলো।

ঐ সময়টা ফেব্রুয়ারির শেষ ও মার্চের শুরু। '৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন জোরেশোরে চলছে। বাইরে আন্দোলনে সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও ঘরে দাদী-শাশুড়ির সাথে আমাদের পারিবারিক জীবন স্বাভাবিক গতিতেই চলছিলো। ৬ মার্চ কলেজ থেকে শহরে যাবার পথে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে চলে গেলাম। বাসায় কাজের ছেলে জলিল ছাড়া আর কোন পুরুষ নেই। তৃতীয় দিন সকাল ১০ টায় রংপুর জেলে আমার শ্বশুর সাহেব আমাকে দেখতে গেলে জানা গেলো যে, আমার গ্রেপ্তার হবার পর আমারই এক ছাত্র দিনাজপুরের আবদুর রহীম টেলিগ্রাম করে নওগাঁয় শ্বশুর সাহেবকে খবর দেয়। সে সম্পর্কে তাঁরই আত্মীয়। ঐ ছাত্র বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট আবদুর রহীম।

শ্বশুর সাহেব তাঁর আম্মা ও কন্যাকে নওগাঁ নিয়ে যান। বিয়ের পর প্রথম পারিবারিক জীবনের আনন্দময় দিনগুলোর বদলে কারাগারে বিরহ জীবন শুরু হলো। বিবাহিত জীবনের পয়লা বসন্তকালটা ভাষা-আন্দোলনের অপরাধে জেলেই কাটাতে হলো।

রংপুর জেলে এক মাস

'৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভিত্তিক দেশব্যাপী ছাত্র-গণআন্দোলন চলে। তখন রংপুরে যারা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে তাদের মধ্যে কলেজের তিনজন অধ্যাপক শীর্ষে ছিলেন।

ঘটনাক্রমে ঐ তিনজন তারাই, যারা ১৯৫০-এর ৩ ডিসেম্বর একই সাথে কলেজে যোগদান করে। আমি, বাংলার অধ্যাপক জমীরুদ্দীন আহমদ ও দর্শনের অধ্যাপক কলীমুদ্দীন আহমদ। এ তিনজনকে গ্রেপ্তার করার কথা। কিন্তু অধ্যাপক কলীমুদ্দীন ঐ সময় রংপুর অনুপস্থিত থাকায় গ্রেপ্তার হননি। আমি ও অধ্যাপক জমীরুদ্দীন একই সাথে জেলে ছিলাম। এক সাথেই থাকা, খাওয়া, নামায, বৈকালিক টহল ইত্যাদি হতো।

৪২ নং কিস্তিতে 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন' শিরোনামে লেখাটিতে এ গ্রেপ্তারের কথা এবং রংপুর জেলের জেলার সাহেবের কথা উল্লেখ করলেও তখন তাঁর নামটা কিছুতেই স্মরণ করতে পারছিলাম না। এখন মনে হয়েছে। তাঁর নাম জনাব ওয়াহিদুয্যামান। অধ্যাপক জমীরুদ্দীনের বন্ধু ও একই থানা চৌদ্দগ্রামের অধিবাসী। জনাব ওয়াহিদুয্যামান বাংলাদেশ আমলে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

৪২ নং কিস্তিতেই উল্লেখ করেছি যে, তাঁরই চেষ্টায় আমরা গ্রেপ্তারের পর দিনই ডিভিশন পেয়ে গেলাম। তাঁরই কারণে জেলে আমাদের আইনগত সুযোগ-সুবিধা হাসিলের জন্য সামান্য চেষ্টাও করতে হয়নি; বরং অতিরিক্ত সুবিধা দেবার ব্যবস্থাও করতেন। তাই জেল জীবন ভালোভাবেই কেটেছে।

আমার স্ত্রীকে রংপুরের বাসায় আনার তৃতীয় সপ্তাহের শেষদিকেই গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় দাম্পত্য জীবনে অস্বাভাবিক কারণে ছেদ পড়ে গেলো। এ অনুভূতি যখন তীব্র হতো তখন সত্যিই খুব খারাপ লাগতো।

কোন অপরাধ করে জেলে আসিনি। তথাকথিত নিরাপত্তা আইনে বিনাবিচারে জেলে আছি। জেলের কর্মচারী ও কয়েদীরা সবাই সম্মান করতো। জেল লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে সময় কাটাতাম। ইসলামী আন্দোলনে যোগদানের পর '৫৫, '৬৪ ও '৯২ সালে জেলে যে তৃপ্তি বোধ করতাম, '৫২ সালে সে চেতনার জন্ম হয়নি বলে জেলখানাকে শুধু মুসীবত মনে হতো। পরবর্তী সময়ের জেল-জীবন আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত বলে মনে করতাম। কুরআনের তাফসীর, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন, কুরআনের বহু সূরা মুখস্থ করা, তাহাজ্জুদের নামাযে মুখস্থ করা সূরাগুলো পড়ে স্মরণে স্থায়ী করা, আল্লাহর দরবারে অসহায় হিসেবে কাতরভাবে ধরনা দেবার মজা উপভোগ করা, ইসলামী আন্দোলন ও দেশ গড়ার ব্যাপারে সুস্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা এবং কুরআন ও হাদীসের দোয়া মুখস্থ করা ও তা প্রাকটিস করার যে সুযোগ জেলে পেয়েছি, তা বাইরে পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু '৫২ সালের জেলে এ চেতনার অভাবে জেলটা সত্যি জেল বলে মনে হয়েছে এবং জেল থেকে বের হবার জন্য মনটা ছটফটও করেছে। কিন্তু জামায়াতে যোগদানের পর তেমন মানসিক অস্থিরতা বোধ করিনি।

প্রসঙ্গক্রমে জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে সূরা, জেলা আমীর সম্মেলন, জামায়াত ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন শিক্ষা-শিবিরে আমি বহুবার রসিকতা করে বলেছি যে, যদি আমার হাতে জেল দেবার ক্ষমতা থাকতো তাহলে উৎকৃষ্ট তরবিয়াত হাসিলের জন্য অন্তত ৬ মাসের জন্য আপনাদেরকে জেলে পাঠাতাম।

জুমআ বারে জেলে জুমআর নামাযের ব্যবস্থাও ছিলো। বাইরের একজন এসে ইমামতি করতেন। জেলার সাহেবকে বলেছিলাম, নামাযের আগে বা পরে কয়েদীদেরকে ইসলাম ও নামায-রোযা সম্পর্কে নসীহতমূলক কিছু কথা শুনাবার

সুযোগ দেওয়া যায় কিনা। তিনি বললেন, উপরের অনুমতি ছাড়া আমি সুযোগ দিতে অক্ষম। নামাযের শেষে আমি জোরে উচ্চারণ করে দোয়া শুরু করলাম এবং দোয়ার মাধ্যমেই যা বলার উদ্দেশ্য ছিলো তা বলে ফেললাম। তাদের দুঃখী জীবনের কথা উল্লেখ করে তাদের প্রতি রহম করার জন্য আবেগের সাথে দোয়া করলাম। সবাই কাঁদলেন এবং তৃপ্তি পেলেন। উপরের নির্দেশে এরপর আমাকে আর জুমআয় যেতে দেওয়া হয়নি।

তাম্বুল সেবন

দাদী-শাশুড়ি আদর করে পান খাওয়ার বদভ্যাস করাবার ফলে জেলখানায়ও জেলারের অনুমতি নিয়ে পান খাওয়া অব্যাহত রাখতে হলো। বিশেষ করে জর্দা দিয়ে পান খাওয়ার মজাই আলাদা। এতে যে মৃদু নেশা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তামাক নিয়েই জর্দা তৈরি করা হয়। তাই ধূমপানের মতোই এটাও নেশা। বিড়ি-সিগারেটের তামাক তো পুড়িয়ে ধোঁয়ায় পরিণত করে পান করা হয়। আর জর্দার তামাক সরাসরি চিবিয়ে খাওয়া হয়। এটা একেবারে প্রত্যক্ষভাবে খাওয়া। তামাককে রিফাইন করে আরও কিছু উপাদান মিশিয়ে জর্দা তৈরি করা হয়। তামাকের শুকনো পাতা কাঁচাও পানের সাথে খাওয়া হয়, যার নাম 'সাদা'।

২৫ দিন জেলে থাকার পর মুক্তি পেয়ে নওগাঁ গেলাম। দাদী-শাশুড়িকে বললাম যে, পান খাওয়া তো শেখালেন, কিন্তু আপনি যে চমৎকার সুগন্ধি জর্দা খান তা তো পাই না। নওগাঁ বেড়াতে গেলে তিনি ঐ জর্দা দিতেন। আমি বগুড়াস্থ জামিল ফ্যাক্টরির জর্দা ব্যবহার করতাম। ঢাকায় বিহারী দোকানে লক্ষ্ণৌর জর্দা এবং কিমাম পাওয়া যেতো। কিন্তু এর মান দাদী-শাশুড়ির জর্দার সমান ছিলো না।

আমি লক্ষ্য করলাম যে, আমার স্ত্রী পান খাওয়ায় আসক্ত হননি। মাঝে মাঝে খান। বুঝতে পারলাম যে, তিনি জর্দা খান না বলেই নেশার শিকার হননি। এখনও বিয়ে-শাদীতে গেলে পান খান। বাড়িতে পান খাওয়ার কোন ব্যবস্থা তিনি করেন না। পানখোর মেহমান দাওয়াতে আসলে দোকান থেকে তৈরি পান আনা হয়।

১৯৫৫ সালে সর্বপ্রথম আমার লাহোর যাবার সুযোগ হয় এবং মাওলানা মওদূদীর সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সৌভাগ্য হয়। তিনিও জর্দা দিয়ে পান খান দেখে আমার পান খাওয়ার অভ্যাসটাকে আর বদভ্যাস মনে হলো না। পকেটে রাখার উপযোগী ছোট কৌটায় জর্দা আমার পকেট থেকে বের করে তাঁকে অফার করলাম। আমার জর্দাও তিনি পছন্দ করলেন। তাঁর জর্দাও আমাকে দিলেন, যা আরও উন্নতমানের। মাওলানা খুবই পারিপাট্যের সাথে পান খেতেন। মুরাদাবাদী বিখ্যাত পানদানের মধ্যে পান, সুপারি, খয়ের, চুন সাজিয়ে রাখা হতো। নেতার অনুকরণে আমিও সুন্দর একটা মুরাদাবাদী পানদান কিনলাম। গৌরবের সাথে বন্ধু ও পরিচিত মহলে বললাম যে, আমি লিয়াকতের সাথে পান খাই, অগোছালোভাবে নয়।

১৯৫৭ সালের শেষ দিকে রংপুর শহরে জামায়াতের ৭ দিনব্যাপী এক শিক্ষা-শিবির

অনুষ্ঠিত হয়। আমিই প্রধান মুরব্বীর দায়িত্ব পালন করছিলাম। শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন হোমিও ডাক্তারও ছিলেন। তিনি বড় ডাক্তার হিসেবেই গণ্য ছিলেন। রংপুর কলেজে কর্মরত থাকাকালে আমার শিশু ছেলে তার চিকিৎসাধীন ছিলো। শিক্ষা-শিবির চলাকালে আমি আমাশয়ে আক্রান্ত হলাম। তিনি আমার চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন। ঔষধ দেবার সময় জানতে চাইলেন, আমি ধূমপান করি কিনা। বললাম, তা করি না; কিন্তু পানের সাথে জর্দা খাই। তিনি বললেন যে, জর্দা খাওয়া চলবে না। তাহলে ঔষধে কাজ হবে না। বললাম, আমার পান খাওয়ার অভ্যাস। জর্দা ছাড়া পান খাবো কেমন করে? জর্দার অভ্যাস ত্যাগ করা কঠিন। তিনি তরবিয়তে আমারই বক্তৃতা উদ্ধৃত করে বললেন, "আপনি আমাদেরকে 'নাফস' দমন করার উপর এতো তাগিদ দিলেন। আর জর্দার ব্যাপারে আপনি নাফসকে দমন করতে পারবেন না? তাহলে আপনার নসীহত পালন করতে আমরা কেমন করে উদ্বুদ্ধ হবো।"

ডাক্তার সাহেব বয়সে আমার বড় ছিলেন। তার কথায় আমি লজ্জা বোধ করলাম এবং জর্দা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। জর্দা বাদ দিয়ে পান খেতে কোন মজা পেলাম না। মনে হলো, ঘাস চিবুচ্ছি। দু'দিন পর পান খাওয়াই ছেড়ে দিলাম। সেই যে পান ছাড়লাম, জীবনে আর কোনদিন পান মুখে দেইনি। আমার স্ত্রী এখনও মাঝে মাঝে খান। কিন্তু আমি খাই না। কেউ সাধলে বলি, "আমার পানদোষ নেই।"

১৯৬৪ সালে আইয়ূব খান জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা করে সকল জামায়াত নেতাকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনাক্রমে আমি ও মাওলানা আবদুর রহীম কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের অধিবেশন উপলক্ষে লাহোরে ছিলাম এবং সেখান থেকেই গ্রেপ্তার হই। তাই মাওলানা মওদূদীর সাথে দু'মাস জেলে থাকাকালে তাঁকে শীতের দুপুরে রোদে বসে কৌটায় পান সাজাতে দেখেছি।

১৯৫৩ সালে মাওলানা মওদূদীকে ফাঁসির হুকুম দিয়ে আটক করার পর তিনি যতদিন জেলে আটক ছিলেন কখনো পান খাননি। জেলে পান নেবার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করতে হবে জেনে তিনি যালিমের নিকট দরখাস্ত দিতে অস্বীকার করলেন। তিনি সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে, পানকে তিনি তালাক দিয়েছেন।

'৫৫ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বের হবার সময় জেলগেটেই কোন একজন পান অফার করলে তিনি তা মুখে নিয়ে মুচকি হেসে বললেন, "আমি বায়েন তালাক দেইনি।" তিনি পানকে এতো পছন্দ করতেন যে কৌতুক করে বলতেন,

"হাযা মিন ওরাকিল জান্নাহ" অর্থাৎ এটা বেহেশতের পাতা।

এ দেশে অনেক বছর জামায়াতে ইসলামীর প্রধান ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম। তাঁর অধীনে তের বছর আমি সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছি। তিনিও পানের ভক্ত ছিলেন। মাওলানা মওদূদীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলতেন যে, ইসলামের যেমন পাঁচটি রুকন, পানেরও পাঁচটি রুকন আছে—পানের পাতা, সুপারি, খয়ের,

চুন ও জর্দা। একবার খয়ের ছাড়া মাওলানা মওদূদীকে পান দিলে তিনি মন্তব্য করলেন, "পান মে তো একই খায়র (মঙ্গল) হ্যায়, ইয়ে ভি না দিয়া তো কেয়া দিয়া?"

একবার জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া তোফায়ল মুহাম্মদ ঢাকায় এলেন। আমি ও মাওলানা আবদুর রহীম তাঁর সাথে হেঁটে চলছি। হঠাৎ মাওলানা সাহেব আমাদের দু'জন থেকে আলাদা হয়ে পানের দোকানে গেলেন। আমি কৌতুক করে বললাম, "মিয়া সাহেব দেখিয়ে মাওলানা হাম দু'নো সে আলাগ হো গেয়া।" মাওলানা পান হাতে নিয়ে ফিরে এসে বললেন, "ম্যায় আমীরে জামায়াত কি সুন্নাত পর আমল কার রাহা হুঁ।" মিয়া সাহেব সাথে সাথেই মন্তব্য করলেন, "আমীর মে আগার একই নাকস (ত্রুটি) হ্যায়, আপকো ওহী পছন্দ আগেয়া।" (আমীরের মধ্যে যদি ঐ একটি ত্রুটিই থেকে থাকে সেটাই আপনার পছন্দ হয়ে গেলো।) মিয়া সাহেব পান মোটেই পছন্দ করতেন না।

মাওলানা মওদূদী এ দেশে প্রথম সফরে আসেন ১৯৫৬ সালে। দিনের বেলা বড় স্টীমারে বরিশাল যাবার সময় তিনি কেবিনে আরাম না করে বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে দৃশ্য দেখছিলেন। মন্তব্য করলেন, "গোটা দেশটাই সাজানো বাগান। এমন সুন্দর দৃশ্য ইতঃপূর্বে দেখিনি।" জিজ্ঞেস করলেন, লোহার পিলারের মতো এই লম্বা গাছগুলো কিসের? আমি বললাম, এগুলো সুপারি গাছ। তিনি মন্তব্য করলেন, এ জন্যই এতো সুন্দর।

ঢাকায় মানুষের পান খাওয়ার দৃশ্য দেখে মন্তব্য করলেন, "মুখে পান আর হাতে চুনের পতাকা। একজন করে দোকান থেকে পান মুখে দিয়ে হাতে পানের বোটাতে চুন লাগিয়ে পতাকার মতো হাত উঁচিয়ে চলতে দেখলে আমার হাসি পায়।"

আমার পান খাবার বদভ্যাসের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অনেক কথাই বলে ফেললাম। মজার ব্যাপার হলো, দাদী-শাশুড়ি আমাকে পান খাওয়া শেখালেন যে রংপুরে, ঘটনাক্রমে ঐ রংপুরেই পানের অভ্যাস চিরতরে ত্যাগ করলাম।

৬১.

পিতা হবার উপক্রম

১৯৫২ সালের মাঝামাঝি আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা বলে বুঝা গেলো। মনে এক অদ্ভুত আবেগ সৃষ্টি হলো। আমি পিতা হতে যাচ্ছি, এ কথা মনে আলোড়িত হতে থাকলো। নতুন অতিথির অভ্যর্থনার আয়োজন নিয়ে গবেষণা ও পরিকল্পনা করা শুরু হয়ে গেলো।

মনের এ অবস্থা নিয়ে একদিন রংপুর শহরে আমার দর্জির দোকানে গেলাম। গরম প্যান্ট বানাতে গিয়ে এ দর্জির সাথেই টাখনুর উপরে বানাবার ব্যাপারে বিতর্ক হয়। তার নাম মুতিউর রহমান। তিনি দাড়ি শোভিত সুন্দর চেহারার অধিকারী। যদ্দিন রংপুরে ছিলাম তার কাছ থেকেই সব কাপড় তৈরি করা হয়েছে। দর্জির সাথে কথা

বলছি, এমন সময় দু'বছর বয়সী ফুটফুটে একটি ছেলে আব্বু ডাকতে ডাকতে তার গলা জড়িয়ে ধরলো। তিনি সোহাগভরে ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন। এমন দৃশ্য নতুন নয়। কিন্তু সেদিন দেখে মুগ্ধ হলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "বলুন তো! আব্বু ডাক শুনতে কেমন লাগে?" কৌতুকের সুরে বললেন, "শুনতে তো মজাই লাগে; কিন্তু জ্বালাতনও কম সইতে হয় না। এই দেখুন না, আপনার সাথে নিরিবিলি কথা বলতে দিলো না। কোন কোন সময় রাতে মাকে তো বিরক্ত করেই, আমারও ঘুম নষ্ট করে।" এ কথাগুলো বলে ছেলেকে চুমু খেলেন। বুঝলাম, যতো বিরক্তই করুক, ছেলের প্রতি স্নেহের প্রাবল্য সব ভুলিয়ে দেয়।

সৃষ্টিধারা অব্যাহত রাখার কৌশল

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মানব সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য মাতাপিতার অন্তরে সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতার এমন ব্যবস্থা করেছেন, যা মানুষকে সন্তানের কাঙাল বানিয়ে দিয়েছে। বিয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে সন্তান না হলে স্বামী-স্ত্রী ও উভয় পরিবারের সবাই অস্থির হয়ে যায়। ডাক্তারি পরীক্ষা করে কারণ জানতে চায়। ডাক্তারের রিপোর্ট মন্দ হলেও হাজারো তদবিরে লেগে যায়। যে যা করতে বলে সবই করতে থাকে। মহাকৌশলী আল্লাহ্ মানুষকে স্নেহের এমন ফাঁদে ফেলেছেন যে, যারা স্রষ্টাকে বিশ্বাসই করে না তারাও এ ফাঁদে পড়তে বাধ্য। মায়ের পেটে সন্তান ধারণের কষ্ট, প্রসব যন্ত্রণা, লালন-পালনের বিরাট ঝামেলা মা হাসিমুখে সহ্য করে। সন্তানের মুখ দেখার সাথে সাথেই মায়ের মধ্যে যে স্নেহের বন্যা বয়ে যায়, তাতে সব যাতনা ভুলে যায়। যদি ভুলতে না পারতো তাহলে কোন মা দ্বিতীয় সন্তান কামনা করতে সাহস করতো না।

আল্লাহ্ তাআলা মায়ের এ কষ্টের কথা কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন, "তার মা তাকে কষ্টের সাথে বহন করেছে এবং কষ্ট করে প্রসব করেছে। পেটে বহন ও বুকের দুধ পান করায় (কমপক্ষে) ৩০ মাস লেগেছে।" (আহকাফ ঃ ১৫)

এ কারণে রাসূল (স) পিতার চেয়ে মাতার হক তিনগুণ বেশি বলে উল্লেখ করেছেন।

গর্ভ সঞ্চারের পর প্রথম কয়েকমাস মা রীতিমতো অসুস্থ থাকে। গর্ভধারণ কালটাতে যে কষ্ট হয় তা সব মায়ের এক রকম নয়। কারো কারো ৫/৬ মাস খুবই কষ্ট হয়। বমির কারণে কোনরকমে কিছু খেতে পারলেও তা পেটে স্থায়ী হয় না। পানি পর্যন্ত বমি হয়ে যায়। এমনকি বমি রোধ করার জন্য যে ঔষধ খাওয়ানো হয় তাও বের হয়ে আসে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার স্ত্রী বেচারী তাদেরই একজন। এ সময়টা আমার সম্মানিতা শাশুড়ির তত্ত্বাবধানেই তাকে থাকতে হয়েছে। আমি সপ্তাহে বা ১৫ দিনে একবার যেয়ে দেখে আসতাম। তার জন্য খুব দরদবোধ করতাম। কিন্তু দোয়া করা ছাড়া আমার আর করণীয় কিছুই ছিলো না। ডাক্তারদের কাছে দৌড়াদৌড়ি কম করিনি। শেষ পর্যন্ত আমার শ্বশুর সাহেব কবিরাজি ঔষধের আশ্রয় নিলেন। এ সময় তাকে রংপুরের বাসায় আনার সাহস করিনি। এ অবস্থার

প্রথমদিকে কলেজ ছুটি থাকায় আমার কাছে বেশকিছু দিন ছিলো। এ ব্যাপারে আম্মাও ভুক্তভোগী। তাঁর অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করেও তেমন উপশম হয়নি।

প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো

আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মায়ের প্রথম সন্তান তার পিতার বাড়িতেই ভূমিষ্ঠ হয়। অধীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে পিতা হবার দিনটির জন্য অপেক্ষা করছি। শেষ দু'মাস প্রতি সপ্তাহেই নওগাঁ যেয়ে দেখে আসতাম। ১৯৫৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি একটি টেলিগ্রাম এলো। রংপুরের বাসায় টেলিগ্রামটা আমার হাতে দিয়ে পিয়ন দস্তখত নেবার পরও বিনয়ের সাথে দাঁড়িয়ে রইলো। টেলিগ্রামটা পড়েই ওর দাঁড়াবার কারণটা বুঝতে পারলাম। পিয়ন টাকা নিয়ে সালাম দিয়ে খুশি মনে চলে গেলো। টেলিগ্রামে ছেলে সন্তান হবার খবর পেলাম।

সন্তান ছেলে হোক, মেয়ে হোক সবই আল্লাহর মহানিয়ামত। আমি ছেলে হবার খবরে আল্লাহর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। কারণ বংশের প্রথম সন্তান ছেলে হোক এটাই আমার কামনা ছিলো। মেয়ে হলে অন্য বংশে চলে যাবে। বংশের চেরাগ তো ছেলেই হয়। নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য ছেলেই বেশি উপযোগী। প্রথম সন্তান ছেলে হলে পরবর্তী সন্তানদের উপর সে মুরুব্বীর ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমাদের বংশে প্রথম সন্তান ছেলে হওয়ার ঐতিহ্য রয়েছে। দাদা, আব্বা ও আমি পিতামাতার প্রথম সন্তান। আমার বড় ছেলে, তৃতীয় ও পঞ্চম ছেলের প্রথম সন্তান ছেলে। আমার বড় চাচারও প্রথম সন্তান ছেলে। অবশ্য আমার দ্বিতীয়, চতুর্থ ও কনিষ্ঠ ছেলেদের প্রথম সন্তান কন্যা। যা হোক, আমার প্রথম সন্তান ছেলে হওয়ায় পিতা হবার অনুভূতির মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রা যোগ হলো। দারুণ খুশি হয়ে শ্বশুর সাহেবকে ছেলের জন্মের ৭ম দিনে আকীকার জন্য দু'টো ভালো খাশি কেনার অনুরোধ করলাম। আর আব্বাকে তাঁর প্রথম নাতির আকীকায় হাজির হবার জন্য যাতায়াত খরচ পাঠিয়ে দিলাম।

ছেলের নাম রাখা

আব্বারও প্রথম দাদা হবার আবেগ কম ছিলো না। আমার ভাইয়েরা প্রথম চাচা হওয়ার মর্যাদা এবং বোনেরা প্রথম ফুফু হবার গৌরব বোধ করলো। তারা আব্বাকে পরিবারে নবাগত মেহমানের নাম রাখার জন্য আবদার জানালো। আম্মা অন্তর্মুখী স্বভাবের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও দাদী হবার আনন্দ গোপন রাখতে পারেননি। আব্বা সবাইকে জানালেন যে, তিনি স্বপ্নে নাম পেয়েছেন। তিনি নাকি স্বপ্নে তার আব্বাকে (আমার দাদাকে) দেখে খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার প্রথম নাতির নাম কী রাখবো বলুন।"

জওয়াবে দাদা বললেন, "তুমি জানো না, রাসূল (স) বলেছেন যে, সবচেয়ে ভালো

নাম আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান?” আব্বা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, নাতির নাম আব্দুল্লাহ রাখবেন।

আমার ভাই-বোনেরা ডাক নাম কী হবে জানতে চাইলে আব্বা বললেন, আম্‌ন্‌ শব্দ থেকে চারটি শব্দ গঠিত হয়—মামূন, আমীন, মোমেন ও আমান। এর যে কোন একটা বাছাই করে নাও। তারা মামূন নামটা পছন্দ করলো। আমিও এই নাম পছন্দ করলাম। এভাবে আকীকার পূর্বেই নাম বাছাই হয়ে গেলো আব্দুল্লাহিল মামূন। মামূন শব্দের অর্থ হলো নিরাপদ বা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। আম্‌ন্‌ শব্দের অর্থ হলো নিরাপত্তা ও শান্তি। সে হিসেবে মামূন অর্থ শান্তিপ্রাপ্তও হয়।

পিতা হবার আনন্দ, আবেগ, গৌরববোধ যতই থাকুক, নবজাতকের জন্য কী কী দরকার এ বিষয়ে সামান্য অভিজ্ঞতাও না থাকায় অনেক ভেবেচিন্তে রংপুর থেকে কিছু না নিয়ে যাওয়াই সঠিক মনে করলাম। নওগাঁ যেয়ে স্ত্রীর মাধ্যমে অভিজ্ঞদের পরামর্শ যোগাড় করে নওগাঁ থেকেই কেনার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিলাম।

নতুন অতিথির সাথে সাক্ষাৎ

আকীকার আগের দিন পিতা হবার আবেগপূর্ণ অনুভূতি ও উৎসাহ নিয়ে নওগাঁ রওনা হলাম। সাথে শুধু ছেলের নামটুকু নিয়ে খালি হাতেই গেলাম। সারাপথে আমার মন না দেখা ছেলেই দখল করে রইলো। দেখতে কেমন হয়েছে, কার চেহারার সাথে মিল বেশি, রঙ কি আমার পেয়েছে না মায়ের ইত্যাদি চিন্তা অবিরাম মনে জেগে রইলো। ট্রেন যথাসময়ে রওনা হয়ে ঠিক সময়েই পার্বতীপুর জংশনে পৌঁছলো। কিন্তু মনে হচ্ছিলো যে, আজ অনেক ধীরে চলছে। ট্রেন বদল করে ব্রডগেজের গাড়িতে যথাসময়েই বসলাম। সান্তাহার জংশনে নেমে ঘোড়ায় টানা টাঙ্গা গাড়িতে ৩ মাইলের মাথায় নওগাঁ শহর। বার বার ঘড়ি দেখছি, পথ যেন শেষ হতে চায় না। মন এক অদ্ভুত চিজ। পরিস্থিতি ও পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে চায় না। সে তার নিজস্ব গতিতে চলতে চায় বলেই মানুষ অস্থিরতা ও অশান্তিতে ভোগে। আরবীতে একটা কথা আছে “অপেক্ষা ও প্রতীক্ষা মৃত্যুর চাইতেও ভয়ানক।”

যা হোক, নওগাঁয় শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছার পর সর্বপ্রথম শ্রদ্ধেয়া দাদী-শাশুড়ি মুবারকবাদ জানালেন। শালা সাহেবরা জড়িয়ে ধরে খুশি প্রকাশ করলো। শাশুড়ি আম্মা বললেন, “তুমি গোসল করে যোহরের নামায পড়ে খেয়ে নাও।” আমি বললাম, “সবার আগে মেহমানের সাথে দেখা করতে চাই।” দাদী-শাশুড়ি আমাকে সমর্থন করলেন এবং প্রসূতির ঘরে নিয়ে গেলেন। তখন বেশ শীত ছিলো। বড় একটা সুন্দর তোয়ালে জড়িয়ে দাদী-শাশুড়ি শিশুটিকে আমার কোলে তুলে দিলেন। আমি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রথমে ছেলের চোখ বন্ধ ছিলো। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে চাইলে মনে আদরের বন্যা বয়ে গেলো। দাদী-শাশুড়ি আমার স্ত্রীকে বললেন, “দেখো তামাশা! এ কয়দিন কমই চোখ খুলে চেয়েছে, আজ বাপকে পেয়ে কেমন বার বার চোখ খুলে তাকাচ্ছে।”

স্ত্রীর মুখে তখন প্রশান্তি বোধের হাসি। ঘরে ঢুকে আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলা ছাড়া আর কোন কথাই বলা হয়নি। সকল মনোযোগ বাচ্চার দিকেই কেন্দ্রীভূত ছিলো। দাদী-শাশুড়ির ঐ কথায় বাচ্চার মায়ের দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, মা হওয়ার গৌরবে তৃপ্ত উৎফুল্ল চেহারা। চোখের ভাষায় আমাকে জানিয়ে দিল যে, পুত্র সন্তান প্রসব করে আমার বাসনা পূর্ণ করতে পেরে সে ধন্য।

গোসল, নামায ও খাওয়ার পর স্ত্রীর সাথে একান্তে আলাপের সময় এতোদিনের এতো ঘনিষ্ঠ পরিচিত মানুষকে একটু ভিন্ন মনে হলো। কথায়, চলায়, বলায় পূর্বের চেয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ লক্ষ্য করলাম। মনস্তত্বের এক বইতে পড়েছিলাম যে, বধূ সন্তান হবার পূর্বপর্যন্ত স্বামীর বাড়িতে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত বোধ করে না। সন্তান হবার পর তার অবস্থান মযবুত বলে বোধ করে এবং নিজের উপর আস্থাশীল হয়।

সন্তানসহ স্ত্রীর সাথে রাত্রিযাপন

ঘুমাবার সময় পূর্বের মতো একই বিছানায় দু'জন পাশাপাশি শুইলাম। পার্থক্য হলো এটুকু যে, তার বাঁ পাশে নতুন মেহমান। এটাই স্বাভাবিক যে নবজাতক সন্তানের প্রতি তাকে সবসময় মনোযোগ দিতে হয়। কয়দিনের বাচ্চা। বারবার পেশাবের কাপড় বদলাতে হয়। পায়খানাও কয়েকবার পরিষ্কার করতে হয়। ঘন ঘন দুধ খাওয়াতে হয়। কেঁদে উঠলে দেখতে হয়, কী অসুবিধা বোধ করছে। সন্তানের পিতা একই বিছানায় নিরাপদে ঘুমায়। কিন্তু মায়ের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সন্তানের প্রতি মায়ের এ যত্নের কোন তুলনা নেই। এ সব বিবেচনা করলে স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি পাওয়ারই কথা। আমার সন্তানের জন্য তার এ ত্যাগ ও তিতিক্ষা তার প্রতি আমাকে কৃতজ্ঞ করে তুললো।

পিতা হবার আনন্দ, গৌরব ও সন্তানের প্রতি গভীর স্নেহের অনুভূতি এবং সন্তানের সেবাযত্নে স্ত্রীর নিষ্ঠা ইত্যাদি যথাযথ উপলব্ধি করা সত্ত্বেও একটি সূক্ষ্ম বেদনার অস্তিত্বও অনুভব করলাম।

এক বিশেষ বেদনাবোধ

এ সূক্ষ্ম বেদনার কথাটি কারো কাছে প্রকাশ করার বিষয় নয়, শুধু উপলব্ধি করার। পাঠকদের মধ্যে যারা পিতা হয়েছেন, তারাও প্রথম পিতা হবার সময়টার ঐ বেদনাটুকু ভুলে গেলেও আমার এ লেখা পড়ার পর অবশ্যই স্মৃতির সাগরে ভাসমান দেখতে পাবেন। সন্তানের পিতা হবার আবেগময় অনুভূতি ও গৌরববোধ ঐ বেদনাটুকু সহজেই সহনীয় করে দেয় এবং অল্প দিন পরই অপত্যস্নেহের প্রাবল্যে তা বিস্মৃত হয়ে যায়। কিন্তু ঐ সাময়িক বেদনাটুকুর অস্তিত্ব অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই। পাঠকগণের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটিয়ে রহস্যময় বেদনার কথাটি বলেই ফেলি।

জীবনে যা দেখলামের ৪৬ নং কিস্তির প্রধান শিরোনাম ছিলো 'আমার জীবনে বিয়ের প্রতিক্রিয়া'। এর শেষদিকে 'আরো একটি অনুভূতি' উপ-শিরোনামে

লিখেছিলাম, "বিয়ের পর একটি বিশেষ অনুভূতি আমাকে এমন তৃপ্তি দিতো, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। একটি মানুষ একান্তই আমার, আর কেউ এতে শরীক নেই। তার বাবা-মা, ভাই-বোন, শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে যে সম্পর্ক সেটা অন্য ধরনের। কিন্তু আমার একান্ত জীবন সাথী হিসেবে এ মানুষটি শুধুই আমার। এমন সাথী আর কেউ নেই।"

রাতে শোবার সময় থেকে সকাল পর্যন্ত এ মানুষটি শুধু আমার ছিলো। তার মনোযোগের শতকরা একশ' ভাগ আমি একাই পেতাম। আর কেউ এর একভাগও দাবি বা ভোগ করার সামান্য অধিকারীও ছিলো না। সন্তানের মা হবার পর তার পাশে একই শয্যায় ঘুমালাম বটে; কিন্তু তার মনোযোগ শতকরা দশভাগও পেলাম না। প্রথম রাতটিতেই বেদনাবোধ তীব্র মনে হয়েছে। হঠাৎ করে আমার একান্ত মানুষটি এভাবে হারিয়ে গেলো? আর একজন উড়ে এসে তাকে দখল করে ফেললো? আমি অধিকার থেকে অকস্মাৎ বঞ্চিত হয়ে গেলাম? এ অনুভূতিকে কি বেদনা না বলে উপায় আছে?

এ বেদনা শুধু সূক্ষ্ম নয়, গভীরও। কারণ অন্যসব বেদনার কথা আপনজনদের কাছে বলা যায়। তাদের সহানুভূতিতে বেদনার উপশম হয়, প্রতিকারও করা যায়। কিন্তু এটা এমন ধরনের বেদনা, যা কারো কাছে বলাও যায় না। আমার স্ত্রীও এ লেখা পড়ার মাধ্যমে প্রথম জানতে পারবে যে একসময় আমি এ বেদনাবোধ করেছি এবং তার মতো আপনজনকেও বলতে পারিনি।

যে বেদনার কথা কাউকে বলা যায় না এবং একাই যা সইতে হয়, তা গভীরই হয়। পরদিন আকীকা করে এর পরের দিন রংপুরে ফিরে গেলাম। দু'রাত জীবন সাথীর সাথে নতুন অনুভূতি নিয়ে কাটালাম। প্রতি সপ্তাহে এসে দু'রাত কাটিয়ে যেতাম। মাস দেড়েক এভাবেই কাটলো।

মনের এমন একটি গোপন কথা আজ প্রকাশ করলাম, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এ পর্যন্ত জানতে পারেনি। দুনিয়াটা এমনই জায়গা যে, এখানে দুঃখ ছাড়া কোন সুখই হাসিল করা যায় না। "দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?" —কবির এ কথাটি কতো বিরাট সত্য! কতো কষ্ট সহ্য করে মাকে সন্তান পাওয়ার সুখ পেতে হয়! সে হিসেবে সন্তানের পিতা হবার সৌভাগ্য লাভ করতে গিয়ে ঐ অব্যক্ত বেদনাটুকু অতি নগণ্য।

আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় সুখ ও দুঃখকে একসাথে মিশিয়ে রেখেছেন। জীবনে সাফল্য লাভ করতে হলে দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ-তিতিক্ষা অপরিহার্য। কুরআনের বাণী "ফাইন্নামাআল উসরি ইউসরান, ইন্না মাআল উসরি ইউসরা।" একই কথা দু'বার একই সাথে বলে এ কথাটির গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। কষ্ট করে আয়-রোজগার না করলে খাওয়া-পরা-থাকার সুখ পাওয়া যায় না। ছাত্রজীবনে কঠোর সাধনা করলেই পরবর্তী জীবনে সুখের নাগাল পাওয়া যায়।

সুখ-দুঃখ কাকে বলে?

অভাবই দুঃখের মূল। যা চাই তা না পেলেই অভাববোধ হয়। এরই ফলে দুঃখ ভোগ করতে হয়। অভাব না থাকলেই সুখবোধ হয়। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে সুখ ও দুঃখ একত্র করে রেখেছেন। এখানে এ দুটোকে আলাদা করার উপায় নেই।

আখিরাতে সুখ ও দুঃখকে সম্পূর্ণ আলাদা করা হবে। কোথাও কখনো এ দুটো একত্র হবে না। বেহেশতে শুধু সুখ এবং দোযখে শুধু দুঃখ। সূরা হা-মীম আস সাজদার ৩০ নং আয়াতে বেহেশতের বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, "সেখানে তোমাদের মন যা চায় তাও পাবে, আর যা দাবি করবে তা তো পাবেই।"

অর্থাৎ যা চাইবে তা তো পাবেই, এমনকি যা মনে মনে কামনা করবে, চাইবার আগেই তাও পেয়ে যাবে। সেখানে তাই কোন অভাব থাকবে না বলে দুঃখের কোন কারণই নেই।

দোযখ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যেখানে শুধু দুঃখই আছে। সুখের কোন গন্ধও সেখানে নেই। সেখানে পিপাসায় কাতর হয়ে পানি চাইলে এমন পানি দেওয়া হবে, যা পিপাসার দুঃখ আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। তাই সেখানে শুধু দুঃখই দুঃখ।

বেহেশতে যা নেই তা-ই দোযখে আছে। আর দোযখে যা আছে তা বেহেশতে নেই। বেহেশতে কোন কিছুরই অভাব নেই। সেখানে শুধু অভাবেরই অভাব। আর দোযখে শুধু অভাবই আছে, আর কিছুই নেই। অভাব বোধই দুঃখের মূল কারণ। তাই বেহেশতে তা নেই। বেহেশতের চিরস্থায়ী সুখ পেতে হলে যেভাবে চললে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন সেভাবে চলতে গিয়ে যে দুঃখ-কষ্ট হয় তা হাসিমুখে বরণ করে নিতে হবে। হাদীসে আছে, বেহেশতকে অপছন্দনীয় জিনিস দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে এবং দোযখকে লোভনীয় বস্তু দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।

৬২.

জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে আব্বার মনোভাবে পরিবর্তন

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আমার ছোট ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্যামকে মাওলানা মওদূদী (র)-এর কয়েটি বই দিয়ে আব্বাকে পড়াবার দায়িত্ব দিলাম। ছুটির পর আমি রংপুরে চলে গেলাম। কয়েক মাস পর আব্বার এক চিঠি পেলাম। তিনি আমাকে খুলনা যাবার নির্দেশ দিলেন। সেখানে তাবলীগ জামায়াতের এক ইজতিমায় তাবলীগের কেন্দ্রীয় আমীর হযরতজী মাওলানা ইউসুফ সাহেবের আসবার কথা। তাবলীগের এদেশীয় আমীর মাওলানা আবদুল আযীয জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে আব্বাকে চরম বিরূপ ধারণা দিয়েছিলেন বলেই তিনি যে কঠোর মনোভাব পোষণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, মাওলানা মওদূদী (র)-এর বইগুলো পড়ার পর তাঁর মনোভাব নমনীয় হলেও আমার সাথে তাবলীগের আমীরের সামনা-সামনি আলোচনা ছাড়া আব্বা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না।

আমার ভাইটি খুবই হিকমতের সাথে জামায়াতের বইগুলো পড়াতে সক্ষম হওয়ায় আব্বার মনোভাবে পরিবর্তন আসলেও তখনো পুরো নিশ্চিত হতে পারেন নি। তাই তিনি চাচ্ছিলেন যে, খুলনায় হযরতজী মাওলানা ইউসুফের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ নেবেন। আব্বা লাহোরে চিল্লারত থাকাকালে মাওলানা আবদুল আযীযের চিঠি পেয়ে পেরেশান হয়ে চিল্লা থেকে ফিরে আসবার পথে দিল্লীতে হযরতজীর সাথে দেখা করে আমার কথা উল্লেখ করলে তিনি নাকি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আমার উপরে যেন চাপ সৃষ্টি না করেন। আমাকে আবার চিল্লা দিতে উদ্বুদ্ধ করার পরামর্শও দিয়েছেন।

যাহোক, আব্বার নির্দেশ মোতাবেক যথাসময়ে রংপুর থেকে আমি খুলনা গেলাম। এদিকে ঢাকা থেকে আব্বা ও আমার ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্যামও গেলেন। খুলনায় হযরতজীর সাথে সাক্ষাতের কোন সুযোগই পাওয়া গেলো না। হযরতজী নাকি ফরিদী সাহেব নামক তাবলীগের এক নেতাকে আমার সাথে কথা বলার দায়িত্ব দিয়েছেন। তার সাথে আলোচনার সুযোগ গ্রহণের জন্য খুলনা থেকে তাবলীগের রিজার্ভ করা লঞ্চে আব্বার সাথে আমিও ঢাকা আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। লঞ্চে ফরিদী সাহেবের সাথে সাক্ষাতে আব্বা মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না। কারণ ফরিদী সাহেব আমাকে কোন কথা বলার সুযোগই দিতে চাইলেন না। তিনি নসীহত করলেন যে, আপনি আবার তিন চিল্লায় আসুন, যাতে তাবলীগের হাকীকত বুঝে আসে। আমি বললাম, আমি দু'বার তিন চিল্লা দিয়েছি এবং ১ চিল্লা করে আরও ৩/৪ চিল্লা দিয়েছি। তিনি বললেন, "আপনাকে আবার তিন চিল্লায় দিল্লী যেতে হবে।"

আমি আব্বাকে বললাম, "ফরিদী সাহেব আমাকে কথাই বলতে দিলেন না। এতো চিল্লা দেবার পরও আমার মতো লোক যদি তাবলীগের হাকীকত বুঝতে না পারে তাহলে আবার চিল্লা দেবার উৎসাহ কেমন করে পাওয়া যাবে?" আব্বাও আমার সাথে একমত হলেন। আমি রংপুরে ফিরে গেলাম।

আবার গ্রেপ্তার ও মুক্তির পর করাচী গমন

১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আবার গ্রেপ্তার হয়ে রংপুর জেলে গেলাম। জেলে থাকাকালে আমাকে কলেজের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। সে কাহিনী পরে শুনাবো ইনশাআল্লাহ। আব্বার সাথে দীনের ব্যাপারে আমার যে মতবিরোধ চলছিলো সে প্রসঙ্গ এ লেখায়ই সমাপ্ত করতে চাই।

১৯৫৫ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় জামায়াতের পক্ষ থেকে আমাকে ডেকে পাঠানো হলো। ঐ বছরই নবনির্বাচিত গণপরিষদের পূর্ব-পাকিস্তানি সদস্যদেরকে ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য জামায়াতে ইসলামী আমার উপর দায়িত্ব অর্পণ করে। করাচী রওনা হবার পূর্বে ইসলামী আন্দোলনের পুস্তকাদির একটা সেলফ আব্বার শোবার ঘরে রেখে গেলাম। আর আমার সহযোগী ভাইটিকে বলে গেলাম যে, এ সব বইতে যেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা জানবার জন্য যেন আব্বার সাথে যোগাযোগ রাখে।

আমার ভাই থেকে জানতে পারলাম যে, আব্বা আগ্রহের সাথে বই পড়ছেন এবং আব্বার মনোভাব পরিবর্তন হচ্ছে। আমি ডিসেম্বরেই ঢাকা ফিরে এলাম।

তাবলীগের নেতাদের সাথে বৈঠক

তখন কাকরাইলে তাবলীগের বড় ইজতিমা হতো। ১৯৫০ সালে ভারতে আমার চিল্লা দেবার সময় মাওলানা জিয়াউদ্দীন আলীগড়ী আমার তাবলীগী উস্তাদ ছিলেন। ইজতিমায় আব্বার সাথে তাঁর দেখা হলো। আমার সাথে আলোচনার জন্য আব্বা তাঁকে রাজি করালেন। আমি সেখানে গিয়ে আসরের জামায়াতে শরীক হলাম। নামায শেষে মসজিদের এক জায়গায় মাওলানা আলীগড়ী ও মাওলানা আবদুল আযীয আমার সাথে বসলেন। আব্বাও সেখানে উপস্থিত। প্রায় ৩০/৪০ জন তাবলীগী ভাই আমাদের তিন পাশে বসে যিকির ও দোয়া করতে থাকলেন। বুঝতে পারলাম, তারা আমার হেদায়াতের জন্য দোয়া করছেন।

আগের আলোচনায় এসেছে যে, মাওলানা জিয়াউদ্দীন আলীগড়ীর সাথে আমার অত্যন্ত মহব্বতের সম্পর্ক ছিলো। তিনি নিবিড়ভাবে আমার সাথে মুয়ানাকা (কোলাকুলি) করলেন। মাওলানা আলীগড়ী অত্যন্ত আবেগের সাথে বললেন, "আপনি তো তাবলীগে অনেক অগ্রসর হয়েছিলেন। এতোদিনে তো তাবলীগের মুরুব্বীদের মধ্যে আপনার গণ্য হওয়ার কথা।" মাওলানা আবদুল আযীয বলেন, "দুনিয়ায় বহু ফিরকাহ সৃষ্টি হয়েছে। সঠিক পথ চেনা ও টিকে থাকা খুবই কঠিন। আল্লাহর রহমতে তাবলীগ জামায়াতে হাক্কানী আলেমগণ আছেন। আপনি আগের মতো আবার তাবলীগে কাজ করুন।" আমি দু'জনকেই বললাম, "আপনারা আমার মুরব্বী। আপনাদের দু'জনেরই আমি শাগরেদ। আমি আপনাদের খেদমতে কিছু আরয করতে চাই। যদি মেহেরবানী করে শোনেন তাহলে বলতে পারি।"

বলাবাহুল্য, এ আলোচনা উর্দু ভাষায়ই হচ্ছিল। মাওলানা আলীগড়ীর কারণেই উর্দুতে আলোচনা করতে হলো। আমার ঐ কথার পর মাওলানা আবদুল আযীয বললেন, "এখানে এতো লোকের মধ্যে নয়, ভেতরে চলুন।" এ কথা বলে তাঁরা দু'জন এবং আমি ও আব্বা মসজিদের ভেতরে গেলাম। সেখানে আর কেউ ছিলো না। আমি বললাম, "আমি কুরআনের তাফসীর পড়ে উপলব্ধি করেছি যে, রাসূল (স) দীনকে কায়েম করার জন্য যে পদ্ধতিতে এবং যে ধরনের কর্মসূচি নিয়ে কাজ করেছেন, তা তাবলীগের কর্মসূচির চেয়ে অনেক ব্যাপক।"

আমাকে থামিয়ে দিয়ে মাওলানা আবদুল আযীয বললেন, "এ কর্মসূচি ইলহামের মাধ্যমে পাওয়া। আমরা এবং বহু বড় বড় আলেম এতে মুৎমাইন।" আমি বললাম, "হুযুর, আপনারা বড় আলেম। আমার অনুরোধ, যদি ঐ তাফসীর আপনাদের মতো আলিমগণ পড়েন তাহলে লাখ লাখ লোক আপনাদের মাধ্যমে দীনের আলো পাবে।" এ কথা শুনে রাগতস্বরে এবং বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে তিনি বললেন, "আমরা জ্ঞানহীন লোক। মুরুব্বীদের পরামর্শ ছাড়া আমরা কোন কিতাব পড়ি

না।" এ কথা বলে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। মাওলানা আলীগড়ী আগাগোড়া চুপচাপই রইলেন। আমরাও চলে এলাম।

আব্বার সম্পূর্ণ পরিবর্তন

কাকরাইল মসজিদে তাবলীগের দু'জন নেতার সাথে আমার সাক্ষাতের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আব্বা বাড়িতে এসে আমার ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্যামকে ডেকে আমার সামনেই যা বললেন, তাতে আমি অত্যন্ত আশ্বস্তবোধ করলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, আব্বা জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে মাওলানা আবদুল আযীযের দেওয়া অপবাদ মোটেই সঠিক নয় বলে বুঝতে পারলেন। আব্বা বললেন, "তারা তোমার ভাইয়ের সাথে বিতর্ক করার কোন যোগ্যতাই রাখেন না। আলোচনা করতেই তারা সম্মত হলেন না। আলোচনার উদ্দেশ্যেই আমি তাকে তাদের নিকট নিয়ে গেলাম। আমাদেরকে একদল তাবলীগ জামায়াতের লোক ঘেরাও করে রাখলো এবং সবার সামনে তারা ওকে উপদেশ দিতে থাকলো। যেই মাত্র সে কিছু বলার অনুমতি চাইলো, অমনি তারা সবার সামনে বলার সুযোগ দিলো না। বোধ হয় তাদের আশঙ্কা হলো যে, ওর কথা সবাই শুনলে প্রভাবান্বিত হতে পারে। ভেতরে গোপনে আলাপের জন্য নিয়ে গেলো বটে, কিন্তু সেখানেও কথা বলা শুরু করতেই থামিয়ে দিলেন এবং বক্তব্য সমাপ্ত করার সুযোগ পর্যন্ত দিলেন না। তাদেরকে তাফসীর পড়ার অনুরোধ জানালে রাগ হয়ে যা বললেন, তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।"

এ ঘটনার পর আব্বা কাকরাইল মসজিদে আগের মতো যাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। আমার বুক থেকে বিরাট অস্বস্তি দূর হয়ে গেলো। যে আব্বা আমাকে ছোট সময় থেকে ধর্মীয় দিক দিয়ে সযত্নে গড়ে তুললেন; সে মহান আব্বাকে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে মিথ্যা ফতোয়া দিয়ে আমার সাথে তাঁর সংঘাত সৃষ্টি করা হলো। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বেদনাময় ঘটনা। "জামায়াত কাদিয়ানীদের চেয়ে জঘন্য ফিতনা" বলে আব্বাকে বিভ্রান্ত না করলে আমার এ দুর্ভোগ পোহাতে হতো না এবং আব্বাও তিন বছর পেরেশানীতে ভুগতে বাধ্য হতেন না। মিথ্যা ফতোয়া কী ভয়ঙ্কর!

আরো দু'ছেলের জন্ম

আমার প্রথম ছেলে মামুনের জন্মের ১৭ মাস পর ১৯৫৪ সালের আগস্ট মাসে দ্বিতীয় ছেলে নওগাঁতেই ভূমিষ্ঠ হলো। আমি তখনো রংপুর কলেজে আছি। এ ছেলে পয়দা হবার পর নামের জন্য আব্বার দরবারে দরখাস্ত করা হলো। তিনি জানালেন,

"মূল নাম তো আবদুল্লাহই থাকবে। ডাক নাম আগে দেওয়া চারটি থেকে আর একটা নিয়ে নাও।"

সে হিসেবে তার নাম রাখা হলো আবদুল্লাহিল আমীন।

ভাষা-আন্দোলনের অপরাধেই ৫৫ সালের মার্চ মাসে চাকরিচ্যুত হয়ে গেলাম। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখে মাওলানা মওদূদী (র) সর্বপ্রথম পূর্ব-

পাকিস্তান সফরে আসেন। ৪০ দিন সফর করে ফিরে যাবার পূর্বে জামায়াতে ইসলামীর পূর্ব-পাকিস্তান সংগঠনকে ৪টি বিভাগীয় শাখায় রূপান্তরিত করা হয়। আমাকে ঐ সময়কার রাজশাহী বিভাগের আমীর নিয়োগ করা হয় এবং মাসিক আড়াইশ টাকা ভাতা নির্ধারণ করে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৯৫৬ সালের অক্টোবরে আমার তৃতীয় ছেলে পয়দা হয়। আব্বার পূর্ব উপদেশ অনুযায়ী এর নাম রাখা হয় আবদুল্লাহিল মোমেন। 'আম্‌ন্' শব্দ থেকে গঠিত ৪টি শব্দের মধ্যে ৩টি শব্দই খরচ হয়ে গেলো।

আমি তখন আব্বা-আম্মা ও ভাইদের সাথে আব্বার কেনা মগবাজারের বাড়িতেই থাকি। আমার বড় ছেলের জন্মের দেড় মাস পরই আমার দ্বিতীয় ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্‌যামের প্রথম সন্তান পয়দা হয়। নতুন জেনারেশনে এটিই প্রথম কন্যা সন্তান। এর ডাক নাম রাখা হয় মুনীরা। প্রথম কন্যা সন্তান হিসেবে গোটা পরিবারে সে সবার আদরের ভাগী হয়ে গেলো।

তখনো আমরা এক পাকেই খাই। আর বড় বউ হিসেবে আমার স্ত্রী পাক ঘরের ঝামেলাপূর্ণ দায়িত্বের বোঝা বইতেন।

সন্তানদের নাম রাখার নীতি

আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়ম হলো আসল নাম আরবীতে রেখে ডাক নামটা আলাদা রাখা। আত্মীয়-স্বজনরা ডাক নামেই চেনে। তারা আসল নাম অনেকেই জানে না। ডাক নাম না বললে চিনতেও পারে না। আমাদের ৪ ভাইয়ের মধ্যে কনিষ্ঠজন ড. মুহাম্মদ মাহদীউয্‌যামান ছাড়া আর সবারই দু'নাম। আমার ডাক নাম ছাত্রজীবন থেকেই ব্যবহার করা ক্ষান্ত করেছি। অপর দু'ভাই এখনো ডাক নামেই আত্মীয়দের নিকট পরিচিত।

আমরা ক'ভাই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমাদের সন্তানদের আসল নামের অংশকেই ডাক নাম হিসেবে ব্যবহার করবো। সে হিসেবেই আমার ছেলেদের আসল নামের শেষ অংশই ডাক নাম। মামুন, আমীন, মোমেন ইত্যাদি ডাকা হয়। আমার দু'ভাই তাদের ছেলেদের মূল নামের প্রথম শব্দকে ডাক নাম হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন, সোহায়েল আবদুল্লাহ মুয়ায্‌যাম, ফায়সাল আবদুল্লাহ মুয়ায্‌যাম, সালেহ আবদুল্লাহ মুকাররাম। সবার নামেই আবদুল্লাহ্ আছে। আর শেষ শব্দ পিতার নাম।

ডাক নাম আসল নাম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হলে কী দশা হয় তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে থাকাকালে দেখেছি। আমাদের হলের এক ছাত্রের পিতা সচ্ছল গৃহস্থ। ছেলেকে হলে রেখে পড়াবার সঙ্গতি আছে। কিন্তু নিজে লেখাপড়া জানেন না। ছেলেকে দেখতে হলে আসলেন। তিনি ছেলের আসল নাম বলতে পারলেন না। ডাক নাম বললেন। কিন্তু হলে এ নামে ঐ ছেলে পরিচিত নয়। হলের হাউস টিউটর অবশেষে পিতার নাম নিয়ে পিয়নকে দিয়ে হলের কামরায় কামরায় যেয়ে তালাশ করে ছেলের সন্ধান করলেন।

এই সেদিন আমার এক মামাতো ভাইয়ের ছেলে 'সাহেব মিয়া'র ছেলের ওয়ালীমায় গেলাম। যে গেটে আমাকে রিসিভ করলো সে বললো, আমি অমুকের জামাতা। চিনতে না পারায় সে বলল, আমি বরের ভগ্নীপতি। বললাম, তুমি সাহেব মিয়ার জামাই? সে আবার সাহেব মিয়া নাম জানে না। দু'রকম নামে এমন অনেক সমস্যারই সৃষ্টি হয়।

আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত লোকেরও অর্থহীন নাম পাওয়া যায়। নামটি আরবী শব্দেই গঠিত। কিন্তু অর্থ তালাশ করে পাওয়া যায় না। যেমন 'তবীবুর রহমান'। তবীব মানে চিকিৎসক। আল্লাহর চিকিৎসক মানে কী? 'রেজাউল হায়াত' মানে জীবনের সন্তুষ্টি। রেজাউর রহমান হলে ঠিক হতো। 'কিতাবুদ্দীন' দীনের কিতাব মানে কী? অভিধানে এ শব্দটি অনুপস্থিত। 'সাইয়েদুর রব'—রব তো আল্লাহ। আর সাইয়েদ অর্থ নেতা। আল্লাহর নেতা মানে কী?

নাম রাখার সময় আরবী ভাষা জানেন এমন কোন লোকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। রাসূল (স) সুন্দর অর্থপূর্ণ নাম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি অনেকের অর্থহীন বা কদর্থবোধক নাম বদলিয়ে দিয়েছেন।

আব্বার পরিবারে কম বয়সে মৃত্যু

আব্বার পরিবারে শিশু বয়সে কেউ মারা যায়নি। আমি যখন ১৯৩৯ সালে কুমিল্লায় ৭ম শ্রেণীতে পড়ি তখন বর্ষাকালে আমার বড় চাচা জনাব গোলাম কিবরিয়ার দ্বিতীয় ছেলে গোলাম মোস্তফা শিশু বয়সে পানিতে ডুবে মারা যায়। এ নামটা আমিই রেখেছিলোম বলে আল্লাহর প্রতি অভিমান করে বেদনা প্রকাশ করেছিলাম। কবি গোলাম মোস্তফার নাম পাঠ্য বইতে দেখে এবং তাঁর কবিতায় মুগ্ধ হয়ে এ নাম রাখার জন্য বড় চাচার নিকট আবদার জানিয়েছিলাম।

আমাদের বংশে গোলাম শব্দে বেশ কয়টি নাম শুরু হয়েছে। আব্বা, বড়-চাচা, আমি ও আমার ছোট দু'ভাইয়ের নামের প্রথম শব্দই গোলাম। বড় চাচার বড় ছেলের নামও প্রথমে গোলাম সারওয়ার রাখা হয়। সারওয়ার মানে নেতা বা সর্দার। সে হিসেবে তাকে আমরা সর্দার বলেই ডাকতাম। এখন সারওয়ারই ডাকা হচ্ছে। অর্থের দিক দিয়ে গোলাম সারওয়ার সুন্দর নয় বলে বদলিয়ে যহুরে সারওয়ার রাখা হয়।

আব্বার বংশে কম বয়সে প্রথমে আমার বোনদের মধ্যে দ্বিতীয়জন বিয়ের বয়সী হয়ে মারা যায়। ওর নাম ছিলো নূরুন্নাহার। খুবই মেধাবী ছিলো। বালিকা বিদ্যালয় না থাকায় লেখাপড়ার সুযোগ পেলো না বলে আফসোস হতো। তবে সে বাড়িতেই লেখাপড়া করতো। আমার হাতের লেখা হুবহু নকল করতে পারতো। পড়ার খুব সখ ছিলো। বই পেলেই পড়তো। সে নিউমোনিয়া রোগে মারা যায়।

আব্বা ১৯৩৬ সাল থেকে ১৭ বছর চান্দিনা ছিলেন। এ বোনটির কবর সেখানেই মোকামবাড়ি মসজিদের পাশে চিহ্নিত আছে। সড়ক পথে কুমিল্লায় আসা-যাওয়ার সময় ওর কবরটি যিয়ারত করি।

আইএ ক্লাসে আমার সহপাঠী বন্ধু মুহাম্মদ মাসীহুর রাহমানের সাথে আমার তৃতীয় বোন আন-ওয়ারার বিয়ে হয়। আমার ঐ ভগ্নীপতি মোমেনশাহীতে আয়কর উকিল ছিলেন। গত বছর (২০০১) সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। ছেলেদেরকে উপযুক্ত করে সফল জীবন যাপন করে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।

আব্বা-আম্মা তাদের বড় মেয়ের মৃত্যুতেই বেশি ব্যথা পেয়েছেন। আমরা ৪ ভাই ও ৫ বোন ছিলাম। ভাইদের সবাই আল্লাহর মেহেরবানীতে এখনো জীবিত। ৫ বোনের মধ্যে ২য় বোন দুনিয়ার অনেক কিছু ভোগ করার পূর্বেই চলে গেলো। বোনদের মধ্যে সবার বড় ছিলো শামসুন নাহার। ৩ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে ১৯৫৭ সালের জানুয়ারিতে সে মারা যায়। ছোট মেয়ে নাঈমার বয়স তখন মাত্র ৪০ দিন। এ বোনের স্বামী রেল বিভাগে চাকরি করতেন। অবসর জীবনে হোমিও চিকিৎসক হিসেবেও অনেক দিন কাজ করেছেন। তার নাম ডা. আবু আহমদ আবদুল হাই আখুন্দ। কুমিল্লা শহরে নিজের বাড়িতেই আছেন। বয়স ৮৭ বছর।

৬৩.

১৯৫৪ সালের নির্বাচন

১৯৫৪ সালের মার্চে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের আইনসভার জন্য প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখন জনাব নূরুল আমীন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং মুসলিম লীগের দলীয় শাসন ছিলো।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো কয়েকজন নিহত হবার পর ভাষা-আন্দোলন সারাদেশে ব্যাপক গণআন্দোলনে পরিণত হয়। নূরুল আমীন সরকার ও মুসলিম লীগ প্রধানত এ কারণেই জনপ্রিয়তা হারায়।

তখন পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু ছিলো। অর্থাৎ মুসলিম ভোটাররা তাদের প্রতিনিধি পৃথকভাবে নির্বাচিত করতো। আর অমুসলিম ভোটাররা তাদের প্রতিনিধি আলাদাভাবে নির্বাচিত করতো। মুসলিমদেরকে কোন অমুসলিম প্রার্থীকে ভোট দিতে হতো না এবং কোন অমুসলিম ভোটারকেও কোন মুসলিম প্রার্থীকে ভোট দিতে হতো না। তাই নির্বাচনী ময়দানে হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো না।

ব্রিটিশ শাসন আমলে এ পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি চালু ছিলো বলেই ১৯৪৫ ও ৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম ভোটাররা ভারত বিভাগ করে পাকিস্তান কায়েম করতে সক্ষম হয়। গান্ধী ও নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস দল মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করালেও মুসলিম ভোটাররা তাদেরকে ভোট দেয়নি।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আর সব মুসলিম দল

যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেযামে ইসলাম পার্টি, গণতান্ত্রিক দল ও খেলাফতে রাব্বানী পার্টি ২১ দফা নির্বাচনী কর্মসূচি ঘোষণা করে। তিন নেতার নামই ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। শ্লোগানে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নামই সর্বত্র শোনা যায়।

ঐ নির্বাচনে আমি এক ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার ছিলাম। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই অনুষ্ঠিত হয়। সন্ত্রাস ও ছিনতাই জাতীয় শব্দ তখনো চালু হয়নি। ভোটারদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ছিলো। পোলিং বুথগুলো বারবার তদারক করে ভোটগ্রহণ সন্তোষজনকই পেয়েছি। প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারদের ভোট খামে করে আলাদাভাবে রিটার্নিং অফিসারের নিকট ডাকযোগে পাঠাবার বিধান ছিলো। আমি রংপুর শহরে ভোটার ছিলাম। প্রার্থীদের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে একজনকেও ভোট পাওয়ার যোগ্য মনে করিনি বলে আমি ভোট দেইনি। তখনো আমি জামায়াতে যোগদান করিনি। জামায়াতে আসার পর বুঝতে পারলাম যে, ভোটাধিকার প্রয়োগ না করার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিলো না। প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে কম মন্দ প্রার্থীকে আমার ভোটটি দেওয়া উচিত ছিলো।

ঐ নির্বাচনে ৩০৯ আসনের মধ্যে মুসলিম আসন ছিলো ২৩৭, অমুসলিমদের ছিলো ৭২টি আসন। মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসনে বিজয়ী হয়। জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়ে মুসলিম লীগে যোগদান করায় পার্লামেন্টারি পার্টির মর্যাদা কোন রকমে বহাল থাকে।

২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৮টি আসনে বিজয়ী হয়। এর মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৪৩, কেএসপি ৪৮, নেজামে ইসলাম পার্টি ২২, গণতন্ত্রী দল ১৩, খেলাফতে রাব্বানী পার্টি ২টি আসন পায়।

৭২টি অমুসলিম আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২৫টি, তফশীল ফেডারেশন ২৭, সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট ১৩, কমিউনিস্ট পার্টি ৪ ও গণতন্ত্রী দল ৩টি আসন পায়।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন

যুক্তফ্রন্টের প্রধান নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের দল মাত্র ৪৮টি আসন পাওয়া সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্টের প্রধান নেতার মর্যাদা তারই ছিলো। তাছাড়া অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি দেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। তাই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রীর আসন তিনিই দখল করেন।

এ দেশের রাজনীতির একটা বড় ট্র্যাজেডি হলো, ১৯৪০ সালে যে শেরে বাংলা মুসলিম লীগ সম্মেলনে পাকিস্তান প্রস্তাব (লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত) পেশ করেন, তিনি ১৯৪৬-এর নির্বাচনে পাকিস্তান দাবির বিরুদ্ধে নির্বাচন করেন। তিনি যদি মুসলিম লীগ ত্যাগ না করতেন তাহলে অবশ্যই পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হতেন।

১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল সকল প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর নেতৃত্বে 'গভর্নর জেনারেলস্ ওয়ার কাউন্সিল'-এর সদস্য হবার আহ্বান জানান। মুসলিম লীগ এতে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ নির্দেশ অমান্য করে বঙ্গদেশের প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক এর সদস্য হন। কায়েদে আযম দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে তাকে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করেন।

মুসলিম লীগের সমর্থন হারিয়ে ফজলুল হক সাহেব হিন্দু মহাসভার সাথে কোয়ালিশন করে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। হিন্দু মহাসভা নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি উগ্র হিন্দুবাদী হওয়ার কারণে এ মন্ত্রিসভা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অতঃপর খাজা নাজিমুদ্দীন ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার কায়েম হয়। শেরে বাংলার মতো জনপ্রিয় নেতা পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে সরে যাওয়ায় মুসলিম জাতির বিরাট ক্ষতি হয়েছে। পাকিস্তান আন্দোলনের ছাত্র-কর্মী হিসেবে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় আমাদের মধ্যে এ চর্চাই ছিলো যে, শেরে বাংলা কায়েদে আযমের নির্দেশ অমান্য করে নিজের তো মহাক্ষতি করলেনই, পাকিস্তান আন্দোলনেরও বিরাট ক্ষতি হলো। তিনি নেতৃত্বে থাকলে হয়তো বঙ্গদেশকে বিভক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা যেতো। অন্তত কোলকাতা ও মুর্শিদাবাদ জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হতো। এ কথা সঠিক হোক বা না হোক, এ চর্চা আমাদের মধ্যে ব্যাপক ছিলো।

পূর্ব-পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট সরকার হলেও কেন্দ্রে তখনো মুসলিম লীগ সরকার। খাজা নাজিমুদ্দীন তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং গোলাম মুহাম্মদ গভর্নর জেনারেল।

শেরে বাংলা ফজলুল হক নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা হন। ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল তিনি প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হন। প্রধানমন্ত্রী হবার এক মাসের মাথায় ৩০ এপ্রিল শেরে বাংলা কোলকাতায় যান। তিনি মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কৃত হবার পর যে হিন্দু নেতাদেরকে সাথে নিয়ে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন, ঐ নেতারা শেরে বাংলাকে ৩০ এপ্রিল এক বিরাট সংবর্ধনা দেন। তিনি আবেগতাড়িত হয়ে সংবর্ধনার জওয়াবে বলেন, "রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ বিভক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু বাঙালির শিক্ষা, সংস্কৃতি আর বাঙালিত্বকে কোন শক্তি কোন দিন ভাগ করতে পারবে না।" মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় সরকার শেরে বাংলার এ বক্তব্যকে পাকিস্তানের মূলভিত্তি মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিরোধী আখ্যায়িত করে। মুসলিমগণ একটি আলাদা জাতি (Two Nation Theory) ঘোষণা করেই মুসলিম লীগ ভারতকে বিভক্ত করে পাকিস্তান কায়েমের দাবি জানায়। শেরে বাংলার বক্তব্য ঐ 'টু নেশন থিওরি'র বিরোধী। ৩০ মে গভর্নর জেনারেল শেরে বাংলা মন্ত্রীসভা বাতিল করে পূর্ব-পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় শাসন চালু করে।

কেন্দ্রীয় শাসন

জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর ও ব্রিটিশ আমলের জাঁদরেল আইসিএস (ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস) অফিসার এন এম খানকে (নিয়াজ মুহাম্মদ খান) চীফ সেক্রেটারি নিয়োগ করে পূর্ব-পাকিস্তানকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে শাসন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ইসলামের দোহাই দিয়ে পাকিস্তান কায়েম করা হলেও পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালনাকালে পাকিস্তানে ইসলামী আদর্শ কায়েমের পরিকল্পনা না থাকায় কেন্দ্রীয় শাসন এমন সব লোকদের হাতেই আসে, যারা ইংরেজদের তৈরি মন, মগজ ও চরিত্রে গড়ে উঠেছেন। তাই তারা এমন দু'জন যোগ্য লোককেই পূর্ব-পাকিস্তানের শাসক হিসেবে পাঠিয়েছেন, যারা তাদের প্রতিনিধিত্ব করার উপযুক্ত।

ইস্কান্দার মির্জা জেনারেল হিসেবে অবসর নেবার পর সিভিল সার্ভিসে ঢুকেন। তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রকারী তিন জনের অন্যতম ছিলেন। বাকি দু'জন জেনারেল আইয়ূব খান ও গোলাম মুহাম্মদ। ১৯৫৮ সালে ৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর জেনারেল থাকা অবস্থায় সেনাপতি আইয়ূব খানের সাথে ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোয খান নূন সরকারকে উৎখাত করে সামরিক শাসন জারি করেন। ২৭ অক্টোবর আইয়ূব খান ইস্কান্দার মির্জাকে দেশান্তরিত করে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের পদ দখল করেন।

এনএম খান ত্রিশের দশকের শেষ দিকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার এসডিও ছিলেন। জাঁদরেল অফিসার হিসেবে দাপটের সাথে তিনি শাসন করেছেন। লোকটি বড়ই করিতকর্মা ছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার একাংশে সেঁচের অভাবে ফসল হতো না। তিনি স্বেচ্ছাসেবার ডাক দিয়ে মহকুমার প্রতিটি বাড়ি থেকে একজন করে লোককে খাল কাটার কাজে লাগিয়ে তিতাস নদী থেকে পানি নেবার ব্যবস্থা করেন।

১৯৩৬ সালের কথা। আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। আমাদের বাড়ি থেকে আব্বা গেলেন। ফিরে এসে আব্বা বললেন যে, মাটি কাটার জন্য আব্বার মতো পোশাক ও বয়সের লোকদেরকে বাধ্য করা হয়নি। হাজার হাজার মানুষ স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে কয়েকদিনের মধ্যে বিরাট খাল খনন করে ফেলে। এসডিও তাদেরকে শুধু সামান্য খাবার দিয়ে এতো বিরাট কাজ করিয়ে নিতে সক্ষম হলেন।

প্রতিবছর কচুরিপানা বর্ষাকালে জমির ফসল নষ্ট করতো। এনএম খান ফরমান জারি করলেন, সবাইকে কচুরিপানা ধ্বংস করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। যার বাড়ির সামনে কচুরিপানা পাওয়া যাবে তার রক্ষা নেই। আমাদের বাড়ির সামনের ডোবার কচুরিপানা উঠানো হলো। নদীতে যতো নৌকা চলে সব মাঝি ও নৌকার আরোহীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, চলার সময় নৌকা থেকে নাগাল পাওয়া যায় এমন কচুরিপানা নৌকায় তুলে নিয়ে শুকনায় ফেলতে হবে। এ নির্দেশ সারা মহকুমায় পালন করে জনগণ চরম আনুগত্যের পরিচয় দিলো। এমন সফল শাসক অতুলনীয়।

গল্প শুনেছি যে, এক ডিঙ্গি নৌকার মাঝি একটি বড় নৌকার মাঝিকে চিৎকার করে বলছে, "হে মাঝি! তোমার নৌকার পাশের কচুরিপানা না তুলেই কোন্ সাহসে তুমি চলে যাচ্ছো? আমাদের এসডিও সাহেবের হুকুম অমান্য করছো। ঘটনাক্রমে ঐ নৌকায় এনএম খান স্বয়ং ছিলেন। তিনি নৌকা থামিয়ে ঐ ডিঙ্গি নৌকার মাঝিকে ডেকে পুরস্কৃত করলেন।

আমার স্পষ্ট মনে আছে। একবার এনএম খান বিরাট এক নৌকায় আমাদের গ্রামে এলেন। তখন বর্ষার পানি কমে গেছে। গণ্যমান্য লোকদেরকে ডাকলেন। আব্বাও গেলেন। আব্বার সাথে আমিও গেলাম। এনএম খান নৌকা থেকে নামলেন। একটা বড় খালের পাশেই নৌকাটি বাঁধা। নিচে নেমে গণ্যমান্য লোকদের সাথে বাংলায় কথা বললেন। হঠাৎ তিনি তাকিয়ে দেখেন, খালের পানিতে কচুরিপানা। যেসব লোক তামাশা দেখতে এসেছে, সবাইকে তিনি ঐ দিকে ইশারা করে বললেন, কচুরিপানা উঠাও। ইউনিয়নের দফাদারও লোকদেরকে কচুরিপানা উঠাতে তাগিদ দিলো। তিনি দফাদারের হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে দফাদারের পায়ের গোছায় জোরে আঘাত করে বললেন, "তুমি যাও না কেনো?" লাঠির আঘাতে বেচারার পায়ে রক্ত বের হয়ে গেলো। তবু সে কচুরিপানা তুলতে গেলো। আমি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আব্বার হাত ধরে বাঁচার চেষ্টা করলাম। এনএম খান এমন পাগলা অফিসারই ছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরের বিখ্যাত নিয়াজ মুহাম্মদ স্কুল ও নিয়াজ মুহাম্মদ মাঠ সেই এসডিওরই স্মৃতি বহন করছে।

এনএম খানের শাসনকাল

ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর হলেও আসল শাসকের ভূমিকা এনএম খানই পালন করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তিনি দাপটের সাথে শাসন করতে লাগলেন। তার দু'দফা কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি দফার উদ্দেশ্য ছিলো, গোটা যুব শক্তিকে খেলাধুলা, নাচগান ও তথাকথিত আর্ট কালচারে মগ্ন করে তাদেরকে রাজনীতি বিমুখ করা। অপর দফাটি ছিলো, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনীতি ও ভাষা-আন্দোলনে জড়িত শিক্ষকদের বিতাড়িত করা।

প্রথম দফার কর্মসূচি

স্বৈরশাসকদের নিকট যুব ও ছাত্র সমাজই বড় সমস্যা। এরাই আন্দোলন করে ময়দান গরম করে তোলে। রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বিরত রাখার জন্য যুবক-যুবতী ও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এমন ধরনের বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রাখা প্রয়োজন মনে করা হলো, যা তাদের চরিত্র ধ্বংস করলেও শাসকদের কিছুই আসে যায় না।

এ কর্মসূচি অনুযায়ী রাজধানীসহ দেশের সর্বত্র আর্ট কাউন্সিল করা হলো। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এসডিওগণ প্রশাসন কর্মকর্তা হিসেবে জেলা ও মহকুমায় এর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। উদ্দেশ্য হলো, তারা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে যুব ও ছাত্র সমাজকে মাতিয়ে রাখবে, যাতে তাদের মগজে

রাজনীতি ঢুকবার ফাঁকই না পায়।

এরই অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ইন্দোনেশিয়া থেকে ৬০ জন সুন্দরী নর্তকী আমদানি করে রাজধানী ঢাকাকে আনন্দে ভাসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হলো। কর্তৃপক্ষ এ মহাআনন্দ থেকে জেলা ও মহকুমা শহরকেও বঞ্চিত করলো না। ১০/১২ জনের গ্রুপ বানিয়ে এ ৬০ জন নর্তকীকে জেলা ও মহকুমায় পাঠানো হলো। রংপুরও এ সৌভাগ্যের (!) ভাগী হলো।

একদিন বিকেলে কলেজ ক্যাম্পাসস্থ আমার বাসায় বৈঠকখানা থেকে দেখতে পেলাম যে, আরবীর অধ্যাপকসহ কয়েকজন আকর্ষণীয় পোশাকে সজ্জিত হয়ে শহরের দিকে এগুচ্ছেন। কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে দ্রুত কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এতো সেজেগুঁজে কোথায় যাচ্ছেন?" একজন বললেন, এ কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না। আর একজন বললেন, দাওয়াতে যাচ্ছি।

সঠিক খবর জানতে পারলাম না। আমার পাশের বাসায় ফার্সি ও উর্দুর অধ্যাপক সৈয়দ ইসহাক আহমদের কাছে গেলাম। তিনি বৈঠকখানা থেকে তাদের যাওয়া ও তাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্য করছিলেন। আমাকে দেখেই মুচকি হেসে বললেন, "জানেন তারা কোথায় যাচ্ছেন?" বললাম, "তারা আমাকে কিছুতেই বললেন না বলেই তো আপনার কাছে জানতে এলাম।"

তিনি বললেন, "আজ টাউন হলে ইন্দোনেশিয়ার নর্তকীদের অনুষ্ঠান হচ্ছে। কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট হিসেবে কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট (সেকালে ডিসি বলা হতো না, ডিএম বলা হতো) সাহেব অধ্যাপকদের জন্য বিনামূল্যে টিকেট পাঠিয়েছেন। অধ্যাপকদের সম্মানের খাতিরে সর্বোচ্চ মূল্যের টিকেটই পাঠানো হয়েছে। প্রিন্সিপাল সাহেব আমাকেও দিতে চেয়েছিলেন। আমি নিতে রাজি হইনি।" নিম্নমূল্যের আসনে অধ্যাপকরা যাবেন না। আর উচ্চ মূল্যের টিকেট কিনতে অক্ষম বলেই বিনামূল্যে টিকেট পাঠালেন। আমি বললাম, "প্রিন্সিপাল সাহেব তো আমাকে টিকেট দেননি। ব্যাপার কি?" তিনি বললেন, "আপনি জানলে হয়তো এ টিকেট বিলি না করার জন্য তাকে চাপ দেবেন।" অন্তর থেকে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বললাম, "দীনের দাওয়াত এমনই এক মযবুত রক্ষাকবচ যে, দায়ী ইলাল্লাহর নিকট বাতিলের পক্ষ থেকে দাওয়াত দিতে সাহসই পায় না।" পরদিন টিচার্স কমনরুমে আরবীর অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করলাম, "কি মাওলানা সাহেব! শেষ পর্যন্ত আপনিও নাচ দেখে এলেন?" লজ্জিত হয়ে আমার দু'হাত ধরে বললেন, "অমুক অমুকে মিলে আমাকে ধরে নিয়ে গেছে।" দুর্বল ঈমানের লোকেরা এ জাতীয় জওয়াবই দিয়ে থাকে।

দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি

১৯৫৫ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে জানা গেলো যে, ডিএম সাহেব (কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট) বাংলার অধ্যাপক জমীরুদ্দীন আহমদ ও উর্দু-ফার্সির

অধ্যাপক সৈয়দ ইসহাক আহমদকে অধ্যাপনার পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেছেন। জমীরুদ্দীন সাহেব তো '৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অপরাধে আমার সাথেই কারাভোগ করেন। অধ্যাপক ইসহাক ও জমীরুদ্দীন উভয়ই জামায়াতে ইসলামীর কলেজ ইউনিটের কর্মী। তারা আর রাজনীতি করবেন না বলে লিখিত মুচলেকা দিতে রাজি না হওয়ায় তাদেরকে রিজাইন দিতে বাধ্য করা হয়। ইসলামের ইতিহাসের অধ্যাপক গোলাম রাসূল ও অংকের অধ্যাপক আবুল খায়ের কলেজ ইউনিটের কর্মী ছিলেন বলেই তাদেরকে মুচলেকা দিতে চাপ দিলে তারা তা দিয়ে চাকরি বহাল রাখলেন। অধ্যাপক গোলাম রাসূল পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ডিএম সাহেব আমাকে তাঁর বাসায় সাক্ষাতের জন্য খবর পাঠালেন। তাঁর ছেলে বিএ ক্লাসে আমার ছাত্র। সেই জানালো, "আব্বা আপনার সাথে জরুরি আলোচনা করতে চান। তাই বাসায় যাবার জন্য দাওয়াত দিলেন।" ডিএম জনাব ফজলুর রহমান পশ্চিমবঙ্গের লোক। ব্যক্তিগতভাবে ভালো মানুষ এবং খুবই ভদ্র। প্রশাসক হিসেবে দাপট দেখাতেন না। আমি তাঁর ছেলের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের বই পাঠাতাম। তিনি তা পড়ে ছেলের হাতেই ফেরত পাঠাতেন এবং আরো বই চাইতেন। শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে কলেজ গভর্নিং বডির বৈঠকে তিনি আমার মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। আমাকে সম্মান দেখাতেন বলে অনুভব করতাম। খোলা মনেই তাঁর বাসায় গেলাম।

৬৪.

দ্বিতীয় দফা গ্রেপ্তার

ডিএম সাহেবের বাসায় যথাসময়ে হাজির হলাম। তিনি বৈঠকখানার দরজায়ই আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে হাত ধরে ভেতরে খাস কামরায় নিয়ে গেলেন। আমাকে সম্মানের সাথেই বসতে বলে নিজেও বসলেন। মিনিট দেড়েক নিচের দিকে চেয়ে রইলেন। মনে হয়, কিভাবে কথা শুরু করবেন তা ভাবছেন। কথা শুরু করলেন। কিন্তু আমার দিকে তাকাতে যেনো সংকোচবোধ করছেন। বললেন, "আমার ছেলের প্রিয় শিক্ষক হিসেবে আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে আমার নিকট আপনার মর্যাদা রয়েছে। আদর্শের পতাকাবাহী হিসেবে আপনাকে আমি ভালোবাসি। এতোসব সত্ত্বেও আপনাকে এমন কথা আমাকে বলতে হচ্ছে, যা আমার বিবেক-বিরোধী।

"বর্তমান সরকার প্রত্যেক জেলায় ৩ সদস্যবিশিষ্ট স্ক্রিনিং কমিটি করেছে। রংপুরে কমিটির চেয়ারম্যান ডিএম হিসেবে আমি। অপর দু'জন হলেন, এসপি ও সরকারি উকিল। কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনীতির সাথে জড়িত শিক্ষকদের বহিষ্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। রাজনীতির সাথে জড়িত থাকবে না বলে মুচলেকা দিলে তাদেরকে পরীক্ষামূলকভাবে এক বছরের সময় দেওয়া হবে। মুচলেকা না দিলে তাদের নিকট থেকে ইস্তফানামা

নিতে হবে। এ পদ্ধতি অনুযায়ী কলেজের অধ্যাপকদের দু'জন মুচলেকা দিলেন ও দু'জন রিজাইন করলেন। আপনি কি সিদ্ধান্ত নেবেন সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্যই এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে হলো।"

তিনি আরও বললেন, "রংপুর জেলার সকল স্কুল ও কলেজের অবাঞ্ছিত শিক্ষকদের বিরাট তালিকা স্ক্রিনিং কমিটি তৈরি করেছে। 'ইউ টপ দ্যা লিস্ট'। আমি আপনাকে আমার অফিসে নিয়ে আলোচনা করা পছন্দ করিনি।"

আমি ধীরে সুস্থে বললাম, "এ বিষয়ে আমার কিছুই করণীয় আছে বলে আমি মনে করি না। মুচলেকার তো প্রশ্নই ওঠে না। যে কারণে রিজাইন দেবার দাবি করা হচ্ছে, সে কারণকে আমি বৈধ মনে করি না। যদি একজন ছাত্রও অভিযোগ করে যে, আমি যোগ্য শিক্ষক নই, তাহলে আমি অবশ্যই রিজাইন দেবো। সরকারের অন্যায় চাপে আমি কিছুতেই নতি স্বীকার করবো না।"

তিনি বললেন, "আপনি এ রকম জওয়াব দেবেন বলেই আমার আশঙ্কা ছিলো। তবু সরকারের বিধি পালনের প্রয়োজনে আপনার সাথে আলোচনা করতে হলো।"

সসম্মানে বাড়ির গেট পর্যন্ত এসে আমাকে বিদায় জানালেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে। ৫২ সালে আমি ও অধ্যাপক জমীরুদ্দীন রংপুর শহরে গ্রেপ্তার হই। কলেজ ক্যাম্পাস থেকে ইতঃপূর্বে কাউকে কখনো গ্রেপ্তার করা হয়নি। ব্রিটিশ আমলে এক অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে প্রিন্সিপালের নিকট অনুমতি চাওয়া হলে তিনি অনুমতি দেননি।

আমি ঐ সাক্ষাতের পর কলেজ কম্পাউন্ড থেকে ইচ্ছে করেই কয়েকদিন বের হইনি। কলেজ থেকে গ্রেপ্তার করার অনুমতি প্রিন্সিপাল সাহেব দেন কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন মনে করলাম। প্রিন্সিপাল সাহেব বিহার থেকে হিজরত করে এসেছেন। তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করায় তাঁকে গভর্নিং বডি গুরুত্বের সাথেই নিয়োগ দিয়েছিলো। ব্যক্তিগতভাবে খুবই অমায়িক ও ভদ্র ছিলেন। কিন্তু প্রশাসনে দুর্বল বলেই দেখা গেছে।

৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৫) সকাল ৭ টায় কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থিত আমার বাসা থেকেই পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করলো। প্রিন্সিপালের অনুমতি চেয়েছিলো কিনা তাও জানি না। আমাকে তথাকথিত জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানালো। রংপুর জেলের জেলার সাহেব জনাব ওয়াহিদুজ্জামান জেল অফিসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। অধ্যাপক জমীরউদ্দীনের বন্ধু হিসেবে পূর্বপরিচিত হওয়া ছাড়াও '৫২ সালে এ জেলে একমাস তাঁর তত্ত্বাবধানেই ছিলাম। '৫২ সালে গ্রেপ্তারের পূর্বে ডিভিশনের ব্যবস্থা না করায় জেলার সাহেব বিব্রত হয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবার ডিভিশন নিয়েই জেলে প্রবেশ করার সৌভাগ্য হলো।

জেলের পূর্ব-অভিজ্ঞতার কারণে একটি সুটকেসে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং কিছু বই নিলাম। জেল গেটে স্পেশাল বেঞ্চের পুলিশ সুটকেস খুলে বইগুলো পৃথক করে

বললো যে, সেন্সর করে পরে দেওয়া হবে। আমি তাফহীমুল কুরআনের ১ম খণ্ড (উর্দু) পুলিশের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললাম, "আমার সাথেই এ তাফসীর জেলে ঢুকবে। অন্য বই নিয়ে যান। বই কতদিন পর ফেরত দেবেন জানি না। এ কয়দিন আমি অধ্যয়ন ছাড়া সময় কাটাবো কেমন করে? বিশেষ করে এ তাফসীর রোজই আমাকে দীর্ঘ সময় অধ্যয়ন করতে হয়। শক্তিপ্রয়োগ করে যদি আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চান তাহলে আলাদা কথা। আমি স্বেচ্ছায় এটা আপনাদের হাতে তুলে দেবো না।"

জেলার সাহেব ও পুলিশ উভয়েই বিব্রত বোধ করলেন। জেলার সাহেব বললেন, কুরআন শরীফ কি সেন্সর ছাড়া দেওয়া যায় না? পুলিশ বললো, কার লেখা তাফসীর আমরা জানি না।

আমি বললাম, "মাওলানা মওদূদীর লেখা তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন'। উর্দুতে লেখা তাফসীর সেন্সর করার লোক আছে আপনাদের কাছে?"

শেষ পর্যন্ত তাফসীরসহই জেলে প্রবেশ করলাম। কয়েকদিন পর এক পুলিশ অফিসার সেন্সর করা বইগুলোসহ জেলে আমার কামরায় এসে দিয়ে গেলেন এবং তাফসীরে লাগাবার জন্য সীল সাথে নিয়ে এলেন। তাফসীরের শেষ পাতায় সীল মেরে তিনি দস্তখত করলেন। বিনা সেন্সরে কোন বই জেলে আনতে দেওয়া হয় না। এ মহান নিয়ম পালনের প্রয়োজনে সীলকে এবং দস্তখতকারী অফিসারকে নিয়ম ভঙ্গ করে জেলে আসতে হলো। গোটা ব্যাপারটাই আমার নিকট বেশ কৌতুকপূর্ণ মনে হলো।

আমার গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়া

আমি সকাল ৭টায় গ্রেপ্তার হলাম। খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। ১০টায় ক্লাস শুরু হবার কথা। ছেলেরা ক্লাসে না গিয়ে বাইরে সবাই জমায়েত হলো। ছাত্রনেতারা প্রথমে আপত্তি তুললো প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে। পুলিশকে কেনো ক্যাম্পাসে ঢুকার অনুমতি দেওয়া হলো? প্রিন্সিপাল সাহেব জানালেন যে, তার নিকট অনুমতি চাওয়া হয়নি। প্রিন্সিপাল সাহেবের পক্ষ থেকে দু'জন অধ্যাপক ছাত্রদেরকে আশ্বাস দিলো যে, এক মাসের জন্য আটকাদেশ দেওয়া হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাস পার হয়ে গেলে আশা করা যায় যে, মুক্ত হয়ে আসবেন। '৫২ সালেও এক মাসই জেলে ছিলেন। ছাত্ররা মোটামুটি আশ্বস্ত হয়ে ক্লাসে গেলো।

ঐদিনই রাতে গভর্নিং বডির বৈঠক হলো। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, অধ্যাপক সাহেব বারবার গ্রেপ্তার হন বলে ছাত্রদের পড়ার বিরাট ক্ষতি হয়। তাই তাকে এ কলেজের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো।

বেচারা ডিএম সাহেব ধারণা করতে পারেননি যে, এর প্রতিক্রিয়া কত ভয়াবহ হতে পারে। কলেজ থেকে পলিটিক্যাল এ্যালিমেন্টদেরকে বহিষ্কার করার সরকারি নির্দেশ পালনের তাগিদে তিনি গভর্নিং বডির উপর চাপ সৃষ্টি করে এ সিদ্ধান্ত করালেন।

আমি ৬ তারিখ গ্রেপ্তার হলাম। ৭ তারিখে ছাত্রদেরকে কোন রকমে ক্লাস করতে রাজি করা গেলো। ৮ তারিখে ছাত্ররা রীতিমতো মারমুখী হয়ে হরতাল করলো এবং আমাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করার দাবি জানালো। হরতাল ঠেকাবার জন্য পুলিশ ডাকা হলো। নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হলো। পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ হলো। বিকেলে জানলাম যে, ৪/৫ জন ছাত্র গ্রেপ্তার হয়ে জেলে এসেছে। আমার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ ছিলো না। জেল পুলিশ ও কয়েদীদের মুখে এ খবর জানলাম। পরদিন আরও জোরদার ও উচ্ছৃঙ্খল হরতাল হলো। আরও কতক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করার খবর পেলাম। তৃতীয় দিনেও হরতাল বন্ধ করতে না পেরে কলেজের গভর্নিং বডি রাতে ইমারজেন্সি বৈঠক করে তিন মাসের জন্য কলেজ ছুটি ঘোষণা করলো। রমযানের ছুটি এক মাস এবং গ্রীষ্মের ছুটি অগ্রিম দু'মাস মিলিয়ে দীর্ঘ ছুটি দিয়ে কর্তৃপক্ষ হরতালের মোকাবিলা করতে বাধ্য হলো। হোস্টেলের ছেলেদেরকে বাড়ি চলে যেতে বাধ্য করা হলো এবং পরদিন কলেজে প্রবেশের সকল পথ পুলিশ দিয়ে অবরুদ্ধ করা হলো, যাতে কোন ছাত্র বাইরে থেকে কলেজে ঢুকতে না পারে।

এ কয়দিনে ২১ জন ছাত্রকে রংপুর জেলে আটক করা হয়েছে বলে জানা গেলো। এ নিয়ে জেলের ভেতরে রাজবন্দি, কয়েদী ও পুলিশের মধ্যে ব্যাপক চর্চা হতে লাগলো। কৌতুক করে আমি জেলার সাহেবকে বললাম, দেখুন! এ ছাত্ররা আমার কাছে পড়তে চায়। আমাকে কলেজে যেতে দেওয়া হচ্ছে না বলে ওরা এখানে চলে এসেছে। ওদেরকে নিয়ে ক্লাস করার সুযোগ দিন। জেলার সাহেব মুচকি হেসে চলে গেলেন। হরতালের সুযোগ না থাকায় কলেজ শান্ত। কয়েকদিন পর ছাত্রদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ছাত্রদের আন্দোলনে আমার প্রতিক্রিয়া

শিক্ষকের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান অর্জন হলো ছাত্রদের ভালোবাসা পাওয়া। আমাকে চাকরিচ্যুত করায় ছাত্ররা যে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেছে, তাতে কারাভোগের সব বেদনা দূর হয়ে গেলো।

ছাত্রদের তিনটি দাবি ছিলো। আমাকে জেল থেকে মুক্তি দিতে হবে, চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে এবং দুর্বল প্রিন্সিপালকে অপসারণ করতে হবে। নিরাপত্তা আইনে প্রথম এক মাসের আটকাদেশ দেওয়া হয়। পরে প্রয়োজনে ১, ২ বা ৩ মাসের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। আমি ভাবলাম যে, যদি এক মাস পর আবার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে হাইকোর্টে রীট পিটিশন করতে হবে। আমার ধারণা ছিলো যে, ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে যেসব অনুষ্ঠান, বিক্ষোভ ও মিছিল হবে তাতে যেনো আমি যোগ দিতে না পারি, সে জন্যই আমাকে আটক করা হয়েছে। আমাকে চাকরিচ্যুত করায় মনে করলাম যে, এক মাস পর হয়তো আমাকে আর আটক রাখা প্রয়োজন মনে করবে না।

মাস শেষ হবার আগের দিন আমার আটকাদেশ আরও তিন মাস বৃদ্ধি করার নোটিশ পেলাম। সপ্তাহখানেক আগেও এ নোটিশ দিতে পারতো। কিন্তু নোটিশটা এমন সময় দেওয়াই তাদের নীতি, যখন বন্দি মুক্তির আশায় উদগ্রীব। মানসিক দিক দিয়ে একটু বেশি কষ্ট দিতে পারলেই কর্তৃপক্ষের সুখ। মৌলিক মানবাধিকার বিরোধী এ আইনের বলে কত লোককে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এভাবে বিনাবিচারে আটক রাখা হচ্ছে। এ কালাকানুন ব্রিটিশ-শাসনের গোলামি যুগ থেকে চলে আসছে। হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা করে এক মাস ছাব্বিশ দিন পর আদালতের নির্দেশে মুক্তি পাই।

ছাত্রদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতার কারণ

কয়েকটি কারণে ছাত্রদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। কলেজ ছাত্র সংসদের সভাপতি হলেন প্রিন্সিপাল। শিক্ষকদের একজনকে তাঁর পক্ষ থেকে সংসদ পরিচালনার উদ্দেশ্যে দায়িত্ব দেওয়া থাকে। রংপুর কলেজে যে ক'বছর ছিলাম এ দায়িত্ব আমার উপরই ন্যস্ত ছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে হল ও বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের জিএস হিসেবে অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ছাত্র সংসদে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রদেরকে পাঠ্যসূচি বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে সক্রিয় রাখার চেষ্টা করতাম। এর ফলে বহির্মুখী সকল ছাত্রের সাথেই আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

যোহরের নামাযের বিরতির সময় ১৫ মিনিট নামায-ঘরে ধারাবাহিকভাবে ছাত্রদেরকে ইসলামী জ্ঞানদানের চেষ্টা করতাম। যারা আমার সরাসরি ছাত্র নয় তারাও এর মাধ্যমে ছাত্র হয়ে যেতো এবং তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হতো।

বিএ ক্লাসে যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র এবং আইএতে যারা সিভিক্সের ছাত্র তারা আমার সরাসরি ছাত্র ছিলো। তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া তো স্বাভাবিকই ছিলো।

এ সব কারণে আমাকে চাকরিচ্যুত করায় ছাত্ররা চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে হরতাল করে।

আমার সিদ্ধান্ত

জেলেই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আর চাকরি করবো না। বাকি জীবন ইসলামী আন্দোলনেই নিয়োগ করবো। জামায়াতে যোগদানের কয়েক মাস পরই রমযান মাসের ছুটিতে ঢাকায় ২০৫ নং নওয়াবপুর রোডের অফিসে ১৫ দিনব্যাপী এক বেলা ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগদান করি। ট্রেনিং সমাপ্ত হবার পরই আমি রুকন হবার জন্য ফরম পূরণ করি। তখনই প্রাদেশিক জামায়াতের আমীর চৌধুরী আলী আহমদ খান আমাকে চাকরি ছেড়ে জামায়াতের হোল টাইম ওয়ার্কার হবার পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, "আপনার লেবেলের বাংলাভাষী লোকদের মধ্যে দাওয়াত সম্প্রসারণের জন্য এটা খুবই জরুরি।"

এ প্রস্তাব আমার আব্বা ও শ্বশুর সমর্থন না করায় তা বাস্তবায়ন করা যায়নি।

আমার ইচ্ছা থাকলেও মুরুব্বীদেরকে অগ্রাহ্য করা সঠিক মনে করিনি। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ যখন আমাকে চাকরি থেকে সরিয়ে দিলো তখন মুরুব্বীদের আপত্তির সুযোগ রইলো না।

যদিও আমি ভাষা-আন্দোলনের আসামি হিসেবেই কারাভোগ করেছিলাম, তবু '৫২ সালের জেল থেকে এবারের জেলে অনেক পার্থক্য বোধ করলাম। ঐবার জেল থেকে বের হবার জন্য মন ছটফট করতো। কিন্তু এবার জেলের অবকাশটা খুব মূল্যবান মনে হলো। তাফহীমুল কুরআন ছাড়াও মাওলানা মওদূদীর অন্যান্য বেশ কয়টি মৌলিক বই পড়ে ইসলামী আন্দোলনের রসদ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধিরও সুযোগ পেলাম।

শিক্ষকতার পেশা ভেবেচিন্তেই গ্রহণ করেছিলাম। আগেও বলেছি, এটা আমার শুধু পেশা নয়, নেশাও। কারণ নেশায় পরিণত না হলে পেশায় সত্যিকার সাফল্য আসে না। এ পেশা ছেড়ে দেবার পর অন্য পেশা গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। তাহলে জীবিকার উপায় কি হবে? আদর্শিক আন্দোলনে কিছু লোককে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করতেই হয়। বেঁচে থাকার প্রয়োজন পূরণ করতে যে পরিমাণ টাকা না হলেই নয়, তা আন্দোলনের তহবিল থেকে ভাতা হিসেবে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। আমি আমার সময় ও শ্রমের সবটুকু ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আল্লাহর রহমতে আমার বড় দু'ছেলে বিদেশে উপার্জনে সক্ষম হওয়ায় ১৯৮৩ বা '৮৪ সালেই সংগঠন থেকে ভাতা নেওয়া বন্ধ করে দেই। ছেলেরা তাদের মাকে তখন থেকে সংসারের প্রয়োজনীয় খরচের টাকা পাঠায়। তিনি যোগ্যতার সাথেই সংসার পরিচালনা করছেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবার কারণে আমি নিশ্চিন্তে ইসলামী আন্দোলনে সার্বক্ষণিকভাবে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছি। আল্লাহর এ বিরাট মেহেরবানীর শুকরিয়া আদায় করা অসম্ভব। ছেলেরাও খুশি মনে এ দায়িত্ব পালন করে ইসলামী আন্দোলনে যে অবদান রাখছে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এর উপযুক্ত বদলা দান করুন—এ দোয়াই করি।

রংপুর জেলে বামপন্থী নেতাদের তৎপরতা

ব্রিটিশ আমল থেকেই নিরাপত্তা বন্দি হিসেবে আটক বিখ্যাত কমিউনিস্ট মনি কৃষ্ণ সেন তখন রংপুর জেলে ছিলেন। রেল শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের নেতা শামসুল হকও তখন সেখানে। নীলফামারীর স্কুল শিক্ষক নাযেম সাহেবও (পুরো নাম মনে নেই) অন্যতম বামপন্থী নেতা হিসেবে আটক ছিলেন। তাদের মধ্যে নেতাসুলভ গুণাবলি লক্ষ্য করেছি। রাজনৈতিক বন্দিরাই তাদের আসল টার্গেট। আমি জানতাম এ দেশে মুসলিম লীগ শাসনামলে সরকার বিরোধী আন্দোলনের কারণে যাদেরকে বিনাবিচারে আটক রাখা হতো, তাদেরকে এ জাতীয় বামপন্থী বন্দিরা

কমিউনিস্ট বানাবার সুযোগ গ্রহণ করতো। ঐ সময় জেলখানাগুলো কমিউনিস্টদের শিক্ষালয়ে পরিণত হয়।

জেলে আদর্শ নিরপেক্ষ বন্দিদেরকে সমাজবাদী আদর্শের দীক্ষা সহজেই দেওয়া সম্ভব ছিলো। পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়ার জনাব মুহিউদ্দীন বাম নেতা ও আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতা ছিলেন। আমি তাঁর সম্পর্কে বরিশালের ইসলামপন্থী নেতা জনাব শাহজাহান চৌধুরীর নিকট শুনেছিলাম যে, জনাব মুহিউদ্দীনকে বরিশাল জেলে যখন কমিউনিস্টদের সাথে একই ওয়ার্ডে থাকতে দেওয়া হয় তখন তিনি প্রচণ্ড আপত্তি জানালে অন্যত্র রাখা হয়। সে মুহিউদ্দীন যখন জেল থেকে বের হয়ে আসেন তখন তিনি পাকা কমিউনিস্ট।

রংপুর জেলে ঐ তিনজনের সাথে তাদেরই উদ্যোগে আমার সাথে দীর্ঘ আলোচনা হতো। তারা খুবই যোগ্যতার সাথে আমার নিকট তাদের দাওয়াত পেশ করতেন। পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী অর্থনীতির বিশ্লেষণ করে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর বলিষ্ঠ রচনা অধ্যয়নের তখনো আমার সুযোগ হয়নি। তাই তাদেরকে ইসলামী অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার দাওয়াত দেবার যোগ্যতা আমার ছিলো না। তবে তাদেরকে এক কথায়ই আমি কাবু করতাম। "কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের গন্ধও নেই। সেখানে একদলীয় স্বৈরশাসন এবং শাসকরা রাষ্ট্রের নামে জাতীয় সম্পদের একচেটিয়া মালিক। ব্যক্তি-মালিকানা খতম করে রাষ্ট্রীয় মালিকানার দোহাই দিয়ে সরকার রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে অর্থনৈতিক ক্ষমতাও কুক্ষিগত করে জনগণকে সরকারের দাসে পরিণত করা হয়েছে।"

লক্ষ্য করলাম যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে তারা আগ্রহী নয়। "ব্যাক্তি মালিকানাই শোষণের মূল" এ ভ্রান্ত মতবাদে তারা এতো দৃঢ় বিশ্বাসী যে, সরকারি শোষণ ও স্বৈরশাসন তাদের নিকট একেবারেই নগণ্য। ঐ সময় সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের জয়জয়কার চলছে। তারা ঐ জয়েরই নেশায় বিভোর। সোভিয়েত রাশিয়া তাদের আদর্শ এবং এ দেশেও একদিন সমাজতন্ত্র কায়েম হবে এ বিশ্বাসে তারা অটল। মাত্র কয়েক দশক পরই তাদের মহান আদর্শ নিজ পিতৃভূমি রাশিয়াতেই আত্মহত্যা করবে সে কথা ভাবার মতো পরিবেশ তখনো সৃষ্টি হয়নি।

৬৫.

মার্চ মাসে জামায়াতের রুকন হলাম

১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের কয়েক মাস পর রমযানের ছুটিতে ঢাকায় ১৫ দিনব্যাপী এক ট্রেনিং প্রোগ্রামের শেষে রুকনিয়াতের দরখাস্তের ফরম পূরণ করলাম। তখনো রুকন বানাবার ইখতিয়ার সংগঠনের পূর্ব-পাকিস্তান শাখাকে দেওয়া হয়নি। আমার দরখাস্ত পূর্ব-পাকিস্তানের আমীরের হাতে দেওয়ার পর স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই তা জামায়াতের কেন্দ্রীয় দফতর লাহোর পাঠানো হয়।

জনাব আসাদ গিলানী রাজশাহী বিভাগের সংগঠক হিসেবে সৈয়দপুরে অবস্থান করছিলেন। আমি জামায়াতে যোগদানের কিছুদিন পর তাঁকে সপরিবারে রংপুরে অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। রংপুর কেরামতিয়া মসজিদে জামায়াতের শহর ইউনিটের কেন্দ্র ছিলো। এর কাছাকাছি একটি বাসা ভাড়া করা হয়। আমার কারণেই তিনি রংপুরে স্থানান্তরিত হলেন। অথচ দু'মাসের মধ্যেই আমি গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম।

আগেই বলেছি যে, চৌধুরী আলী আহমদ খান ও আসাদ গিলানী আল্লামা ইকবালের শাগরেদ ছিলেন। তাঁরা দু'জনই জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। আসাদ সাহেব ৮০-এর দশকে জামায়াতে ইসলামীর উপর থিসিস লিখে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি হাসিল করেন।

আমার গ্রেপ্তারের পর প্রতি ১৫ দিন পর পর গিলানী সাহেব জেলে আমার সাথে দেখা করতেন। গ্রেপ্তার হবার সময় আমার পরিবার রংপুরে ছিলো না। শুধু আমার কনিষ্ঠ ভাই মাহদী বাসায় ছিলো। সে রংপুর কলেজে পড়তো। আমার গ্রেপ্তারের পর সে-ই বাসার আসবাবপত্র ঢাকা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে।

সম্ভবত মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে গিলানী সাহেব জেলে সাক্ষাৎ করে জানালেন, লাহোর থেকে খবর এসেছে যে, আমার রুকনিয়াত মঞ্জুর হয়েছে। তিনি জেলেই আমার শপথ নিলেন। রংপুরে সর্বমহলেই আমার পরিচিতি ছিলো নানা কারণে। ৫২-এর ভাষা-আন্দোলন, তাবলীগ জামায়াত, তমদ্দুন মজলিস, কলেজের অধ্যাপক, গ্রেপ্তার ও কলেজে আমার পক্ষে ছাত্রদের আন্দোলন ইত্যাদি কারণেই আমার খবরাখবর নিয়ে আলোচনা হতো বিভিন্ন মহলে।

রাজনৈতিক মহলে আমার রুকন হবার খবরটা নিয়ে এভাবে চর্চা হয়েছে যে, জামায়াতে ইসলামী এমন একটি দল, যার পূর্ণাঙ্গ সদস্য পদ হাসিল করতে হলে জেলে যেতে হয়। যা হোক, রুকন হবার পর জেলের বাকি দিনগুলো আরও ভালোভাবেই কাটলো নতুন জযবা নিয়ে। রংপুরে আমিই প্রথম রুকন হলাম।

জেল থেকে মুক্তি

সম্ভবত ২রা এপ্রিল সকাল দশটায় জেলার সাহেব জানালেন যে, হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক আমাকে মুক্তি দেবার চিঠি জেলে পৌঁছে গেছে। কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আদেশ পাঠিয়েছেন। এ খবর পেয়ে আমার জেলের সংসার গুছিয়ে নিলাম, যাতে নিতে আসলে সাথে সাথেই রওনা দিতে পারি।

আরও একটি কাজ করলাম। যারা আমার পক্ষে এমন তীব্র আন্দোলন করলো তাদেরকে সম্বোধন করে একটা খসড়া তৈরি করলাম। বের হবার পর তা ছাপিয়ে বিলি করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এ খসড়ায় তাদের তিন দফা দাবি সম্পর্কে আমার মতামত ও পরামর্শ লিখেছি, যাতে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

আমার মুক্তির দাবি তো পূরণ হয়েই গেলো। চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি সম্পর্কে লিখলাম যে, এ দাবির আর প্রয়োজন নেই। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আর চাকরি

করবো না। তৃতীয় দাবি ছিলো, প্রিন্সিপালের অপসারণ। আমি খসড়ায় তাকে পরামর্শ দিয়েছি যে, তিনি সসম্মানে পদত্যাগ করে চলে গেলেই ভালো হয়। কলেজ খুলবার পর ছাত্ররা এ নিয়ে আবার আন্দোলন করলে তার জন্য ওটা অপমানজনকই হবে।

আমার ধারণা ছিলো যে, আমার মুক্তির খবর বাইরে পৌঁছতে পারে এবং জেল গেটে কিছু লোক উপস্থিত থাকতে পারে। কিন্তু বিকেলে যখন মুক্তি পেলাম তখন জেলারের অফিসেই জানতে পারলাম যে, বিকাল ৫টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত রংপুর শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। অফিস ছুটি হবার পর থেকে ১৪৪ ধারা বলবৎ করার মহান উদ্দেশ্য হলো, যাতে ছাত্ররা আমাকে নিয়ে মিছিল করতে না পারে। আমার মুক্তির খবর যাতে বাইরে কেউ জানতে না পারে সে ব্যাপারে এমন কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে যে, জেল গেটে কোন লোক আসা সম্ভব হয়নি।

জেল অফিসে বসেই ভাবলাম, কোথায় যেয়ে উঠবো। কলেজ বন্ধ থাকায় সেখানে যেয়ে লাভ নেই। আমার বাসা তো কলেজ কর্তৃপক্ষের হেফাযতে চলে গেছে। ৩ মাস দীর্ঘ বন্ধে কোন অধ্যাপকের বাসায় থাকা স্বাভাবিক নয়। যে প্রশাসন আমার কারণে ১৪৪ ধারা জারি করেছে, তারা আমাকে কলেজ কম্পাউন্ডে নিশ্চয়ই ঢুকতে দেবে না। এ অবস্থায় আমি কোথায় গিয়ে উঠবো?

ইতোমধ্যে এসপি সাহেব জেল অফিসে পৌঁছলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, স্যার আপনি কোথায় যাবেন। বাইরে ১৪৪ ধারা চলছে। ডিএম সাহেব আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, যেনো আমি আপনার গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দেই। আমি বুঝলাম যে, বের হয়ে যাতে আমি ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ করে কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারি, সে জন্যই এ খেদমত করতে চান। রংপুরে যেখানেই থাকতে চাইবো সেখানেই পুলিশ পাহারা থাকবে। কারো সাথেই যোগাযোগ করতে দেবে না। তাই বললাম, "আমাকে রেল স্টেশনে পৌঁছিয়ে দিন। আমি সন্ধ্যার ট্রেনে নওগাঁ চলে যাবো"। পুলিশের গাড়িতেই আমাকে রেল স্টেশনে নিয়ে গেলো। সেখানে কয়েকজন ছাত্রের সাথে দেখা হয়ে গেলো। এর একজন আমার বিশ্বস্ত। তার হাতে আমার লেখাটা দিয়ে এটা কার হাতে পৌঁছাতে হবে তা বলে দিলাম। পরে জানতে পেরেছি যে, হ্যান্ডবিল আকারে ঐ লেখাটা ছাপিয়ে বিলি করা হয়েছে।

আমি ট্রেনে নওগাঁ পৌঁছে গেলাম। রংপুরের সাথে আমার কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটলো। চাকরি জীবন ওখানেই শুরু, ওখানেই শেষ।

নতুন সাংগঠনিক জীবন শুরু

আসাদ গিলানী সাহেব রংপুর থেকে চিঠি লিখে জানালেন যে, তিনি রাজশাহী জেলায় সফরে আসছেন। আমি যেনো রাজশাহীতে তাঁর সাথে মিলিত হই। তিনি গোটা রাজশাহী বিভাগের অর্গেনাইজিং এর দায়িত্বে ছিলেন। আমি রাজশাহীতে

যথাসময়ে পৌঁছলাম। তিনি বললেন, প্রাদেশিক আমীর আপনাকে রাজশাহী বিভাগের সেক্রেটারির দায়িত্ব দিতে চান। যদি আপনি রাজি হন তাহলে এ বিভাগের সবগুলো মহকুমা শহরে আপনাকে নিয়ে সফর করবো। আপনিও আমার মতোই জামায়াতের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করবেন।

আমি তো জেল থেকে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই বের হয়েছি। বললাম, জেল থেকে বের হবার পর আব্বা-আম্মার সাথে এখনো দেখা করতে পারিনি। তাদের সম্মতি নিয়ে আসি এবং নওগাঁ থেকে স্ত্রী ও দু'পুত্র সন্তানকে তাদের কাছে রেখে আসি।

ঢাকায় আব্বা-আম্মার কাছে তাদের বৌ-মা ও দু'নাতিকে রেখে আমি ইসলামী আন্দোলনের সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে নতুন জীবন শুরু করলাম। আব্বা খুশি না হলেও আমার এ সিদ্ধান্তে আপত্তি করেননি। আমার স্ত্রী রংপুরে নিজের বাসায় যে সাবলীল জীবন শুরু করেছিলেন, তার বদলে ঢাকায় বিরাট একান্ন পরিবারের বড় বৌ-এর কঠিন দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিতে বাধ্য হলেন। এ পরিবর্তিত অবস্থায় তার খুব খুশি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু পরিস্থিতির অনিবার্য পরিণতি হিসেবে হাসি মুখেই তা মেনে নিলেন। তখন তার বড় সান্ত্বনা হলো, ছেলেরা তাদের দাদা-দাদী ও চাচা-ফুফুদের স্নেহের আশ্রয় পেলো।

২০৫ নং নওয়াবপুর রোডে অবস্থিত জামায়াতের অফিসে প্রাদেশিক আমীর চৌধুরী আলী আহম্মদ খানের সাথে দেখা করলে তিনি উষ্ণ আলিঙ্গনের মাধ্যমে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং রাজশাহী বিভাগের সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালনে আমি সম্মত জেনে খুব খুশি হলেন।

জনাব আসাদ গিলানীর সাথে দু'সপ্তাহব্যাপী সফরে রাজশাহী বিভাগের মহকুমা শহরগুলোতে সাংগঠনিক ও দাওয়াতী সফরে তার কাছ থেকে যা শিখলাম, তা বই পড়ে শেখার বিষয় নয়। জামায়াতের দাওয়াত তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে পেশ করতেন। তিনি উর্দুতে বক্তব্য রাখতেন। তার বক্তৃতার অনুবাদ না করে এর ভিত্তিতে আমাকে বক্তৃতা করতে বলতেন। বাংলা ভাষা না জানা সত্ত্বেও আমার বক্তৃতার পর কোন কোন পয়েন্ট সংশোধন করে দিতেন এবং নতুন পয়েন্ট যোগ করতে বলতেন। সংগঠন পরিচালনা হলো টেকনিক্যাল বিষয়। ইউনিট বৈঠক পরিচালনা, কর্মী সম্মেলন, রিপোর্ট পর্যালোচনা, দাওয়াতী কাজের টেকনিক, বাইতুল মাল বৃদ্ধির উপায়, সংগঠনকে মযবুত করার কৌশল ইত্যাদি এমন সব বিষয় যা অভিজ্ঞ লোক থেকে হাতে-কলমে শেখা ছাড়া উপায় নেই। বই পড়ে এ সব শেখা কিছুতেই সম্ভব নয়।

আসাদ গিলানী সাহেবের সাথে বেশি দিন কাজ করার সুযোগ পেলাম না। ঢাকা থেকে আমাকে ডেকে পাঠানো হলো। ঢাকায় এসে জানতে পারলাম যে, আমাকে লাহোর যেতে হবে। কেন্দ্রীয় জামায়াত, ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে গণপরিষদে পূর্ব-পাকিস্তানি সদস্যদের মধ্যে লবী করার জন্য আমাকে ডেকেছে।

আমার পশ্চিম-পাকিস্তান সফর

জীবনে প্রথম পশ্চিম-পাকিস্তানে যাবার সুযোগ পেয়ে খুবই উৎফুল্ল হলাম। আমার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ইসলামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাতের মহাসুযোগ। তাফহীমুল কুরআনের মাধ্যমে কুরআন বুঝার যে মজা পেলাম এরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় মাওলানার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, মহব্বত এমন তীব্রভাবে অনুভব করলাম যে, মনে হয় দুনিয়ায় জীবিত আর কোন মানুষকে আমি এতো বেশি ভালোবাসি না। ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর রচিত পুস্তকাদি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছে। আধুনিক শিক্ষিতদের উপযোগী ভাষায় বলিষ্ঠ যুক্তির ভিত্তিতে রচিত এ সাহিত্য আমাকে তীব্রভাবে আকৃষ্ট করেছে।

গভীর আগ্রহ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আমি ঢাকা থেকে পিআইএ (পাকিস্তান এয়ারলাইনস)-এর বিমানে করাচী রওনা হলাম। বিমানে আরোহণের এটাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। ভাগ্যক্রমে জানালার সাথের আসনে বসায় বিমান উপরে উঠার সময় নিচের দিকে দেখার সুযোগ পেলাম। বাড়িঘরগুলো খেলনার মতো ছোট দেখা গেলো। নদীকে লম্বা নালার মতো মনে হলো। কয়েক সেকেন্ড পর এ সবই অদৃশ্য হয়ে গেলো। ধোঁয়ার মতো কালো মেঘগুলো যখন বিমানের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছিল তখন খুব মজা লাগল। মেঘমালার স্তর পার হয়ে আরো উপরে উঠার পর যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে আমি রীতিমতো অভিভূত হয়ে গেলাম। মেঘের উপরিভাগ একেবারেই ধবধবে সাদা দেখা গেলো। মনে হলো, বরফের সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। কখনো মনে হচ্ছিল, তুলা ধুনে রাখা হয়েছে গোটা আকাশ জুড়ে।

ঢাকা থেকে উড়ে ৩ ঘণ্টা পর করাচী বিমানবন্দরে অবতরণের পূর্ব পর্যন্ত সময়টা যেনো অল্প সময়েই ফুরিয়ে গেলো। সাথে পড়ার মতো বই থাকা সত্ত্বেও বাইরের দৃশ্যের আকর্ষণ ওদিকে তাকিয়ে থাকতেই বাধ্য করলো। আল্লাহর সৃষ্টি কত সুন্দর ও রহস্যময় সে কথা বারবার মনে জাগতে লাগলো।

পশ্চিম-পাকিস্তানে পৌঁছলাম

এয়ারপোর্টে জামায়াতের লোক আমাকে নিতে আসবে জানতাম। কিন্তু আমি তাদেরকে কেমন করে চিনবো এবং তারাইবা আমাকে কিভাবে চিনবেন, এ নিয়ে একটু চিন্তিত ছিলাম। টারমাক থেকে এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ে ঢুকেই লক্ষ্য করলাম যে, একজন দু'হাত উঁচিয়ে ইংরেজি অক্ষরে গোলাম আযম লেখা একটা কাগজ ধরে আছে। আমি হাত তুলে জোরে সালাম বলে দ্রুত তার দিকে এগুতেই কয়েকজন দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। দীনী ভাইদের অভ্যর্থনায় প্রশান্তি বোধ করলাম।

তারা তিনজন ভাড়া করা ট্যাক্সিতে করে আমাকে জামায়াত অফিসে নিয়ে গেলেন। পথে তারা পূর্ব-পাকিস্তানের সংগঠন সম্পর্কে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন।

তাদের আগ্রহ দেখে আমিও উৎসাহের সাথে সব প্রশ্নের জবাব দিতে থাকলাম। করাচী থেকে লাহোরগামী মেল ট্রেনে আমার জন্য সিট রিজার্ভ করা ছিলো। ঐ দিনই রাতের ট্রেনে রওনা দিয়ে পরদিন বিকালে লাহোর পৌঁছলাম। রাতে ট্রেনে ঘুমাবার ব্যবস্থা ছিলো। দিনে সারাপথে অপরিচিত এলাকা অত্যন্ত আগ্রহভরে দেখলাম। আমাদের দেশে সবুজের সমাহার দেখে অভ্যস্ত। ওখানে বেশির ভাগই মরুময় এলাকা। তবু দেশের অংশ হিসেবে দেখে ভালোই লাগলো।

লাহোর রেল স্টেশনে জামায়াতের কয়েক ভাই করাচীর মতো একই পদ্ধতিতে আমাকে আবিষ্কার করলেন। তারা এমনভাবে আলিঙ্গন করলেন যে, মনে হয় আমরা আগে থেকেই ঘনিষ্ঠ পরিচিত। দীনের ভিত্তিতে সম্পর্ক রক্ত-সম্পর্কের চেয়ে গভীর ও আন্তরিক। এ সম্পর্কের মধ্যে পবিত্রতার ভাব বিদ্যমান। আল্লাহ স্বয়ং উভয়ের সম্পর্কের মাধ্যম। এক হাদীসে আছে যে, আল্লাহর নিকট যে রহম রয়েছে এর একশ ভাগের একভাগ মানুষসহ সকল জীবের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এতে বুঝা যায় যে, জীব-জানোয়ারের মধ্যে যে পারস্পরিক স্নেহ-মমতা তা ঐ এক ভাগেরই অংশ। রহমের বাকি ৯৯ ভাগ আল্লাহ তাআলার নিকট রিজার্ভ রয়েছে। মানুষে মানুষে আল্লাহর ওয়াস্তে যে মহব্বত, তা হয়তো ঐ ৯৯ ভাগের অংশ। তাই তা বেশি গভীর।

কেন্দ্রীয় মেহমানখানায় পৌঁছলাম

মাওলানা মওদূদী যে গাড়িতে চলাফেরা করেন, সে গাড়িতেই আমাকে লাহোর স্টেশন থেকে জামায়াতের মেহমানখানায় পৌঁছানো হয়। যারা আমাকে নিয়ে এলেন তারা সারাপথে আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে নিলেন। তাদের আন্তরিকতা ও ভালোবাসায় মুগ্ধ হলাম। মাওলানা মওদূদী যে বাড়িতে থাকেন এর পাশের বাড়িতেই মেহমানখানা। মাওলানার সাথে কখন দেখা হবে তা জানার ঔৎসুক্য প্রকাশ করলাম। জানা গেলো যে, ইশার নামায মাওলানার ইমামতিতেই পড়া হবে এবং নামাযের পর দেখা হবে। নামাযের তখনও দু'ঘন্টা দেরি। গোসল ও নাশতা সেরে নামাযে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। ৫-এ জাইলদার পার্কের বাড়িটির একাংশে মাওলানা সপরিবারে থাকেন। বাকি অংশে জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিস। নামাযের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আমাকে নিয়ে গেলো। প্রথমেই জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া তোফাইল মুহাম্মদের সাথে পরিচয় হলো। তিনি পাঞ্জাবী ওজনে চেপে ধরে মহব্বতপূর্ণ দীর্ঘ আলিঙ্গন করলেন। অফিসে কর্মরত সবাই নামাযের স্থানে আসতে লাগলেন এবং তাদের সাথে মিয়া সাহেব পরিচয় করাতে থাকলেন।

সবাই মাওলানার আগমনের জন্য অপেক্ষা করছেন। জামায়াত শুরু হবার নির্দিষ্ট সময়ে মাওলানার ইমামতিতে নামায হবে। মাওলানা যথাসময়ে এসে হাজির হয়ে সালাম দিলেন এবং ইমামের জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি তো প্রতিটি মুহূর্তে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম, কখন তিনি আসবেন এবং আমি দেখতে পাব।

ইমামের জায়নামাযের সামনের দরজা খুলেই তিনি এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। এক ঝলক শুধু দেখলাম।

নামায শেষে সালাম ফিরিয়ে তিনি ঘুরে বসলেন। আমি একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। পয়লা কাতারে মিয়া সাহেবের পাশেই আমি বসা। অপরিচিত লোক দেখে মাওলানা মিয়া সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাতে আমার দিকে ইশারা করলেন। মিয়া সাহেব আমার নাম বলতেই মুচকি হেসে আমাকে বললেন, "কামরায় আসুন।" মাওলানা দু'হাত তুলে নিঃশব্দে অতি অল্প সময়ে মুনাজাত করে চলে গেলেন। আর সবাই সুন্নাত পড়ছেন। আমি মুসাফির বলে সুন্নাত পড়ার দায়িত্ব নেই। নীরবে বসে মনে মনে মাওলানার চেহারার বিশ্লেষণ করতে থাকলাম।

বিরাট স্বচ্ছ দুটো চোখ। প্রশান্ত চেহারা। বিস্তৃত কপাল। উজ্জ্বল ফরসা রঙ। গোটা চেহারায় বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। অন্তরে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় অনুভব করলাম। তাঁর তাফসীর ও সাহিত্য অধ্যয়ন করে তাঁকে একজন মহাপুরুষ বলে যে ধারণা মনে সৃষ্টি হয়েছে তা আরও মযবুত হলো। এমন এক আকর্ষণীয় চেহারা, যার দিকে চেয়ে থাকতে বাধ্য হতে হয়। একটু পরেই তাঁর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য হবে বলে তীব্র আবেগ অনুভব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটু শঙ্কাও বোধ করলাম যে, এত বড় ব্যক্তিত্বের সামনে সহজভাবে কথা বলতে পারবো কিনা!

এ সব চিন্তা ভাবনায় আমি সম্পূর্ণ ডুবে ছিলাম। সুন্নাত পড়া শেষ করে মিয়া সাহেব আমার হাত ধরে বললেন, "চলুন মাওলানা হয়তো আপনার অপেক্ষায় আছেন।"

আমি যেনো হঠাৎ সম্বিত ফিলে পেলাম। মিয়া সাহেব আমার হাত ধরা অবস্থায়ই মাওলানার কামরায় নিয়ে গেলেন। তিনিও কামরায় ঢুকলেন। দু'জনেই একসাথে মাওলানাকে সালাম দিলাম। মাওলানা হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে তাঁর টেবিলের সামনে চেয়ারে বসতে ইশারা করলেন। মিয়া সাহেব আমার পাশের চেয়ারেই বসলেন।

৬৬.

মাওলানা মওদূদীর সান্নিধ্যে

মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ সাথে থাকায় আমার খুব ভালোই লাগলো। নেতাদের মধ্যে তাঁর সাথেই প্রথম পরিচয় হয়। বিশেষ করে তাঁর জোশীলা আলিঙ্গন আমাকে সহজেই আপন করে নেয়। আমি সংকোচপূর্ণ মন নিয়ে মাওলানার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সমীহবোধের দরুন কথা বলতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। মাওলানার বিশাল চোখ দুটি আমার দিকে তাক করা। তিনি মৃদু হাসিমাখা মুখে কথা বলবেন মনে হলো। মিয়া সাহেব আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, "আপনার মতো একজন উচ্চশিক্ষিত বাঙালি যুবকের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিলো। পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলামী

আন্দোলনের প্রসারের জন্য বাংলাভাষীদের মধ্যে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের যোগ্য লোকের অভাব আমরা তীব্রভাবে বোধ করছিলাম। মুহতারাম মাওলানা আপনার রুকুনিয়াতের দরখাস্ত মঞ্জুর করার সময় আপনার ব্যাপারে খুবই আশাবাদী ছিলেন।

তাঁর কথাগুলো আমার অন্তরে উৎসাহের প্রবাহ সৃষ্টি করলো। আমি উৎফুল্ল হয়ে মাওলানার দিকে তাকালাম। অত্যন্ত স্নেহমাখা ভাষায় তিনি আমার ব্যক্তিগত হাল-অবস্থার খবর নিলেন। আমার পিতার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমার স্ত্রী ও সন্তানদের খবর জিজ্ঞেস করলেন। আমরা কয় ভাই, কে কী করে এবং ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে আব্বা ও ভাইদের মনোভাব জেনে নিলেন। সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে কাজ করার সিদ্ধান্তকে মুবারকবাদ জানালেন। বললেন, "একটি আন্দোলনকে গড়ে তুলবার জন্য কিছু লোকের জীবন উৎসর্গ করতেই হয়। যারা দুনিয়ায় নিজদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে আত্মনিয়োগ করে তাদের হাতে কোন আদর্শ কায়েম হতে পারে না। দীনের জন্য আত্মনিয়োগ করার জযবা আছে, এমন কিছু লোক না পেলে এ আন্দোলন দানা বাঁধতে পারতো না। আপনাকে পেয়ে আমরা সবাই খুব খুশি। আসাদ গিলানী সাহেব আপনার সম্পর্কে আগেই আমাকে বিস্তারিত অবহিত করেছেন। আপনাকে পেয়ে আমরা অত্যন্ত খুশি।"

ইতোমধ্যে আমার মন থেকে ইতস্তত ভাব দূর হয়ে মাওলানার অত্যন্ত কাছে পৌঁছে গেছি বলে বোধ করলাম। মাওলানার স্নেহদৃষ্টি ও মধুমাখা কথা আমাকে যেভাবে আপন করে নিলো তাতে আনন্দে আত্মহারা হওয়াই স্বাভাবিক। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললাম, "আপনার কাছে দোয়া চাই, আমাকে আল্লাহ তাআলা এমন তাওফীক দান করুন, যাতে আমার সম্পর্কে যে আশা আপনি পোষণ করেন তা সত্যে পরিণত হয়। আপনার লেখা তাফহীমুল কুরআন আমাকে এ পথে টেনে এনেছে। তাই না দেখেই আপনাকে গভীরভাবে ভালোবাসতে বাধ্য হয়েছি। আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে দীনের উজ্জ্বল আলো দেখালেন। এ পথকেই জীবনের লক্ষ্য বলে স্থির করেছি। আল্লাহ তাআলা যেনো কবুল করেন।"

"আল্লাহ তাআলা আপনাকে কবুল করুন" বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি আবেগভরে তাঁর হাতে হাত মিলালাম এবং দীনী মুরুব্বী হিসেবে তাঁর মতো একজন মহান ব্যক্তিকে পেয়ে পরম তৃপ্তি বোধ করলাম। মাওলানার সাথে আমার এ প্রথম সাক্ষাৎ চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো। মাওলানা এ কথা বলে আমাকে বিদায় করলেন, "এখন খাবার সময়। খেয়ে বিশ্রাম নিন। আগামীকাল আরও কয়েকজনকে নিয়ে আপনার সাথে এক বৈঠকে মিলিত হবো, ইনশাআল্লাহ।"

মাওলানার সাথে বৈঠক

পাকিস্তানের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত গণপরিষদ (যারা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের দায়িত্বও পালন করছেন) সদস্যদেরকে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার

জন্য উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে জামায়াতের পক্ষ থেকে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি টীম গঠন করা হয়েছে। ঐ টীমের সদস্য হিসেবেই আমাকে ডাকা হয়েছে। সন্ধ্যার পর মাওলানার অফিসেই বৈঠক হবার কথা। আমাকে নিয়ে মিয়া সাহেব কামরায় ঢুকলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই টীমের চারজন সদস্য হাজির হয়ে গেলেন। পশ্চিম-পাকিস্তানের ৪ প্রদেশের ৪ জন এবং পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আমি। নিজ নিজ প্রদেশের এমএনএদের (মেম্বার ন্যাশনাল এসেম্বলী) সাথে প্রয়োজনে যাতে প্রাদেশিক ভাষায়ও আলোচনা করা যায়, সে হিসেবেই টীম গঠন করা হয়েছে।

আমরা পরস্পর পরিচিত হলাম। মিয়া সাহেবই প্রথম আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। যথাসময়ে মাওলানা অন্দর মহল থেকে অফিস রুমে ঢুকে সালাম দিলেন। সবার সাথে হাত মিলিয়ে তিনি বসলেন। মাওলানা বললেন, "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালনের জন্য আপনাদেরকে প্রস্তুত হতে হবে। প্রাদেশিক ভাষা ও ইংরেজি ভাষায় বলিষ্ঠভাবে বক্তব্য পেশ করতে হবে। গণপরিষদের অধিবেশন আর দশদিন পর শুরু হবে। আপনারা এখানেই মেহমানখানায় এক সপ্তাহ একত্রে অবস্থান করুন। সংশ্লিষ্ট বই-পুস্তক অধ্যয়ন করুন এবং মতবিনিময় করে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। এক সপ্তাহ পর পিন্ডি যাবার পূর্বে আরও একবার আমার সাথে বৈঠকে মিলিত হবেন।" যেসব বই পড়া জরুরি সে কয়টির নামও বলে দিলেন।

লাহোরে এক সপ্তাহ

লাহোরে থাকাকালে আমাদের উপর ন্যস্ত গুরুদায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিতেই বেশি সময় ব্যয় করলাম। ৭ দিনের মধ্যে ২ দিন লাহোরে দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখলাম। আমাদের গাইড হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেন, টীমেরই এক ভাই যিনি লাহোরেরই অধিবাসী।

আমার বিবেচনায় লাহোরে দেখার মতো জিনিস দু'টো। একটা হলো, বাদশাহ আওরঙ্গজেবের তৈরি বিখ্যাত শাহী মসজিদ। অপরটি হলো, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলের শালিমারবাগ। মসজিদটির বৈশিষ্ট্য হলো যে, এর বাইরে নামাযের জন্য বিরাট প্রশস্ত জায়গা রাখা হয়েছে, যাতে হাজার হাজার লোক জামায়াতে শরীক হতে পারে। মসজিদের চার কোণে ৪টি সুউচ্চ মিনার। সিঁড়ি বেয়ে মিনারের উপর উঠার ব্যবস্থা আছে। উপরে উঠে গোটা লাহোর শহর দেখে নিলাম। মসজিদের প্রধান প্রবেশপথের এক পাশে মহাকবি আল্লামা ইকবালের কবর। মুসল্লীগণ মসজিদে যাবার সময় কবিকে মহব্বত করে সালাম জানায়।

শালিমারবাগ এক বিরাট বাগান। বাগ ফার্সি শব্দ। এর অর্থ বাগান। বাগানের অর্ধেক এলাকা নয়নজুড়ানো বহু রকমের ফুলে সজ্জিত। অপর অর্ধেক পানিতে পূর্ণ। বাগান থেকে পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাবার জন্য রাস্তা রয়েছে। যতটা জায়গা জুড়ে পানি আছে এর সবটুকুর উপরই রাস্তা প্রসারিত আছে যাতে সারা

এলাকায়ই বিচরণ করা যায়। রাতে যখন রাস্তার উপরকার বিদ্যুতের বাতিগুলোর আলোর ছায়া নিচে পানির উপর পড়ে তখন এমন চমৎকার দৃশ্যের সৃষ্টি হয়, যা বর্ণনা করার ভাষা আমার আয়ত্তে নেই। সত্যিই অপরূপ দৃশ্য। পানি রাস্তার অতি নিকটে। হাতে নাগাল পাওয়া যায়। অগণিত ঝর্না থেকে পানি পড়ে।

ফুলের বাগানকে পেছনে রেখে এবং পানির ঝর্নাগুলোকে সামনে রেখে পাথরে তৈরি বিরাট মঞ্চ রয়েছে, যেখানে বসে আমীর-ওমারাহগণ পানির উপর তৈরি রাস্তাগুলোতে সুন্দরীদের নৃত্যগীত উপভোগ করতো। ঐ মঞ্চে বসে আমরা কল্পনায় ঐ দৃশ্য দেখার চেষ্টা করলাম।

এটা সত্যি মজার ব্যাপার যে, মানুষ বিনোদন ও আনন্দ-উৎসব করার জন্য ফুল ও সুন্দর গাছের সমন্বয়ে বাগান তৈরি করে, যার পাশে ও সম্ভব হলে নিচে ঝর্নাধারা প্রবাহিত হয়। আল্লাহ তাআলা বেহেশতের যে বিবরণ কুরআনে দিয়েছেন, এর সাথে এ সবের হুবহু মিল দেখে বুঝা যায় যে, তিনি মানুষকে বিনোদনের যে প্রবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাতে শালিমারবাগের পরিকল্পনা করাই স্বাভাবিক।

কোন এক লেখকের মন্তব্য পড়েছিলাম যে, কুরআন মরুভূমির দেশে নাযিল হয়েছে বলেই মরুবাসীদের আকর্ষণের জন্য বেহেশতের বিবরণে বহমান ঝর্নাধারার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমি বরফের দেশেও পার্কে ঝর্নাধারা দেখেছি। আসল কথা হলো– সৌন্দর্যবোধ, বিনোদন, চেতনা ও আনন্দ-ফূর্তির কামনার উপাদান হিসেবে সকল দেশে সর্বকালেই ফল ও ফুলের বাগান, বহমান পানি, ঝর্নাধারা ও সুন্দরী নারীকে গণ্য করা হয়েছে। মানুষের এ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দাবি পূরণের জন্যই বেহেশতের বিবরণে ঐ তিনটি উপাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

লাহোর অবস্থানের সময় আমাদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিলো মাওলানার বৈকালিক আসর। মাওলানার অফিসের সামনেই একটি চমৎকার চত্বর সবুজ ঘাসে ঢাকা। প্রায় চারপাশেই ফুলের গাছ। এখানে মাওলানার ইমামতিতে আসরের নামায পড়া হয়। ঐ চত্বরেই নামাযের পর মাওলানা একটি ইজি চেয়ারে বসেন। মাওলানার ডানে ও বাঁয়ে এবং সামনে চেয়ারের সারি। যারা বিনা এ্যাপয়েন্টমেন্টে মাওলানার সাথে সাক্ষাতে আগ্রহী তারা এ সময় এ আসরে হাজির হন। মাওলানার সাথে সরাসরি কথা বলা, কোন প্রশ্ন থাকলে জওয়াব সংগ্রহ করা এবং মাওলানাকে কাছে থেকে দেখার জন্য এটা এক বিরাট সুযোগ। আমরা ৫ জনের টীমের কোন সদস্য এ আসরে অনুপস্থিত থাকা পছন্দ করিনি। ৭ দিন লাহোরে অবস্থানকালে রোজ আসর ও মাগরিবের মাঝের সময়টুকু নিয়মিত হাজির হতাম। অন্যদের মতো আমরাও প্রশ্ন করার সুযোগ গ্রহণ করেছি। অন্যদের প্রশ্নের জওয়াবে অনেক বিষয় শেখার সৌভাগ্যও হলো।

রাওয়ালপিণ্ডি রওনা হবার আগের দিন মাওলানা আমাদেরকে নিয়ে তাঁর অফিসেই বসলেন। গণপরিষদের সদস্যদেরকে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার জন্য উদ্বুদ্ধ করার

উদ্দেশ্যে তাদের সাথে ক্রমিকধারায় যেসব বিষয়ে আলোচনা করতে হবে, সে সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য পরামর্শ দিলেন। তাঁদেরকে যেসব বই পড়াবার চেষ্টা করতে হবে তাও বলে দিলেন। তাদের মধ্যে যারা বিতর্ক করতে চান তাদেরকে কিভাবে কাবু করতে হবে সে কৌশলও শিখিয়ে দিলেন।

গণ-পরিষদের পরিচয়

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের নমিনেশনপ্রাপ্ত প্রার্থীরাই গণপরিষদে (Constituent Assemble) নির্বাচিত হন। পশ্চিম-পাকিস্তানের সদস্যদের মধ্যে মুসলিম লীগের বাইরের কতক সদস্যও ছিলেন। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম সদস্যদের সবাই মুসলিম লীগেই ছিলেন। এমনকি নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান, মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী ও ড. মাহমুদ হোসাইন পূর্ব-পাকিস্তানি না হলেও এখানকার প্রতিনিধি হিসেবেই গণপরিষদ সদস্য ছিলেন।

১৯৪৭ সালে একই সময়ে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালেই ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণীত হয় এবং সে অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অথচ ১৯৫৫ সালেও পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হলো না।

১৯৫৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে মুসলীম লীগ যুক্তফ্রন্টের নিকট শোচনীয় পরাজয় বরণের পর গণপরিষদে পূর্ব-পাকিস্তানের অধিকাংশ সদস্য ইসলামী শাসনতন্ত্রের সমর্থকের ভূমিকা পালন করেন। অথচ ইতঃপূর্বে তাদের ভূমিকা অন্যরূপ ছিলো। জনাব নূরুল আমীনের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তানের সদস্যগণ তাদের জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারের কৌশল হিসেবেই এ ভূমিকা পালন করেন।

নতুন সরকার গঠন

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে ইন্তিকাল করেন। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন গভর্নর জেনারেল হন। ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিকাকত আলী খান রাওয়ালপিণ্ডিতে জনসভায় ভাষণ দানকালে আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে খাজা নাজিমুদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রী করা হয় এবং পাঞ্জাবের গোলাম মুহাম্মদকে গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করা হয়।

খাজা নাজিমুদ্দীন ব্যক্তিগতভাবে ধার্মিক ছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন।

গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে মাওলানা আকরাম খান, মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী, মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকি, সীমান্তের আবদুর রব নিশতার প্রমুখ সদস্যগণ খাজা নাজিমুদ্দীনকে জোর সমর্থন দেন। ১৯৫৩ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্রের যে খসড়া প্রণয়ন করা হয়, তা সত্যিকারার্থেই ইসলামী শাসনতন্ত্র ছিলো বলে আমি মাওলানা আকরাম খানের মুখে শুনেছি।

খাজা নাজিমুদ্দীন তখন পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি ও মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির লিডার। ১৯৫৩ সালের ১৭ এপ্রিল গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ খাজা নাজিমুদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে বরখাস্ত করে মুহাম্মদ আলী বগড়াকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। মুহাম্মদ আলী বগড়া আমেরিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি চরম নপুংসকের ভূমিকা পালন করে। মুসলিম লীগ সভাপতি ও পার্লামেন্টারি পার্টি লীডারকে বরখাস্ত করে একজন সরকারি কর্মচারীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগকে সমর্থন করে মুসলিম লীগ গোলাম মুহাম্মদের ক্রীড়নকের ভূমিকাই পালন করলো। খাজা নাজিমুদ্দীন ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার অপরাধেই পদচ্যুত হন।

আবার সরকার পরিবর্তন

এদিকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগ নির্মমভাবে পরাজিত হওয়ায় জনসমর্থন ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে যখন ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনায় উৎসাহী হলো তখন প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলী বগড়াও তাদেরকে সমর্থন করলেন। তার আমলে প্রণীত শাসনতন্ত্র খাজা নাজিমুদ্দীনের রচিত শাসনতন্ত্রের সমমানের ইসলামী না হলেও মোটামুটি ইসলামীই ছিলো। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে, ২৫ ডিসেম্বর (১৯৫৪) জাতির পিতা কায়েদে আযমের জন্মদিনে জাতিকে ইসলামী শাসনতন্ত্র উপহার দেওয়া হবে।

গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ অক্টোবরেই গণপরিষদ ভেঙে দেন, যাতে ইসলামী শাসনতন্ত্র পাস হতে না পারে। গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট মৌলভী তমীযুদ্দীন খান হাইকোর্টে এর বিরুদ্ধে মামলা করেন। কোর্ট তার পক্ষে রায় দিলে সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপীল করে। গোলাম মুহম্মদ নমিনেশনের মাধ্যমে নতুন গণপরিষদ গঠনের ঘোষণা দিলেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মুনীরও ইসলাম বিরোধী ছিলেন। তিনি গণপরিষদ বাতিলকে বৈধ ঘোষণা করলেও নমিনেশনে নতুন গণপরিষদ গঠন অবৈধ ঘোষণা করেন এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহের সদস্যদের ভোটে নতুন গণপরিষদ নির্বাচনের নির্দেশ দেন।

সুপ্রিম কোর্টের ঐ নির্দেশ মোতাবেক নির্বাচিত নতুন গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যেই আমরা লবী করছিলাম। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তান আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে গণপরিষদের ৪০ জন সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালের ৩১ মে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের ১৬ জন, আওয়ামী লীগের ১২ জন, মুসলিম লীগের ১ জন, বাকি ১১ জন জাতীয় কংগ্রেস, তফসিলি ফেডারেশ ও অন্যান্য গ্রুপের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন। যুক্তফ্রন্টের ১৬ জনের মধ্যে কয়েকজন নেযামে ইসলাম পার্টিরও ছিলেন। এ নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে লবী করার কাজে আমরা নিয়োজিত হলাম।

রাওলপিণ্ডি রওনা

জানা গেলো যে, গণপরিষদ ৭ জুলাই (১৯৫৫) মারীতে প্রথম অধিবেশনে বসবে। মারী রাওলাপিণ্ডি থেকে ৪০/৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইংরেজ শাসনামলে বড় কর্তারা গ্রীষ্মকালে এখানে অবস্থান করতেন। ৯ হাজার ফুট উচ্চে এ শহরটি স্থাপিত।

আমরা লাহোর থেকে রেল-কারে রাওলপিণ্ডি রওনা হলাম। রেল-কার ট্রেন লাইনেই চলে। মাত্র দুটো বিরাট বগির সমন্বয়ে গঠিত। ট্রেনের চেয়ে অনেক দ্রুতগামী।

আমরা ৫ জন একই সাথে রওনা হলাম। পথে আলাপ-আলোচনার প্রচুর সময় পেয়ে আমরা নিজ নিজ প্রদেশের ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য বিনিময়ের সুযোগ পেলাম। কে কিভাবে ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত হলাম তা খুব আগ্রহ নিয়ে জানলাম। পশতু, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচী ও বাংলা ভাষাভাষী আমরা ৫ জনের মধ্যে নিবিড় ভালোভাসা গড়ে উঠলো।

আমরা উর্দু ভাষায়ই ভাব-বিনিময় করছি। যদিও সবাই ইংরেজি শিক্ষিত তবু উর্দুতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম। অথচ আমাদের কারো মাতৃভাষাই উর্দু নয়। তাফহীমুল কুরআন ও ইসলামী আন্দোলনের সাহিত্য ভাণ্ডার উর্দু ভাষায় হওয়ায় এবং আমরা সবাই উর্দু ভাষায়ই এ সব অধ্যয়ন করায় আমাদের ভাব-বিনিময়ের জন্য উর্দুই সহজ মনে হলো।

ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে বুঝা গেলো যে, আমরা আল্লাহর রহমতে ইসলামী জ্ঞানে মোটামোটি ওয়াকিফহাল। আমরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমেই ইসলামী জ্ঞানচর্চার মহাসুযোগ পেলাম। সবাই প্রাণভরে আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া আদায় করলাম যে, তিনি ইসলামী আন্দোলনের পথে আসার তাওফীক না দিলে তাঁর দীনকে এভাবে জানার সুযোগ হতো না। এ আন্দোলন না থাকলে আমাদের জীবন যে কোন্ পথে কিভাবে কাটতো তা ভাবলে আল্লাহর ঐ মহান বান্দাহর জন্য অন্তর থেকে দোয়া আসে, যার প্রচেষ্টায় ইকামাতে দীনের এ আন্দোলন আমাদের মতো অগণিত আধুনিক শিক্ষিতদের জীবনে হেদায়াতের আলো পৌঁছাচ্ছে। ইতঃপূর্বে আমরা ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবেই জানতাম। ইসলাম যে জীবনের সকল দিকের জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ বিধান এ কথা ইসলামী আন্দোলনে এসেই জানলাম।

রাওয়ালপিণ্ডি রেল স্টেশনে পৌঁছলে ওখানকার জামায়াতের লোক আমাদেরকে জামায়াত অফিসে নিয়ে গেলেন। একদিন পর মারী রওনা হবার কথা।

মারী রওনা

আমরা ৫ জন একটি বড় ট্যাক্সী (স্টেশন ওয়াগন) নিয়ে রওনা হলাম। পাহাড়ি পথে ঘণ্টায় ২০/২৫ মাইলের বেশি বেগে গাড়ি চলে না। পাহাড়ের গা ঘেঁষে আঁকাবাঁকা রাস্তায় খুব সাবধানে চলতে হয়। রাস্তা এতটুকু মাত্র প্রশস্ত যে দুটো গাড়ি ক্রস করতে পারে।

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে মারী যাবার পথে আড়াই ঘণ্টা সময় আমি সাথীদের সাথে আলোচনা করার চেয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখায়ই মগ্ন ছিলাম। সিন্ধী ও বেলুচী ভাইতো আমার মতোই নিশ্চুপ হয়ে দেখছেন। পাঞ্জাব ও সীমান্তের দু'ভায়ের নিকট এ জাতীয় দৃশ্য নতুন নয়। তারা আলাপে ব্যস্ত থাকলেন।

গাড়ি পাহাড় বেয়ে উপরে উঠছে। রাস্তার এক পাশে পাহাড়। পাহাড় ঘেঁষেই গাড়ি চলছে। অপর পাশে খাদ। ফেলে আসা পথ নিচে দেখা যাচ্ছে। নিচ থেকে পাহাড়ি উঁচু পাছগুলো এখন উপর দিক থেকে দেখা যাচ্ছে। যতই উপরে উঠছি পাহাড়ি গাছ পাশেরগুলো দেখতে বিরাট উঁচু আর নিচেরগুলোর শুধু মাথা দেখা যাচ্ছে।

গরমের দিন। কিন্তু যতই গাড়ি উপরে উঠছে ক্রমেই গরম কমছে। মারীর কাছাকাছি পৌছার আগেই মেঘের স্তর পার হয়ে যাচ্ছি। গাড়ির জানালা বন্ধ। মেঘগুলো গাড়ির সাথে ধাক্কা-ধাক্কি করছে। কি চমৎকার দৃশ্য! তন্ময় হয়ে উপভোগ করছি। ড্রাইভার বললো যে, জানালা খোলা থাকলে কোন সময় বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ গাড়ির ভেতর দিয়ে এপার ওপার হয় এবং সবাইকে ভিজিয়ে দিয়ে যায়। জানালা খুলে মেঘকে গাড়িতে ঢুকতে দিতে আমার আগ্রহ থাকলেও ড্রাইভার কড়াভাবে নিষেধ করলো।

মারী শহরে পাহাড়ের উপর এক বাসায় আমরা পৌছলাম। ঘরে গিয়েই শীতের কাপড় পরতে হলো। জামায়াতের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সেক্রেটারি সিদ্দীকুল হাসান গিলানী আগে থেকেই ঐ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তিনি আমাদের টীমের পরিচালক। আগেই এসে বাড়ি ভাড়া করে আমাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তাঁরই আপন ছোট ভাই জনাব আসাদ গিলানী, যার কথা ইতঃপূর্বে বার বার এসেছে, যিনি উত্তরবঙ্গে জামায়াতের দায়িত্বে ছিলেন। আমি তাঁর সেক্রেটারি ছিলাম।

মারীতে আমাদের তৎপরতা

টীমের ৫ জনের মধ্যে সিন্ধী ও বেলুচী ভাই দু'জনের নাম মনে নেই। পাঞ্জাবের যিনি, তিনি এক হাই স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। খুব নামকরা স্কুলের দায়িত্বে ছিলেন। বেশ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মনে হয়েছে। নাম হলো, জনাব আবদুল জাব্বার গাযী। জামায়াতের সিনিয়র রুকন হিসেবেই গণ্য। সীমান্ত প্রদেশের আমীর খান সরদার আলী খানও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক। বয়সে দু'জনই আমার মুরুব্বী।

আমাদের পরিচালক গিলানী সাহেবের সাথে পরামর্শ করে আমরা কাজ শুরু করলাম। গণপরিষদের সদস্যরা যেসব হোটেলে থাকেন, সেখানে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য সকালে নাশতা করেই যেতে হতো। দুপুরের পূর্বেই তাদেরকে পাওয়া যায়। বিকাল ও সন্ধ্যায় তারা অধিবেশনে বা বৈঠকাদিকে ব্যস্ত থাকেন।

আমরা যে বাসায় উঠেছি এটা পাহাড়ের চূড়ায়। রাস্তা থেকে হেঁটেই উঠা-নামা

করতে হয়। সাবধানে হাঁটতে হয়, যাতে পা পিছলে না যায়। বাঁধানো সিঁড়ি নেই। পায়ে হাঁটা পথ। নামতে তেমন সমস্যা হয় না; অবনতি তো সহজই। কিন্তু উঠার সময় বেশ কষ্ট হয়। উন্নতি কখনও সহজ নয়। উপরে উঠার সময় অল্প সময়েই আমার নিঃশ্বাস চড়ে যেতো। আবদুল জাব্বার গাযী সাহেব আমাকে উপরে উঠার পদ্ধতি শেখালেন। বললেন, উপরে উঠার সময় নিঃশ্বাস দীর্ঘ করে মুখ বন্ধ রেখে বেশ কয়েক ধাপ ধীরে ধীরে উঠার পর থামতে হবে এবং মুখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে। এভাবেই উঠতে থাকতে হবে। সত্যি এ কৌশলটি বেশ সহায়ক মনে হলো। কোথাও বেশি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হলে আমি এখনও এ পদ্ধতি অনুসরণ করি।

যে তৎপরতার উদ্দেশ্যে আমরা মারী গেলাম, সে কাজের তেমন সুবিধা পাওয়া গেলো না। সদস্যদেরকে কোথাও ধীরে-সুস্থে বসতে দেখা যায় না। সবাইকে মহাব্যস্ত মনে হলো। গণপরিষদ সদস্য নেযামে ইসলাম পার্টির সভাপতি মাওলানা আতহার আলীর সাথে দেখা হলে তিনি আমার হাত ধরে টেনে তাঁর কামরায় নিয়ে গেলেন। ১৯৫০ সালে আমি যখন তাবলীগ জামায়াত নিয়ে কিশোরগঞ্জ শহীদী মসজিদে হাজির হই, তখন তিনি ঐ মসজিদের ইমাম ছিলেন। তখন থেকে তাঁর সাথে পরিচয়। নেযামে ইসলাম পার্টি গঠন করার সময় ১৯৫৩ সালে তাঁর দাওয়াতে আমিও বড়কাটারা মাদরাসায় গিয়েছিলাম।

তিনি কামরায় ঢুকে আমাকে চেয়ারে বসালেন এবং একগাদা টেলিগ্রাম আমার সামনে টেবিলে হাজির করলেন। বললেন, "পূর্ব-পাকিস্তান থেকে রোজ এ সব টেলিগ্রাম আসছে। আমার দলের যারা গণপরিষদ সদস্য তারাও সবাই নেতা এবং নানাভাবে ব্যস্ত। কেউ আমাকে সময় দিতে পারছে না। এ সব টেলিগ্রাম কোথা থেকে কারা পাঠিয়েছে এর তালিকা আমার প্রয়োজন। আমি ইংরেজি পড়তে জানি না। টেলিগ্রাম করে ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবি জানাবার জন্য পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে এসেছিলাম। এ সবের হিসাব গণপরিষদে যথাসময়ে পেশ করতে চাই। আপনি এ বিষয়ে আমাকে একটু সাহায্য করুন।"

আমি মাওলানাকে আশ্বাস দিলাম, "আমার হাতে সময় আছে। আমি আপনার অবৈতনিক সেক্রেটারির দায়িত্ব নিলাম। আপনার এ কাজ রোজ এসে করে দিয়ে যাবো।"

আমি কেন মারী আসলাম এবং এখানে আমি কি করি তা তিনি জানতে চাইলেন না। তিনি নিজের সমস্যায় চিন্তিত। আমাকে পেয়ে তাঁর সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়ে এবং আশ্বাস পেয়ে তিনি নিশ্চিত হলেন। আমি তাঁর সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন শুরু করার আগে বললাম, "আপনি যে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনায় আগ্রহী, সে কাজে সাহায্য করার জন্য জামায়াতে ইসলামী এক টীম পাঠিয়েছে। গণপরিষদের পূর্ব-পাকিস্তানি সদস্যদেরকে ইসলামী শাসনতন্ত্রের সমর্থক বানাবার জন্য চেষ্টা করার উদ্দেশ্যেই আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে।" এ কথা শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং এ কাজে উৎসাহ দিলেন।

আমি মাওলানা সাহেবের কাছ থেকে জানতে চাইলাম যে, গণপরিষদ সদস্যরা কী বিষয়ে এত ব্যস্ত যে, তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি না। তিনি বললেন, "আমিও সবাইকে কর্মব্যস্ত দেখছি। এ বিষয়ে ভালোভাবে জানতে হলে অমুক হোটেলের অমুক কামরায় মৌলভী ফরীদ আহমদের সাথে দেখা করুন।"

জনাব ফরীদ আহমদ ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। অথচ তিনি মৌলভী ফরীদ আহমদ নামেই রাজনৈতিক মহলে খ্যাত। আমরা একই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। তিনি এসএম হলে ছিলেন। তাঁর সাথে তখন আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়নি। তাঁর কামরায় গেলাম। সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। মারীতে কেনো এলাম জানতে চাইলেন। শুনে খুশি হলেন। মাওলানা আতহার আলীর প্রাইভেট সেক্রেটারি হবার খবর জেনে পুলকিত হয়ে বললেন, "এ কাজটি আমারই করা উচিত ছিলো; কিন্তু সময় বের করতে পারছি না।"

আপনারা কী নিয়ে এত ব্যস্ত তা জানার জন্যই আপনার কাছে আসলাম। মাওলানা সাহেব এ বিষয়ে বলতে পারলেন না। আমার এ কথা শুনে তিনি বললেন, "গণপরিষদের সদস্য হিসেবে আমরা দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হয়েছি। এ কাজ কবে শুরু হবে আল্লাহই জানেন। এখন নোংরা রাজনীতি নিয়ে সবাই মহাব্যস্ত।"

মারীতে রাজনীতির চিত্র

তাঁর কাছ থেকে যা জানলাম তা হলো, পশ্চিম-পাকিস্তানের সদস্যরা তাদের স্বার্থের ব্যাপারে সবাই একমত। পূর্ব-পাকিস্তানিরা এলাকার স্বার্থের চেয়ে দলের স্বার্থ নিয়ে বিভক্ত। যুক্তফ্রন্টের বিশাল বিজয় বিভেদের কারণে অকার্যকর। পশ্চিম-পাকিস্তানি সদস্যদের প্রায় সবাই মুসলিম লীগের লোক। ৫৪-এর নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানে মুসলিম লীগ উৎখাত হয়ে যাবার পরে পশ্চিম-পাকিস্তানিরা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পশ্চিম-পাকিস্তানিরা আমাদের দলাদলি থেকে ফায়দা নিচ্ছে। ৮০ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভায় আওয়ামী লীগ মাত্র ১২টি আসন পেয়েছে। অথচ তাদের দাবি হলো যে, কেন্দ্রে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী করতে হবে। মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির যিনি নেতা হবেন তারই প্রধানমন্ত্রী হওয়া স্বাভাবিক।

পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার ভিত্তিতে মারীতে একটি ৫ দফা চুক্তি হয়। আওয়ামী লীগ মনে করে যে, সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী না হলে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বার্থ বিপন্ন হবে। গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ নাকি সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী করার ওয়াদা দিয়েছেন। পশ্চিম-পাকিস্তানি সদস্যরা চৌধুরী মুহাম্মদ আলীকে পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচিত করার পরও ঐ ওয়াদার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের তৎপরতা চলতে থাকলো।

১৪ জুলাই গণপরিষদ মুলতবি হয়ে যাবে। এরপর অধিবেশন করাচীতে বসবে। মারীতে শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শুরু হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

মৌলভী ফরীদ আহমদ থেকে এ সব মূল্যবান তথ্য জানার পর সিদ্দীকুল হাসান গিলানী ও টীম সদস্যদেরকে অবহিত করলাম। গিলানী সাহেব তাঁর পরিচিত পাঞ্জাবী সদস্যদের থেকে ঐ সব তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন। তাই আমাদের মারী অবস্থান দীর্ঘায়িত না করে লাহোর ফিরে যাওয়াই সমীচীন বলে সাব্যস্ত হলো।

মারী শহরে দেখার মতো কিছু থাকলে দেখে চলে যাবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। আসলে মারী শহরটাই দেখার মতো। পার্কগুলো ও বড় বড় রেস্টুরেন্টগুলোসহ গোটা শহরটিই দেখতে চমৎকার। পাহাড়গুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠে সারাটা শহর একসাথে দেখার পর আমরা আর মারীতে থাকা প্রয়োজন মনে করলাম না। জানা গেলো যে, ৮ আগস্ট (১৯৫৫) করাচীতে গণপরিষদের পরবর্তী অধিবেশন বসবে।

ইতোমধ্যে অসুস্থ গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ আরো অসুস্থ হওয়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ভারপ্রাপ্ত গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন এবং কিছুদিন পর গোলাম মুহাম্মদের মৃত্যু হলে ইস্কান্দার মির্জা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী করার মৌখিক ওয়াদা নাকি গোলাম মুহাম্মদ করেছিলেন। ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর জেনারেল হয়েই সোহরাওয়ার্দীকে জানিয়ে দিলেন যে, মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি যাকে নেতা নির্বাচিত করবে তিনি যদি পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন পান তাহলে তাকেই প্রধানমন্ত্রী করতে হবে।

মারী থেকে বিদায়

গণপরিষদ (Constitutional Assembly) দু'ধরনের দায়িত্ব পালনের অধিকারী। একটি হলো শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, অপরটি হলো কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসেবে দায়িত্ব পালন। মারী অধিবেশনে প্রথম দায়িত্বের কাজ শুরুই হয়নি। এমনকি দ্বিতীয় দায়িত্বে গণ্য কোন কাজ হয়েছে বলেও মনে হলো না। নানান দেন-দরবার, দরকষাকষি ও দলীয় কোন্দলই ৭ জুলাই থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত চললো। ১৪ তারিখে ঘোষণা করা হলো যে, গণপরিষদের পরবর্তী অধিবেশন ৮ আগস্ট করাচীতে শুরু হবে।

আমাদের সিদ্ধান্ত হলো যে, কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সেক্রেটারি গিলানী সাহেব ও আমি রাওয়ালপিণ্ডিতে দু'দিন অবস্থান করে লাহোর ফিরে যাবো। আর অন্যান্যরা নিজ নিজ এলাকায় চলে যাবেন। এটাও সিদ্ধান্ত হয় যে, ৮ আগস্টের ২/১ দিন আগেই সবাইকে করাচী পৌঁছতে হবে।

মারী ত্যাগের পূর্বে মাওলানা আতহার আলী ও মৌলভী ফরীদ আহমদের সাথে শেষ দেখা করতে গেলাম। প্রথমে ফরীদ আহমদের রুমে গেলাম। ইতোমধ্যে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সময় আমরা ছাত্র থাকাকালীন কতক স্মৃতিচারণ আমাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে। ১৯৪৪ সালে আমি

বিএ ক্লাসে ভর্তি হই। তিনি তখন বিএ অনার্স (ইংরেজি) থার্ড ইয়ারের ছাত্র। ৪৪-৪৫ সেশনের ডাকসু নির্বাচনে ফরীদ সাহেব স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ান। একটি মাত্র প্যানেল থাকায় নির্বাচনী প্রচারাভিযান তেমন ছিলো না। তবু কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকায় নির্বাচনে ভোট দিতে হলো। প্যানেলের ১৬ জনের মধ্যে ১৫ জনকে ভোট দিই, একজনকে কোন কারণে অপছন্দ করি। তার বদলে আমি ফরীদ সাহেবকে ভোট দিই। তিনি আমাদের হলে এসে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্য আমাকে আকৃষ্ট করে। এ সব কথা মারীতেই পয়লা তাঁকে জানাবার সুযোগ হয়। তাছাড়া ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষের লোক হিসেবেও আমরা একই আদর্শের পতাকাবাহী। ১৯৫৫ সালে মারীতে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় তা কোন সময়ই ঢিলা হয়নি। '৭১ সাল পর্যন্ত এ সম্পর্ক অটুটই ছিলো।

করাচীতে আবার দেখা হবে বলে ফরীদ সাহেব থেকে বিদায় হয়ে মাওলানা আতহার আলীর কামরায় গেলাম। তিনি যেনো আমারই অপেক্ষায় ছিলেন। বললেন, "আপনি দু'দিন আসেননি। এ দুদিনে আরো টেলিগ্রাম এসে জমা হয়েছে।" কিছুক্ষণ সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করে তাঁর কাছ থেকেও বিদায় নিলাম। করাচীতে যেনো আমি তাঁকে না ভুলি সে বিষয়ে তাগিদ দিয়ে বিদায় দিলেন।

৬৭.

রাওয়ালপিণ্ডিতে তিন দিন

রাওয়ালপিণ্ডিতে দু'দিন থাকার কথা ছিলো। কিন্তু স্থানীয় জামায়াত ৩ দিন থাকতে বাধ্য করলো। রাওয়ালপিণ্ডি পাঞ্জাব প্রদেশের একটি বিভাগীয় শহর। এ শহরের বড় পরিচয়ই হলো পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর হেডকোয়ার্টার এখানে অবস্থিত। হেডকোয়ার্টার তো দেখার সুযোগ নেই। বাকি শহরে দেখার মতো বিশেষ উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ছিলো না। একবেলা গাড়িতে শহরটা ঘুরে দেখলাম।

স্থানীয় জামায়াত নেতৃবৃন্দ আমাকে উপলক্ষ করে ব্যাপক সাংগঠনিক কর্মসূচি গ্রহণ করলেন। সকাল, বিকাল ও সন্ধ্যায় বিভিন্ন এলাকায় কর্মী-সমাবেশ হলো। এ সব সমাবেশে প্রশ্নোত্তরই প্রধান কর্মসূচি ছিলো। পূর্ব-পাকিস্তান সম্পর্কে জানার অদম্য উৎসাহ দেখে আমিও তাদেরকে দীর্ঘ সময় দিয়ে তৃপ্তি বোধ করলাম। পূর্ব-পাকিস্তান দেশেরই একটা প্রদেশ। অথচ সেখানে যেয়ে দেখা সম্ভব নয়। তাই আমার কাছ থেকে সবকিছু জেনে নেবার জন্য প্রশ্নের যেনো শেষ নেই।

পূর্ব-পাকিস্তানের আবহাওয়া, প্রধান খাদ্য, বিভিন্ন ধর্মের লোকের সংখ্যা, প্রধান ফসল, শিল্প, শিক্ষার হার ইত্যাদি এবং জামায়াতের সাংগঠনিক অবস্থা, পুরুষ, মহিলা ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের কতটুকু প্রসার ইত্যাদি সম্পর্কে অগণিত প্রশ্নের জওয়াব দিতে হয়েছে। তাদের আগ্রহে আমিও উৎসাহিত হয়ে জওয়াব দিয়েছি।

তিন দিন পর আমি ও গিলানী সাহেব লাহোর রওনা হলাম। রেল-কারেই গেলাম। পথে এক জায়গায় চলন্ত অবস্থাতেই বগিটি হঠাৎ প্রায় ফুট দুয়েক উপরে উঠে গেলো। বিরাট ঝাঁকুনি খেলাম। গতি মন্থর হয়ে গেলো। দুর্ঘনায় পড়েছি বলে শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। গাড়ি থামলে নিচে নেমে দেখলাম একটা মহিষ কাটা পড়েছে। বিরাট আকারের মহিষ। তাই গাড়ি লাফিয়ে উঠেছে। গাড়ি লাইনচ্যুত হয়নি বলে সবাই আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম।

লাহোরে মাওলানার সান্নিধ্যে বেশ ক'দিন থাকার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু করাচী থেকে ওখানকার জামায়াতের আমীর দাবি জানিয়েছেন যে, গণপরিষদের অধিবেশন করাচীতে শুরু হবার আগে পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে করাচীতে বাঙালি সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করার জন্য আমার অবিলম্বে করাচী চলে যাওয়া প্রয়োজন।

তাই মাওলানার নির্দেশে মাত্র ৩ দিন পরই করাচী চলে যেতে হলো। তখন প্রচণ্ড গরমের মওসুম। ২৪ ঘণ্টা ট্রেনে খুব কষ্ট হবে বলে প্লেনেই যাবার ব্যবস্থা করা হলো। মনোবেদনা নিয়েই মাওলানা থেকে বিদায় নেবার সময় বললাম, "আপনার সান্নিধ্যে আরও কিছুদিন থাকার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো না।"

তিনি বললেন, "দীনের দাওয়াতে মশগুল থাকার চেয়ে বড় কোন সৌভাগ্য মুমিনের নেই। ইনশাআল্লাহ, আবার দেখা হবে।"

করাচীতে আমার কর্মতৎপরতা

জামায়াতে ইসলামী করাচী শহর শাখার আমীর চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ জামায়াত অফিসের কাছে একটি হোটেলে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তিনি জানালেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে কর্মরত লোকদের মধ্যে যারা জামায়াতের রুকন বা কর্মী আছেন তাদের সহকর্মী বাঙালিদের সাথে আপনাকে তারা পরিচয় করিয়ে দেবেন। আপনি তাদের নিকট দীনের দাওয়াত যতটুকু সম্ভব পৌঁছাতে চেষ্টা করে দেখুন।

যোগাযোগের পদ্ধতিটি আমার ভালোই লাগলো। প্রথম দিন এক অফিসে দু'জন বাঙালির সাথে পরিচয় হলো। তারা আমাকে পেয়ে খুশিই হলেন। কার বাড়ি কোথায়, কে কোথায় লেখাপড়া করেছেন, সরকারি চাকরি কতোদিন থেকে করছেন ইত্যাদি খবরাখবর নেবার মাধ্যমে পরিচয় পর্ব শেষ হলো। তারা জানতে চাইলেন যে, আমি করাচীতে কেনো গেলাম। এর জওয়াবেই দাওয়াতী কথা বলার সুযোগ নিতে সক্ষম হলাম। দেশের শাসনতন্ত্র রচনার কাজ চলছে। গণপরিষদের সদস্যদের নিকট ইসলামী শাসনতন্ত্রের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্যই জামায়াতে ইসলামীর একটি টীম করাচীতে কাজ করছে। আমি বাঙালি সদস্যদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করার দায়িত্ব পালন করতে চাই। গণপরিষদের অধিবেশন মারীতে শুরু হয়ে মুলতবি হয়। আমি সেখানেও গিয়েছিলাম। তিন সপ্তাহ পর

করাচীতে সদস্যগণ আসলে এ কাজ শুরু হবে। এ ফাঁকে আমার অবসর সময়ে দেশী ভাইদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করছি।

আমি অনুভব করলাম যে, তারা আমাকে একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক বলেই ধারণা করেছেন। তারা আমার সাথে সম্মানজনকভাবেই ব্যবহার করলেন। তারা খুবই জুনিয়র কর্মকর্তা। দু'জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী। ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, "আপনারা যেখানে থাকেন সেখানে আমি যেতে পারবো। অফিসে আপনারা কর্মরত। এখানে বেশি সময় আপনাদের সাথে আলোচনা করতে গেলে নিশ্চয়ই কাজের ক্ষতি হবে।"

তারা আমার প্রস্তাব পছন্দ করলেন। তাদের ঠিকানা নিয়ে চলে এলাম। বললাম, "বাঙালি ভাইদের আরও কয়েকজনকে আপনাদের সাথে একত্র করা সম্ভব কিনা?" তারা উৎসাহের সাথে সম্ভব বলে জানালেন।

একদিন পরই ছিলো ছুটির দিন। নাশতা করে রওনা হলাম। গিয়ে দেখলাম যে, তারা ৭/৮ জন এক বাসায় ড্রইং রুমে বসা। সবাই আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। সবার সাথে কোলাকুলি হলো, ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হলাম। একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সময়কার ছাত্র। ডাকসুর সাবেক জিএস হিসেবে আমাকে চিনলেন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে দেওয়া স্মারকলিপির কথা উল্লেখ করলেন। ঐ ছাত্র সমাবেশে হাজির ছিলেন বলে জানালেন।

পরিচয় পর্বের মাধ্যমে আমরা মন খুলে কথা বলার মতো পরিবেশ পেলাম। অফিসে পরিচিত যে দু'জন এ বৈঠকের ব্যবস্থা করেছেন তারা সবাইকে আমার করাচী আসার উদ্দেশ্য জানিয়েছেন বলে তাদের প্রশ্নের ধরন থেকে বুঝতে পারলাম। প্রায় দু'ঘণ্টা তাদের প্রশ্নের জওয়াব দেবার মাধ্যমে ইসলাম যে শুধু ধর্ম নয়, ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান তা স্পষ্ট করে তুলে ধরার সুযোগ পেলাম।

জ্ঞান যে সত্যি কত বড় শক্তি তা সেদিন টের পেলাম। তাদের প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানসমৃদ্ধ উত্তর পেয়ে সবাই যেভাবে আমাকে সম্মান দেখালেন, তাতে আমি অভিভূত হলাম। দুঃখের বিষয় যে, তাদেরকে দেবার মতো বাংলা বা ইংরেজি কোন বই না থাকায় তাদেরকে কোন খোরাক দিয়ে আসতে পারলাম না। তখনো বাংলা বইতো পূর্ব-পাকিস্তানেই সামান্য কয়েকটা বের হয়েছে। পরে তাদেরকে 4 Point demand for Islamic Constitution নামে একটা পুস্তিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের মতো কোন বাংলা বা ইংরেজি বই দেওয়া গেলো না।

করাচীতে ৩ সপ্তাহ সময় এ ধরনের কাজেই ব্যস্ত রইলাম। কিন্তু বাংলা বই-পুস্তক না থাকায় তাদেরকে সংগঠনভুক্ত করা গেলো না। উর্দুভাষীদের যেমন সংগঠন রয়েছে, বাংলাভাষীদেরও সে রকম সংগঠন কায়েম করতে হলে আমাকে কিছুদিন সাপ্তাহিক বৈঠক পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয়। লোকদেরকে সংগঠন করতে রাজি করা, সংগঠনভুক্ত করা এবং বৈঠকে বসানো সময়সাপেক্ষ কাজ। আমার হাতে সে

সময় না থাকায় ইসলামের কিছু বীজ বপন ছাড়া বেশি অগ্রসর হওয়া সম্ভব হলো না। বাংলাভাষীদেরকে উর্দু ভাষায় পরিচালিত সংগঠনে শামিল করাও সঙ্গত মনে হলো না। কয়েকজনকে টার্গেট নেবার মতো অগ্রসর করা গেলো মাত্র।

গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হলো

৮ আগস্ট (১৯৫৫) গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হবার কথা। যথাসময়ে অধিবেশন বসলেও শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শুরুর কোন লক্ষণও দেখা গেলো না। পার্লামেন্ট হিসেবেই অধিবেশন শুরু হলো। ৯ আগস্ট চৌধুরী মুহাম্মদ আলী মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচিত হন। যুক্তফ্রন্ট, কংগ্রেস ও তফসিলীদেরকে সাথে নিয়ে চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ১০ আগস্ট। শেরে বাংলা এ মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পেলো।

চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার কায়েম হবার পর ডিসেম্বর মাস পর্যন্তও গণপরিষদের কাজ শুরু হতে পারেনি। গণপরিষদের সদস্যগণ পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবেই আইন রচনার কাজে মাসের পর মাস ব্যয় করার পর জানুয়ারি (১৯৫৬) মাসে শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শুরু হয়।

করাচীতে টীমের তৎপরতা

আমি তো গণপরিষদের অধিবেশন শুরুর তিন সপ্তাহ আগেই করাচী পৌঁছলাম। টীমের অন্যান্য সদস্য যথাসময়ে পৌঁছলেন। আমার মতো তাদেরকে কোন হোটেলে থাকার প্রয়োজন হয়নি। তাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতেই তারা অবস্থান করার সুযোগ পেয়েছেন।

গণপরিষদ সদস্যদের অধিকাংশই তাদের জন্য রবাদ্দকৃত হোস্টেলে থাকেন। তাদের সাথে সেখানেই সাক্ষাৎ করা সহজ। যারা ওখানে থাকেন না তাদেরকে গণপরিষদ ভবনের লবীতে নাগাল পাওয়া গেলেও ধীরে-সুস্থে আলোচনার সময় পাওয়া সহজ হয় না। তখন করাচী রাজধানী ছিলো বলে পশ্চিম-পাকিস্তানের সব প্রদেশের এমএনএ-দের বেশ সংখ্যক নিজস্ব বাড়িতেই থাকতেন। তাদের সাথে এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে সেখানেই দেখা করতে হয়। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি হিসেবে সাক্ষাতের জন্য সময় চাইলে কেউ সাক্ষাৎকার দিতে অস্বীকার করেন না।

আমরা ৫ জন নিজ নিজ প্রদেশের এমএনএ-দের সাথে সাক্ষাতের অভিযান রীতিমতো চালিয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে দেখা হয়ে গেলে নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে পরামর্শও করি। কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে আলোচনা করে সমাধান বের করি। করাচীর আমীর জনাব চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদের অফিসে মাঝে মাঝে আমরা একত্র হই। তিনি আমাদের কর্মতৎপরতার রিপোর্ট নিয়ে মাওলানাকে লাহোরে প্রতি সপ্তাহে জানান।

গণপরিষদের শাসনতন্ত্র রচনার কাজ তখনো শুরু হয়নি। সদস্যদেরকে ইসলামী

শাসনতন্ত্রের গুরুত্ব, মূল দাবিসমূহ ও এর যৌক্তিকতা এবং পাকিস্তান কায়েমের উদ্দেশ্য যে ইসলামী রাষ্ট্র ছিলো এ সব বিষয়ে অবহিত করে তাদেরকে এর সক্রিয় সমর্থক বানানোর উদ্দেশ্যেই আমরা কর্মতৎপর হলাম।

করাচীতেও মাওলানা আতহার আলীর সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছি। মাওলানা আমার তৎপরতার খবরাখবর নিতেন। এ কাজে আমাকে উৎসাহ দিতেন। ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আমার সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করতেন। জামায়াতের এ কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতিতে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করতেন। পশ্চিম-পাকিস্তানের সদস্যদের মধ্যে ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করে পূর্ব-পাকিস্তানের সদস্যদের ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন।

করাচীতে মৌলভী ফরীদ আহমদের সাথে মাঝে মাঝে দেখা হতো। তিনি পার্লামেন্টে জোরদার বক্তব্য রাখতেন এবং আমাকে সে বিষয়ে জানাতেন। তিনি ইংরেজিতে তুখোর বক্তা হিসেবে জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর কারণেই নেযামে ইসলাম পার্টির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

লবীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা

খাজা নাজিমুদ্দীনের আমলে প্রণীত ১৯৫৩ সালের শাসনতন্ত্র ও ১৯৫৪ সালের মুহাম্মদ আলী বগড়ার সময়কার রচিত শাসনতন্ত্র নতুন গণপরিষদের নিকট বিবেচ্য বলে গণ্য না হলেও ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ গণপরিষদে গৃহীত Objectives Resolution (আদর্শ প্রস্তাব) বাতিল না করায় ইসলামী শাসনতন্ত্রের ভিত্তি বহাল ছিলো। তাই আমাদের জন্য সদস্যদের সাথে আলোচনার সুযোগ ছিলো। পূর্ব-পাকিস্তানের সদস্যদের মধ্যে মুসলিম লীগের একমাত্র সদস্য ছিলেন মুহাম্মদ আলী বগড়া। তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্রের সমর্থক হলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি এ বিষয়ে কোন ভূমিকা রাখা সম্ভব মনে করেননি। তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম সদস্যদের সবাই মুসলিম লীগেরই ছিলেন। এখন তাদের কেউ নেই। আমি পূর্ব-পাকিস্তানের ৪০ জন সদস্যের মধ্যে কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের ১৬ জন ও আওয়ামী মুসলিম লীগের ১২ জনের সাথেই যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। Basic Principles of Islamic Constitution নামে একটি পুস্তিকা সবার মধ্যে বিলি করা হয়। সদস্যগণ নিজস্ব কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাকে সময় দিতেন।

তাদের সাথে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের লোক পেয়েছি। নেযামে ইসলাম পার্টির কে কে এবং কয়জন ছিলেন তা স্মরণ করতে পারছি না। তবে যুক্তফ্রন্টের ১৬ জনের মধ্যে বেশির ভাগই ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। একমাত্র হামীদুল হক চৌধুরীই বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, "শাসনতন্ত্রের সাথে ইসলামের কী সম্পর্ক? ধর্মের বিধান আলাদা বিষয়। আধুনিক যুগের উপযোগী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে।" এখানে ইসলামের কথা অপ্রাসঙ্গিক।

আধুনিক শিক্ষিত লোকদের ইসলামী শাসনতন্ত্রের ধারণা থাকা মোটেই স্বাভাবিক নয়। ইসলাম তাদের নিকট ধর্ম হিসেবেই পরিচিত। ইসলাম সম্পর্কে তাদের অধ্যয়নের সুযোগ কোথায়? আলেম সমাজেরও এ বিষয়ে সঠিক ধারণা ছিলো না। ১৯৫১ সালে করাচীতে সকল ইসলামী মহলের ৩১ জন আলেমের সম্মেলনে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রকাশের পরই আলেম সমাজে এর চর্চা শুরু হয়।

আওয়ামী মুসলিম লীগের সদস্যদের মধ্যে প্রথমেই মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের সাথে দেখা করলাম। তিনি মাওলানা হিসেবে পরিচিত হওয়ায় এ বিষয়ে আগ্রহী হবেন বলে আশা করেই তার কাছে গেলাম। তিনি এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে হাসিমুখে হাত মিলিয়ে বসতে দিলেন। কিন্তু কথা বলার সুযোগ তেমন পেলাম না। আমি কেনো এলাম সে বিষয়ে জানতেও চাইলেন না। তিনি নিজেই সারাক্ষণ কথা বলতে থাকলেন। কুরআনের আয়াতও মাঝে মাঝে তিলাওয়াত করলেন। কিন্তু তিনি কী বুঝাতে চাইলেন তা আমার মগজে স্পষ্ট হলো না। আমি কয়েকবার চেষ্টা করেও ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মত-বিনিময়ের সুযোগ পেলাম না। আমার কথার মাঝখানেই তিনি আবার কথা বলা শুরু করলেন। আমি বুঝলাম যে, তিনি আমার সাথে আলোচনার জন্য মোটেই প্রস্তুত নন। আরও একবার গিয়ে একই অবস্থা দেখে চলে এলাম। এটা তাঁর স্বভাব, না আমার সাথেই তিনি এ আচরণ করলেন তা আল্লাহ্ তাআলাই ভালো জানেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করার সুযোগ পেলাম। শেখ মুজিব আমার চাচা জনাব শফিকুল ইসলামের রাজনৈতিক সহকর্মী ও বন্ধু। তাঁরা দু'জনই এক বয়সের। বয়সে আমার চেয়ে তিন বছরের বড়। তাদেরকে আমি তুই-তুমি সম্বোধন করে কথা বলতে কয়েকবারই দেখেছি। কিন্তু তিনি আমার সাথে কথা বলতে চাচার বন্ধু হিসেবে মুরুব্বির ভাব দেখাতেন না। আমাকে আপনি করেই বলতেন এবং স্বাভাবিক সৌজন্যমূলক ব্যবহারই করতেন। চাচার অপর এক ঘনিষ্ঠ ও সমবয়সী বন্ধু খন্দকার মুশতাক আহমদ মুরুব্বীয়ানা আচরণ করতেন। বাবা, চাচামিয়া কেমন আছ ইত্যাকার ভাষায় আমার সাথে কথা বলতেন।

ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে শেখ মুজিব আমাকে বললেন, "আমরা পশ্চিম-পাকিস্তানি নেতাদের চেয়ে ভালো মুসলমান। ওরাই ইসলাম থেকে দূরে। ওদের জীবনাচার বিলাসিতায় পূর্ণ। ওদেরকে বুঝান। ওরা ইসলামী শাসনতন্ত্র চাইলে আমরা বাধা দেবো না।"

আমি বুঝলাম যে, তিনি রাজনৈতিক কৌশলে আমাকে বিদায় করতে চাচ্ছেন। 'কুরআন ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে কোন আইন করা হবে না' ইসলাম সম্পর্কে এটুকু নীতিই যথেষ্ট বলে তিনি মনে করেন। তার সাথে আলোচনায় এ কথাই স্পষ্ট বুঝা গেলো।

আমাদের শিক্ষিত সমাজ যে শিক্ষাব্যবস্থায় গড়ে উঠেছে সেখানে ইসলামকে একটি জীবন বিধান হিসেবে জানবার সামান্য সুযোগও নেই। পাঠ্যসূচিতে যতো বিদ্যা

শেখার ব্যবস্থা আছে তাতে এ বিশ্বের কোন স্রষ্টা আছে কিনা, মৃত্যুর পর আবার জীবিত হতে হবে কিনা, সেখানে পার্থিব জীবন সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে কিনা, মানুষের জীবনে স্রষ্টার নিকট থেকে পথ-নির্দেশ পাওয়ার দরকার আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মগজে সামান্য ভাবনা-চিন্তার উদ্রেক হবারও কথা নয়। তাদের মধ্যে যারা নামায-রোযা করেন তারা পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবেই তা করেন। বাস্তব জীবনের সাথে এ সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা জানেন না। তাদের এ অবস্থার জন্য তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। শিক্ষাব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী।

একটি বিশেষ উপলব্ধি

গণপরিষদ সদস্যদের মধ্যে যারা নামায-রোযা করেন না তাদের কথা আলাদা। যারা মোটামুটি ধার্মিক তাদের মধ্যেও ইসলামে ফৌজদারি আইনে কঠিন শাস্তির বিষয়টি বিরাট সমস্যা হিসেবে গণ্য। চোরের হাত কেটে ফেলা, যিনার জন্য পাথর মেরে হত্যা করার মতো 'অমানবিক' আইন বর্তমান সভ্যজগতে কি চালু করা সম্ভব? ইসলামী শাসনতন্ত্র সমর্থন করেও এ প্রশ্নে তারা বিব্রত। তাদের এ মানসিক অবস্থা বিবেচনা যোগ্য এবং এর সঠিক জওয়াব প্রয়োজন। বাংলা বা ইংরেজিতে এ বিষয়ে কোন বই আছে কিনা তা আমার জানা ছিলো না। উর্দুতে আমি যা পড়েছি এর ভিত্তিতে তাদেরকে জওয়াব দিয়েছি। কিন্তু আমার মুখের কথায় তারা সন্তুষ্ট বলে মনে হয়নি।

প্রশ্নকারীদের মুখ বন্ধ করার মতো একটা জওয়াব দেওয়া যায় বটে, কিন্তু এতে মন সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে জওয়াবটি হলো, "যারা চোর ও ব্যভিচারী তারা ইসলামের এ কঠোর শাস্তিকে ভয় করাই স্বাভাবিক। ভদ্র লোকেরা ভয় পাবে কেনো?"

আমি উপলব্ধি করলাম যে, আমাদের শিক্ষিত সমাজে ইসলাম সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত এ বিষয়ে বিব্রত থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ বিষয়ে কোন বই রচনা করার চেষ্টা করিনি। অথচ এটা অনেক আগেই করা প্রয়োজন ছিলো।

এ প্রয়োজন এতদিনে পূরণ হলো

১৯৯১ সালের কথা। জামায়াতে ইসলামী রাজশাহী শহর অফিসে তদানীন্তন RDA (Rajshahi Development Authority)-এর চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার (১৯৯৬ সালে মেজর জেনারেল হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত) আইনুদ্দীন আমার সাথে দেখা করতে এলেন। বললেন, "আপনাদের স্লোগান আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন" এর শেষাংশটি খুবই আকর্ষণীয়। আসলে সৎ লোকের শাসনের অভাবেই এতো অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা। কিন্তু অনেকেই 'আল্লাহর আইন'-কে বড় ভয় পায়। এতো কঠোর শাস্তি আর কোন আইনে নেই।

আমি বললাম, "আল্লাহর আইন মানে শুধু ফৌজদারি আইন নয়; মানুষকে সৎ বানাবার আইন, মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের আইন, অভাবের কারণে যেন অপরাধ করতে বাধ্য না হয় সে ব্যবস্থার আইন, বিবেকের বিরুদ্ধে চলার মতো

সুযোগ যাতে না থাকে তেমন পরিবেশ সৃষ্টির আইন ইত্যাদি চালু করার পরও কেউ কুস্বভাবের বশবর্তী হয়ে অপরাধ করলে ইসলাম এমন কঠোর শাস্তির আইন দিয়েছে, যাতে মানুষ অপরাধ করার সাহসই না পায়।"

ব্রিগেডিয়ার সাহেবের ঐ কথা শুনবার পরই আমি 'আল্লাহর আইন সৎ লোকের শাসন' নামক বই লেখা প্রয়োজন মনে করলাম। সে হিসেবে এ বইটি রচনায় তাঁর পরোক্ষ অবদান অবশ্যই রয়েছে।

আল্লাহর আইন আমাদের দেশে নেই। যে আইনই আছে তাতে মানুষ কিছুটা হলেও নিরাপদ বোধ করতে পারতো যদি শাসকরা সৎ লোক হতো। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী থেকে থানার দারোগা-পুলিশ পর্যন্ত যারা দেশ শাসন করছেন, তারা যে শিক্ষাব্যবস্থায় গড়ে উঠেছেন সেখানে নৈতিকতা ও সততা শিক্ষা এবং বিবেককে লালন করার কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এ কারণেই সৎ লোকের শাসন থেকে দেশ বঞ্চিত।

বিনা পরিকল্পনায় বাগান তৈরি হয় না; কিন্তু জঙ্গল আপনা-আপনিই তৈরি হতে পারে। তদ্রূপ সৎ লোক এমনিতেই গড়ে উঠে না। যে বিবেকের বিরুদ্ধে চলে না সে-ই সৎ লোক। আল্লাহর ভয় ও আখিরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতিই মানুষকে সৎ বানায়। এটা অবিরাম প্রশিক্ষণের বিষয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এর কোন কর্মসূচি নেই। দেশ পরিচালনার দায়িত্বশীলদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। এটা সত্যিই ভয়ানক উদ্বেগের কারণ।

অপরাধ দমনের জন্য থানায় দারোগা-পুলিশ রয়েছে। এরাই যদি অপরাধপ্রবণ হয় তাহলে অপরাধ দমন করবে কে? এরা যদি ভেতর থেকে সৎ না হয় তাহলে উপায় কী? বেড়া-ই যদি ক্ষেত খায় তাহলে রক্ষা করবে কে? তাই শাসন-ক্ষমতা সর্ব পর্যায়ে এমন লোকদের হাতেই থাকা প্রয়োজন, যারা বিবেকের বিরুদ্ধে চলবে না।

মানুষ জন্মগতভাবে অসৎ হয়ে পয়দা হয় না, এ কথা ঠিক; কিন্তু কোন মানুষই আপনা-আপনি সৎ হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। সে যে মানের পরিবার, সমাজ ও পরিবেশে ছোট থেকে বড় হয় সে সে মানেই গড়ে উঠে। বিনা পরিকল্পনায় সৎ লোক গড়া সম্ভব নয়। এক খণ্ড জমি নিজে একটা জঙ্গলে পরিণত হয়; সেখানে ফুল বা ফলের বাগান বিনা পরিকল্পনায় গড়ে উঠবে না।

সব মানুষই সুখে-শান্তিতে থাকতে চায়। ভালো আইন ও সৎ লোকের শাসন ছাড়া এ আশা পূরণ হতে পারে না। তাই এ বিষয়টা প্রত্যেকের সবচেয়ে জরুরি চাহিদা। কিন্তু দুনিয়ায় এরই সবচেয়ে বেশি অভাব। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতটুকু উন্নতি হয়েছে, তাতে এ অভাব পূরণের বদলে আরও বেড়ে গেছে। তাই ঠাণ্ডা মাথায় এ সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করা কর্তব্য।

আল্লাহর আইন মানে কী

ইসলাম বিরোধীদের কুপ্রচারণার ফলে সাধারণভাবে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, আল্লাহর আইন মানে চোর-ডাকাতের হাত কাটা, যিনাকারকে সঙ্গেসার (পাথর

মেরে হত্যা) করা, মদখোরকে বেত মারা, সুদখোরকে জেলে দেওয়া ইত্যাদি। সমাজে চুরি-ডাকাতি, যিনা, মদ, সুদ, জুয়া ইত্যাদি ব্যাপক হওয়ায় বহু লোক এ সব মন্দের সাথে জড়িত। তাই ইসলামবিরোধীরা এ সব লোককে আল্লাহর আইন কায়েমের বিরুদ্ধে সংগঠিত করার হীন উদ্দেশ্যেই এ অপপ্রচার চালায়।

অথচ আল্লাহর আইনের উদ্দেশ্য হলো সমাজকে এমনভাবে গঠন করা, যাতে জনগণের মন, মগজ, চরিত্র আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা মতে গড়ে উঠার সুযোগ পায়। মানুষ ভাত, কাপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির অভাবে যেনো অসৎ পথে চলতে বাধ্য না হয়। বিয়ে ছাড়া যেনো নারী-পুরুষের অবৈধ মিলনের কোন সুযোগ না ঘটে। যেসব কুঅভ্যাস সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে, তা থেকে জনগণকে যাতে রক্ষা করা যায়।

সাধারণ শিক্ষা, বিশেষ শিক্ষা, প্রচার ও গণশিক্ষার মাধ্যমে জনগণকে আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূল (স)-এর আনুগত্য করার যোগ্য বানানোই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব। জনগণের মৌলিক প্রয়োজন যাতে পূরণ হয় এবং মানুষ যাতে অভাবের কারণে কুপথ বেছে না নেয়, সে ব্যবস্থা করাও সরকারের কর্তব্য। হালাল পথে রোজগার করার সুযোগ দান করে হারাম পথ বন্ধ করাও সরকারেরই দায়িত্ব। এতো কিছু করার পরও যারা অপরাধ করে তাদের জন্যই কঠিন শাস্তি।

রংপুর কলেজ থেকে অপ্রত্যাশিত চিঠি

করাচীতে আমার কর্মব্যস্ত দিনগুলো বেশ ভালোভাবেই কেটে যাচ্ছিলো। আমি মন-প্রাণ দিয়ে দায়িত্ব পালন করছিলাম। হঠাৎ জামায়াতের অফিসের ঠিকানায় এক অভাবিত চিঠি পেলাম। ইংরেজিতে টাইপ করা চিঠিটি লিখেছেন রংপুর কারমাইকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর আশকার আলী। তাঁকে সরকারি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে চিনতাম। তিনি পোশাকে ও আচরণে ইংরেজদের অনুকরণ করতেন। মাথায় হ্যাট পড়েই ক্লাসে যেতেন।

তাঁর চিঠি পেয়ে প্রথমে বিস্মিত হলাম। চিঠি পড়ে পুলকিত ও উল্লসিত হলাম। চিঠি থেকে বুঝতে পারলাম, আমার সময়কার প্রিন্সিপাল শাহাবুদ্দীন আহমদ বিদায় নিয়েছেন এবং ডক্টর আশকার আলীকে সরকার 'অন ডিপুটেশন' প্রিন্সিপালের দায়িত্ব দিয়েছেন। চিঠির মর্ম নিম্নরূপ ঃ

"আমি আনন্দের সাথে আপনাকে জানাচ্ছি যে, এ কলেজের ছাত্ররা আপনাকে আবার তাদের অধ্যাপক হিসেবে পেতে চায়। তারা গভর্নিং বডির নিকট জোর দাবি জানায়। গভর্নিং বডিও আপনাকে কলেজে পুনর্বহাল করতে সম্মত। আপনার এ জনপ্রিয়তায় আমি অভিভূত। তাই কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে আপনার নিকট আমার প্রস্তাব ঃ

আপনি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করতে সম্মত হলে অবিলম্বে চলে আসুন। যদি চাকরিতে বহাল হতে না চান তাহলেও রংপুরে এসে বেড়িয়ে যান। কলেজ আপনাকে বিদায় সংবর্ধনা জানিয়ে সম্মানের সাথে অব্যাহতি দেবে। যেভাবে

আপনাকে বিদায় করা হয়েছে, তা ছাত্র ও অভিভাবকগণের নিকট অত্যন্ত আপত্তিকর। আমার প্রস্তাব আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য কিনা অবিলম্বে জানান।"

এ চিঠি আমার মনে কী তৃপ্তি দিয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আমি জীবনের মিশন হিসেবে অধ্যাপনার পেশা গ্রহণ করেছিলাম। ১৯৫৫ সালে চাকরি থেকে বিদায় হয়েছি। কিন্তু কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্তও বহুবার স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি কলেজে আবার শিক্ষকতা করছি। এ স্বপ্নটি আমার প্রিয় স্বপ্নগুলোর একটি, যা দেখার সুখ এখনো অনুভূত হয়।

এ বিবেচনায় আমার পক্ষ থেকে উক্ত প্রস্তাব লুফে নেবারই কথা। কিন্তু ইতোমধ্যে আমি জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে ফেলেছি। তাই কলেজে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া গেলো না। ইসলামী আন্দোলনে আমি শিক্ষকের ভূমিকা পালনেই তৃপ্তি বোধ করছি। ছাত্রদের বদলে সংগঠনের কর্মীদের গড়ে তুলবার কর্মসূচিই আমার সবচেয়ে প্রিয় কাজ। আমি মনে করি যে, আমি শিক্ষকতা ত্যাগ করিনি, কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করেছি মাত্র।

আমি করাচীতে যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে তৎপর এটা মুলতবি করারও উপায় নেই। যদি আমি ঐ সময় দেশে থাকতাম তাহলে হয়তো দ্বিতীয় প্রস্তাবটি কবুল করতাম। আমি প্রিন্সিপালের চিঠির জওয়াবে লিখলাম, "আপনার আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠির জন্য গভীর শুকরিয়া জানাই। আপনার মূল্যবান প্রস্তাব পেয়ে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ। কিন্তু আমার পক্ষে কলেজে আবার যোগদান করা কিছুতেই সম্ভব নয়। রংপুর যেয়ে সসম্মানে বিদায় নেবার জন্য যাওয়াও অসম্ভব। আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে কলেজের সকল ছাত্র, ছাত্রদের অভিভাবক ও গভর্নিং বডির নিকট আমি তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার প্রতি যে আচরণ করা হয়েছিলো, আপনার চিঠি সে দুঃখও সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দিয়েছে।"

৬৮.

করাচীতে জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলন

গণপরিষদের সদস্যদের সাথে লবীর কাজে আমি ১৯৫৫ সালের জুলাই থেকে নিয়োজিত ছিলাম। তখন পাকিস্তানের রাজধানী ছিলো করাচী। সেখানেই গণপরিষদের অধিবেশন চলছিলো। ঘটনাক্রমে অক্টোবরেই করাচীতে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে যোগদানের সৌভাগ্য আমার সাংগঠনিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন জামায়াতের করাচী শহর শাখার আমীর চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ। বিশাল এক এলাকা জুড়ে সম্মেলনের আয়োজন। এমন চমৎকার সুশৃঙ্খল কোন সম্মেলন ইতঃপূর্বে কখনো দেখিনি। তাই প্রবল ঔৎসুক্য নিয়ে আমি ব্যবস্থাপনার সকল দিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন মনে করলাম। এতে যা শেখার

সুযোগ পেলাম, তা বই-পুস্তক পড়ে জানার বিষয় নয়। পূর্ব-পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলন আয়োজনে আমার ঐ বাস্তব অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে।

ঐ সম্মেলনে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে প্রাদেশিক আমীর চৌধুরী আলী আহমদ খান, সেক্রেটারি মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, রাজশাহী বিভাগের আমীর আসাদ গিলানী এবং অল্প কয়েকজন উর্দুভাষী রুকন যোগদান করেন। সম্মেলনে বিভিন্ন প্রদেশের রুকনদের জন্য নির্দিষ্ট প্যান্ডেল ছিলো। অধিবেশনের জন্য সাজানো প্যান্ডেলটি দেখার মতো ছিলো। বড় বড় অক্ষরে অর্থসহ কুরআনের আয়াত ও হাদীসের বিরাট বিরাট ব্যানার, মাওলানা মওদূদীর উদ্ধৃতি সংবলিত প্রচুর পোস্টার, জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াতী পোস্টার ইত্যাদিতে গোটা প্যান্ডেল সুশোভিত ছিলো। পাতাবাহার ও ফুলের টব চমৎকারভাবে সাজানো ছিলো।

খাওয়ার প্যান্ডেল আলাদা ছিলো। এ ধরনের সম্মেলনে খাদ্য পরিবেশন, যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ডেলিগেটদের সন্তোষ অর্জন করা সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। এদিক দিয়েও ঐ সম্মেলন সুনামের সাথে উত্তীর্ণ।

এতো লোকের পেশাব-পায়খানার সুব্যবস্থা করা, অযূ-গোসলেরর এন্তেজাম করা এবং পানির সরবরাহ যথাযথভাবে করা সহজসাধ্য নয়। এ সব বিষয়েও চমৎকার ব্যবস্থা দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার বিবরণ আর দীর্ঘ করবো না। এ সম্মেলন থেকে শেখার বিষয়গুলো আমার নিকট গুরুত্বপূর্ণ ছিলো বলে এতটুকু উল্লেখ করলাম।

এ সম্মেলন শুধু রুকনদের সম্মেলন ছিলো না। এতে জামায়াতের কর্মী ও সমর্থকগণও শরীক হয়েছেন। মহিলাদের জন্য পৃথক প্যান্ডেল ও যাবতীয় ব্যবস্থা ছিলো। তাদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মহিলা রুকন ও কর্মীদের উপরই ন্যস্ত ছিলো। এটাও আমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা।

মাওলানা মওদূদীর সাথে দীর্ঘ একান্ত সাক্ষাৎ

সম্মেলন উপলক্ষে মাওলানা কয়েকদিন আগেই লাহোর থেকে করাচী পৌঁছেন। সম্মেলনের পূর্বে মজলিসে শূরার একাধিক বৈঠক করলেন। আমরা যে ৫ জন গণপরিষদ সদস্যদের সাথে লবী করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম, মাওলানা তাদেরকে ডাকলেন। তিনি আমাদের তৎপরতার বিবরণ জানতে চাইলেন। গণপরিষদ সদস্যদের অবস্থা ও তাদের মধ্যে আমাদের চেষ্টার প্রতিক্রিয়া জেনে নিলেন। কিছু মূল্যবান পরামর্শও দিলেন, যা পরবর্তীতে আমাদের কাজে লেগেছে। মাওলানার সাথে এ সাক্ষাতের সুযোগে আমি তাঁর নিকট ঘণ্টাখানেকের জন্য একান্ত সাক্ষাতের আবদার জানালাম। সম্মেলন উপলক্ষে আগত মজলিসে শূরার বৈঠক ও প্রাদেশিক আমীরদেরকে সাক্ষাৎ দানে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি সময় দিতে রাজি হলেন। আমার আবেগপূর্ণ আবদার কবুল করায় অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আমার একটি কথার বিশেষ গুরুত্ব দিলেন। বলালাম,

"পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বার বার এসে আপনার নিকট মনের কথা খুলে বলার সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। আমার মনে এমন কিছু প্রশ্ন আছে, যা শুধু আপনাকেই করতে হবে। আন্দোলনের জীবনে এ সব প্রশ্নের জওয়াব আমার জন্য অত্যন্ত জরুরি।"

তিনি এক ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করলেন। কিন্তু সাক্ষাতের সময় দেড় ঘণ্টা চলা সত্ত্বেও তিনি আপত্তি করেননি।

আমার প্রথম প্রশ্ন

যথাসময়ে মাওলানার সান্নিধ্যে পৌঁছলাম। তিনি স্বভাবসুলভ মিষ্টি মুচকি হাসি দিয়ে হাত মিলালেন। খুব কাছাকাছি চেয়ারে বসতে বললেন। মাঝে কোন টেবিলও ছিলো না। বললাম, "আমার প্রথম প্রশ্নটি আপনার সম্পর্কেই। উপমহাদেশে খ্যাতনামা আলিমদের তালিকায় আপনার নাম উচ্চারিত হয় না। বড় কোন মাদ্‌রাসা থেকে কোন ডিগ্রিও আপনি হাসিল করেননি, অথচ আপনিই এ যুগে এ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামী আন্দোলনের ডাক দিলেন। ইসলাম যে শুধু ধর্ম নয়; ইসলাম যে একটি বিপ্লবী আন্দোলন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, মানব সমাজে ইসলাম যে বিজয়ী হওয়ার জন্যই প্রেরিত হয়েছে এবং মুসলিম জীবনের আসল কর্তব্যই যে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন কায়েম করা, এ সব বিপ্লবী কথা আপনি কোথায়, কিভাবে শিখলেন? উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমগণ যা জানেন বলে প্রমাণ পাই না, তা আপনি কেমন করে জানলেন?"

এত বিরাট প্রশ্নের অতি সংক্ষিপ্ত জওয়াবে বললেন, "আমি 'আল-জিহাদ ফিল ইসলাম' বই থেকে এ সব শিখেছি।"

এটুকু বলেই তিনি মুচকি হেসে মুখে পান নিলেন। আমি তো এ জওয়াব শুনে হতবাক। বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম,

"মাওলানা এ বইটি তো আপনারই রচনা। এ বই থেকে কেমন করে শিখলেন আমি বুঝতে পারলাম না।" তখন তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন।

"১৯২৪ সালে খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর মুসলিম জাতির উপর চরম হতাশা নেমে আসে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নামে এক হিন্দু ধর্মীয় নেতা 'শুদ্ধি আন্দোলন' নামে মুসলমানদেরকে হিন্দু ধর্মে ফিরে আসার আহ্বান জানায়। তার মতে, ভারতের মুসলমানরা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। মুসলমানদের রাজত্ব খতম হয়ে যাবার পর তাদের আবার হিন্দু হয়ে যাওয়া উচিত। সে ইসলাম ও রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে জঘন্য ভাষায় প্রচারাভিযানও চালায়।

১৯২৬ সালে আবদুর রশীদ নামের একজন সাধারণ মুসলমান উক্ত নেতাকে হত্যা করে নিজেই পুলিশের নিকট ধরা দেন। আদালতে তিনি প্রশান্ত মনে স্বীকার করে বলেন, "ইসলাম ও রাসূলের ইজ্জত রক্ষার জন্য আল্লাহর এ দুশমনকে আমি হত্যা করেছি। আমি বিশ্বাস করি, এর ফলে আমি বেহেশত লাভ করবো। আমাকে আপনারা ফাঁসি দিতে চান দিন। আমি এ জন্য প্রস্তুত।"

এ ঘটনা সারা ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদেরকে ক্ষেপিয়ে দিলো। এমনকি গান্ধীর মতো উদারপন্থী নেতাও বিবৃতিতে বললেন, "মুসলমানদের ইতিহাস থেকে রক্তের গন্ধ পাওয়া যায়। জিহাদের প্রেরণা মুসলমানদেরকে খুনী বানায়।" আমি তখন দিল্লিতে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মুখপত্র অর্ধ-সাপ্তাহিক 'আল জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদক।

আমি দিল্লির শাহী জামে মসজিদেই জুমআর নামায আদায় করতাম। মুসলমাদের সবচেয়ে সাহসী ও জনপ্রিয় নেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর দিল্লি উপস্থিত থাকলে ঐ মসজিদে ভাষণ দিতেন। এক জুমআয় তিনি আক্ষেপের সাথে বললেন যে, ইসলামের জিহাদ সম্পর্কে এতো অপপ্রচার চলছে। এমন কোন মুসলমান কি নেই যে এ সবের জওয়াব দিতে পারে? তার বক্তব্য এমন প্রাণস্পর্শী ও প্রেরণাদায়ক ছিলো যে, আমি এ বিষয়ে লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। (তখন মাওলানার বয়স মাত্র ২৩ বছর)।

"আমি লেখা শুরু করলাম। আল জমিয়ত পত্রিকায় কিস্তির পর কিস্তি লিখছি। এ পত্রিকার পাঠকদের মধ্যে সারা ভারতের বড় বড় আলেমও রয়েছেন। কয়েক কিস্তি প্রকাশিত হবার পর থেকেই আলেমদের চিঠি আসা শুরু হলো। আমাকে উৎসাহ দেবার সাথে সাথে মূল্যবান পরামর্শও আসতে থাকলো। এ বিষয়ে এমন কতক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকের নাম জানতে পারলাম, যেসব নাম আগে কখনও শুনিনি। কেউ কেউ আরবী ভাষায় রচিত প্রাচীন প্রাসঙ্গিক বই লোক মারফত পাঠিয়ে দিয়েছেন। মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহর বিখ্যাত বিরাট লাইব্রেরী থেকে যে কোন কিতাব ব্যবহার করার সাদর আহ্বান পেলাম। রেফারেন্স হিসেবে যতো বই-এর নাম জানলাম তার অধিকাংশই মুফতী সাহেবের লাইব্রেরীতে পাওয়া গেলো। যেসব সেখানে নেই তা যোগাড় করার দায়িত্ব তিনিই নিলেন। বহু দূর-দূরান্ত থেকেও বই আনা হলো। মনে হলো যে, গোটা আলেম সমাজ আমাকে এ বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করা কর্তব্য মনে করেছেন। জিহাদ সম্পর্কে আমার গবেষণায় অনেক আলেম আশাতীত সহযোগিতা করেছেন। দু'বছরে আমার এ গবেষণা সম্পন্ন হয় এবং ১৯২৮ সালে তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।"

সত্যি কথা বলতে কি এ গ্রন্থটি রচনা করতে আমাকে ব্যাপক অধ্যয়ন করতে হয় এবং এ গবেষণাই আমাকে ইসলামের বিপ্লবী রূপের সন্ধান দেয়। তাই বলেছি যে, এ বই থেকেই আমি এ সব শিখেছি।"

মাওলানার এ দীর্ঘ বক্তব্য থেকে আমার এ ধারণা হলো যে, কেউ কোন বিষয়ে সাধনা করলে অপ্রত্যাশিতভাবেই সহযোগিতা পাওয়া যায়। মাওলানার এ মহা মূল্যবান গ্রন্থটি রচনার এ ইতিহাস অন্য কোথাও লিখিত আছে কিনা জানি না। আমি সর্বপ্রথম তাঁর মুখ থেকেই এ সব কথা জানতে পেরেছি। মাওলানাকে আল্লাহ তাআলা প্রতিভা দিয়েছেন। তাঁর মতো প্রতিভার হাতেই এ বিরাট কাজটি হলো। মুসলিম জাতির ঐ হতাশার সময় আল্লাহ পাক তাঁর মাধ্যমে ইসলামে বিপ্লবী

চেতনার উন্মেষ ঘটালেন। এভাবেই যুগের দাবি পূরণের ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা সব যুগেই করে থাকেন।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন

"আপনি আল জিহাদ ফিল ইসলাম'-এর এক স্থানে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত ভার্সাই সন্ধির পর্যালোচনা করতে গিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, আবার যদি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তাহলে তা পোল্যান্ড থেকে শুরু হবে। আপনার লেখার ১২ বছর পর ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর সত্যি সত্যিই পোল্যান্ড থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। আমার জানতে ইচ্ছে করে যে, আপনার উপর ইলহাম হয় কিনা?"

জওয়াবে মুচকি হেসে বললেন, "আমি জানি না, ইলহাম হয় কিনা। তাছাড়া যার উপর ওহী নাযিল হয়, তিনি জানতে পারেন যে, কোন্‌টা ওহী। কিন্তু কারো উপর ইলহাম হলেও তার পক্ষে নিশ্চিত হওয়া কঠিন যে, তার জ্ঞানের কোন্ অংশটি ইলহাম। কেনো পোল্যান্ড থেকে যুদ্ধ শুরু হবে সে বিষয়ে আমি প্রয়োজনীয় যুক্তি পেশ করেছি। ২ আর ২ যোগ করলে যেমন সবাই বলবে যে, যোগফল ৪-ই হবে। আমিও ভার্সাই সন্ধি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি যে, কেনো পোল্যান্ড থেকে যুদ্ধ শুরু হবে।"

আমার তৃতীয় প্রশ্ন

১৯৪০-এর সেপ্টেম্বরে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রাচী হলে দেওয়া আপনার ভাষণটি আমি ইংরেজিতে গত বছর পড়েছি। আপনার বক্তৃতার উর্দু পুস্তিকার নাম হলো 'ইসলামী হুকুমত কিস্ তারাহ কায়েম হুতী হ্যায়?' ইংরেজিতে এর নাম The Process of Islamic Revolution. (বাংলায় 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' নামে অনূদিত।) ঐ বক্তৃতায় আপনি ১৯৪০-এর মার্চ মাসে লাহোরে মুসলিম লীগের সম্মেলনে গৃহীত ভারত বিভাগের প্রস্তাবকে জোর সমর্থন জানিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মুসলিমগণ একটি আলাদা জাতি হিসেবে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম করার যথার্থ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ঐ রাষ্ট্রটি ইসলাম অনুযায়ী পরিচালিত না হলে এর উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। আপনি ঐ ভাষণে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, যারা পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র কায়েমের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা ঐ রাষ্ট্রটিকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়োজনীয় কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করছেন না। তাই আপনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, "অমুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী আন্দোলনকে দমন করার জন্য জেলে দেওয়াই যথেষ্ট মনে করতে পারে। কিন্তু এ জাতীয় মুসলিম রাষ্ট্র এর জন্য ফাঁসির হুকুম দিতেও পরওয়া করবে না।"

আপনার এ ভাষণের ১৩ বছর পর ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান সরকার আপনার উপরই মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলো। আপনি এমন স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে উচ্চারণ করতে পারলেন? জওয়াবে তিনি বললেন ঃ

"আমি ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে বলিনি। ঘটনাক্রমে আমার উপরই ফাঁসির হুকুম হয়ে

গেলো। আসলে মুসলিম জাতির ইতিহাসে দেখা যায় যে, যুগে যুগে মুসলিম শাসকরা ইসলামী ব্যক্তিত্বকে দমন করার জন্য অত্যন্ত কঠোর ও অমানবিক আচরণ করে। অমুসলিম শাসকরা এতোটা হিংস্রতা প্রকাশ করে না। জাতিগতভাবে মুসলিমরা যেনো ক্ষিপ্ত না হয়, সেদিকে খেয়াল রেখেই অমুসলিমদের পদক্ষেপ নিতে হয়। কিন্তু মুসলিম শাসকদের পক্ষে মুসলিমদের বিরাট সমর্থন থাকে বলেই তারা নৃশংস হতে দ্বিধা করে না। ইয়াজিদের শাসনকাল থেকে শুরু করে যুগে যুগে প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। এ সব দিক বিবেচনা করেই আমি এ শঙ্কা প্রকাশ করেছি।

এ যুগেও দেখুন মুসলিম বিশ্বে কী হচ্ছে? মিসরে জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলিমুনদের ইসলামী আন্দোলনকে দমন করার জন্য যে হিংস্রতা ও নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে, এমনটা কোন অমুসলিম শাসক করছে না।

পাকিস্তান, তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি রাষ্ট্রে মুসলিম নামধারী শাসকরা ইসলামী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য যে দাপট দেখাচ্ছে, কোন অমুসলিম শাসক এভাবে দেখায় না।

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ও ঐ সময়কার মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই আমি ঐ কথা বলেছিলাম।"

দেড় ঘণ্টাব্যাপী এ সাক্ষাৎকারটি আমার জীবনে একটি স্মরণযোগ্য ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

জামায়াতের সম্মেলনের দুটো অনুষ্ঠান

করাচীর বিখ্যাত জাহাঙ্গীর পার্কেই বড় বড় জনসভা হয়ে থাকে। জামায়াতের সম্মেলন উপলক্ষে ঐ ময়দানেই বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়। প্রধান বক্তা মাওলানা মওদূদী। প্রশস্ত মঞ্চে কিছু মেহমানের আসন রাখা হয়েছে। আমি পূর্ব-পাকিস্তানি কয়েকজন এমএনএ (গণপরিষদ সদস্যকে) মঞ্চে হাজির করলাম।

পশ্চিম-পাকিস্তানে সাধারণত জনসভা ও বড় মাহফিল ইশার নামাযের পর শুরু হয়। মঞ্চ চমৎকার আলোকসজ্জায় সজ্জিত। গোটা ময়দানই আলোকময়। মঞ্চ থেকে মাইকে প্রয়োজনীয় ঘোষণা চলছে। সভা শুরু হবার সময়ও বার বার জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রধান অতিথি সভা শুরু হবার আগেই মঞ্চে উপস্থিত হবেন বলে ঘোষণা করা হলো। নির্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট আগে থেকেই মঞ্চের মেহমানগণ প্রবেশ পথের দিকে বারবার তাকাচ্ছেন। যখন মাত্র ৩ মিনিট সময় বাকি তখন এমএনএ-গণ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, কই! মাওলানা সাহেবতো এখনও পৌঁছলেন না? শুনেছি জামায়াতের সভা নাকি ঘড়ির কাঁটা ধরে যথাসময়ে শুরু হয়। এ কথা বলতে বলতেই মাওলানা মঞ্চে আরোহণ করলেন। তখনও দু'মিনিট বাকি।

জনসভায় মাওলানা ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবিতেই বক্তব্য পেশ করলেন। তাঁর বক্তৃতায় আমার মেহমানরা খুবই উদ্বুদ্ধ হলেন। তাঁরা মাওলানার লেখা বই পড়তে আগ্রহী হলেন। জনসভার সামগ্রিক পরিবেশ দেখে এবং বিশাল জনতার শৃঙ্খলা

দেখে তাঁরা মুগ্ধ হলেন।

মাওলানার বক্তৃতার সারকথা ছিলো, মানুষ তার স্রষ্টার প্রেরিত পথ-নির্দেশের প্রয়োজন মনে করে না বলেই দুনিয়ায় এতো অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা। ইসলামের নামে পাকিস্তান কায়েম হওয়া সত্ত্বেও যদি ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম করা না হয়, তাহলে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। তাঁর বলিষ্ঠ যুক্তি ও চমৎকার পরিবেশনা সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

জামায়াতের রুকন সম্মেলন

সম্মেলন উপলক্ষে রুকনদের পৃথক বৈঠক হয়। সে বৈঠকে মাওলানা মওদূদী সভাপতিত্ব করেন। রুকন হিসেবে আমিও সেখানে উপস্থিত। গঠনতন্ত্রের দাবি অনুযায়ী এবং জামায়াতের ঐতিহ্য মোতাবেক মুহাসাবার প্রোগ্রামটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে। এ ধরনের কোন কর্মসূচি ইতঃপূর্বে আমি দেখিনি। ১৯৫৫ সালের এপ্রিলে রংপুর জেলে থাকাকালে রুকন হলাম। জুন মাসেই পশ্চিম-পাকিস্তানে চলে এলাম। পূর্ব-পাকিস্তানে থাকাকালে কোন রুকন সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ হয়নি।

মাওলানা ঘোষণা করলেন, "সংগঠনের সুস্থতার জন্যই আমাদের সবাইকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমাদের মধ্যে যেনো কোন দোষ-ত্রুটি না থাকে। কারো মধ্যে কোন ত্রুটি চোখে পড়লে প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে একান্তে তার দোষ ধরিয়ে দিতে হবে। তার সংশোধনই একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে। তাকে হেয় করা উদ্দেশ্য না থাকলে মহব্বতের ভাষায়ই বলা হবে। তাহলে তিনি বরং খুশিই হবেন, সংশোধন হবেন এবং দোষ ধরিয়ে দেবার জন্য শুকরিয়া জানাবেন। জামায়াতের ঐতিহ্য অনুযায়ী সর্বপ্রথম আমি নিজকে সংশোধনের জন্য আপনাদের সামনে পেশ করছি।"

এ কথার পর লিখিত কাগজের টুকরা মাওলানার হাতে পৌঁছতে থাকলো। তিনি সমালোচনা ও সংশোধনমূলক কথা কাগজগুলো থেকে পড়ে শুনিয়ে জওয়াব দিতে থাকলেন। এ পদ্ধতিটি আমার অত্যন্ত ভালো লাগলো। এর মধ্যে একটি সমালোচনা সবার বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করলো। তাতে লেখা ছিলো, "আমীরে জামায়াত! আপনিই রুকনিয়াতের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। এ সম্মেলনে এমন রুকনও দেখা যায়, যার দাড়ি নেই। দাড়িবিহীন ব্যক্তিকে আপনি কেমন করে রুকন বানালেন?"

এর জওয়াবে মাওলানা বললেন, "আপনার এ আপত্তি সঠিক নয়। আপনার জানার কথা যে, জামায়াতের গঠনতন্ত্রে রুকন হওয়ার জন্য ফরয-ওয়াজিব পালন করা ও হারাম থেকে বেঁচে থাকার শর্ত রাখা হয়েছে। দাড়ি রাখা ঐ শর্তের মধ্যে পড়ে না।" মাওলানা এটুকু বলার সাথে সাথেই এক লম্বা যুবক দাঁড়িয়ে বললেন, "মাওলানা আমি সবার দিকে চেয়ে লক্ষ্য করলাম যে, আমি ছাড়া সবারই দাড়ি আছে। মাওলানা আমি কী করব? আমার যে দাড়ি উঠেই না।"

লোকটিকে আমি চিনলাম। তার নাম আবদুল্লাহ। করাচীতেই ছোট্ট ফলের দোকান করেন। পেশোয়ারের পাঠান। ৬ ফুটেরও বেশি লম্বা। জামায়াত অফিসে মাঝে মাঝে এসে কিছু ফল দিয়ে যান। বড়ই সরল-প্রাণ ও মুখলিস কর্মী। তাঁর মাধ্যমে বেশ কয়জন পাঠান রুকন হয়েছেন।

তার অসহায় বক্তব্য শুনে সবাই হেসে উঠলো। আমিও হাসলাম। কিন্তু মাওলানা একটুও হাসলেন না। তিনি গম্ভীরভাবেই বললেন, "তার দাড়ি উঠে না শুনে আপনাদের হাসি থেকে আমার ধারণা হলো যে, যিনি সমালোচনা করেছেন তার আপত্তিকে আপনারাও হয়তো সঠিক মনে করেছেন। তাই যে ভাইয়ের দাড়ি নেই তার দাড়ি উঠে না শুনে আপনারা আশ্বস্ত হয়ে খুশি হয়ে হাসলেন। আমি আবার বলছি, দাড়ি রাখাকে জামায়াত রুকন হবার শর্ত বানায়নি। তাই এ আপত্তি জানানো গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সঠিক হয়নি। তবে আমি আল্লাহ তাআলার প্রতি শুকরিয়া জানাই যে, রুকনদের সবারই দাড়ি আছে। আলহামদু লিল্লাহ।"

সম্মেলনের সব কয়টি আইটেমই আমার নিকট পরম আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় মনে হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনসমূহে ঐ শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগের সুযোগও হয়েছে। তাই ঐ সম্মেলনের অভিজ্ঞতা আমার নিকট মহামূল্যবান সম্পদ।

৬৯.

করাচীতে অবস্থান

১৯৫৫ সালের জুলাই থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত গণপরিষদ সদস্যদের মধ্যে ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে সমর্থন সংগ্রহের জন্য কর্মতৎপর ছিলাম। জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলন শেষে আরও প্রায় দু'সপ্তাহ এ কাজে নিয়োজিত থেকে ঢাকায় ফিরে আসি।

করাচীতে প্রায় সাড়ে চারমাস অবস্থানকালে উর্দু ভাষায় ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য প্রচুর সময় পেয়েছি। করাচীতে দর্শনীয় যা আছে তা দেখার জন্য প্রয়োজনীয় অবসর পেতে অসুবিধা হয়নি। আমার নিকট ক্লিফটন বীচই বেশি আকর্ষণীয় ছিলো। এটা হলো করাচীর সাগর-সৈকত। আরব সাগরের পূর্ব তীর ঘেঁষে অবস্থিত। সকল বয়সের প্রচুর মানুষ বিশেষ করে বিকেলে সাগরের তীরে পানির প্রশান্ত দৃশ্য দেখে প্রাণ জুড়ায়। পানির নিকটে গিয়ে উঁচু উঁচু ঢেউকে বালুময় তীরে আছড়ে পড়তে দেখার মজাই আলাদা। এ সাগরের কারণেই করাচীতে সারাদিনই প্রবল বাতাস বইতে থাকে। বাতাসের কারণে রোদেও ছাতা ব্যবহার করা যায় না। সেখানে রিকশায় এ জন্যই কোন ঢাকনা নেই। অবশ্য এ রিকশা ঢাকার রিকশা থেকে ভিন্ন। এ রিকশা দু'চাকাওয়ালা। কোলকাতার রিকশার মতো এ রিকশা মানুষই টানে। বর্তমানে এ রিকশার অস্তিত্ব আছে কিনা জানি না।

করাচী শহরে বহু ট্রাকের বাহক হলো উট। বিরাট বিরাট উট ট্রাকভর্তি মাল টেনে

নেয়। আমি একদিন জামায়াত অফিসে কৌতুক করে জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে কি বড় বড় আকারেই উট পয়দা হয়? উটের বাচ্চা তো দেখি না।" আমাকে এক ভাই ক্লিফটন বীচে নিয়ে গেলেন। ওখানে দেখলাম, সাগরের কাছে বালিতে উটে চড়িয়ে সৈকতে ভ্রমণ করায়। বড় উটের সাথে বাচ্চাটাও দৌড়াতে থাকে। মনে হয়, বাচ্চাকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। আরও ছোট ছোট উটের বাচ্চা দেখলাম। বাচ্চা কেন এতো সুন্দর দেখায় তা সত্যিই বিস্ময়কর। শুধু মানুষের বাচ্চা নয়, সব জীবের বাচ্চাই দেখতে অত্যন্ত সুন্দর, এমনকি কুকুরের বাচ্চাও।

করাচীতে কায়েদে আযম স্মৃতিসৌধটিও দেখার মতো। এখানেই বিরাট প্রশস্ত এলাকা জুড়ে তাঁর মাজার রয়েছে। বিকেলে ও সন্ধ্যায় প্রচুর লোক-সমাগম হয় সেখানে। স্মৃতিসৌধ ছাড়া পার্ক হিসেবেও অনেক লোক সেখানে যায়।

করাচীতে একটি পার্কের নাম ব্রিটিশ আমল থেকেই 'গান্ধী গার্ডেন'। ভারত বিভাগের পরও এ নাম পরিবর্তন করা হয়নি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের যত রাজনৈতিক শত্রুতাই থাকুক, পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর গান্ধীর নাম মুছে ফেলার প্রস্তাবও কেউ তুলেনি। অথচ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জিন্নাহ এভিনিউর নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ রাখা হলো। বঙ্গবন্ধুর নামে নতুন কোন রাজপথ তৈরি করা যেতো। অথবা যেসব রাস্তার নামকরণ হয়নি, সে সবের নামকরণ করা যেতো। মন্ত্রীপাড়ায় অবস্থিত ব্রিটিশ আমলের মিন্টু রোডের নাম এখনও বহাল আছে। লর্ড কার্জনের নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কার্জন হলের নাম বদল করা হয়নি। এ জাতীয় সংকীর্ণ বিদ্বেষ সুস্থ মানসিকতার পরিচয় বহন করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে জিন্নাহ হল ও ইকবাল হলের নাম মুছে তাদেরকে ছোট করা যায়নি, আমরাই ছোট হয়েছি।

করাচীর আবহাওয়া সারা বছরই প্রায় এক রকম। প্রচণ্ড গরম বা ভীষণ শীত নেই। কোন কোন বছর শীতকালে কুয়েটার শৈত্যপ্রবাহ করাচীকে সপ্তাহখানেক একেবারে পঙ্গু করে রাখে। একবার আমি এর পাল্লায় পড়লাম। সারা গায়ের চামড়া ফেটে গেলো। আয়নায় চেহারা দেখে নিজেকে চেনাই দায়। সরকারি ও বেসরকারি অফিসগামী সবাই হাতে সারা বছরই কোট বহন করে। কারণ, বলা যায় না কোন্ সময় শীত লাগে।

জামায়াতের করাচী সম্মেলন উপলক্ষে মজলিসে শূরায় পূর্ব-পাকিস্তান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করাচীতে জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলন চলাকালে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় পূর্ব-পাকিস্তানে সাংগঠনিক দায়িত্ব পরিবর্তনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মজলিসে শূরার যে দু'জন সদস্য পূর্ব-পাকিস্তানে দু'বছর থেকে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করছিলেন তারা মজলিসে শূরাকে কনভিন্স করতে সক্ষম হন যে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ও অধ্যাপক গোলাম আযম প্রাদেশিক নেতৃত্বের

দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম, তাই তাঁরা দুজন ওখান থেকে চলে আসতে চান। শূরা সম্মতি দিলো। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯৫৬ সালের জানুয়ারিতেই আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদী স্বয়ং পূর্ব-পাকিস্তান সফর করে নতুন সাংগঠনিক কাঠামো গড়বেন। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চৌধুরী আলী আহমদ খান ও জনাব আসাদ গিলানীকে পূর্ব-পাকিস্তানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। মাওলানা আবদুর রহীম প্রাদেশিক ভারপ্রাপ্ত আমীর নিযুক্ত হলেন।

ঢাকা প্রত্যাবর্তন

নভেম্বরের মাঝামাঝি ঢাকায় ফিরে এলাম। আসার সময় চমনের মিষ্টি ও সুস্বাদু আঙুর আধমণ নিয়ে এলাম। এত সস্তা, যা ঢাকায় কল্পনাও করা যায় না। রিকশাওয়ালাকে দু'আনায় এক পোয়া আঙুর খেতে দেখে আমি হতবাক হবার উপক্রম। ছোট আকৃতির একটু লম্বাটে চমনের বিচিহীন এ আঙুরের তুলনা নেই। এ থেকেই সব চেয়ে ভালো মানের কিশমিশ হয়।

বাড়িতে দুষ্প্রাপ্য এতো আঙুর দেখে ছোট বড় সবাই কী যে খুশি হলো তা বলার নয়। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে বিলি করে পরম তৃপ্তি পাওয়া গেলো। এরপরও যতবার পশ্চিম-পাকিস্তানে গিয়েছি আঙুরের মওসুম হলে বেশি করে আঙুর এনেছি। বহু দেশে আঙুর খেয়েছি। আমি এ আঙুরকেই সেরা মনে করি।

আব্বার সাথে দেখা হলে তিনি এক দীর্ঘ নিবিড় আলিঙ্গন করে বুঝিয়ে দিলেন যে, জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে তার ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। পরম তৃপ্তি ও প্রশান্তিতে আমার চোখে আনন্দাশ্রু বইতে লাগলো। মনে হলো, আমার হৃদয়ের উপর থেকে বিরাট এক বোঝা নেমে গেলো। যার দোয়া আমার বড় সম্বল, তিনি যদি গুমরাহ মনে করেন তাহলে তো দোয়ার বদলে বদদোয়াই পেতে থাকবো। তিনি যতদিন আমার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন ততোদিন তার দোয়া আমি কী করে পাব? এ পেরেশানি আমার অন্তরে ভারী পাথরের মতো অবস্থান করছিলো। আজ আব্বার স্নেহের পরশ পেয়ে মনে হলো যে দুনিয়ার সকল বিপদ যেন দূর হয়ে গেলো।

আমার ছোট ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্যাম আব্বাকে বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধার করার জন্য অত্যন্ত দরদি ভূমিকা পালন করেছে। এ ব্যাপারে তার অবদান বিরাট। আমার প্রতি এ ভাইয়ের অকৃত্রিম মহব্বত না থাকলে এমন ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হতো না। ১৯৯২ ও ৯৩ সালে এ ভাইটি জেলে আমার সাথে কয়েকবার দেখা করেছে। আমার স্ত্রী প্রতি ১৫ দিনে একবার দেখা করার অনুমতি পেতো। জেলে আমার ভাইকে বললাম ঃ

"তুমি আমাকে বড় ভাই হিসেবে মান্য করা ছাড়াও আন্তরিকভাবে যে মহব্বত করো, তা আমার হৃদয় স্পর্শ করে। আমিও ছোট ভাই হিসেবে স্নেহ করা ছাড়াও দীনের ব্যাপারে আমার সহায়ক হিসেবে তোমাকে ভালোবাসি। এ ভালোবাসার

দাবিতে তোমাকে জামায়াতের রুকন হবার জন্য বিশেষ তাগিদ দিচ্ছি। জেলে থেকে বের হয়ে তোমাকে রুকন হিসেবে দেখলে আমার জেলখাটা সার্থক মনে করবো।" আল্লাহর মেহেরবানীতে আমার এ আবেগ তার হৃদয় স্পর্শ করলো এবং রুকন হয়েই আমার সাথে দেখা করতে জেলে গেলো। আমি জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানালাম। জেল থেকে বের হবার আগেই রুকন হয়ে যাওয়ায় আমার মনে আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো।

প্রথম প্রাদেশিক আমীর নির্বাচন

১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে লাহোর থেকে আমীরে জামায়াতের নির্দেশ এলো। এতে আমাকে নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব দিয়ে অবিলম্বে প্রাদেশিক আমীরের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে বলা হলো। তখন রুকন সংখ্যা কমই ছিলো। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সৈয়দপুর, ঈশ্বরদী, বগুড়া মিলে মোট সংখ্যা পঞ্চাশও ছিলো না।

তবু নির্বাচনের বিধি যথাযথ পালনের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার মুদ্রণ, রেজিস্ট্রি ডাকে ব্যালট পেপার প্রেরণ এবং লোক মারফত ব্যালট সংগ্রহ করা হলো। ঢাকা শহর আমীর ও শহরের আরও দুজন রুকন ভোট গণনার দায়িত্ব পালন করেন। সর্বোচ্চসংখ্যক ভোট মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম পান। নির্বাচন কমিশনার হিসাবে আমি ফলাফল ঘোষণা করি এবং ঢাকা শহরের রুকনগণের সামনে আমি শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করি।

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম প্রথম নির্বাচিত প্রাদেশিক আমীর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেই আমাকে প্রাদেশিক সেক্রেটারি নিয়োগ করেন। তখনো প্রাদেশিক মজলিসে শূরা গঠিত হয়নি।

মাওলানা মওদূদীর ঢাকা আগমনের প্রস্তুতি

১৯৫৬ সালের আগে মাওলানা মওদূদীর পূর্ব-পাকিস্তান সফরে আসা সম্ভব হয়নি। মাত্র ৫৩ সালে এখানে প্রাদেশিক সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা শুরু হয়েছে। মাওলানা ৫৩ থেকে ৫৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত জেলেই ছিলেন। ৫৫ সালেই জামায়াতের কেন্দ্রীয় সম্মেলন করা প্রয়োজন বলে সম্মেলনের পরই মাওলানার সফর হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরের শুরুতেই পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক জামায়াত মাওলানার ঢাকা আগমনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে গেলো। মাওলানা আবদুর রহীম ও আমি মাওলানার সফরসূচি প্রণয়নে নিয়োজিত হলাম।

ঢাকা শহর জামায়াতের উপর মাওলানার অভ্যর্থনা, ঢাকা অবস্থান, পল্টন ময়দানে জনসভা, সুধী-সমাবেশ ইত্যাদি বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হলো। এ সময় ঢাকা শহরের তরুণ ও উৎসাহী নতুন আমীর জনাব ওসমান রাময অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এ দায়িত্ব পালনে তৎপর হলেন। ঢাকার রুকন সংখ্যা কম হলেও

বেশসংখ্যক কর্মী (যাদের অধিকাংশই উর্দুভাষী) নিয়ে শহর আমীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন বহু জেলায় তখনো ভালোভাবে দানা বাঁধতে পারেনি। তখন রুকনদের মধ্যে উর্দুভাষী মুহাজিরদেরই প্রাধান্য। ভারত বিভাগের পর ভারত থেকে হিজরত করে যারা পূর্ব-পাকিস্তানে এলেন, তাদের মধ্যে কিছু জামায়াতের কর্মী ও সমর্থক ছিলেন। তারা প্রধানত ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, দিনাজপুর, সৈয়দপুর, রংপুর, ঈশ্বরদী প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে ছিলেন। তাদের চেষ্টায়ই ৫১ সালে করাচী থেকে মাওলানা রফী আহমদ ইন্দোরীকে কেন্দ্রীয় জামায়াতের পক্ষ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে পাঠানো হয়। তিনি মাওলানা মওদূদীর লেখা উর্দু বই পূর্ব-পাকিস্তানের বিশিষ্ট আলেমগণের নিকট পৌছান। তিনি ১৯৫৩ সালের শুরুতে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় রিপোর্ট দিতে গিয়ে জানান যে, এখানকার আলিমগণের মধ্যে যারা মাওলানার বই পড়েছেন, তাদেরকে সংগঠিত করা ও শিক্ষিত সুধী মহলে জামায়াতের দাওয়াত পৌছাবার জন্য একটি টিম যাওয়া প্রয়োজন।

১৯৫৩ সালের অক্টোবরে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার ছয় সদস্যবিশিষ্ট এক টিম এসে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে সব জেলা এবং বেশ কতক মহকুমা শহরে মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ করেন, বই বিলি করেন এবং তাদের সহযোগিতায় জনসভা ও সুধী-সমাবেশ করেন। উক্ত ছয় সদস্যবিশিষ্ট টিমের অন্যতম সদস্য ছিলেন চৌধুরী আলী আহমদ খান। তিনি প্রাদেশিক আমীর হিসেবে দু'বছর দায়িত্বে থাকাকালে টিমের সদস্যগণ যেসব শহরে সফর করেছেন, সেখানে সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও বাংলাভাষী যোগ্য লোকের অভাবে তেমন অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। তবে তার এ প্রচেষ্টার ফলে ঐ সব শহরে জামায়াতের প্রতি আকৃষ্ট লোকের সংখ্যা বেড়েছে। তাই ঐ সব জায়গায় মাওলানা মওদূদীর সফর প্রোগ্রাম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মাওলানার ঢাকা আগমন

মাওলানা মওদূদীর প্রথম ঢাকা আগমন উপলক্ষে ঢাকা শহর জামায়াত সাধ্যাতীত আয়োজন করেছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও হ্যান্ডবিল বিলি করে ২৬ জানুয়ারি পিআইএ বিমানে বিকেল ৩টায় তেজগাঁও বিমানবন্দরে মাওলানা পৌছবেন বলে জানানো হলো। বিমানবন্দরে মাওলানাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আগ্রহীদের সুবিধার্থে শহরের কয়েকটি স্থানে বাসের ব্যবস্থা করা হলো।

মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য যারা অধ্যয়ন করেছেন এবং যারা মাওলানাকে মহব্বত করেন বলে ধারণা ছিলো, মাওলানা আবদুর রহীম ও ঢাকা শহর আমীর জনাব ওসমান রাময তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বিমানবন্দরে যাবার জন্য দাওয়াত দেন। তারা খুশি হয়ে দাওয়াত কবুল করলেন।

২৬ জানুয়ারি মাওলানার বিমান বিকেল ৩টায় বিমানবন্দরে পৌছল। ভিআইপি

যাত্রীরা যে পথে আসেন সেখানে আমন্ত্রিত মেহমানগণসহ আমিও উপস্থিত ছিলাম। জামায়াতের অন্যান্য দায়িত্বশীলরা মাওলানাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আগত লোকদের সাথে রইলেন।

মেহমান যারা হাজির ছিলেন তারা হলেন, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খান এমএনএ, লালবাগ জামেয়া কুরআনিয়ার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, ঢাকার জনপ্রিয় মুফাসসীরে কুরআন মাওলানা মুফতী দীন মুহাম্মদ খান, জমিয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী এবং প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী।

ঘটনাক্রমে একই বিমানে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ূব খান আসায় বিমানের কাছে সেনাবাহিনীর তৎপরতা ছিলো। সর্বপ্রথম সেনাপ্রধান অবতরণ করেন। আরও কতকযাত্রী অবতরণ করার পর মাওলানা বিমানের দরজার সামনে হাজির হতেই 'মাওলানা মওদূদী জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে বিমানবন্দর মুখরিত হয়ে গেলো। সাদা শেরওয়ানী ও উচ্চ টুপি পরিহিত দেখে সবাই সহজেই চিনে নিলো, যদিও ইতঃপূর্বে তারা মাওলানাকে দেখেনি।

আমি বিস্মিত হয়ে দেখলাম, মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী হাতের লাঠি উঁচিয়ে নিজেই যোশের সাথে 'মাওলানা মওদূদী' স্লোগান দিলেন। আমরা যারা তার পাশে ছিলাম 'জিন্দাবাদ' বললাম। মাওলানা কাফী বেশ কয়েকবার স্লোগান দিলেন।

মাওলানা আবদুর রহীম ও ঢাকা শহর আমীর জনাব ওসমান রাময বিমানের সিঁড়ির পাশেই অপেক্ষমাণ ছিলেন। শহর আমীর মাওলানাকে মাল্য ভূষিত করলে উপস্থিত জনতা আরও যোশের সাথে জিন্দাবাদ ধ্বনিতে বিমানবন্দর কাঁপিয়ে তুলে। আমরা আশা করিনি যে, এতো লোক মাওলানাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য হাজির হবে।

মাওলানার সাথে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া তোফাইল মুহাম্মদও ছিলেন। মাওলানা ও মিয়া সাহেবকে নিয়ে মাওলানা আবদুর রহীম ও ওসমান রাময ভিআইপি গেট দিয়ে ঢুকলে সম্মানিত মেহমানদের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তাদের সাথে মাওলানার মুসাফাহা ও মুয়ানাকা দেখে আমি অভিভূত হলাম।

বিমানবন্দর থেকে অভ্যর্থনাকারী জনতা মিছিল করে মাওলানাকে তেজগাঁও থেকে নওয়াবপুর রোডে পৌঁছে দেয়। মিছিলে মাওলানার গাড়ির সাথে অপর গাড়িতে মাওলানা আকরাম খান ও মাওলানা ফরিদপুরী ছিলেন। মাওলানার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মাওলানা আকরাম খান মাওলানাকে তাঁর বাড়িতে (দৈনিক আযাদের অফিস সংলগ্ন) দাওয়াত দেন। মাওলানা শামসুল হক জানান যে, মাওলানার আসা উপলক্ষে তিনি বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের সাথে এক মজলিসে মিলিত হবার ব্যবস্থা করেছেন। মাওলানা এর জন্য আন্তরিক শুকরিয়া জানালেন।

মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খান

মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খানকে মুসলিম সাংবাদিকতার জনক বলা হয়। তার প্রতিষ্ঠিত 'দৈনিক আযাদ' পাকিস্তান আন্দোলনের একমাত্র বাংলা মুখপত্র হিসাবে গণ্য ছিলো। বাংলাভাষী মুসলমানদের একমাত্র সম্বল ছিলো দৈনিক আযাদ।

মাওলানা আমার শ্বশুর মাওলানা মীর আব্দুস সালামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। দু'জনই আহলে হাদীসের আলেমগণের মধ্যে গণ্য ছিলেন। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি আমাকে একান্তে বললেন ঃ

"ইসলামী শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে মুসলিম লীগ সরকারের কঠোর সমালোচক মাওলানা মওদূদীকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানাবার দোষে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে। মাওলানা মওদূদীর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক যাই থাকুক প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে সরকারবিরোধী এক দলের নেতাকে সংবর্ধনা জানাতে যাওয়া আমার মোটেই উচিত হয়নি বলে তারা সুস্পষ্ট মত আমাকে জানালেন।

মাওলানাকে অভ্যর্থনা জানাতে না গেলে পূর্ব-পাকিস্তানি মুসলিম নেতা হিসেবে আল্লাহর নিকট কৈফিয়ত দেবার আশঙ্কায় আমি গিয়েছি। ওরা মাওলানার মর্যাদা জানে না। ওরা ইসলামী শাসনতন্ত্রও চায় না। ১৯৪৮ সালে মাওলানা মওদূদী ইসলামী শাসনতন্ত্রের ৪ দফা দাবি পেশ না করলে, আমরা গণপরিষদে এ বিষয়ে আমাদের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হতাম না। ঐ দাবি পেশ করার অপরাধে সরকার মাওলানাকে ৪৮-এর মার্চ মাসে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক রাখে। কিন্তু সরকারের প্রধান পরিচালকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাওলানা শাব্বির আহমদের (এমএনএ) নেতৃত্বে ঐসব দাবির ভিত্তিতে রচিত আদর্শ প্রস্তাবের (Objective Resolution) পক্ষে গণপরিষদ সদস্যদের একটি মযবুত গ্রুপ জোর প্রচেষ্টা চালায়। একদিকে বাইরে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার দাবিতে (মুতালিবায়ে নেযাম ইসলামী) জনগণের মধ্যে আন্দোলন চলায় আমরা ভেতরে শক্তি বোধ করলাম। ফলে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে আদর্শ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গণপরিষদে পাস হয়ে গেলো। তখনও মাওলানা মওদূদী জেলে বন্দি। ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার দাবিতে জামায়াতে ইসলামীর অব্যাহত আন্দোলন এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মাওলানার রচিত পুস্তকাদি থেকেই আমরা যথার্থ পথনির্দেশ পেয়েছি। গণপরিষদে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন তারা সবাই মাওলানার প্রতি কৃতজ্ঞ। তাই সরকার ও সরকারি দলের মতামতের পরওয়া না করেই বিমানবন্দরে যাওয়া কর্তব্য মনে করেছি।"

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী

আমার সাথে মাওলানার দীর্ঘ সম্পর্কের বিবরণ 'জীবনে যা দেখলাম' প্রথম খণ্ডের ৬৫ পৃষ্ঠা থেকে ৭১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুলে

অনুষ্ঠিত ১০ দিনব্যাপী এক সেমিনারের এক অধিবেশনে মাওলানা ফরিদপুরী প্রধান বক্তার ভাষণে বলেন ঃ

মাওলানা মওদূদীকে আমি ১৯৪৩ সাল থেকে চিনি। '৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী কায়েম হবার পর তিনি পাঞ্জাবের পাঠানকোটে দারুল ইসলাম নামে মারকায কায়েম করেন। তার বিরুদ্ধে ফতোয়া আমার কাছে পৌঁছুলো। আমি কারো মতকে যাচাই না করে গ্রহণ করি না। তাই ১৯৪৩ সালে দীর্ঘ সফর করে আমি পাঠানকোট পৌঁছি। তাঁকে আমি প্রশ্ন করলাম, মুসলমানদের মধ্যে ফেরকা, দল ও গ্রুপের শেষ নেই। আপনিও 'দেড় ইটের' আলাদা এক ঘর বানালেন। এতে উম্মতের কী কল্যাণ হবে?

মাওলানা আমাকে তিনদিন মেহমান হিসেবে আটকে রাখলেন। তিনি কী কী করছেন ও কী করতে চান সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিলেন। আমাকে এমন কয়েকটি কথা বলে বিদায় করলেন, যা স্বর্ণের অক্ষরে লিখে রাখার মতো। (ঐ কথাগুলো প্রথম খণ্ডে ৯ম কিস্তিতে আছে)।

আমি জামায়াতে যোগদান করায় মাওলানা ফরিদপুরী খুব খুশি হলেন। আমি তাঁর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতাম। আমি ভালোভাবেই জানি যে, মাওলানা মওদূদীর রচিত 'খিলাফত ও মুলুকিয়াত' বইটিতে হযরত মুয়াবিয়া (রা) সম্পর্কে কতক বক্তব্যকে তিনি মোটেই সঠিক মনে করতেন না। এ বিষয়ে একদিন আমি মাওলানা সাহেবকে বললাম যে, ঐ সব মন্তব্য কোনটাই তার নিজের নয়, অন্যের লিখিত নির্দিষ্ট কিতাব থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ কথার জওয়াবে তিনি বললেন, এ কথা ঠিক বটে, কিন্তু ঐ সব কিতাব শিয়াদের লেখা বলেই আমার ধারণা।

আমি একবার বললাম, "হুযুর! মাওলানা মওদূদী আবার ঢাকায় এলে আমি এ বিষয়ে আপনার সাথে মাওলানার আলোচনার ব্যবস্থা করতে চাই এবং সে আলোচনা আমি টেপ রেকর্ড করে রাখতে আগ্রহী।" তিনি সম্মত হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, মাওলানা মওদূদী যখন ঢাকায় এলেন, আমি লালবাগ যেয়ে দেখলাম, তিনি এমন অসুস্থ যে, কথা বলতেও অক্ষম। আমার ঐ আশা পূরণ হলো না।

৭০.

পূর্ব-পাকিস্তানে মাওলানার একচিল্লা (৪০ দিন)

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী পূর্ব-পাকিস্তানে তাঁর প্রথম সফরে ৪০ দিন ছিলেন। ফার্সিতে ৪০-কে চিল্লা বলে। ১৯৫৬ সালের ২৬ জানুয়ারি পৌঁছলেন এবং ৬ মার্চ বিদায় হয়ে গেলেন। চিল্লা শব্দটি তাবলীগ জামায়াতে চালু আছে।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতার মুখ থেকে এ দেশের মানুষ ইসলাম ও জামায়াতের দাওয়াত সম্পর্কে সরাসরি শুনবার সুযোগ পেলো। তিনি বহু জনসভায় বক্তৃতা করেন, বেশসংখ্যক সুধী-সমাবেশে ভাষণ দেন এবং বৈঠকী সমাবেশে

প্রশ্নের উত্তর দেন। শুক্রবার যেখানেই প্রোগ্রাম হতো, সেখানে জুমআয় খুতবা দিতেন এবং নামাযে ইমামতি করতেন।

আমার পরম সৌভাগ্য যে, বরিশাল ছাড়া সব জায়গায়ই আমি মাওলানার ঘনিষ্ঠ সফরসঙ্গী ছিলাম। জনসভা, সুধী-সমাবেশ ও বৈঠকী আলোচনায় মাওলানার উর্দু ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতা ও প্রশ্নের উত্তরের বাংলা অনুবাদ করার দায়িত্ব আমার উপরই ছিলো। বরিশালে এ দায়িত্ব অধ্যাপক মাওলানা হেলালুদ্দীন পালন করেন।

৩৮ দিন মাওলানার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আমার আদর্শিক ও সাংগঠনিক জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা। এর আগে দেড় বছর মাওলানার প্রচুর বই পড়েছি। কিন্তু মাওলানার সাহচর্যে ইসলামী জ্ঞান, বক্তব্য পরিবেশনার আর্ট, প্রশ্নের জওয়াব দেবার টেকনিক শেখার সুযোগ পেয়ে নিজকে ধন্য মনে করলাম। অনুভব করলাম যে, দেড় বছরে যা শিখেছি এর চেয়ে অনেক বেশি দেড় মাসের কম সময়েই হাসিল হয়েছে। বুঝা গেলো, শুধু কিতাবই যথেষ্ট নয়; আদর্শ নেতার সুহবত ছাড়া আসল শিক্ষা হয় না। যদি কিতাবই যথেষ্ট হতো তাহলে নবী পাঠাবার প্রয়োজন হতো না। কিতাব ও শিক্ষক সমভাবে জরুরি। ১৯৬৪ সালে লাহোর জেলে দু'মাস মাওলানার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছিলাম। মাওলানার প্রথম পূর্ব-পাকিস্তান সফরে ও জেলে যে সান্নিধ্য পেয়েছি, এতো বেশি দিন একটানা এমন সৌভাগ্য আর হয়নি।

ঢাকায় মাওলানার অবস্থান

জামায়াতে ইসলামীর এমন আর্থিক সঙ্গতি ছিলো না যে, মাওলানাকে মধ্যম মানের কোন হোটেলেও থাকার ব্যবস্থা করা যায়। জামায়াতের সাথে জড়িত কারো এমন বাড়ি ছিলো না, যেখানে মেহমান হিসেবে রাখা যায়। ২০৫ নং নওয়াবপুর রোডের দোতলায় প্রাদেশিক ও শহর জামায়াতের অফিসেই থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হলো। পঞ্চাশোর্ধ বয়সের মেহমানকে যতটুকু আরামে রাখা প্রয়োজন ছিলো এর ব্যবস্থা করতে না পারার দুঃখ আমি এখনো বোধ করি। কিন্তু মাওলানা ও মিয়া তোফাইল মুহাম্মদ আমাদেরকে বুঝতেই দেননি যে, তাঁরা কোন অসুবিধাবোধ করছেন।

সফরে ট্রেনেই যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকা থেকে বরিশাল ও খুলনায় স্টিমারে গিয়েছেন। তখন আমাদের এমন অবস্থা ছিলো না যে, মোটরকারে আরামে সফর করাতে পারি।

মাওলানার সফরসূচি ও কৃতকাজ

মাওলানার সফরসূচি ঢাকা থেকে শুরু হয়। ঢাকায় সুধী-সমাবেশ ও পল্টন ময়দানে জনসভার পর বাইরে দু'কিস্তিতে সফর সমাধা করা হয়। প্রথম কিস্তি সিলেট থেকে শুরু হয়ে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ফেনী, মাইজদি (নোয়াখালী) হয়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তন। দ্বিতীয় কিস্তি বরিশাল, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর হয়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তন।

জামায়াতের সংগঠন যে পর্যায়েই থাকুক সব জায়গায়ই মাওলানার জন্য গঠিত অভ্যর্থনা কমিটিতে সব মহলের গণ্যমান্য লোকই শরীক হয়েছেন। সর্বত্রই মাওলানাকে দেখার জন্য মানুষ অত্যন্ত উৎসুক ছিলো। ট্রেনে সফরকালে যে স্টেশনেই গাড়ি থেমেছে সেখানে অনেক লোক মাওলানাকে একনজর দেখার জন্য জোর দাবি জানিয়েছে। এর ফলে গাড়িতে একটানা বিশ্রাম করতে পারেননি। স্টেশনে স্টেশনে গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে সমবেত জনতাকে সালাম দিতে হয়েছে। মাওলানার চেহারা দেখে মানুষ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তো। বারবার মাওলানাকে আরাম করা অবস্থা থেকে উঠতে বলতে খুবই সংকোচ বোধ করা সত্ত্বেও এ কাজ আমাকে করতেই হতো। কৌতুক করে মাওলানা বললেন, "চিড়িয়াখানায় টিকেট করে জানোয়ার দেখতে হয়। আপনিও টিকেটের ব্যবস্থা করতে পারেন।"

জনসভাগুলোতে মাওলানা আবদুর রহীম সভাপতিত্ব করতেন এবং আমি বাংলায় অনুবাদ করতাম। মাওলানা এক একটি পয়েন্ট ২/৩ মিনিট বলে বসতেন, আমি এর বাংলা অনুবাদ শুনাতাম। এভাবে সাধারণত অনুবাদসহ মাওলানার বক্তৃতায় ঘণ্টাখানেক সময় লেগে যেতো।

জামায়াতে ইসলামী একটি দল হিসেবে জনগণের নিকট নতুন হলেও পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে বিরাট আলেম এসেছেন জেনে দূর-দূরান্ত থেকেও বিপুলসংখ্যক মানুষ জনসভায় সমবেত হতো এবং দেখার জন্য মঞ্চের কাছে আসার চেষ্টা করতো।

সুধী-সমাবেশগুলোতে আধুনিক শিক্ষিত সব পেশার লোক এবং আলেম-ওলামা সমবেত হতেন। মাওলানার বক্তৃতা শেষে শ্রোতারা প্রশ্ন করার সুযোগ গ্রহণে আগ্রহ দেখাতেন। লিখিত প্রশ্নের সন্তোষজনক জওয়াবে সবাই মুগ্ধ হতেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব দীর্ঘায়িত করার দাবি জানাতেন। সুধী-সমাবেশেও একই পদ্ধতিতে বাংলায় অনুবাদ করা হতো।

সকালে নাশতার পর দুপুর পর্যন্ত মাওলানার অবস্থান স্থলে সকল পেশার লোকই দেখা করতে আসতেন। এ ধরনের বৈঠকে ফরমাল কোন কর্মসূচি থাকতো না। আগত লোক মাওলানার সাথে হাত মিলালে তিনি পরিচয় জিজ্ঞেস করতেন। কেউ কোন প্রশ্ন করলে জওয়াব দিতেন। সে জওয়াব থেকে সবাই মূল্যবান জ্ঞান হাসিল করার সুযোগ পেতেন। প্রশ্ন বাংলায় করলে আমি উর্দুতে অনুবাদ করে শুনাতাম। জওয়াবের অনুবাদও আমাকেই করতে হতো। সব রকমের প্রশ্নই করা হতো। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হোক, প্রশ্নকর্তা মাওলানার জওয়াব শুনে যে তৃপ্ত হতেন তা আমি লক্ষ্য করতাম।

মাওলানার আলোচ্য বিষয়

জনসভায় মাওলানার বক্তৃতার প্রথম অর্ধেক সময়ে ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে পেশ করতেন। রাসূল (স)-এর ২৩ বছরের নবুওয়াতের জীবনের উল্লেখ করে রাসূলেরই অনুকরণে দীন-ইসলামকে বাস্তবে

কায়েম করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতেন। জামায়াতে ইসলামী যে ঐ মহান উদ্দেশ্যেই আন্দোলন করছে, তা উল্লেখ করে জামায়াতে যোগদানের দাওয়াত দিতেন।

তাঁর বক্তৃতার দ্বিতীয় অর্ধেক সময় পাকিস্তানের ঐ সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার গুরুত্ব তুলে ধরতেন। ঐ সময়ই শাসনতন্ত্র রচনার কাজ চলছিলো। করাচীতে গণপরিষদের অধিবেশনে তুমুল বিতর্ক চলছিলো। আওয়ামী লীগের সদস্যগণ পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনকে উপলক্ষ করে শাসনতন্ত্রের ইসলামী ধারাগুলো সম্পর্কেও কৌশলে আপত্তি উত্থাপন করতেন। তাই মাওলানার বক্তৃতার রাজনৈতিক অংশে যা বলতেন তা পরোক্ষভাবে আওয়ামী লীগের সমালোচনার পর্যায়েই পড়ে।

সুধী-সমাবেশগুলোতে মাওলানা বক্তব্যে প্রচলিত আইনের বদলে ইসলামী আইনের প্রাধান্য ও গুরুত্ব তুলে ধরতেন এবং এর জন্য প্রথমে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা ত্বরান্বিত করার উপর জোর দিতেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের অসারতাও তুলে ধরতেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্রোতাদের মন জয় করতেন।

ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন

ঘটনাক্রমে মাওলানার পূর্ব-পাকিস্তান সফরে থাকাকালেই ১৯৫৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদে ইসলামী রিপাবলিক অব পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র পাস হয়ে যায়। মাওলানা গণপরিষদকে মুবারকবাদ জানিয়ে বিবৃতি দেন। পরবর্তী জনসভা ও সুধী-সমাবেশগুলোতে এ শাসনতন্ত্রের উপর আলোকপাত করে বলেন, খাজা নাজিমুদ্দীন প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৫৩ সালে রচিত শাসনতন্ত্র যে পরিমাণ ইসলামী ছিলো, এমনকি মুহাম্মদ আলী বগড়ার সময় ১৯৫৪ সালে যতটুকু ইসলামী ছিলো, ১৯৫৬ সালে প্রণীত শাসনতন্ত্র সে তুলনায় নিম্নমানের হওয়া সত্ত্বেও এতে ১৯৪৯ সালে গৃহীত আদর্শ প্রস্তাব অপরিবর্তিত থাকায় এটা গ্রহণযোগ্য।

গভর্নর জেনারেল ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে গণপরিষদ ভেঙে দিলে মুহাম্মদ আলী বগড়া প্রধানমন্ত্রিত্ব হারান। ১৯৫৫ সালের মে মাসে নতুন গণপরিষদ নির্বাচনের পর পশ্চিম-পাকিস্তানের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যগণ চৌধুরী মুহাম্মদ আলীকে দলীয় নেতা নির্বাচন করায় এবং যুক্তফ্রন্ট সদস্যগণ (আওয়ামী লীগ ছাড়া) তাঁকে সমর্থন করায় তিনি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তারই নেতৃত্বে ৯ মাসের মধ্যে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণীত ও গণপরিষদে গৃহীত হয়।

আমরা যখন ১৯৫৫ সালে করাচীতে গণপরিষদ সদস্যদের মধ্যে ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে লবী করি তখন চৌধুরী মুহাম্মদ আলীই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ইসলামী শাসনতন্ত্র গণপরিষদে পাস করাতে সফল হওয়া সত্ত্বেও দেশ শাসনের ব্যাপারে মুসলিম লীগ সদস্যদের সাথে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন।

মাওলানার সাংগঠনিক কার্যক্রম

পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা সফর সমাপ্ত করে তিনি জামায়াতে ইসলামীর

সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করেন। জামায়াতের গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সংগঠনের পর বিভাগীয় স্তর রয়েছে। পশ্চিম-পাকিস্তানে সংগঠন সম্প্রসারিত থাকায় তা আগেই চালু করা সম্ভব হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানে তখনও বিভাগীয় সংগঠন শুরু হয়নি। মাওলানার সফরের মাধ্যমে জামায়াত দাওয়াত ও সংগঠনের দিক দিয়ে অগ্রসর হওয়ায় পূর্ব-পাকিস্তানেও সংগঠনের বিভাগীয় স্তর কায়েম করা প্রয়োজন বলে মাওলানা অনুভব করলেন।

তখন সরকারিভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা এ চারটি বিভাগ ছিলো। জনাব আবদুল খালেককে গাইবান্দার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হলো। জনাব আসাদ গিলানী লাহোরে চলে যাবার পর উত্তরবঙ্গের দায়িত্ব আমার উপরই ন্যস্ত ছিলো। মাত্র মাস দেড়েক দায়িত্ব পালনের পরই আমাকে করাচীতে চলে যেতে হলো। রাজশাহী বিভাগ বলতে উত্তরবঙ্গকেই বুঝায়। মাওলানা আমার উপরই বিভাগীয় আমীরের দায়িত্ব দিলেন। প্রাদেশিক সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সাথে এটা অতিরিক্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করা হলো। মাওলানা নির্দেশ দিলেন যে, রাজশাহী বিভাগে জনাব আব্বাস আলী খানকে নিয়ে যেন আমি সফর করি এবং বিভাগীয় আমীরের দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে যেন খান সাহেবের উপর অর্পণ করা হয়।

খুলনা বিভাগের আমীরের দায়িত্ব দেবার মতো কোন বাংলাভাষী রুকন পাওয়া গেলো না। মাওলানা ইউসুফ তখন মঠবাড়িয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করছেন। কলেজের অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়ে মাওলানা মুহাম্মদ হেলালুদ্দীন ঢাকায় অবস্থান করে জামায়াতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছিলেন। কিন্তু তিনি তখনো রুকন হননি। মাওলানা তাকে খুলনার আমীর নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে রুকন বানিয়েছিলেন। রুকনিয়াতের শপথ ও বিভাগীয় আমীরের শপথ একই সময় নিলেন।

মাওলানা হেলালুদ্দীন মুসলিম লীগের জেলা পর্যায়ের নেতা ছিলেন এবং আলিমদের সংগঠনের কাজও করেছেন। তাই ধারণা ছিলো যে, এ দায়িত্ব তিনি সামলাতে সক্ষম হবেন। কিন্তু জামায়াতের মতো একটি সংগঠনের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন হঠাৎ করে নতুন লোকের পক্ষে অসম্ভব। স্বাভাবিক কারণেই অল্প কিছুদিন পরই এ দায়িত্ব পালনে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদী তখন প্রাদেশিক আমীর মাওলানা আবদুর রহীমকে কয়েক মাস খুলনা অবস্থান করে যখন সম্ভব মাওলানা ইউসুফের উপর দায়িত্ব অর্পণের চেষ্টা করার পরামর্শ দেন।

ঢাকা বিভাগের দায়িত্ব দেবার মতো কোন বাংলাভাষী লোক ছিলো না। তাই বিভাগীয় আমীরের দায়িত্ব লালবাগস্থ রহমতুল্লাহ হাইস্কুলের হেড মাস্টার সাইয়েদ হাফিযুর রহমানের উপর ন্যস্ত করা হয়।

ঢাকায় মাওলানার সর্বশেষ প্রোগ্রাম

মাওলানা ৬ মার্চ লাহোর ফিরে গেলেন। এর দু'দিন আগে ৪ মার্চ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড হলে

এক সুধী-সমাবেশে মহামূল্যবান এক ভাষণ দেন। এর শিরোনাম ছিলো 'পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্যা ও এর সমাধান'। এ ভাষণটি পরবর্তীতে বাংলা ও উর্দুতে পুস্তিকাকারে বিলি করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, হাইকোর্টের এডভোকেট, ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট সাংবাদিকসহ বাছাই করা লোকেদেরকে কার্ড-মারফত দাওয়াত দেওয়া হয়। অনেকেই এসেছেন এবং মাওলানার বক্তব্য শুনে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

আমি প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিধ ও রাজনীতিক এবং পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম নেতা জনাব আবুল হাশিমকে এ সমাবেশে আসবার জন্য দাওয়াত দিতে তাঁর বাসায় গেলাম। তিনি আগ্রহের সাথে দাওয়াত কবুল করলেন। তিনি বললেন, "আমি জেনেছি যে, মাওলানা মওদূদী মাদরাসা পাস গতানুগতিক মাওলানা নন; কুরআন ও হাদীসে পাণ্ডিত্য অর্জন করে তিনি মাওলানা হয়েছেন। এ কারণেই তাঁর বক্তব্য শুনতে যাবো।"

তিনি যথাসময়ে আসলেন। তাঁকে মঞ্চের নিকটবর্তী ভালো একটি চেয়ারে বসালাম। মাওলানার বক্তৃতা তিনি তন্ময় হয়ে শুনলেন। সুধী-সমাবেশ শেষ হলে আমি তাঁকে মাওলানার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তিনি উর্দুতেই মাওলানাকে বললেন, "আপনার বক্তব্যের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।"

মাওলানার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগে

পাঁচ সপ্তাহ মাওলানার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়ে বিভিন্ন সময় সবরকম প্রশ্ন করে মূল্যবান জওয়াব হাসিল করেছি। সব কথা তো মনে থাকা স্বাভাবিক নয়। স্মৃতির পাতা উল্টিয়ে কিছু এখানে পেশ করছি।

পূর্ব-পাকিস্তানের সবুজ রূপে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। বলতেন, পশ্চিম-পাকিস্তানে সবুজ এলাকা তালাশ করতে হয়, আর এখানে খালি মাটি দেখতে হলে তালাশ করতে হয়। পূর্ব-পকিস্তান সবটাই এক বিরাট সাজানো বাগান। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে কোন্‌টাকে বেশি ভালোবাসেন?" জওয়াবে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "আপনার দুটো চোখের কোন্ চোখকে বেশি ভালোবাসেন?" এর চেয়ে সুন্দর জওয়াব কী হতে পারে? একবার প্রশ্ন করলাম, আপনার লেখায় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রকে একই কু-মাতার দু' কু-সন্তান বলেছেন। জড়বাদকে আপনি কু-মাতা সাব্যস্ত করেছেন। এর দু' সন্তান কি একই মানের কু-সন্তান? এ দু'টোর মধ্যে কোন্‌টা বেশি মন্দ? জওয়াবে বললেন, "কলেরা ও বসন্ত রোগের মধ্যে কোন্‌টাকে আপনি কম মন্দ মনে করেন?" ঐ একই কায়দায় মোক্ষম জওয়াব পেলাম।

একবার তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কে মাওলানার মন্তব্য জানতে চাইলাম। বললেন, "ভাই, যে যতটুকু দীনের খেদমত করছেন, তা স্বীকার করা উচিত। দীনের সব রকম খেদমতকেই ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক মনে করবেন। এই যে মসজিদে

ছেলে-মেয়েদেরকে শুধু কুরআন পড়া শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, এটাও বিরাট খেদমত। আমরা যখন জনসভায় ইসলাম সম্পর্কে বক্তব্য রাখি তখন কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতেই অশিক্ষিত সাধারণ লোকও চিনতে পারে যে, এটা কুরআনের আয়াত। এরা মাতৃভাষাও পড়তে জানে না। কিন্তু ছোট সময় মসজিদে কুরআন পড়া শেখায় আমাদের বক্তৃতায় আয়াত শুনলে মাথা ঝুঁকায়।"

অন্য এক সময় জিজ্ঞেস করলাম, "জামায়াতে ইসলামী দীন কায়েম করার যোগ্য লোক তৈরি করছে। তাবলীগ জামায়াত কেমন লোক তৈরি করছে?" বললেন, "দীন কায়েম হলে এরা দীন মেনে চলবে। দীন মানার লোক তৈরি হওয়াও তো দরকার।"

মিনিটখানেক নীরব থেকে আবার বললেন, এরা মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে ধার্মিক বানাচ্ছে। সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের কোন কর্মসূচি নেই বলে এ জামায়াতের তৈরি লোক 'বাতিল নেযাম কা দিয়ানাতদার খাদেম' হিসেবে গড়ে উঠছে।

এ কথার অর্থ আমি বুঝলাম যে, তাবলীগ জামায়াতের মাধ্যমে গড়ে উঠা মানুষ যেখানেই কাজ করেন সততার সাথে করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থাকে বদলাবার চিন্তা করেন না। সুদী ব্যাংকে সততার সাথে চাকরি করছেন; কিন্তু সুদবিহীন ব্যাংকব্যবস্থা কায়েমের প্রচেষ্টা চালানো যে কর্তব্য সে চেতনা নেই।

এক সময় আলাপ প্রসঙ্গে বললাম, "মাওলানা, আমি তাবলীগ জামায়াতে প্রথম আকৃষ্ট হই তাদের আমীরের মোনাজাতে। আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া করার মধ্যে যে মজা তা প্রথমে তখনই বোধ করেছি।" তিনি বললেন, "চুলকানি হলে নখের সাহায্যে চুলকাতে অবশ্যই খুব মজা লাগে। কিন্তু এ দ্বারা চিকিৎসার উদ্দেশ্য সফল হয় না। সঠিক চিকিৎসা প্রয়োজন। তেমনি আল্লাহকে ডেকে কাঁদতে পারা মুমিনের জন্য এক মহাসম্পদ; কিন্তু মুমিনের নিকট দীনের আসল দাবি হলো, ইকামাতে দীনের জন্য জান ও মাল দিয়ে সংগ্রাম (জিহাদ) করা। এ আসল দায়িত্ব পালন করতে গেলে বাতিল শক্তির মোবাবিলায় বিজয়ী হবার জন্য আল্লাহর দরবারে চোখের পানি ফেলে ধরনা দেবার মধ্যে যে মজা ও তৃপ্তি এর কোন তুলনা নেই। ইকামাতে দীনের এ দায়িত্ব পালন না করে ইসলামের যতো খেদমতই করা হোক এবং দোয়াতে যতই চোখের পানি ফেলা হোক, তাতে দীন বিজয়ী হবে না। অথচ রাসূল (স)-কে পাঠানোই হয়েছে দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়ে। যারা নবীর উপর ঈমান আনবে তাদের উপরও এ দায়িত্ব রয়েছে। যারা রাসূল (স)-এর সাথে জামায়াতে নামায আদায় করা সত্ত্বেও জিহাদের ময়দানে যেতে রাজি হয়নি, তাদেরকে কুরআনে মুমিন হিসেবে গণ্য করা হয়নি।"

মাওলানা যা দিয়ে গেলেন

মাওলানার এ সফরে জনগণের নিকট সর্বপ্রথম জামায়াতে ইসলামীর নাম ব্যাপক পরিচিতি লাভ করলো। শিক্ষিত ও সুধী মহলে মাওলানা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি

হলো। রাজশাহী বারের সভাপতি মাওলানার বক্তব্য শুনবার পর আমাকে বললেন, "বিরাট মাওলানা পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আসবেন শুনে কল্পনা করেছিলাম যে, বিশাল পাগড়ি মাথায় এবং জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে সজ্জিত অবস্থায় দেখবো। এখন দেখলাম যে, রীতিমতো একজন প্রতিভাবান ভদ্রলোক।"

মাওলানা জামায়াতের দাওয়াতকে ব্যাপক করে দিয়ে গেলেন এবং সাংগঠনিক কাঠামোকে পুনর্গঠিত করে তাঁর দাওয়াতের প্রভাবকে কাজে লাগাবার নির্দেশ দিয়ে গেলেন। এরপর মাওলানা যতোবার এ এলাকায় সফরে এসেছেন, ঢাকার ধর্মনিরপেক্ষ পত্রিকাগুলো মাওলানাকে শুধু একজন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসাবেই বিবেচনা করেছে। দীনী ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁকে গণ্যই করেনি।

৭১.

যুক্তফ্রন্ট বিযুক্ত হলো

আমাদের এ দুর্ভাগা দেশে যারা রাজনীতি করেন, তারা ক্ষমতার রাজনীতিতেই পারদর্শী। আদর্শিক রাজনীতি তো বিরাট কথা, তাদের মধ্যে দেশ গড়ার রাজনীতিও নেই; কোন রকমে ক্ষমতায় যেতে পারা এবং একবার ক্ষমতা পেলে হাজারো অন্যায় উপায়ে সেখানে টিকে থাকাই আসল আদর্শ। তাই এ জাতীয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে বিভেদ সৃষ্টির মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ, কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলী বগড়া, গভর্নর ইস্কান্দার মির্জা ও চীফ সেক্রেটারি এনএম খান যুক্তফ্রন্টকে বিযুক্ত করে দুটো রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম হন।

কেন্দ্রে তিন কুচক্রী

ঐ সময় মুহাম্মদ আলী বগড়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেও আসল ক্ষমতা ছিলো গভর্নর জেনারেলের হাতে। সেনাপতি আইয়ূব খান তখন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। ১৯৫১ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত হত্যার পর তিন কুচক্রী পাকিস্তানের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। অনেকেরই বিশ্বাস, এরাই লিয়াকত হত্যার নায়ক। তাকে অপসারণ করা ছাড়া ক্ষমতার চাবিকাঠি দখল করা সম্ভব ছিলো না। প্রকাশ্য দিবালোকে জনসভায় হাজার হাজার লোকের চোখের সামনে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করা হলো। হত্যাকারীকে সাথে সাথেই ধরে হত্যা করে আসল নায়কদেরকে আড়ালে রাখার ব্যবস্থা করলো।

ঐ তিন মহানায়কের একজন গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ, একজন সেনাপতি আইয়ূব খান এবং আর একজন পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর ইস্কান্দার মির্জা।

গভর্নর জেনারেলের গলায় মালা পরানোর প্রতিযোগিতা

১৯৫৪ সালের নভেম্বরের ১৪ তারিখ গোলাম মুহাম্মদ ঢাকা এলেন। ইতোমধ্যে

যুক্তফ্রন্টের দু'দলে বিভক্তি চূড়ান্ত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা আতাউর রহমান খান এবং যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য দলের নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হকের মধ্যে একে অপরের আগে গভর্নর জেনারেলের গলায় মালা পরানোর প্রতিযোগিতা চললো। উভয়েরই বিশ্বাস ছিলো, গভর্নর জেনারেল যার উপর সন্তুষ্ট হবেন তাকেই পূর্ব-পাকিস্তানে সরকার গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হবে। বিমানবন্দরে গোলাম মুহাম্মদ উভয়ের হাত ধরে দু'জনের মালা একসাথে গলায় পরে তাদেরকে ধন্য করলেন। উভয়েই রাজনৈতিক মহলে হাস্যস্পদ হলেন এবং গভর্নর জেনারেল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর মর্যাদা হাসিল করলেন।

ঐ সফরে গভর্নর জেনারেল রংপুরেও গিয়েছিলেন। আমি তখনো রংপুর কারমাইকেল কলেজে ছিলাম। গভর্নর জেনারেল কলেজ দেখতে গেলেন। প্রিন্সিপাল সাহেব অধ্যাপকবৃন্দকে লাইনে দাঁড় করালেন। প্রিন্সিপাল সাহেব আমাদেরকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এ উপলক্ষে হাত মিলাতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, গভর্নর জেনারেলের মুখে প্যারালাইসিস। তিনি 'হাউ আর ইউ' বলতেই মুখ বাঁকা হয়ে গেলো। হাতও সম্পূর্ণ শক্তিহীন মনে হলো।

শাসনতন্ত্র রচনায় সংকট

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের নেতারা পরাজিত হলেও গণপরিষদে তারা সদস্য ছিলেন। তাদের চাপে প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলী বগড়া জনগণের নিকট মুসলিম লীগের মর্যাদা বহালের আশায় ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অগ্রসর হলেন। ঘোষণা দিলেন যে, ২৫ ডিসেম্বর কায়েদে আযমের জন্মদিনে তিনি জাতিকে ইসলামী শাসনতন্ত্র উপহার দেবেন। ঐ তিন কুচক্রীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩১ মে গভর্নর জেনারেল গণপরিষদই ভেঙে দিলেন। গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট মৌলভী তমীজুদ্দীন খান লাহোরে যেয়ে মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাৎ করে জানালেন যে, তিনি হাইকোর্টে গভর্নর জেনারেলের অন্যায় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মামলা করতে চান। কিন্তু মুসলিম লীগ নেতারা ময়দানে তৎপর হতে সাহস পাচ্ছেন না। এমনকি মামলার খরচ যোগাড়েও কোন আর্থিক সহযোগিতা করছেন না। মাওলানা মওদূদী মামলার খরচের দায়িত্ব নিলেন।

এ মামলা চলাকালেই গভর্নর জেনারেল এক অর্ডিন্যান্স বলে ঘোষণা করলেন যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের যোগ্য লোকদেরকে একটি কনভেনশনে সমবেত করবেন এবং তাদেরকে শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব দেবেন। অর্থাৎ তিনি নমিনেশন দিয়ে 'যোগ্য' লোকদেরকে এ মহান কাজে নিয়োগ করবেন। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কনভেনশনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার সিদ্ধান্তকে মেনে নেবার জন্য ব্যাপক রাজনৈতিক লবী চললো।

মৌলভী তমীজুদ্দীন খানের আবেদন সীন্দ চীফ কোর্টে গৃহীত হয়। চীফ জাস্টিস কর্নেলিয়াসের নেতৃত্বে কোর্ট গভর্নর জেনারেল কর্তৃক গণপরিষদ বাতিল করার

আদেশকে বেআইনী ঘোষণা করে। এ রায়ের বিরুদ্ধে গভর্নর জেনারেলের পক্ষে সরকার ফেডারেল কোর্টে আপিল দায়ের করলো। ফেডারেল কোর্টে সরকার বিজয়ী হবে আশা করে গভর্নর জেনারেল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রীত্বের লোভ দেখিয়ে কনভেনশন গঠন করার পক্ষে আওয়ামী লীগের সমর্থন হাসিল করার দায়িত্ব দিলেন। 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' সোহরাওয়ার্দী ও গভর্নর ইস্কান্দার মির্জা এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য একই সাথে ঢাকা আসলেন। মাওলানা ভাসানী কনভেনশনের বিরুদ্ধে আগেই বিবৃতি দেবার ফলে সমস্যা সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিবের সাহায্যে এ সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। সোহরাওয়ার্দীর দুর্ভাগ্য যে, তার রাজনৈতিক তৎপরতা শেষ হবার আগেই ১০ এপ্রিল (১৯৫৫) ফেডারেল কোর্টের রায় ঘোষণা হয়ে গেলো। প্রধান বিচারপতি মুনীর গভর্নর জেনারেল কর্তৃক গণপরিষদ বাতিল করাকে বৈধ বলে ঘোষণা করলেও কনভেনশনকে অবৈধ বলে রায় দিলেন। কোর্টের মতে, শাসনতন্ত্র রচনার জন্য কনভেনশন গঠনের ইখতিয়ার গভর্নর জেনারেলের নেই। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের ভোটে নতুন গণপরিষদ নির্বাচিত করতে হবে।

নতুন গণপরিষদ

৩১ মে (১৯৫৫) প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের ভোটে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ৪০ জন এবং পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে ৪০ জন নির্বাচিত হন। পূর্ব-পাকিস্তানের সদস্যদের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের ১৬ জন, আওয়ামী লীগের ১২ জন, মুসলিম লীগের ১ জন ছিলেন। বাকি ১১ জন কংগ্রেস, তফসিলী ফেডারেশন ও অন্যান্য গ্রুপের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন।

১৯৫৫ সালের ৬ জুন প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলী বগড়া ঢাকা এসে শেরে বাংলার দলের আবু হোসেন সরকারকে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন। গোলাম মুহাম্মদের গলায় মালা দেওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পেলো না। এর প্রধান কারণ, ৭২ জন অমুসলিম সদস্য আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেনি। আইনসভায় কেএসপির নেতৃত্বে মেজরিটি হয়। আওয়ামী লীগের ১৪৩ জন সদদ্যসের মধ্যে ১৯ জন কেএসপিতে যোগদান করেন এবং আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে আরো ২০ জন পৃথক দল হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামেই যুক্তফ্রন্টে চলে যান। ১৪৩ জনের মধ্যে ১০৪ জন আওয়ামী লীগে টিকে থাকেন।

ইতোমধ্যে গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদের অসুস্থতা বেড়ে যায় এবং ইস্কান্দার মির্জা ভারপ্রাপ্ত গভর্নর জেনারেল হন। আরো কিছুদিন পর গোলাম মুহাম্মদের মৃত্যু হলে মির্জা গভর্নর জেনারেল হন।

গোলাম মুহাম্মদ সোহরাওয়ার্দীকে নতুন গণপরিষদে প্রধানমন্ত্রী করার ওয়াদা করেছিলেন। সে ওয়াদা পূরণ করা ইস্কান্দার মির্জার জন্য জরুরি নয়। ১৯৫৫ সালের ১০ আগস্ট চৌধুরী মুহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী হন। পশ্চিম-পাকিস্তানের

মুসলিম লীগ ও পূর্ব-পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট মিলে গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ কোয়ালিশন সরকার হয়। এ সরকারে শেরে বাংলা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর সোহরাওয়ার্দী বিরোধীদলীয় নেতা মনোনীত হন।

চৌধুরী মুহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী হবার ছয় মাস পরই ১৯৫৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি শাসনতন্ত্র রচনা চূড়ান্ত হয়ে গণপরিষদে পাস হয়ে যায়।

শাসনতন্ত্রের বাস্তবায়ন

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তিনবার প্রণীত হয়েছে। ১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের আমলে সবচেয়ে ভালো মানের ইসলামী শাসনতন্ত্র রচিত হয়। গণপরিষদে চূড়ান্তভাবে পাস হবার আগেই গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ অবৈধভাবে খাজাকে গদিচ্যুত করেন।

১৯৫৪ সালে প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলী বগড়ার নেতৃত্বে প্রণীত শাসনতন্ত্র গণপরিষদে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবার আগেই গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ গণপরিষদই ভেঙে দিলেন।

১৯৫৬ সালে চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে রচিত শাসনতন্ত্র গণপরিষদে পাস হলেও তা বাস্তবায়নের আগেই আইয়ূব খান সামরিক শাসন জারি করে শাসনতন্ত্রকে বাতিল করে দেন। অথচ এ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে সারা পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন হবার কথা ছিলো। এর চার মাস আগেই ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারি হয়ে যায়। এতো ব্যাপক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে স্বাধীন পাকিস্তানের জনগণ ৯ বছর পরে একটি শাসনতন্ত্র পেয়েও এর সুফল ভোগ করতে পারলো না। সামরিক বাহিনীর একমাত্র দায়িত্ব হলো দেশ রক্ষা করা। দেশ শাসন তাদের দায়িত্ব নয়। সেনাপতি আইয়ূব খান শাসনতন্ত্রের হেফাযতের শপথ নিয়ে সেনাপতি হলেন। তারই নেতৃত্বে ঐ শাসনতন্ত্র বাতিল হয়ে গেলো। জনগণের চাকর হয়ে জনগণের দেওয়া অস্ত্র ব্যবহার করে জনগণকেই তারা গোলাম বানালো। নিজেদের দেশ নিজেরাই জয় করে নিলো।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সেনাপতি আইয়ূব খান সামরিক শাসন শুরু করে ১৯৬২ সালের ১ মার্চ বেসামরিক সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে একটি নতুন শাসনতন্ত্র দেশের উপর চাপিয়ে দিলেন। অবশ্য এ শাসনতন্ত্রটিতে ১৯৫৬ সালে প্রণীত শাসনতন্ত্রের প্রায় অনুরূপই ছিলো। তবে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের গণতান্ত্রিক কাঠামোর বদলে মৌলিক গণতন্ত্র (Basic Democracy) নামে পৃথক এক ফর্মুলা পেশ করা হয়। এতে প্রেসিডেন্ট, কেন্দ্রীয় আইনসভা ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের নির্বাচন পরোক্ষ পদ্ধতিতে করার বিধান রাখা হয়। জনগণ প্রত্যক্ষ ভোটে ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার নির্বাচন করবে। পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানে ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার মেম্বারদের ভোটে অন্যান্য যাবতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এ শাসনতন্ত্রও স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। আইয়ুব খান ৭০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ৭০ সালে সারা পাকিস্তানে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন হয়। নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া ভুট্টোর ষড়যন্ত্রের ফলে পাকিস্তান ভেঙে যায় এবং ৭১-এর ডিসেম্বরে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালেই শাসনতন্ত্র রচনা করতে সক্ষম হয়। এতে সংশোধনীর মাধ্যমে অনেক মৌলিক পরিবর্তন হলেও ঐ শাসনতন্ত্রই এখনও চালু আছে।

জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালেই পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়। ১৯৭৭ সালে সেনাপতি জিয়াউল হক সামরিক শাসন জারি করেন। তিনিও নতুন করে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার ব্যবস্থা নেন। পাকিস্তানে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রচিত শাসনতন্ত্র স্থায়ীভাবে চালু থাকবে কিনা কে জানে? পাকিস্তানের বর্তমান (২০০২) প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মুশাররফ কর্তৃক জেনারেল আইয়ুব খান ও জেনারেল জিয়াউল হকের মতোই দীর্ঘকাল স্বৈরশাসন কায়েম রাখার আশঙ্কা অবশ্যই রয়েছে। অবশ্য নির্বাচনের মাধ্যমে বেসরকারি সরকার ২০০২ সালে কায়েম হয়েছে।

আওয়ামী মুসলিম লীগের আদর্শিক পরিবর্তন

১৯৫৫ সালের জুনে আবু হোসেন সরকার প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ আইনসভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন যোগাড় করতে ব্যর্থ হওয়ায় কেএসপির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের সাথে অমুসলিমদের কোয়ালিশন সরকার কায়েম হয়।

৭২ জন অমুসলিম সদস্য আওয়ামী লীগকে কেন সমর্থন করলেন না তা জানতে পেরে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দলীয় আদর্শ পরিবর্তন করা অত্যাবশ্যক বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। শেরে বাংলা ১৯৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় অমুসলিম সদস্যগণ তার দলকে অসাম্প্রদায়িক মনে করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন। মাওলানা ভাসানী আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। তাদের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের নামে 'মুসলিম' শব্দ প্রমাণ করে যে, এ দলটি 'সাম্প্রদায়িক'।

আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতারা উপলব্ধি করলেন যে, ক্ষমতায় যেতে হলে আইনসভার হিন্দু সদস্যদের সমর্থন অপরিহার্য। তাই ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবরে সদরঘাটে অবস্থিত রূপমহল সিনেমা হলে দলের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ অপসারণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯৪৯ সালে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে মুসলিম লীগের বিরোধী একটি দল গঠিত হয়। খাজা নাজিমুদ্দীন তখন প্রাদেশিক

প্রধানমন্ত্রী। মুসলিম লীগ নেতারা দলটিকে কুক্ষিগত রাখার উদ্দেশ্যে তাদের অপছন্দনীয় লোকদেরকে দলের বাইরে রাখার ষড়যন্ত্র করে। ১৯৪৭ সালে বঙ্গদেশ বিভক্ত হবার পর পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচনের সময় শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পরাজিত করে খাজা নাজিমুদ্দীন নির্বাচিত হন। পূর্ববঙ্গে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেমের নেতৃত্বেই পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হয়। তাই ময়দানে, বিশেষ করে ঢাকায় এ দু'নেতার সমর্থকই বেশি ছিলো।

খাজা নাজিমুদ্দীন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় এরা স্বাভাবিক কারণেই সন্তুষ্ট ছিলো না। ১৯৪৮-এ রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে তাদের দূরত্ব আরো বেড়ে যায়। সরকারি মুসলিম লীগ দল এদেরকে দলে স্থান দিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। মাওলানা ভাসানী দেশ বিভাগের পর আসাম থেকে হিজরত করে পূর্ব-পাকিস্তানে এসে সরকারি দলের নিকট কোন মর্যাদাই পেলেন না।

এ পরিস্থিতিতে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। মাওলানার শ্লোগান ছিলো ঃ

মুসলিম লীগের নেতৃত্বে জনগণ পাকিস্তান কায়েম করেছে। বর্তমানে ঐ মুসলিম লীগ আর জনগণের দল হিসেবে গণ্য নয়। সরকারি মুসলিম লীগ খাজাদের লীগ। এদের দ্বারা জনগণের আশা পূরণ হবে না। জনগণের মুসলিম লীগ চাই, যাতে জনগণের পক্ষ থেকে এদেরকে সঠিক পথে চলতে বাধ্য করা যায়, সে জন্য জনগণের দল প্রয়োজন।

'জনগণ' শব্দের আরবী হলো 'আওয়াম'। তাই এ দলের নাম রাখা হলো 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'। মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত মুসলিম লীগ নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে 'আওয়ামী লীগ' নাম ধারণ করে দলটি গঠন করার সময়কার আদর্শ বিসর্জন দিলো। কারণ তাদের আসল আদর্শ হলো ক্ষমতা। ক্ষমতায় যেতে হলে হিন্দুদের সমর্থন প্রয়োজন। মুসলিম শব্দ বর্জন না করলে তাদের সমর্থন পাওয়া যাবে না।

আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে মৌলিক পরিবর্তন

দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়াকেই কংগ্রেস ও অন্যান্য অমুসলিম দল যথেষ্ট মনে করলো না। জানা গেলো যে, আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি সংযোজন না করা পর্যন্ত দলটিকে অসাম্প্রদায়িক হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

এ দুটো দাবি পূরণ করে অমুসলিমদের নিকট পরিপূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য হওয়ার 'মহান উদ্দেশ্যেই' ১৯৫৬ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার কাগমারিতে (বর্তমান নাম সন্তোষ) কাউন্সিল অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনেই আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণরূপে 'অসাম্প্রদায়িক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' হওয়ার মহাগৌরব (?) অর্জন করে।

যুক্ত ও পৃথক নির্বাচন

ব্রিটিশ আমলে মুসলিম জাতি ব্রিটিশ সরকার থেকে 'পৃথক নির্বাচন' দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়। এ পদ্ধতির নির্বাচনে মুসলিম ভোটাররা পৃথকভাবে ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকার পেলো। এভাবেই হিন্দু, শিখ ও খ্রিস্টানরা পৃথক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে।

যুক্ত নির্বাচন মানে প্রতিটি নির্বাচনী আসনে হিন্দু-মুসলিম ভোটার ঐ নির্বাচনী এলাকার একজন প্রতিনিধি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট দেবে।

ঐ আসনে হিন্দু বা মুসলমান যত প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চসংখ্যক ভোট যে পাবে, সেই আইনসভার সদস্য হবে। প্রার্থীদের মধ্যে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যসব দলের পক্ষ থেকেই প্রার্থী থাকতে পারে। যদি এ পদ্ধতিতে ১৯৪৫ ও ৪৬ সালে নির্বাচন হতো তাহলে মুসলিম লীগ খুব কম আসনই পেতো। পাকিস্তান কায়েম করা তো দূরের কথা মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবি করার সুযোগও পেতো না।

১৯৪৫ সালে অবিভক্ত ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন ও ১৯৪৬ সালে সারা ভারতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচন হয়। কেন্দ্রে মুসলমানদের ৩০টি আসনের সব ক'টিই মুসলিম লীগ দলীয় প্রার্থীরা দখল করে। কংগ্রেস হিন্দু-মুসলিমকে এক জাতি দাবি করে ঐ নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও মুসলিম আসনে কংগ্রেস সমর্থক মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করায়। কিন্তু মুসলিম ভোটাররা পাকিস্তান দাবির পক্ষে মুসলিম লীগ প্রার্থীদেরকে বিপুল ভোটাধিক্যে বিজয়ী করে। প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ শতকরা ৮০ ভাগ মুসলিম আসন দখল করে। নির্বাচনের এ ফলাফল ব্রিটিশ সরকার ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে পাকিস্তান দাবি মেনে নিতে বাধ্য করে।

৭২.

কংগ্রেস ও হিন্দু দলগুলো কেন যুক্ত নির্বাচন দাবি করলো?

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সংখ্যালঘুরাই পৃথক নির্বাচন দাবি করে থাকে, যাতে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। এ কারণেই অবিভক্ত ভারতে মুসলিমরা সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে পৃথক নির্বাচন দাবি করে তা আদায় করেছে।

পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও তারা যুক্ত নির্বাচন কেন দাবি করলো? তারাই আওয়ামী লীগকে যুক্ত নির্বাচন দাবি মেনে নিতে বাধ্য করলো।

১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেস ২৫টি, তফসিলী ফেডারেশন ২৭টি এবং সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট ১৩টি আসন পেয়ে আইনসভায় বিরাট ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেলো। যুক্তফ্রন্ট বিযুক্ত হয়ে যখন ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো, তখন

'ব্যালেন্স অব পাওয়ার' হিন্দু সদস্যদের হাতে চলে গেলো। তারা যাদেরকে ক্ষমতায় বসাতে চায় তারা ছাড়া অন্য কেউ ক্ষমতায় যেতে পারে না। ১৯৫৪ সালে তারা শেরে বাংলার নেতৃত্বে পরিচালিত যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসালো।

আওয়ামী লীগ যখন মুসলিম পরিচিতি বর্জন করে এবং যুক্ত নির্বাচন ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণ করে হিন্দুদের আস্থা অর্জন করলো তখন ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হবার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি বহাল থাকলে এখনো আইনসভায় সংখ্যালঘুদের হাতে 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার' স্থায়ীভাবেই থাকতো। তা সত্ত্বেও তারা যুক্ত নির্বাচন দাবি করলো কেনো?

বাংলাদেশের শানসতন্ত্রে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থাই রয়েছে। যদি পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকতো তাহলে সংখ্যানুপাতে হিন্দুরা শতকরা ১২টি আসন পেতো। ৩০০ আসনের মধ্যে কমপক্ষে ৩৬টি আসন হিন্দুদের হাতে থাকতো। ২০০১ সালের নির্বাচনে নগণ্যসংখ্যক হিন্দু সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। যুক্ত নির্বাচনের কারণেই তাদের এ দশা হয়েছে।

পৃথক নির্বাচন না থাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সংখ্যানুপাতে বর্তমান আইনসভায় নেই। এর জন্য কারা দায়ী? হিন্দুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিল করা হয়নি; বরং হিন্দু নেতৃবৃন্দের দাবিতেই যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু হয়েছে। যে হিন্দু নেতারা ১৯৫৫ সালে যুক্ত নির্বাচন দাবি করলেন, তারা কি এর পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন? তাদের হাতে সংসদে ক্ষমতার চাবিকাঠি ছিলো। তারা এতো বড় সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবার সিদ্ধান্ত কেনো নিলেন?

কংগ্রেস নেতা কামিনী কুমার দত্ত ও ধীরেন্দ্র নাথ মুখার্জির মতো নেতাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই। তারা যে আদর্শে বিশ্বাস করতেন, সে আদর্শের স্বার্থে তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিসর্জন দিলেন। কংগ্রেসের আদর্শ ছিলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও হিন্দু-মুসলিম অভিন্ন জাতীয়তাবাদ এবং অখণ্ড ভারত। যে মুসলিম জাতীয়তাবাদ তাদের ভারতমাতাকে বিভক্ত করেছে সে পৃথক জাতীয়তাবোধ মুসলমানদের মন থেকে উৎখাত করতে পারলে আবার এই ভারতের মহাসাগর তীরে হিন্দু-মুসলিম এক জাতিতে পরিণত হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যদি বাঙালি মুসলমানদের আদর্শ বলে গণ্য হয় তাহলে ইসলামী শাসনের বিরুদ্ধে তারাই রুখে দাঁড়াবে।

কংগ্রেস নেতারা অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন। তারা আইনসভায় যে 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার' ভোগ করছিলেন তা মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার কোন সুযোগ সৃষ্টি করেনি। মুসলমান সদস্যরা দলাদলি করলে ঐ ক্ষমতাটুকু ব্যবহার করে এক দলের বদলে অন্য দলকে ক্ষমতায় আনা যায় বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসল শাসনক্ষমতা মুসলমানদের হাতেই থেকে যায়। তাই তারা ঐ 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার'টুকু আইনসভা থেকে সরিয়ে ইলেকটোরেটে (ভোটের ময়দানে) নিতে

চেয়েছেন। তারা নির্বাচন কেন্দ্রে 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার' ব্যবহার করে মুসলমান নামধারী এমন লোকদেরকে নির্বাচিত করার পরিকল্পনা নিলেন, যারা যোগ্যতার সাথে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। হিন্দুদের মুখে ইসলামী শাসন ও ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে কিছুই বলা সম্ভব নয়। এ জাতীয় কথা বলার জন্য উপযোগী মুসলমান সদস্যদেরকে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত করতে পারলে তাদের সব মহান উদ্দেশ্য সহজেই পূরণ হবে। ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠ আইনসভায় প্রয়োজন। এ বিরাট প্রয়োজন হিন্দুদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে কিছুতেই পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। তাই পরোক্ষভাবে মুসলমান নামধারী ইসলামবিরোধী লোক নির্বাচিত করতে হবে। এর জন্য যুক্ত নির্বাচন অত্যাবশ্যক। মুসলমানদের ভোট মুসলমান প্রার্থীদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাবে। হিন্দুরা যে 'মুসলমান'-কে সদস্য বানাতে চান তাকে হিন্দুদের সব ভোট একচেটিয়া দিলে মুসলমানদের একাংশের ভোটেই তাদের লোক পাস করতে সক্ষম হবে, এটাই ছিলো আসল উদ্দেশ্য।

কংগ্রেস নেতারা যে 'মহৎ' উদ্দেশ্যে যুক্ত নির্বাচন চেয়েছিলেন তাতে তারা সফল হয়েছেন। তাদের আদর্শই বিজয়ী হয়েছে। এর জন্য তারা বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন এনেছে

যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু হওয়ার ফলে দেশের রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এ পদ্ধতিতে নির্বাচনে হিন্দু ও মুসলিম ভোটারদেরকে একই সাথে ভোট দিতে হচ্ছে। তাই যে দলের প্রার্থীই হোক হিন্দুদের ভোট সবারই প্রয়োজন। মুসলমান প্রার্থীদেরকেও বাধ্য হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সমর্থন করতে হয়। মুসলিম জাতীয়তা, ইসলামী শাসন, আল্লাহর আইন ইত্যাদি কথা মুসলিম প্রার্থীরাও নির্বাচনের সময় বলতে সাহস করেনি। বললে অবশ্যই হিন্দু ভোট হারাবে।

পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকাকালে মুসলিম প্রার্থীরা নির্বাচনের সময় পাঞ্জাবি-পায়জামা-টুপি পরে মুসলিম ভোটারদের কাছে যেতে বাধ্য হতো। নামাযের অভ্যাস না থাকলেও ময়দানে থাকাকালে নামায পড়তে বাধ্য হতো। এমনকি কেউ কেউ ওযূ ছাড়াই নামাযে দাঁড়িয়ে যেতো বলে শুনেছি। মুসলমানদের ভোট পাওয়ার প্রয়োজনে ইসলামের জন্য জান দেবার ওয়াদাও করতো। যুক্ত নির্বাচন এ পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে।

যেসব রাজনৈতিক দল হিন্দু ভোট পাওয়ার আশা করে না, তারাও যুক্ত নির্বাচনের কারণে ইসলামের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখে না। ইসলামী মূল্যবোধ পর্যন্ত বলাই যথেষ্ট মনে করে।

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির সংযোজন

১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও হিন্দু সদস্যদের

কোয়ালিশন সরকার কায়েম হয়। জনাব আতাউর রহমান খান প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হন। কেন্দ্রে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী বানাবার প্রয়োজন দেখা দিলো। গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পশ্চিম-পাকিস্তানের সদস্যদেরকে সোহরাওয়ার্দীর সমর্থক বানাতে সক্ষম হন। আওয়ামী লীগ, কংগ্রেস ও তফসিলী মিলে কেএসপি ও নেযামে ইসলাম পার্টির সদস্যদের চেয়ে বেশি হলেও পশ্চিম-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের কোন শক্তি ছিলো না।

ইস্কান্দার মির্জা ও পশ্চিম-পাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থের ধ্বজাধারীরা প্রধানত একটি উদ্দেশ্যে সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া অপরিহার্য মনে করেন। এ রহস্যময় উদ্দেশ্যটির কথাই এখন বলছি। চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে ১৯৫৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের যে শাসনতন্ত্র গণপরিষদে পাস হয়, তাতে নির্বাচন পদ্ধতির বিষয়টি অমীমাংসিত রাখা হয়। পশ্চিম-পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশকে একটি প্রদেশে পরিণত করে যে আইনসভা গঠন করা হয়, সেখানে সদস্যগণ প্রায় সর্বসম্মতভাবেই পৃথক নির্বাচনের পক্ষে রায় দেন। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তান আইনসভায় অধিকাংশ সদস্য যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে মতামত দেয়। এ অবস্থায় এ বিষয়ে শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণ বিষয়টি মুলতবি রাখতে বাধ্য হন। গণপরিষদের দায়িত্ব শেষে এর সদস্যগণ কেন্দ্রীয় আইসভার সদস্য হিসেবে এ বিষয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে সাব্যস্ত হয়। এটা চৌধুরী মুহাম্মদ আলী ও গণপরিষদের বিরাট ব্যর্থতা। এটা মুলতবি রাখায় শাসনতন্ত্রের ইসলামী ধারাগুলো বাস্তবায়নের পথে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি হলো।

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পশ্চিম-পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশকে 'পশ্চিম পাকিস্তান ইউনিট' হিসেবে যখন একটি প্রদেশে পরিণত করা হলো তখন এ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী কে হবে, এ নিয়ে বিরাট বিতর্ক সৃষ্টি হয়। গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা নওয়াব মুশতাক আহমদ গুরমানীর সাথে মিলে এ মীমাংসা করেন যে, মুসলিম লীগের নেতা নওয়াব গুরমানী পশ্চিম-পাকিস্তান প্রদেশের গভর্নর হবেন এবং সীমান্ত প্রদেশের নেতা ডা. খান সাহেব প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হবেন। ৪ প্রদেশের মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে কেউ প্রধানমন্ত্রী না হওয়ায় তারা সবাই এ মীমাংসা মেনে নিলেন। অথচ ডা. খান সাহেব কংগ্রেস নেতা ছিলেন এবং তিনি তাঁর নেতা 'সীমান্ত গান্ধী' নামে পরিচিত খান আবদুল গাফফার খানের সহোদর।

গভর্নর জেনারেল মির্জা, পশ্চিম-পাকিস্তানের গভর্নর নওয়াব গুরমানী ও কংগ্রেস নেতা প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী ডা. খান সাহেব মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিটি শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে হলে সোহরাওয়ার্দীর মতো লোকের প্রধানমন্ত্রী হওয়া প্রয়োজন। ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তিনি যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি কেন্দ্রীয় আইনসভায় (ন্যাশনাল এসেম্বলী) পাস করিয়ে নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠান ত্বরান্বিত করার টার্গেট নিয়ে কর্মতৎপর হন।

ন্যাশনাল এসেম্বলীর অধিবেশন পশ্চিম-পাকিস্তানে বসলে ওখানকার পরিবেশে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা পাস করানো অসম্ভব বিবেচনা করেই গভর্নর জেনারেলের অনুমতি নিয়ে তিনি ঢাকায় অধিবেশন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন।

ঢাকায় জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসলো। সন-তারিখটা এখনও যোগাড় করতে পারলাম না। গত কয়টি কিস্তিতে অনেক রাজনৈতিক তথ্য পরিবেশন করেছি। যে সব বই থেকে সহযোগিতা নিয়েছি তাতে এ তথ্যটা আমার চোখে পড়েনি। বইগুলো হলো, জনাব আবুল মনসুর আহমদের 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', জনাব অলী আহাদের 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫', জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর 'রাজনীতির তিন কাল' এবং এডভোকেট সাদ আহমদের 'আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিন কাল'।

সন-তারিখ দিতে না পারলেও জাতীয় সংসদের ঐ অধিবেশনের কথা স্মৃতিতে অম্লান আছে। যে সব দল যুক্ত নির্বাচনবিরোধী, তারা পল্টন ময়দানে পৃথক নির্বাচনের পক্ষে বিরাট জনসভার আয়োজন করে। জাতীয় সংসদের বেশ কয়েকজন পশ্চিম-পাকিস্তানি সদস্য অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় পৃথক নির্বাচনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। পূর্ব-পাকিস্তানের সদস্যদের মধ্যে নেযামে ইসলামী পার্টি ছাড়া আর কোন দল পৃথক নির্বাচনের পক্ষে সোচ্চার ছিলো বলে মনে পড়ে না। জনসভা শেষে পল্টন ময়দান থেকে বিরাট মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করার জন্য বের হয়। মিছিল পল্টন ময়দান এলাকায় থাকাকালেই যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে প্রাদেশিক সরকারের লেলিয়ে দেওয়া গুণ্ডারা মিছিলের উপর দূর থেকে বৃষ্টির মতো ভাঙা ইট ও পাথরের ঢিল ছুড়তে লাগলো। পুলিশ সঙ্গত কারণেই তামাশা দেখার ভূমিকা পালন করল। আমার মাথাও ঢিল পড়লো। রক্তে জামা ভিজে গেলো। খালি হাতে মিছিলকারীরা কিছুক্ষণ ঢিল খেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। মুসলিম লীগ নেতা আবুল কাসেম ও শাহ আজীজুর রহমানকে আওয়ামী লীগ গুণ্ডারা ধরে নিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করলো, আর পুলিশ তাদেরকে হাসপাতালে পাঠিয়েই দায়িত্ব শেষ করলো। যারা এ দু'-নেতার উপর নৃশংস হামলা চালালো, পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে সামান্য কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করলো না।

জাতীয় সংসদে গভীর রাত পর্যন্ত প্রচণ্ড বিতর্ক চললো। পূর্ব-পাকিস্তানি সদস্যদের কয়েকজন ছাড়া সবাই এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের সদস্যদের একাংশ মিলে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন যোগাড় করে প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী গভর্নর জেনারেলের দেওয়া পবিত্র দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করলেন।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেই পশ্চিম-পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের আইনসভায় প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে পৃথক নির্বাচনের পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়। সবক'টি প্রদেশেই বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য মুসলিম লীগের। তাদেরই প্রতিনিধিদের একাংশ কেন্দ্রীয় আইনসভায় (জাতীয় সংসদে) কেমন করে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে

রায় দিলো, এ প্রশ্ন বিরাট রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করলো। এরই পরিণামে সোহরাওয়ার্দীকে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে হলো।

পশ্চিম-পাকিস্তানে বিশেষ ধরনের রাজনীতি

পূর্ব-পাকিস্তানে জনগণ নির্বাচনে যতোটা স্বাধীনভাবে ভোট দেয়, পশ্চিম-পাকিস্তানের জনগণ ততোটা স্বাধীন নয়। জমিদারি প্রথা, গোত্রীয় ঐক্য এবং আরও বিভিন্ন রকম শ্রেণীভেদের কারণে এসবের প্রভাবমুক্ত হয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে জনগণ ভোট দেবার সুযোগ পায় না। তাছাড়া যারাই নির্বাচিত হন তারা সরকারি দলে থাকাই জরুরি মনে করেন। মুসলিম লীগবিরোধী ছোট ছোট কতক দলই সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলেও সদস্যগণ জনস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন না। তারা প্রায় সবাই কায়েমি স্বার্থবাদী গ্রুপেরই প্রতিনিধি।

রাজনৈতিক ইস্যুর ভিত্তিতে তারা কমই বিভক্ত হন। ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের শক্তি যাদের হাতে, তাদের নির্দেশ এরা সহজেই মেনে নেয়। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ, সেনাপতি আইয়ুব খান ও প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা সেনাবাহিনীর শক্তিবলেই পাকিস্তানের রাজনীতি দীর্ঘকাল নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এ তিন কুচক্রীর অশুভ আঁতাত না হলে পাকিস্তানের ইতিহাস ভিন্ন হতো।

এ কুচক্রী সৃষ্টির পেছনেও মুসলিম লীগ নেতাদের অবদান রয়েছে। ১৯৫০ ও ৫১ সালে পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের নির্বাচনে মুসলিম লীগ নেতারা চরম নির্বাচনী কারচুপি করে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখে। বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তারা রাজনৈতিক নেতাদের আনুগত্য করেন জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার কারণে। যখন তাঁরা দেখলেন যে, রাজনৈতিক ময়দানে নেতারা সরকারি কর্মচারীদের কাঁধে বন্দুক রেখে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করছেন, তখন এর প্রতিক্রিয়ায় তারা নিজেরাই ক্ষমতা হস্তগত করার সিদ্ধান্ত নিলো।

ইংরেজ শাসনামলে এদের কাঁধে চড়েই তারা দেশ শাসন করেছে। অবশ্য ইংরেজরা যোগ্য শাসকই ছিলো। নির্বাচনে কারচুপি করে যারা শাসন ক্ষমতা দখল করছে, তারা সরকারি কর্মকর্তাদের চেয়ে বেশি যোগ্য নয়। অথচ অবৈধভাবে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য তারা সরকারি কর্মকর্তাদেরকে ব্যবহার করছে। সরকারি (বেসামরিক ও সামরিক) কর্মকর্তাদের মধ্যে এ চেতনা সৃষ্টি হলো যে, এ সব অযোগ্য লোক আমাদের কাঁধে চড়ে শাসন করতে চায়। আমরা এদের চেয়ে বেশি যোগ্য। এদেরকে কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে আমরাই তো সরাসরি শাসন করতে পারি। এরা যদি জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধি হতো, তাহলে তাদের আনুগত্য করতে আমরা নৈতিক দিক দিয়ে বাধ্য ছিলাম। এরা সত্যিকার প্রতিনিধি নয়, এদেরকে মানতে আমরা বাধ্য নই।

এ কুচিন্তার নায়ক হিসেবে বেসামরিক কর্মকর্তা গোলাম মুহাম্মদ ও সামরিক

কর্মকর্তা আইয়ূব খান ও ইস্কান্দার মির্জার মধ্যে এ আঁতাত হয়। ১৯৫১ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হত্যা থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজনীতি এ তিন কুচক্রীর ষড়যন্ত্রের জালেই আবদ্ধ ছিলো।

এ কথার বাস্তব উদাহরণ

লিয়াকত হত্যা যে এদেরই পরিকল্পনা, তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত হলেই ঐ পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যেতো। তাই হত্যাকারীকে হত্যা করে তদন্তের উৎস মুছে ফেলা হলো। এ তিন কুচক্রী বারবার মুসলিম লীগের টিকেটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদেরকে ব্যবহার করেই সব কুকর্ম চালু করতে সক্ষম হয়েছে। বড় কয়েকটি উদাহরণ ঃ

১. ১৯৫৩ সালের ১৭ এপ্রিল গভর্নর জেনারেল গণপরিষদের মুসলিম লীগ সদস্যদের নির্বাচিত নেতা ও দলের সভাপতি খাজা নাজিমুদ্দীনকে বিনা কারণে পদচ্যুত করলেন। গণপরিষদের মুসলিম লীগ সদস্যগণ এর কোন প্রতিবাদ পর্যন্ত করেননি। প্রতিবাদ হবে না এ বিষয়ে নিশ্চিত না হলে গভর্নর জেনারেল এতো বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। আরও বিস্ময়ের বিষয় যে, সদস্যগণ গভর্নর জেনারেলের নির্দেশে বিনাদ্বিধায় আমেরিকায় নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত (সরকারি কর্মচারী) মুহাম্মদ আলী বগড়াকে পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা হিসেবে মেনে নিলেন।

২. ১৯৫৪ সালের ৩১ মে গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ গণপরিষদ বাতিল করে দিলে এর প্রতিকারের সামান্য চেষ্টাও তারা করেনি। গণপরিষদ সভাপতি মৌলভী তমীজুদ্দীন খানকে সীন্দ চীফ কোর্টে মামলার ব্যাপারেও কোন সহযোগিতা করেননি।

৩. ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পশ্চিম-পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশকে একীভূত করে বৃহত্তর প্রদেশ করা হলো। ৪টি প্রদেশের আইনসভায়ই মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা ছিলো। অথচ 'ওয়ান ইউনিট' কায়েম করে গোটা পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সীমান্তের কংগ্রেস নেতা ডা. খান সাহেবকে মেনে নিতে তাদের কোন আপত্তি হয়নি। এমনকি ডা. খান সাহেবের দাবি অনুযায়ী মুসলিম লীগের সদস্যগণ গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার নির্দেশে 'রিপাবলিকান পার্টি' নামে নতুন দলে যোগদান করতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

৪. ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ডা. খান সাহেবের রিপাবলিকান পার্টি গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার নির্দেশে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মেনে নেয়।

৫. ১৯৫৭ সালের ১১ অক্টোবর গভর্নর জেনারেলের ইচ্ছা পূরণ করতে সোহরাওয়ার্দীর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে এবং মুসলিম লীগ নেতা আইআই চন্দ্রিগড়কে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত হয়।

৬. ১৯৬২ সালে সামরিক শাসক আইয়ুব খান যখন বেসামরিক সরকার কায়েমের উদ্যোগ নেন, তখন তার নিজস্ব রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন হয়। তিনি মুসলিম লীগ নেতাদেরকে একটি সম্মেলনে (কনভেনশন) হাজির হতে আহ্বান জানান। কিছু নেতা ছাড়া মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় প্রায় সবাই আইয়ূব খানের নেতৃত্ব মেনে নেন এবং মুসলিম লীগকে সামরিক শাসনকর্তা তার পকেটস্থ করেন।

৭. ১৯৮০ সালে জেনারেল জিয়াউল হকও অনুরূপভাবেই মুসলিম লীগ দখল করেন।

প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর আকস্মিক বিদায়

গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা, সেনাপতি আইয়ূব খান ও পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী রিপাবলিকান পার্টির নেতা ডা. খান সাহেব সোহরাওয়ার্দীকে যে উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন, সে হীন উদ্দেশ্য পুরা হবার পর তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ জরুরি মনে করলেন। কারণ সোহরাওয়ার্দী যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে আইনসভার নির্বাচন ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারলে পূর্ব-পাকিস্তানে তার আওয়ামী লীগই হিন্দুদের সমর্থনে বিজয়ী হবে বলে বিশ্বাস করতেন। ওদিকে মির্জা ও আইয়ূব খান নির্বাচনের আগেই ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করেন। ১৯৫৭ সালের ১১ অক্টোবর পশ্চিম-পাকিস্তানের রিপাবলিকান পার্টি, চিন্তা-চেতনায় (মুসলিম লীগ) দেশের উপর জোর করে যুক্ত নির্বাচন চাপিয়ে দেবার অজুহাতে সোহরাওয়ার্দীর উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করলো। ১৯৫৭ সালের ১৮ অক্টোবর চন্দ্রিগড় প্রধানমন্ত্রী হয়েই আবার পৃথক নির্বাচন জাতীয় সংসদে পাস করাবার উদ্যোগ নেন। মির্জা ও ডা. খান সাহেবের ষড়যন্ত্রে ১১ ডিসেম্বর চন্দ্রিগড়কে পদত্যাগ করতে হয়।

৭৩.

পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক চিত্র

আমি দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে লিখছি না। ইতিহাসের দাবি হলো, ঘটনাগুলোকে ধারাবাহিক ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে তুলে ধরা। 'জীবনে যা দেখলাম' শিরোনামে যা লিখছি, তাতে ইতিহাসের দাবি পূরণ করা সম্ভব নয় এবং প্রয়োজনও নেই। অবশ্য আমি যা দেখলাম তাতে দেশের রাজনীতি নিশ্চয়ই থাকবে। সে হিসেবে যতটুকু রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন তাই-ই লিখছি।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ নামে যে ভূখণ্ডটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান পেয়েছে, ইতঃপূর্বে এটাই পূর্ব-পাকিস্তান নামে অভিহিত ছিলো। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় বঙ্গদেশও পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ নামে

বিভক্ত হয়। ঐ পূর্ব-বঙ্গই পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিলো। বর্তমানে তা বাংলাদেশ। বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে বিভাগ-পূর্ব অবিভক্ত বঙ্গদেশের রাজনীতি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা জরুরি। পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমি হিসেবেই ঐ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

অবিভক্ত বঙ্গদেশের রাজনীতি

ইংরেজ শাসনামলে বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের একটি প্রদেশ ছিলো। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (Indian Act of 1935) অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন উপলক্ষেই রাজনীতিতে গতি সঞ্চার হয়। ঐ নির্বাচন পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতেই অনুষ্ঠিত হয়। তাই মুসলিম রাজনীতি ও হিন্দু রাজনীতি নির্বাচনী ময়দানে সম্পূর্ণ পৃথক ছিলো। ঐ নির্বাচনে ১২২টি প্রাদেশিক মুসলিম আসনে দুটো দলেই আসল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। খাজা নাজিমুদ্দীন ও নওয়াব হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ এবং শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি, যা পাকিস্তান আমলে নাম পরিবর্তন করে কৃষক-শ্রমিক পার্টি নাম ধারণ করে।

নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহর উদ্যোগে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠিত হবার পর থেকে এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নওয়াব পরিবারেই সীমাবদ্ধ থাকে। ১৯৩৭ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনে নওয়াব পরিবার থেকেই ১১ জন পাস করেন। তখন অবশ্য প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ছিলো না। ট্যাক্সদাতারাই শুধু ভোটার ছিলো। রাজনীতি তখনো সাধারণ জনগণের নাগালে আসেনি।

তখনকার রাজনৈতিক মান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেবার জন্য একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। ১৯৩৭ সালের নির্বাচন উপলক্ষে বড়াইল জুনিয়র মাদরাসা মাঠে এক জনসভা হয়। আমি তখন ঐ মাদরাসার ক্লাস সিক্সের ছাত্র। ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহর ছোট ভাই নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন। মাইল দেড়েক দূরে তাঁর গ্রীন বোট থেকে নেমে তিনি সাজানো বিরাট এক পালকিতে বসে মাঠে পৌঁছলেন। বিশালদেহী সোনার বরণ মানুষটি মঞ্চে বসলেন। অত্যন্ত ঔৎসুক্য নিয়ে মঞ্চের কাছেই বসলাম। কে সভাপতিত্ব করলেন ও কে কে বক্তৃতা করলেন সেদিকে আমার কোন আগ্রহ ছিলো না। বক্তৃতায় কে কী বললেন, তাতো মনে থাকার কথাই নয়। নওয়াবজাদা কিছুই বললেন না। তিনি পকেট থেকে এক-একটি সিগারেট বের করে সিগারেটের চার ভাগের এক ভাগ ধূমপান করেই মঞ্চের পেছনের দিকে ফেলে দিতেন। ৮/১০ জনকে কাড়াকাড়ি করে তা সংগ্রহ করতে দেখলাম। হাতের সিগারেটটা ফেলে দেবার পরপরই আর একটি সিগারেট ধরালেন। মানুষটি দেখতে এতো সুন্দর যে, আমি চোখ ফিরাতে পারছিলাম না। যতক্ষণ তিনি মঞ্চে বসা ছিলেন আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার ধূমপান দেখলাম। সভাশেষে তিনি পালকিতে চড়লেন। আমি এবং আরও অনেকে পালকির সাথে

সাথে নদী পর্যন্ত গেলাম এবং গ্রীন বোট ছাড়ার পর মাদরাসায় ফিরে এলাম। বলতে গেলে ওটা একতরফা নির্বাচনই ছিলো। নওয়াবজাদার বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলো বলে শুনিনি। ঐ এলাকা নওয়াবদের জমিদারির আওতায়ই ছিলো।

১৯৩৭-এর নির্বাচনে ১২২টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৬০টিতে মুসলিম লীগ বিজয়ী হয়। কৃষক-প্রজা পার্টি কিছু স্বতন্ত্র বিজয়ী প্রার্থী নিয়ে ৫৮টি আসন পায়। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এ প্রদেশের মুসলিম রাজনীতি এ দুটো দলই নিয়ন্ত্রণ করেছে। ঐ নির্বাচনে একটি আসনে (পটুয়াখালী) খাজা নাজিমুদ্দীন ও শেরে বাংলার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এতে শেরে বাংলা বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। নওয়াব পরিবারের ১১ জন নির্বাচিত হলেও খাজা পরাজিত হন।

ঐ নির্বাচনে বর্ণ-হিন্দু ও তফসিলী মিলে ৯৯টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৬০টি আসন পায়। কৃষক-প্রজা পার্টি কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগ মিলে কোয়ালিশন সরকার কায়েম হয়। শেরে বাংলা মুসলিম লীগে যোগদান করে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি কৃষক-প্রজা পার্টির সভাপতি পদেও বহাল থাকেন।

কৃষক-প্রজা পার্টি দীর্ঘদিন থেকে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও মহাজনি আইন বাতিলের আন্দোলন করে আসছে। শেরে বাংলা প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে কৃষক-প্রজা পার্টির একাংশ কংগ্রেসের সাথে মিলে ১৯৩৯ সালে হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করে। আমি তখন কুমিল্লায় ক্লাস এইটের ছাত্র। কুমিল্লায় মুসলীম লীগ হক মন্ত্রিসভার পক্ষে বিক্ষোভ মিছিল করে। আমি ঐ মিছিলে স্লোগান দিতে দিতে গলা ভেঙে ফেলি। আমার জীবনে ওটাই রাজনীতির শুরু। মিছিলের পর টাউন হল ময়দানে সভা হয়। বক্তাদের কথা থেকে জানলাম, শেরে বাংলাকে হিন্দুরা ক্ষমতা থেকে নামাতে চায় এবং তারা ক্ষমতা দখল করতে চায়। মিছিলের স্লোগান ছিলো, 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ, শেরে বাংলা জিন্দাবাদ, কংগ্রেস ধ্বংস হোক' ইত্যাদি।

অনাস্থা প্রস্তাব নাকচ হলে আবার বিজয় মিছিলে গলা ফাটালাম। '৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগের সম্মেলনে শেরে বাংলাই বিখ্যাত 'লাহোর প্রস্তাব' পেশ করেন। ঐ প্রস্তাবই পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি। আমি তখন ঢাকায় ক্লাস নাইনে পড়ি। লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমেই শেরে বাংলার খ্যাতি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৩৯ সালে অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে শেরে বাংলা কৃষক-প্রজা পার্টির মূল দাবি মেনে নিয়ে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করেন এবং ঋণ সালিসি বোর্ড স্থাপন করে মহাজনি আইনের খপ্পর থেকে কৃষকদের মুক্তিদান করেন। এতে হক সাহেবের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

১৯৪০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় মুসলিম হল স্থাপিত হয়। ঐ হলের নাম রাখা হয় ফজলুল হক মুসলিম হল। '৭২ সালে শেখ মুজিব ক্ষমতাসীন হবার পর

ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতার দোহাই দিয়ে ইসলাম ও মুসলিম শব্দ উৎখাত করা হয়। এখনো সে ব্যবস্থাই আছে। তাই ঐ হলের নাম এখন ফজলুল হক হল। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সংক্ষিপ্ত নাম ছিলো মুসলিম হল। অথচ সে মুসলিম শব্দ উৎখাত হওয়ায় এখন এর নাম সলিমুল্লাহ হল।

শেরে বাংলা রাজনৈতিক ময়দানে বহুবার ডিগবাজি খেয়েছেন। তাঁর অদ্ভুত জনপ্রিয়তার কারণে তিনি কোন সমস্যায় পড়েননি। তাই যে দলই করেন, সে দলেই তিনি প্রধান নেতা। তাই তিনি একাই একটি রাজনৈতিক দলের মর্যাদায় আসীন। তার এ ব্যক্তি ইমেজের কারণে তিনি কারো পরওয়া করতেন না। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলন দানা বাঁধার পর তিনি কায়েদে আযমের নির্দেশ অমান্য করে বিপদে পড়লেন। মুসলিম লীগ থেকে তিনি বহিষ্কৃত হয়ে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে পাকিস্তান ইস্যুর বিরুদ্ধে নির্বাচন করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনে বিজয়ী হলেও তাঁর দলকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। এরপরও ১৯৫৪ সালে তাঁর কৃষক-শ্রমিক পার্টি যুক্তফ্রন্টে গুরুত্বপূর্ণ পজিশন পায়। তাই বলছিলাম যে, তিনি একাই একটি দলের মর্যাদার অধিকারী।

রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মুসলিম লীগ

১৯৪৩ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের কোন গণভিত্তি ছিলো না। ঢাকার নওয়াব পরিবারেই এর নেতৃত্ব সীমাবদ্ধ ছিলো। পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হবার সাথে সাথেই দলটিকে জনগণের দলে পরিণত করা জরুরি হয়ে পড়লো। দলের প্রাদেশিক নেতৃত্বে পরিবর্তন আসলো। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আবুল হাশেম প্রাদেশিক সেক্রেটারি হন। আহসান মঞ্জিল (নওয়াব বাড়ি) থেকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিস ১৫০ মোগলটুলীতে স্থানান্তরিত হয়। ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে সাড়া পড়ে। পূর্ববঙ্গে তরুণ নেতা টাঙ্গাইলের শামসুল হককে সংগঠকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তার নেতৃত্বে সক্রিয় হয়। আমিও তার একজন ছাত্র-কর্মী ছিলাম।

আবুল হাশেমের মতো বলিষ্ঠ সংগঠকের প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ গণসংগঠনে পরিণত হয় এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বিরাট সাফল্য অর্জন করে। মুসলিম লীগ তখন মুসলিম জাতির একমাত্র জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে বলতে গেলে গোটা যুব নেতৃত্বই ছিলো আবুল হাশেমের সংগঠিত বাহিনী।

এ বিরাট রাজনৈতিক শক্তিটি দেশ বিভাগের সময় থেকে দুর্বল হতে থাকে। প্রাদেশিক আইনসভার হিন্দু সদস্যদের দাবিতে ইংরেজ সরকার ভারত বিভাগের সাথে সাথে বঙ্গদেশকেও বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলো। অবিভক্ত বঙ্গদেশে মুসলিমদের সংখ্যা বেশি বলে গোটা প্রদেশটিই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সদস্যরা এ অজুহাত তুললো যে, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পশ্চিমবঙ্গ আলাদা প্রদেশ ছিলো না। তাই এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য হবার কথা নয়। কিন্তু

ইংরেজ সরকার ঐ অজুহাত গ্রহণ করে বঙ্গদেশকেও বিভক্ত করে দিলো।

অবিভক্ত বাংলায় আইনসভায় নির্বাচিত মুসলিম সদস্যদের ভোটে যদি মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নির্বাচন হতো তাহলে নিঃসন্দেহে শহীদ সোহরাওয়ার্দী লিডার নির্বাচিত হতেন। ঘটনাক্রমে সোহরাওয়ার্দীর বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে হওয়ায় খাজা নাজিমুদ্দীন, নূরুল আমীন, মোহন মিয়ার নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের মুসলিম সদস্যগণ দাবি জানালেন যে, পার্লামেন্টারি পার্টির নির্বাচন পূর্ববঙ্গের সদস্যদের মধ্যে পৃথকভাবে হতে হবে। যেহেতু প্রদেশ বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং পূর্ববঙ্গই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং পূর্ববঙ্গের সদস্যরাই নতুন আইনসভার সদস্য হবে, সেহেতু তাদের নেতা কে হবে এর সিদ্ধান্ত নেবার ইখতিয়ার শুধু তাদেরই। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খাজা নাজিমুদ্দীন পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা হন এবং সে হিসেবেই প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগে ১৯৪৩ সাল থেকেই দুটো গ্রুপ ছিলো। এক গ্রুপের নেতৃত্বে মাওলানা আকরাম খান ও খাজা নাজিমুদ্দীন, অপর গ্রুপের নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেম। বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার সময় এ গ্রুপিং আরো স্পষ্ট হয়। খাজা নাজিমুদ্দীন ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যগণের ভক্ত ও অনুরক্ত কোন উল্লেখযোগ্য জনশক্তি ঢাকায় ছিলো না। মুসলিম লীগকে পূর্ববঙ্গে যে যুবকরা গণসংগঠনে পরিণত করেছে তারা প্রধানত শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেমের ভক্ত। ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দীনের সক্রিয় সমর্থক রাজনৈতিক যুবকর্মী নগণ্যসংখ্যক ছিলো।

'৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যারা আন্দোলন শুরু করে তারাও প্রধানত সোহরাওয়ার্দী গ্রুপেরই লোক। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির যাদের সাথে ভাষা সংক্রান্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন তারাও ঐ গ্রুপের। ভাষা আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই সরকারবিরোধী শক্তি ছিলো। এরপর খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৫২ সালে পল্টন ময়দানে 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে' বলে ঘোষণা দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলেন। তিনি প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সাথে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন এর বিপরীত ভূমিকা পালন করে 'কনডেমড' হয়ে গেলেন। '৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে দমন করার জন্য ছাত্রদের উপর গুলি চালিয়ে মুসলিম লীগ সরকার ছাত্র-জনতার আস্থা হারিয়ে ফেললো।

১৯৪৫ থেকে '৪৭ সাল পর্যন্ত যে মুসলিম লীগ এ দেশে এক বিরাট রাজনৈতিক শক্তি ছিলো সে দলটি মাত্র ৪/৫ বছরের মধ্যে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। সরকার গঠনের পর মুসলিম লীগকে খাজা নাজিমুদ্দীন-নূরুল আমীন গ্রুপ নিজেদের কুক্ষিগত রাখার চেষ্টা করার ফলে পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় যুবশক্তি তাদের বিরোধী ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হলো। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ

জনগণের আস্থা হারানোর পর এ দলটি আর দাঁড়াতেই পারলো না। বর্তমানে (২০০২) মুসলিম লীগ রাজনৈতিক দল হিসেবে বিলুপ্তপ্রায়।

১৯৫৪-এর পর

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও শেরে বাংলার দল দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ছিলো। শেরে বাংলার মৃত্যুর পর তার ব্যক্তিভিত্তিক দলটি আর রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গণ্য রইলো না। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বামপন্থীদের নেতা হিসেবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) নামে একটি দল গঠন করলেন।

১৯৬৯ সালে আইয়ূবী শাসনের শেষদিকে যখন বিরাট গণআন্দোলন গড়ে উঠে, তখন মাওলানা ভাসানী একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গণ্য ছিলেন। কিন্তু '৭০ সালে শেখ মুজিবের ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে জাতীয় নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া সকল রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে ময়দান ছেড়ে দেয়। নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগই একমাত্র রাজনৈতিক শক্তির মর্যাদা লাভ করে।

স্বাধীন বাংলাদেশ

স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে আওয়ামী লীগই একক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গণ্য ছিলো। শেখ মুজিবের কুশাসনের ফলে প্রতিবাদী কণ্ঠ হিসেবে প্রথমে মাওলানা ভাসানী এবং পরে মেজর আবদুল জলীল ও আ স ম আবদুর রবের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। সরকার বিরোধী আন্দোলন স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব একদলীয় বাকশালী শাসন চালু করে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রকে স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত করেন। পরিণামে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হন। এ সময়ও শাসন ক্ষমতা খন্দকার মুশতাক আহমদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের হাতেই ছিলো। '৭৫-এর ৩ জুন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সামরিক শক্তিবলে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করলে সেনাবাহিনীর জোয়ানরা বিদ্রোহ করে। ৭ নভেম্বর জোয়ানরা সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে মিছিল করে বের করলে লাখ লাখ মানুষ তাদের সাথে মিলিত হয়ে বিজয়ী বীর হিসেবে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতায় বসায়। জিয়াউর রহমান সাড়ে ৫ বছর দেশ শাসন করেন। তিনি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং এ দেশের রাজনীতিতে মর্যাদার আসন হাসিল করেন।

৭৪.

বর্তমানে বাংলাদেশে রাজনৈতিক শক্তি

বর্তমান (২০০২ সাল) বাংলাদেশে তিনটি রাজনৈতিক শক্তি বিরাজ করছে— বাঙালি জাতীয়তাবাদী, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী।

বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তি

এ শক্তিটির নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ রয়েছে। তাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য সুস্পষ্ট।

১. ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদই তাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও আদর্শ। অন্যান্য ধর্মের মতোই ইসলামকে তারা কতক অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম মনে করেন। রাজনীতি ও অর্থনীতিকে তারা ইসলামের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত রাখতে দৃঢ়সংকল্প। ধর্মকে শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসাবেই গণ্য করেন। এতোটা ব্যক্তিগত যে, তারা সরকারি ব্যবস্থাপনায় এবং সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায়ও ধর্ম-শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিরোধী। বেসরকারিভাবে যাদের ইচ্ছা তাদের সন্তানদের ধর্ম শিক্ষা দিতে পারেন। এটা সরকারের দায়িত্ব নয় বলে তাদের ধারণা।

   বিশুদ্ধ ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদের দাবি এটাই যে, রাষ্ট্র পরিচালনায়, সরকারি কার্যক্রমে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ধর্মকে টেনে আনা চলবে না। মানব সমাজের উন্নয়নে মানব জাতির অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস এবং মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রতিভাই যথেষ্ট। ডিভাইন গাইডেন্সের কোন প্রয়োজন নেই। আওয়ামী লীগ এ আদর্শেই বিশ্বাসী। তাই দেশের শাসনতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ উৎখাত হয়ে গেলেও শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বার বার এ আদর্শে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা দিতে দ্বিধাবোধ করেননি।

২. বাঙালি জাতীয়তাবোধ তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণ করে। বাঙালি সংস্কৃতির নামে চিরকাল হিন্দুগণ যা কিছু চর্চা করেছেন, তা সবই আওয়ামী লীগ আত্মস্থ করে নিয়েছে। মঙ্গল প্রদীপ, শঙ্খ-ধ্বনি, ভাই-ফোঁটা, উল্কি অঙ্কন, সীমন্তে সিঁদুর পরিধান, খোল-করতাল, উলুধ্বনি, রাখিবন্ধন ইত্যাদি বাঙালি হিন্দুদের ধর্মীয় কালচার। এ সবকে বাঙালি কালচার হিসেবে আওয়ামী লীগ গ্রহণ করেছে। আওয়ামী লীগের নিকট হিন্দুয়ানী কালচার বাঙালি সংস্কৃতি হিসেবে স্বীকৃত। তারা মুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাসী নয় বলেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম কালচার থেকে ভিন্ন।

৩. ভারতের সাথে আওয়ামী লীগের আত্মিক ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে এবং হিন্দু কালচারের অনুসারী হিসেবে ভারতীয় বাঙালিদের সাথে মিলেই তারা অখণ্ড বাঙালি জাতি। ভারতকে তারা আন্তরিকতার সাথেই বন্ধু মনে করে। ক্ষমতাসীন থাকাকালে আওয়ামী লীগ সর্বাবস্থায় ভারতকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের পাদুয়া নামক স্থানটি ভারতের অন্যায় দখল থেকে আমাদের বিডিআর বাহিনী দখল করার পর শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট ফোনে ক্ষমা চেয়ে তা ভারতকে ফেরত দেন। ভারতের গুজরাট প্রদেশে সরকার ও উগ্র হিন্দুবাদী সন্ত্রাসীরা হাজার হাজার মুসলমানকে পুড়িয়ে ও বিভিন্ন উপায়ে হত্যা করে এবং তাদের বাড়ি-ঘর, দোকানপাট ও

সহায়-সম্পদ ধ্বংস করে ও লুট করে চরম নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। শেখ হাসিনা এর সামান্য প্রতিবাদও জানাননি; বরং বাংলাদেশে হিন্দুদেরকে হত্যা করা হচ্ছে বলে বিদেশেও অপপ্রচার চালিয়েছেন। আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর বিদেশ সফরকালে দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুস সামাদ আজাদও গুজরাটের নৃশংসতার নিন্দা না জানিয়ে 'বাংলাদেশে গুজরাটের মতোই হিন্দুদের উপর নির্যাতন চলছে' বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন।

বাংলাদেশের উপর যদি কখনো আক্রমণ হয় তাহলে একমাত্র ভারতের পক্ষ থেকেই হতে পারে বলে দেশবাসীর ধারণা। অথচ আওয়ামী লীগ ভারতকেই অকৃত্রিম বন্ধু বলে বিশ্বাস করে। তাই আওয়ামী লীগের হাতে দেশের স্বাধীনতা নিরাপদ কিনা এ প্রশ্ন জনমনে রয়েছে।

৪. আওয়ামী লীগের বিগত পাঁচ বছরের (১৯৯৬-২০০১) শাসনামলে সরকারি যাবতীয় তৎপরতায় কোন দিক দিয়েই দেশকে গড়ে তুলবার সামান্য লক্ষণও দেখা যায়নি। শেখ মুজিব একদলীয় স্বৈরশাসনের যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন সেটাই আওয়ামী লীগের আদর্শ বলে প্রমাণিত হয়েছে। শেখ মুজিবের স্বৈরাচার ও কুশাসন থেকে মুক্তির কোন বিকল্প পথ না থাকায় কয়েকজন দেশপ্রেমিক সেনা কর্মকর্তা সফল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশকে উদ্ধার করেন। এটা ব্যক্তিগত স্বার্থে হত্যার কোন ঘটনা ছিলো না। গোটা দেশবাসী ঐ দিন জাতীয় উৎসব পালনের মতো আচরণ করেছে। এ কারণেই আওয়ামী লীগ ১০ জনের একটি প্রতিবাদ মিছিল করারও সাহস পায়নি। ক্ষমতার তেমন কোন বড় পরিবর্তনও হয়নি। শেখ মুজিবের নিহত হওয়ার পরেও আওয়ামী লীগই ক্ষমতায় ছিলো। আইনসভাও তখন পর্যন্ত ভেঙে দেওয়া হয়নি। মুজিব আমলের মন্ত্রীরাই প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রী হলেন। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আওয়ামী লীগেরও বিরাট অংশ মুজিব হত্যাকে সমর্থন ও স্বাগত জানিয়েছিলো।

শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মুজিব হত্যার বিচারের উপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এটা যদি সাধারণ হত্যা হয়ে থাকে তাহলে গোটা দেশবাসীকেই আসামি করা প্রয়োজন ছিলো। কারণ, এ হত্যায় তারা আনন্দ ও উল্লাস করেছে। আওয়ামী লীগের যারা পরবর্তী সরকারে শরীক ছিলো তাদেরকেও আসামি করা হয়নি। শুধু সামরিক লোকদেরকেই আসামি করে বিচারের প্রহসন করা হয়েছে। গোটা বিশ্ব মুজিব হত্যাকে একটি সফল অভ্যুত্থান হিসেবেই গ্রহণ করেছিলো। এটাকে সাধারণ হত্যা গণ্য করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। তাই মুজিব হত্যার বিচার জনগণের উপর মহা অবিচার।

১৯৭৫ সালেই শেখ মুজিব জনগণের আস্থা সম্পূর্ণ হারিয়েছেন। অথচ শেখ হাসিনা তার পিতাকে জবরদস্তি করে জাতির পিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার

জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। আইনের বলে শেখ মুজিবের ফটোকে সম্মান করার জন্য দেশবাসীকে বাধ্য করেছেন। ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান জোর করে আদায় করার বস্তু নয়—এ মোটা কথাটি উপলব্ধি করার যোগ্যতাও তার নেই। তার স্বৈরাচারী পিতাকে অতিমানবের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে গিয়ে তাকে দেশবাসীর নিকট বরং হেয়ই করেছেন।

শেখ হাসিনা জাতীয় ঐক্য গড়ার বিপরীতে জনগণকে বিভক্ত করা ও পরস্পর বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য জঘন্য অপচেষ্টা চালিয়েছেন। শুধু পুলিশ ও প্রশাসন নয়; সেনাবাহিনীকে পর্যন্ত আত্মীয়করণ ও দলীয়করণের সর্বনাশা নীতি গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশকে পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে নির্লজ্জের মতো পূর্বপ্রতিষ্ঠিত বহু প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে তার পিতার নাম যুক্ত করেছেন।

৫. আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী বলে মাদরাসা, ওলামা ও ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহকে তাদের আদর্শের জন্য মারাত্মক হুমকি মনে করে। এ সবকে উৎখাত করতে না পারলে তাদের ঐ কুফরী মতবাদ এ দেশে কিছুতেই শিকড় গাড়তে পারবে না। তাই আওয়ামী শাসনামলে এ সবের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান চালানো হয়।

এ সব কারণেই আওয়ামী লীগ কোন সুস্থ রাজনৈতিক শক্তি নয়। এটাকে দেশ ও জাতির জন্য এক জঘন্য ফ্যাসিস্ট অপশক্তি ও অভিশাপ হিসেবে চিহ্নিত করা ছাড়া উপায় নেই।

৬. ১৯৭৫ সালে সাড়ে তিন বছরের আওয়ামী শাসনে দেশবাসী সাংঘাতিকভাবে অতিষ্ঠ হওয়ায় এরপর ২১ বছর পর্যন্ত জনগণ তাদেরকে ক্ষমতায় আসতে দেয়নি। গত ৫ বছরের কুশাসন ও দুঃশাসনে নতুন প্রজন্মও তাদের আসল পরিচয় পেয়ে গেছে। বর্তমান জোট সরকার যদি কিছুটা সুশাসন কায়েম করতে সমর্থ হয়, তাহলে ঐ অপশক্তি ধীরে ধীরে দুর্বলই হতে থাকবে। তাদের কোন ইতিবাচক চিন্তাধারা নেই। কোন কিছু গড়ে তুলবার সাধ্য তাদের নেই। গড়ার বদলে ভাঙায়ই তারা পারদর্শী। গত ৫ বছর তারা দেশ, জাতি ও জনগণের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধই চালিয়ে গেছেন।

৭. আওয়ামী লীগ দেশে একটি মযবুত কায়েমী স্বার্থ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ৭২ থেকে ৭৫ সালে তারা অবাঙালিদের ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কল-কারখানা দখল করে দলীয় লোকদের মধ্যে বিরাট আর্থিক শক্তি সৃষ্টি করেছে। তাই মুজিব হত্যার পরও দলটি সুসংগঠিত ছিলো। ১৯৭৩ সালে পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে দলীয় ক্যাডারদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে এ দলটি সরকারি শাসনযন্ত্রে এক বিরাট শক্তি সৃষ্টি করেছে। তারা শেখ হাসিনার শাসনামলে দলীয় নেতৃত্বের ভূমিকাই পালন করেছে। তাদের অনেকের মধ্যেই ৭৫ থেকে ৯৫ পর্যন্ত মোটামুটি অফিসারসুলভ মানসিকতা

সৃষ্টি হয়েছিলো। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেই তাদের মধ্যে দলীয় স্পৃহা জাগ্রত করে প্রশাসনের গোটা কাঠামোকে বিকৃত করে ফেলেন। পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে বর্তমানে তারাই কর্মরত রয়েছেন। তাই জোট সরকার তাদের যথাযথ সহযোগিতা ও আন্তরিকতা থেকে এখনও হয়তো বঞ্চিত।

৮. আওয়ামী লীগ জনগণের মধ্যে তৃণমূল থেকে সংগঠিত। দেশের অর্থনৈতিক কায়েমি স্বার্থের ধারক বিরাট একটা সংখ্যা এ দলে সক্রিয়। বুদ্ধিজীবী অঙ্গনে ধর্মনিরপেক্ষ ও ইসলামবিরোধী প্রায় সবাই এ দলের পৃষ্ঠপোষক। ধর্মনিরপেক্ষ ও ভারতপন্থী সকল পত্র-পত্রিকা এ দলের ধারক ও বাহক। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাদের সমর্থকরা সুসংগঠিত। রাজনীতিতে সক্রিয় অমুসলিম জনশক্তি আওয়ামী লীগকে তাদের অভিভাবক গণ্য করে। এসব বিবেচনায় আওয়ামী লীগ অপশক্তি হলেও এদেশে বিরাট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির অধিকারী। প্রতিবেশী দেশটিকে তারা মুরুব্বী গণ্য করায় এ দেশে তাদের অবস্থান অত্যন্ত মযবুত।

৯. আওয়ামী লীগের মতো একটা সংগঠিত দল দেশের জন্য কল্যাণকর ভূমিকা পালন করতে পারে, যদি এ দলটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভ্রান্ত মতাদর্শ ত্যাগ করে এবং শেখ হাসিনার হিংস্র নেতৃত্ব থেকে মুক্ত হয়। তাদের এটুকু উপলব্ধি করা উচিত যে, ইসলামী আদর্শকে এদেশ থেকে উৎখাত করা কখনো সম্ভব হবে না। তাই যদি তারা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ এদেশে চালু করার অপচেষ্টা চালায় তাহলে ইসলামী শক্তির সাথে তাদের অবিরাম সংঘর্ষের পথেই চলতে হবে। দেশে তারা গঠনমূলক কোন কাজই করতে সক্ষম হবে না।

শেখ হাসিনা তার পিতাকে আওয়ামী লীগের একমাত্র মূলধন মনে করেন। তাই আওয়ামী লীগকে এদেশে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে টিকিয়ে রাখতে হলে তার পিতাকে 'জাতির পিতার' মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে হবে বলে তার দৃঢ়বিশ্বাস। তিনি বুঝতে পারছেন না যে, '৭০-'৭২ সালে শেখ মুজিব জনগণের অন্তরে যে স্থান অধিকার করেছিলেন, তার কুশাসনের ফলে '৭৪-'৭৫-এ সে স্থান তিনি চিরতরে হারিয়েছেন। এ দেশবাসী তাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক মনে করলেও দেশ গড়ার নায়ক মনে করে না। ঐটুকু সম্মান নিয়েই শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। শেখ মুজিবকে জাতির পিতা মানাবার জন্য জনগণকে বাধ্য করার অপচেষ্টার পরিণতি যা হয়েছে, এ থেকে তার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু শেখ হাসিনা কিছুতেই এ কথা মেনে নেবেন না। তাই তার নেতৃত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে না পারলে আওয়ামী লীগ আর এগুতে পারবে না। এ কারণেই আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে টিকে থাকতে হলে এবং ভবিষ্যতে ক্ষমতাসীন হতে হলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ পরিত্যাগ করতে হবে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্ব থেকে মুক্ত হতে হবে। দেশ ও দলকে কিছুই

দেবার সাধ্য শেখ হাসিনার নেই। তার ৫ বছরের দুঃশাসন ও ২০০১-এর নির্বাচনোত্তর ভূমিকা এ কথাই প্রমাণ করে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তি

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সফল সামরিক অভ্যুত্থান, খন্দকার মুশতাক আহমদের ৮৩ দিনের শাসন, ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফের পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান, সৈনিক বিদ্রোহ, ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার গণবিপ্লবের পরিণতিতে সেনাপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা লাভ করেন। ৩০ মে ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের জিওসি জেনারেল মনজুরের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন। এ হিসেবে জিয়াউর রহমানের শাসনকাল ছিলো সাড়ে পাঁচ বছর।

তার আমলে বাংলাদেশের রাজনীতি মোটামুটি সংহত ও স্থিতিশীল হয়। রাজনীতিতে তার মূল্যবান অবদান নিম্নরূপ।

১. বাংলাদেশের নাগরিকগণকে বাঙালি বলা হবে, না বাংলাদেশী বলা হবে এ বিতর্কের সরকারি সমাধান তিনিই দান করেন। সব দেশেই দেশের নামের ভিত্তিতেই নাগরিকদের পরিচয় দেওয়া হয়। সে হিসেবে বাংলাদেশের নাগিরকগণ বাংলাদেশী নামে পরিচিত হওয়া স্বাভাবিক। এটাই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। এভাবে আওয়ামী লীগের বাঙালি জাতীয়তাবাদ বর্জন করা হলো।

২. জিয়াউর রহমান অত্যন্ত বলিষ্ঠতা ও আন্তরিকতার সাথে দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার মহান উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের বিভাজন বর্জন করে সকলকেই তাঁর সংগঠনে সমবেত করেন। এমনকি ৭১-এ তার বিপরীত ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও শাহ আজিজুর রহমানের উপর প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতার দায়িত্ব অর্পণ করেন। সেনাপতি হয়েও তিনি রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন বলেই দেশ ও জাতির জন্য এমন কিছু করে যেতে সক্ষম হয়েছেন, যার কারণে তিনি জনগণের অন্তরে স্থান করে নিয়েছেন।

৩. শেখ মুজিব আজীবন গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে গিয়ে বহুবার কারাবরণ করে যে রাজনৈতিক মর্যাদা অর্জন করেছিলেন শেষ জীবনে একদলীয় স্বৈরশাসনের উদ্দেশ্যে 'বাকশাল' নামক এক আজব দল কায়েম করে জীবনের সকল রাজনৈতিক অর্জনকে বিসর্জন দিলেন। কথায় বলে "শেষ ভালো যার সবই ভালো তার"—এ কথাটির আসল মর্ম হলো 'যার শেষ মন্দ তার সবই মন্দ'। জনগণ তাকে মর্যাদার শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলো। কিন্তু সাড়ে তিন বছরের কুশাসন ও দুঃশাসন ঐ মর্যাদাকে ধূলিসাৎ করে জনগণের অন্তর থেকে তাকে সমূলে উৎখাত করে দিয়েছে। '৭৫-এর ১৫ আগষ্ট এককালের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতার সপরিবারে নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার খবর শুনে

জনগণের মধ্যে সামান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া কোথাও দেখা যায়নি; বরং জনগণ শহরে, বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র উৎসব ও উল্লাস করেছে।

সেনাপতি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৮১ সালের ৩০ মে একইভাবে নিহত হলেন। এ খবর শুনে জনগণের মধ্যে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শহীদ জিয়ার জানাযায় সিপাহী-জনতার ঢল নামে। ৭ নভেম্বরে যে সিপাহী-জনতা তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলো, তারাই আবার ঐক্যবদ্ধভাবে অন্তর থেকে শোক প্রকাশ করেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, শহীদ জিয়া জনগণের অন্তরে আরও বড় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। শেখ মুজিব মানুষের অন্তর থেকে মুছে গেছেন। আর শহীদ জিয়া সে স্থান দখল করে আছেন।

জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু করার কারণেই রাজনৈতিক অঙ্গনে শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। জনগণও একনায়কত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তিবোধ করেছে।

৪. বাংলাদেশকে স্বনির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে জিয়াউর রহমান যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, সে কথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য। একটানা মাইলের পর মাইল হেঁটেও তিনি তার খালকাটা কর্মসূচি সফলের চেষ্টা করেছেন। দেশ গড়ার জন্য যা কিছু তিনি করেছেন, সে কর্মসূচির সাথে কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু তার আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থতা সর্বজন স্বীকৃত। তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অভিযোগ কেউ করতে পারেনি।

উপরিউক্ত কারণে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তির আসল মূলধনই হলো শহীদ জিয়াউর রহমান। তার নিহত হওয়ার পর নেতৃত্বে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়। তিনি তার স্ত্রীকে কখনো রাজনৈতিক ময়দানে অবতীর্ণ করেননি। ময়দানই বেগম জিয়াকে ঘর থেকে টেনে বের করেছে। অল্পদিনের মধ্যেই এ সাহসী গৃহবধূ বিএনপির নেতৃত্বের গুরুভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে সক্ষম হন।

রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি'র মূল্যায়ন

জনপ্রিয় রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের ইমেজই এ দলটির প্রধান পুঁজি। বেগম জিয়ার জনপ্রিয়তার মূলেও ঐ ইমেজ। চারদলীয় জোটের অন্যতম শীর্ষনেতা হিসেবে বেগম জিয়ার সাথে আমি ঘনিষ্ঠভাবে মতবিনিময়ের সুযোগ পেয়েছি। এক বছরেরও বেশি সময় আমরা একই কর্মসূচি নিয়ে কাজ করেছি। তার সম্বন্ধে আমার এ ধারণা হয়েছে যে, তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দেশকে গড়ে তুলতে চান। সৎ, যোগ্য, নিষ্ঠাবান ও নির্ভরশীল প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক যোগাড় করতে পারলে তিনি দেশ গড়ার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখতে পারেন। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, এমন কোন টিম তিনি যোগাড় করতে পেরেছেন কিনা। ক্ষমতায় আসার আগে ঐ জাতীয় লোক তৈরি করার কোন সুযোগ তার ছিলো না। যারা দলে এসেছেন তাদের মধ্য থেকে বাছাই করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বিভিন্ন

চিন্তাধারার ভিত্তিতে গড়ে উঠা রাজনৈতিক দল থেকে যারা এ দলে এসেছেন, তাদেরকে একই চিন্তাধারায় সমন্বিত করতে পারলে বেগম জিয়া সফলতা লাভ করতে পারবেন। কিন্তু এ কাজটিই সবচেয়ে কঠিন ও সময় সাপেক্ষ।

ইতঃপূর্বে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে বিস্তারিত সমালোচনার পর চারদলীয় জোট সরকারের সাফল্যকামী হিসেবে নিরপেক্ষভাবে বিএনপি সম্পর্কে আমি আলোচনা করা কর্তব্য মনে করি। তা না করলে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন মূল্যহীন বিবেচিত হবে। বিএনপি'র কল্যাণকামী হিসেবেই আমি দলটিকে ত্রুটিমুক্ত দেখতে চাই। বিএনপির সাফল্যের উপরই চার দলীয় জোটের সাফল্য নির্ভর করে। আমি যে দলের সদস্য, সে দলটি জোট সরকারের শরীক দল। বিএনপি ব্যর্থ হলে আমার দলকেও ব্যর্থতার গ্লানি বইতে হবে। তাই আমার দলের সাফল্যও বিএনপির সাফল্যের উপর নির্ভরশীল।

১৯৯১ সাল থেকে ৫ বছর বিএনপি শাসনকাল নিঃসন্দেহে আওয়ামী লীগের শাসনকাল থেকে ভালো ছিলো। কিন্তু তা এমন মানের ছিলো না যে, জনগণ দলটিকে একটি আদর্শ দল হিসেবে ভালোবাসতে পারে। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনে বিএনপি যে বিপুল সংখ্যায় ভোট পেয়েছে, তার বেশিরভাগই নেতিবাচক ভোট। আওয়ামী মুসিবত থেকে বাঁচার তাগিদেই জনগণ বিএনপিকে আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। জনগণের নিকট বিকল্প নেই বলেই বিএনপির এ মহাবিজয়। আশা করি, বিএনপিও এ কথা স্বীকার করবে।

৭৫.

প্রচলিত রাজনৈতিক দল গঠনের পদ্ধতি

সাধারণত রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাভাবিক পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

১. এক বা একাধিক ব্যক্তি দেশকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং বিশেষ কোন কর্মসূচি প্রণয়ন করে।

২. ঐ পরিকল্পনা ও কর্মসূচি রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রকাশ করে আগ্রহী লোকেদেরকে নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলে, দেশবাসীকে ঐ সংগঠনে যোগদানের আহ্বান জানায় এবং জনগণকে সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করতে থাকে।

৩. নির্বাচনের সময় হলে দলটির পক্ষ থেকে সাধ্যানুযায়ী সংখ্যায় প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। নির্বাচনে কিছু আসনে জয়ী হলে একটি পার্লামেন্টারি পার্টি বা গ্রুপ হিসেবে গণ্য হয়।

৪. দলটি যদি অধিকাংশ আসনে বিজয়ী হয়, তাহলে এককভাবেই সরকার গঠনে সমর্থ হয়। তা না হলে অন্য দলের সাথে কোয়ালিশন সরকারে শরীক হয়।

৫. রাজনৈতিক দল পার্লামেন্টে আসন না পেলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক

ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মতামত প্রকাশ করে এবং জনমত গঠনের চেষ্টা করে।

বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল এ পদ্ধতিতেই গঠিত। বিএনপি এদিক দিয়ে ব্যতিক্রম। জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে বেসামরিক সরকার কায়েমের উদ্দেশ্যেই বিএনপি নামে দলটি গড়ে তোলেন। রাজনৈতিক দল গঠিত হবার পর একসময় ক্ষমতাসীন হয়। আর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় দলটি গঠন করেন। এমপি ও মন্ত্রী বানাবার জন্য যেসব পলিটিক্যাল এলিমেন্ট দরকার তা কেউ চাইলেই হঠাৎ বানাতে পারে না। তাই জিয়াউর রহমান পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের লোকদেরকে নিয়েই বিএনপি গঠন করতে বাধ্য হন। এ অবস্থায় বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির লোকেরাই এ দলটিতে এসে জড়ো হয়েছেন। তাদের মধ্যে কারা জিয়ার নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করে দেশ সেবার উদ্দেশ্যে দলে যোগদান করেছেন, আর কারা এমপি ও মন্ত্রী হবার লোভে এসেছেন তা যাচাই করা কঠিন। এর ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে দলটিতে গ্রুপিং থাকাই স্বাভাবিক।

জিয়াউর রহমান দলের ১৯ দফা কর্মসূচি অনুযায়ী দলের নেতৃস্থানীয় সকলকে একই চিন্তা-ধারায় সমন্বিত করতে কতটুকু সফল হয়েছিলেন জানি না। বেগম জিয়া দলের নেতৃত্ব গ্রহণের পর এরশাদের শাসনামলে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসী ও সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছেন। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় দলটি গঠিত হওয়ায় দলের কতক লোকের মধ্যে রাজনৈতিক দুর্বলতা থাকলেও বিরোধী দলের সংগ্রামী ভূমিকার ফলে সাংগঠনিক দিক দিয়ে দলটি আরও সংহত হবার সুযোগ পেয়েছে।

চারদলীয় জোট কায়েম হবার পর বিএনপির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে গিয়ে বেদনার সাথে লক্ষ্য করেছি যে, প্রায় সর্বত্রই নেতৃত্বের কোন্দল ও বিভিন্ন নেতাভিত্তিক গ্রুপিং রয়েছে। এর কারণ উদ্ঘাটন করে দলের সাংগঠনিক মযবুতির স্বার্থেই এর প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন। এর একটা কারণ হতে পারে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আসা লোকের বিএনপির ১৯ দফাভিত্তিক চিন্তাধারা অনুযায়ী গড়ে না উঠা। এর প্রতিকার সহজ নয়। দলীয় প্রধানকেই এ কঠিন দায়িত্বটি পালন করতে হবে। যদি তা করতে সক্ষম হন, তাহলে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জনগণ ইতিবাচকভাবেই বিএনপিকে ক্ষমতায় বসাতে থাকবে। জনগণের নেতিবাচক ভোট অনিশ্চিত।

এর আর একটি কারণ এও হতে পারে যে, দলের নেতৃত্ব দখল করতে না পারলে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করা যায় না বলেই নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল হয়। যদি গ্রুপিং ও কোন্দল এ কারণেই হয়ে থাকে তাহলে এ মারাত্মক রোগের যথাযথ চিকিৎসা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক নেতাদের মুখে এ সুন্দর কথাটি প্রায়ই শুনা যায় যে, "ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়।" কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীত চরিত্রের পরিচয়ই বেশি পাওয়া যায়। নির্বাচনে দলের নমিনেশন না পেলে বিদ্রোহী হয়ে নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে যায়। এদের নিকট দলের চেয়ে ব্যক্তিই বড়। এ প্রবণতা ঐ সব দলেই দেখা যায়, যে দল এ জাতীয় বিদ্রোহী নির্বাচনে পাস করতে পারলে দলে সাদরে গ্রহণ করে।

রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য

সাধারণত রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্যই ক্ষমতায় যেয়ে দেশের সেবা করা। দেশের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করতে হলে ক্ষমতাসীন হওয়া অবশ্যই জরুরি। কিন্তু যারা দলের নেতৃত্ব দেন, তারা যদি এ সব উদ্দেশ্য সম্পর্কে আন্তরিক হন, তাহলে এমন লোকদেরকেই দলে টানতে চেষ্টা করবেন, যারা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য রাজনীতি করেন না। এ নীতি তাদের মধ্যে বিদ্যমান যারা নিঃস্বার্থ, যারা দেশের স্বার্থে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে সক্ষম। এ গুণটি খুব কম লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়। এর জন্য নৈতিক উন্নত মান প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও চরিত্রবান না হলে ঐ মান আশা করা যায় না। তাই রাজনৈতিক ময়দানে ঐ সব লোকেরই প্রাচুর্য দেখা যায়, যাদের নিকট "দেশের চেয়ে দল বড় এবং দলের চেয়ে ব্যক্তি বড়।"

দেশে সৎ, নিঃস্বার্থ ও চরিত্রবান লোকের সংখ্যা কম হলেও দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, রাজনৈতিক দল তাদেরকে দলে নিতে তেমন আগ্রহী নয়। কারণ দলকে ক্ষমতায় যেতে হলে এমন লোক দরকার যাদের এতোটা ধনবল ও জনবল আছে যে, নির্বাচনে যেমন করেই হোক জিতে আসতে পারবে বলে ধারণা করা যায়। এ সব যোগ্যতা থাকলেই যথেষ্ট। সৎ, নিঃস্বার্থ ও চরিত্রবান কিনা তা বিবেচনার বিষয় নয়। নির্বাচনে ভালো করতে পারবে বলে যারা দাবিদার তারা ফুলের তোড়া উপহার নিয়ে হাজির হলেই দলের প্রধান তাকে হাসিমুখে কবুল করে নেন। নির্বাচনের বছর এ পদ্ধতিতে যারাই দলে যোগদান করেন, তারা নির্বাচনে প্রার্থী হবার নিয়তেই আসেন এবং তাদেরকেই দল থেকে নমিনেশন দেওয়া হয়ে থাকে।

চারদলীয় জোট সরকারের ভাব-মর্যাদা

২০০১ সালের ১০ অক্টোবর বর্তমান চারদলীয় জোট সরকার কায়েম হয়েছে। জনগণ যে বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে জোটকে সমর্থন দিয়েছে, তা পূরণ হবার ব্যাপারে জনগণের প্রতিক্রিয়া অস্পষ্ট নয়। রাজধানীতে পর্যন্ত জান-মাল নিরাপদ বলে কেউ মনে করে না। এক বিয়েতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে আমার দেখা। আইন-শৃঙ্খলার কেনো উন্নতি হচ্ছে না, এ কথার জওয়াবে বললেন ঃ

"ক্রিমিনালরা অত্যন্ত শক্তিশালী।" এ জওয়াব কি একটুও সন্তোষজনক? ক্রিমিনালরা কি সরকারের চেয়েও বেশি শক্তিশালী?

সরকারের প্রথম দায়িত্ব হলো জনগণের জান-মাল ও ইজ্জতের হেফাযত করা।

প্রধানমন্ত্রী ১৯ অক্টোবর জাতির উদ্দেশ্যে প্রথম ভাষণে সন্ত্রাস দমনকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। অথচ রাজধানীতেই সন্ত্রাসের দাপট সবচেয়ে বেশি। রাজধানীতেই মন্ত্রীবর্গ, প্রশাসনিক ও পুলিশ কর্মকর্তাগণ, বিডিআর হাইকমান্ড অবস্থান করেন। রাজধানীর ৮ জন এমপির সবাই বিএনপি থেকে নির্বাচিত। থানার সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে। কর্পোরেশন নির্বাচনেও বিএনপি একচেটিয়া সাফল্য অর্জন করেছে। এর পরেও কেন ঢাকা মহানগরীতে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা নয় মাসেও সন্তোষজনক অবস্থায় আনা গেলো না, তা সরকারকেই আবিষ্কার করতে হবে। অবস্থার আশানুরূপ উন্নতি না হলে কোন ওজর-আপত্তি বা কৈফিয়তেই জনগণকে সন্তুষ্ট করা যাবে না।

এ একটি বিষয়ে সরকার সফল হতে পারলেই জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরে আসবে এবং বিরোধী দলের ধারালো জিহ্বা ভোঁতা হয়ে যাবে। সারাদেশে এখনও চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও দখলবাজি যারাই করুক, বিরোধ দলের লোকেরা সরকারি দল সেজেও যদি করে, তা বন্ধ করা যাচ্ছে না কেনো?

১৯৯৯ সালের চারদলীয় জোটের বলিষ্ঠ ঘোষণা এবং বিএনপির নির্বাচনী মেনিফেস্টো অনুযায়ী যদি জোট সরকার সফল হয় তাহলে কোন বিরোধী অপশক্তি জনগণের নিকট সামান্য পাত্তাও পাবে না। জোট সরকারকে সফল হতেই হবে। গণমনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। যে আস্থা নিয়ে জনগণ জোট প্রার্থীদেরকে বিজয়ী করেছে তা বহাল রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে আওয়ামী লীগের ভূত আবার জাতির ঘাড়ে সওয়ার হবার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

সরকারের ব্যর্থতাকে পুঁজি করেই তারা ময়দানে দাপট দেখাতে সাহস পাচ্ছে। দেশের ভবিষ্যৎ জোট সরকারের সাফল্যের উপর নির্ভর করছে। আমি অত্যন্ত দরদি মন নিয়ে জোট সরকারের সাফল্য কামনা করেই বক্তব্য রাখলাম। এতে কেউ আমার উপর অসন্তুষ্ট হলে আমি নাচার।

সেনাবাহিনীসহ যৌথ অভিযান

[এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হয়েছে তা ২০০২ সালের জুলাই মাসে লেখা। এ বই প্রকাশিত হচ্ছে ডিসেম্বরে, তাই নতুন প্যারা যোগ করতে হচ্ছে।]

২০০২-এর ১৬ অক্টোবর থেকে সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর ও আনসারের যৌথ বাহিনী সন্ত্রাস দমনের যে অভিযান চালাচ্ছে তাতে সরকারের উপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনমনে স্বস্তিবোধ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ সাফল্যকে ব্যর্থ করার জন্য দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র ভয়ানক সক্রিয় দেখা যাচ্ছে।

এক বছর সরকার পরিচালনার পর প্রধানমন্ত্রী অতিষ্ঠ হয়েই যৌথবাহিনী গঠন করতে বাধ্য হয়েছেন। এ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। জনগণের সমর্থন অব্যাহত থাকলে সাফল্য আসতে পারে। তবে সন্ত্রাসের উৎস বন্ধ করতে না পারলে এ অভিযানের স্থায়ী সাফল্য আশা করা যায় না।

আড়াই লাখ মসজিদের ইমাম-খতীব ও মুসল্লীগণ, হাজার হাজার মাদরাসার উস্তায ও ছাত্রগণ, অগণিত খানকাহর পীর ও মুরীদগণ এবং তাবলীগ জামায়াতের সাথে জড়িত লাখ লাখ মুবাল্লিগ ও কর্মীগণ, বিরাট সংখ্যক ওয়ায়েয ও শ্রোতাগণ এবং তাফসীর মাহফিলসমূহের মুফাসসির ও শ্রোতাগণ মিলে বাংলাদেশে বিশাল ইসলামী শক্তি রয়েছে। ধর্মীয় ময়দানে এ শক্তি স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্তু রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামী শক্তি এখনও উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। নির্বাচনে যে কয়টি ইসলামী দল অংশগ্রহণ করছে, তারা সবাই মিলেও মোট ভোটের শতকরা ১০ ভাগও পায়নি।

এ কথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে, প্রায় সকল ইসলামী শক্তি চারদলীয় জোটকে বিজয়ী করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, ইসলামী শক্তি রাজনৈতিক দিক দিয়ে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ নয়। ইসলামী শক্তির এ দুরবস্থা কেনো সে বিষয়ে একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

১. ইংরেজ শাসনের পূর্বে এ দেশের ফৌজদারি আদালতে ইসলামী আইন ছিলো এবং শিক্ষাব্যবস্থাও ইসলামী ছিলো। ইংরেজি শাসনের ১৯০ বছর ইসলাম এমন এতিম অবস্থায় ছিলো যে, আলেম সমাজ মুসলিম জনগণের আর্থিক সহযোগিতায় মাদরাসা শিক্ষা যদি চালু না করতেন, তাহলে জাতি হিসেবে মুসলিমদের অস্তিত্বই হয়তো বিলীন হয়ে যেতো। তারা যে কুরআন ও হাদীসকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রেখেছেন, সে জন্য তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

   কিন্তু তারা ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবেই রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধান তা শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া তা করা সম্ভবও ছিলো না। তাছাড়া তাদের চালু করা শিক্ষায় যারা শিক্ষিত তাদের জন্য রিযকের সব দুয়ার বন্ধ ছিলো। জীবিকা অর্জনের জন্য মসজিদের ইমাম ও মাদরাসার শিক্ষক হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিলো না। এ কারণেই মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, ওয়াজ ও নসীহতের মাধ্যমে ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষাটুকুকে বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে বড় কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

২. শহীদাইনে বালাকোট—সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও মাওলানা ইসমাইল শহীদ উত্তর-পশ্চিম সীমা প্রদেশে যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন, মুনাফিকদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ইংরেজ ও শিখদের যৌথ আক্রমণের ফলে ১৮৩১ সালে বালাকোটের ময়দানে পরাজয়ের মাধ্যমে তা শেষ হয়ে যায়। এরপর একশ' বছরেও আন্দোলন আর দাঁড়াতে পারেনি। ১৯৪০-এর শতকে পাকিস্তান

আন্দোলন মুসলিম জাতির মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করলেও, এমনকি ইসলামের নামে পাকিস্তান কায়েম হলেও, পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরিচালকদের বেঈমানী ও ষড়যন্ত্রের কারণে ইসলাম একটি জীবন বিধান হিসেবে জনগণের নিকট উপস্থাপিতই হয়নি। পাকিস্তান কায়েম হবার পর রাষ্ট্রনায়কগণ যদি রাসূল (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনার পবিত্র দায়িত্ব পালন করতেন, তাহলে আজ পাকিস্তান বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত হয়ে বিরাজ করতো।

পাকিস্তান কায়েম হবার পর পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র ও ইসলামী সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক অঙ্গনে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী আন্দোলন শুরু করে। ১৯৫৩ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে মাওলানা আতহার আলীর নেতৃত্বে ইসলামী শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে নেযামে ইসলাম পার্টি গঠিত হয়। নেযামে ইসলাম পার্টি ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২২টি আসন লাভ করে।

১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ূব খান সামরিক শাসন জারি করার সময় সকল রাজনৈতিক দল বেআইনী ঘোষণা করে। ১৯৬২ সালে রাজনৈতিক দল পুনর্বহালের সুযোগে সর্বপ্রথম জামায়াতে ইসলামী-ই বহাল হবার ঘোষণা দেয়। নেযামে ইসলাম পার্টি সক্রিয় হতে আরও বিলম্ব হয়।

আলেম সমাজ ও রাজনীতি

আলেম সমাজের সবাই দীনের খেদমতে নিয়োজিত। রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁরা কমই আসেন। মাওলানা আতহার আলী ও মাওলানা সিদ্দীক আহমদের মতো বিশিষ্ট নেতাগণের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আলেম সমাজ ব্যাপক সংখ্যায় রাজনৈতিক ময়দানে অবতীর্ণ হননি। তাঁদের মধ্যে যারা মসজিদের ইমাম, তাঁরা বেতনভোগী হওয়ায় মসজিদ কমিটির অধীন। কমিটির কর্তাদের মধ্যে রাজনৈতিক দলের লোকও থাকেন। তাই চাকরিরত ইমামদের পক্ষে ইসলামী রাজনীতি করা সম্ভব নয়। মসজিদের মুসল্লীরা বিভিন্ন দলের লোক। ইমাম সাহেব কোন একদলে সক্রিয় হলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

মাদরাসার শিক্ষকগণের অবস্থা ভিন্ন। যারা আলীয়া মাদরাসার শিক্ষক তাদের পক্ষে রাজনীতি করার সুযোগ বেশি। যারা কওমী মাদরাসার শিক্ষক এ ব্যাপারে তাদের সুযোগ কম। কওমী মাদরাসাগুলো যাদের অর্থ সাহায্যে চলে, তারা যদি কোন রাজনৈতিক দলের লোক হন, তাহলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এমন রাজনৈতিক দলে আসতে সাহস পান না, যে দলটিকে দাতারা অপছন্দ করে। যে মাদরাসার কর্তৃপক্ষ রাজনীতি করেন না, সে মাদরাসার শিক্ষকগণকেও রাজনীতি করার অনুমতি দেন না।

রাজনীতিতে সকল পর্যায়েই নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে হলে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা প্রয়োজন। আলেমগণের মধ্যে সচ্ছল লোক খুবই কম। তাই রাজনীতি করা তাদের পক্ষে সহজ নয়।

ওলামায়ে কেরামের অনেকেই খেদমতে দীনের কাজকেই যথেষ্ট মনে করেন। ইসলাম কায়েমের আন্দোলনে যে ঝুঁকি ও ঝামেলা তা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকাই পছন্দ করেন। দুনিয়ার স্বার্থে যারা রাজনীতি করে তাদের চরিত্র ও আচরণ দেখে রাজনীতির প্রতি নেক লোকদের আকৃষ্ট হওয়ার কথা নয়। এ জাতীয় লোকদের মোকাবিলায় ইসলামী রাজনীতি নিয়ে ময়দানে আসার হিম্মত কম লোকেরই হতে পারে। তাছাড়া দীনদার লোকেরা স্বভাবিকভাবেই শান্তিপ্রিয়। তাঁদের অনেকেই বাতিল শক্তির সাথে সংঘর্ষের ঝামেলায় যেতে চান না। রাজনীতি করা দুনিয়াদারি কারবার মনে করেও অনেক দীনদার এ ময়দানে আসা পরহেযগারীর খেলাফ মনে করেন।

যারা রাজনীতি করা দীনী কর্তব্য মনে করতেন না, তাদের মধ্যে 'হাফেজ্জী হুজুর' নামে খ্যাত মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে তিনি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়িয়ে গেলে দীনী মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নির্বাচনের পর তিনি 'খিলাফত আন্দোলন' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন কায়েম করলে বহু আলেম এতে শরীক হন। তিনি জীবিত থাকাকালেই সংগঠনটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় এবং শায়খুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হকসহ অনেক আলেম ঐ সংগঠন ত্যাগ করেন।

হাফেজ্জী হুজুরের রাজনীতিতে অবতরণ ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার প্রচেষ্টাকে আমি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে সংবাদপত্রের মাধ্যমে মুবারকবাদ জানিয়েছি। আলেম সমাজের রাজনৈতিক ময়দানে আসার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে দৈনিক সংগ্রামে উপসম্পাদকীয় লিখেছি।

এ সব ঘটনায় আলেম সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ইসলামী আইন, ইসলামী শাসন, ইসলামী খেলাফত ইত্যাদি কায়েমের জন্য সংগঠিতভাবে আন্দোলন করা যে দীনী বিরাট কর্তব্য, সে কথার চর্চা ব্যাপক হয়েছে। এর ফলে ১৯৮০-এর দশকে কয়েকটি নতুন ইসলামী দল ময়দানে কর্মতৎপর হয়েছে। আমি জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তির নিকট বহুবার সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছি, আলেমগণ রাজনৈতিক সংগঠন করায় আমরা ইসলামী শক্তির অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে করি। এ সব দল ময়দানে আসবার আগে জামায়াতে ইসলামী একলাই ইসলাম বিরোধীদের সন্ত্রাস, পুলিশের লাঠি চার্জ ও সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারার মোকাবিলা করেছে। এখন আর আমরা একলা নই। বাতিলের মোকাবিলায় আরও ইসলামী দল সক্রিয় হওয়ায় আমরাও আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী বোধ করছি।

ইসলামী শক্তির মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজন

বাংলাদেশে ইসলামী শক্তি বিরাট হলেও নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্যের অভাবে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দুর্বল অবস্থায়ই আছে। ইসলামী শক্তির ঐক্যের অভাবেই দেশের জনগণ এমনসব দলকেই নির্বাচনে ক্ষমতায় বসায়, যারা ইসলামী নয়। জনগণের কমপক্ষে শতকরা পঁচাশিজন আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে মহব্বত করে এবং কুরআনকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। তারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে আলেম সমাজের নেতৃত্ব মেনে চলে। কুরআনের আইন ও রাসূলের আদর্শে সমাজকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ওলামা ও মাশায়েখ যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একমঞ্চে দাঁড়িয়ে জনগণকে ডাক দেন, তাহলে জনগণ যে ব্যাপকভাবে সাড়া দেবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ কথা অনুভব করেই ১৯৭৮ সালে বাধ্যতামূলক নির্বাসন জীবন ত্যাগ করে দেশে আসার পরই আমি 'ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন' নামে একটি পুস্তিকার মাধ্যমে একটি ঐক্যমঞ্চ গড়ার ফর্মুলা পেশ করি। তিন বছর চেষ্টার পর 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ' নামে একটি মঞ্চ কায়েম হয়। জেলা পর্যায়ে সম্মেলন করতে গিয়ে ঐক্যের পক্ষে জনগণের বিপুল সাড়া পাওয়া গেলো। মুসলিম জনতা যে ঐক্যের পাগল তা স্পষ্টই বুঝা গেলো। নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধের ফলে ঐ মঞ্চ টিকলো না।

ইসলামী ঐক্যের জন্য বাইতুল মুকাররমের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক ও ফুরফুরার পীর সাহেবও বেশ চেষ্টা করেছেন। কয়েকটি সংগঠন মিলে ইসলামী ঐক্যজোট গঠিত হয়। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৪ দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট একসাথে নির্বাচন করেছে। আশা করা গিয়েছিলো যে, নির্বাচনের পর সর্বদলীয় ইসলামী ঐক্যমঞ্চ কায়েমের পথ সুগম হবে। অত্যন্ত বেদনার বিষয় যে, ইসলামী ঐক্যজোটই নেতৃত্বের কোন্দলে বিভক্ত হয়ে গেলো। এতে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলেম সমাজের মর্যাদা অত্যন্ত মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। জনগণের নিকটও ইসলামী ঐক্য সম্পর্কে হতাশা সৃষ্টি হলো।

সাধারণত রাজনৈতিক দলে নেতৃত্বের কোন্দল হয়েই থাকে। একদল ভেঙে কয়েক দলেও পরিণত হয়। ব্যক্তিস্বার্থই এর প্রধান কারণ। কিন্তু ইসলামী নেতাদের মধ্যে এ ধরনের কোন্দল খুবই বেদনাদায়ক। ইসলামী ঐক্যের অভাবেই যে দেশে ধর্মনিরপেক্ষ, বে-দীন ও ধর্মবিমুখ লোকদের শাসন অব্যাহত রয়েছে, সে কথা আলেম সমাজ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেই ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা সফল হতে পারে।

৭৬.

মাওলানা মওদূদীর সফরের পর

১৯৫৬ সালের ৬ মার্চ মাওলানা মওদূদী তাঁর ৪০ দিন ব্যাপী সফর সমাপ্ত করে লাহোর ফিরে যান। যাবার আগে তিনি ৪টি বিভাগভিত্তিক সংগঠন কায়েম করে পূর্ব-পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীকে সাংগঠনিক দিক দিয়ে এক ধাপ এগিয়ে দিয়ে যান।

আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদীর বিদায়ের পর পরই প্রাদেশিক আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ৪ বিভাগীয় আমীরের এক বৈঠক ডাকেন। সে বৈঠকে জেলাভিত্তিক সংগঠন কায়েমের সিদ্ধান্ত হয়। তিনি বিভাগীয় আমীরগণকে ব্যাপক তৎপরতার নির্দেশ দেন। তখনো প্রাদেশিক মজলিসে শূরা গঠিত হয়নি বলে বিভাগীয় আমীরদের বৈঠকেই প্রয়োজনীয় সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঐ বৈঠকে সবাই একমত হন যে, মাওলানা মওদূদীর সফরের পর পূর্ব-পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক মঞ্চে আরোহণ করলো। ইতঃপূর্বে রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী পূর্ব-পাকিস্তানে তেমন উল্লেখযোগ্য ছিলো না। এখন জামায়াতের সাংগঠনিক তৎপরতার সাথে রাজনৈতিক তৎপরতাও বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রাখা, তাদেরকে জামায়াত সম্পর্কে অবহিত করা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

প্রাদেশিক আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম একটি বিষয়ের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, "জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত সম্প্রসারণ ও সংগঠনভুক্ত সকলকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হলে জামায়াতের সাহিত্য উর্দু থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদ সবচেয়ে বেশি জরুরি।" সবাই মাওলানার সাথে একমত হলেন।

এরপর মাওলানা প্রাদেশিক আমীর ও সেক্রেটারির মধ্যে কর্ম বন্টনের বিষয়টি উত্থাপন করেন। মাওলানা বলেন, আমাদের দু'জনের উপরই সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু অনুবাদের কাজটি যেহেতু আমাকেই করতে হবে সেহেতু ঐ দুটো দায়িত্বের জন্য আমার সময় দেওয়া সম্ভব নয়। আমাকে পূর্ণ সময় অনুবাদে ব্যয় করতে না দিলে অনুবাদ বিলম্বিত হবে। তাই ঐ দুটো দায়িত্বই সেক্রেটারিকে পালন করতে হবে।

চট্টগ্রাম বিভাগের আমীর জনাব আবদুল খালেক বললেন, "আপনি রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইতে পারেন; কিন্তু সাংগঠনিক দায়িত্ব তো প্রধানত আমীরের। আপনি সংগঠনভুক্ত সবার আমীর, তারা মা'মূর। আপনার নির্দেশ ও হেদায়াত পাওয়া তাদের হক। সংগঠন পরিচালনাই আমীরের আসল দায়িত্ব।"

উপস্থিত সবাই আবদুল খালেক সাহেবের মত গুরুত্ব দিয়ে সমর্থন করলেন।

আমিও বললাম, "আমীরের নির্দেশ অনুযায়ী চলাই আমার দায়িত্ব। তাই সংগঠনের মূল দায়িত্ব আমীরকেই পালন করতে হবে বলে আমার ধারণা।"

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম তাঁর মতে দৃঢ়ই রইলেন। তিনি বললেন, "তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদসহ জামায়াতের বিপুল সাহিত্যের অনুবাদ দ্রুত করতে হলে আমাকে অন্য দায়িত্ব থেকে রেহাই দিতেই হবে।"

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে হলো যে, সাংগঠনিক ব্যাপারেও সেক্রেটারিকেই পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে। যখন যে বিষয়ে আমীরের নির্দেশ প্রয়োজন সে বিষয়ে আমীরকে অবহিত করে নির্দেশ নিতে হবে। এর ফলে সংগঠনকে গড়ে তুলবার দায়িত্বের বোঝা আমার উপরই চাপলো। বিভাগীয় আমীর থেকে মাসিক রিপোর্ট সংগ্রহ করা, নিয়মিত রিপোর্টের পর্যালোচনা করে দিক-নির্দেশনা দান করা, কোথাও সাংগঠনিক সমস্যা দেখা দিলে সমাধানের ব্যবস্থা করা, জেলাগুলোতে সাংগঠনিক সফর করা, প্রাদেশিক বৈঠকের এজেন্ডা তৈরি করা, বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে বক্তব্য ঠিক করা, প্রদেশ থেকে কেন্দ্রে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পাঠানো ইত্যাদি যাবতীয় দায়িত্ব একা আমাকেই করতে হতো। যেসব বিষয়ে আমীরের দস্তখত প্রয়োজন, চাইলেই তিনি নিশ্চিন্তে আমার উপর নির্ভর করে দস্তখত করে দিতেন। যেমন কেন্দ্রে যে রিপোর্ট পাঠানো হতো, তা আমীরের পক্ষ থেকেই যেতো বলে তাতে তিনি দস্তখত করে দিতেন।

রাজনৈতিক যোগযোগ

১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে আমি যখন রাজনৈতিক যোগাযোগের দায়িত্ব পালন শুরু করি, তখন পূর্ব-পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট (আওয়ামী লীগ ছাড়া) ও হিন্দু দলগুলোর কোয়ালিশন সরকারের শাসন চলছে। তখন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রংপুরের আবু হোসেন সরকার। পেশায় তিনি এডভোকেট ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে বিএ ক্লাসে আমার ছাত্র ছিলো। তিনি কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন বলে আমার সাথে তাঁর পরিচয় ছিলো। তখন পূর্ব-পাকিস্তানের গর্ভনর ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।

সে সময় যুক্তফ্রন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন মাওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানী ও সেক্রেটারি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। নেযামে ইসলাম পার্টির সভাপতি ছিলেন মাওলানা আতহার আলী ও সেক্রেটারি ছিলেন মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ। কৃষক-শ্রমিক পার্টির সভাপতি ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ভাগ্নে আযীযুল হক নান্না মিয়া। সেক্রেটারি কে ছিলেন তা মনে নেই। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবির পর গুরুত্ব না থাকায় দলের সেক্রেটারি কে ছিলেন সে কথাও মনে করতে পারছি না। নির্বাচনের সময় মাওলানা মুহাম্মাদ আকরাম খান সভাপতি ছিলেন। যতটুকু মনে পড়ে, আইয়ুব খান ১৯৬২ সালে সামরিক শাসন উঠিয়ে নিয়ে বেসামরিক সরকার কায়েমের সময়

মুসলিম লীগ দলটিকে দখল করার জন্য যখন এক কনভেনশনের (মহাসম্মেলন) আয়োজন করেন, তখনো পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মাওলানা মুহাম্মাদ আকরাম খানই ছিলেন বলে মনে পড়ে।

রাজনৈতিক যোগযোগের জন্য ইস্যুভিত্তিক উপলক্ষ প্রয়োজন। বিনা ইস্যুতে যোগাযোগে অপরপক্ষ আগ্রহী না হলে অসুবিধা হয়। তখন যে রাজনৈতিক ইস্যু ছিলো তা নির্বাচন পদ্ধতির বিতর্ক। ১৯৫৬ সালে প্রণীত শাসনতন্ত্রে এ বিষয়টা অমীমাংসিত রেখে দেওয়ায় পূর্ব-পাকিস্তানে এটাই তখন প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু ছিলো। আওয়ামী লীগ যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে সোচ্চার। তাই তাদের সাথে যোগাযোগের পরিবেশ ছিলো না। পৃথক নির্বাচনের সমর্থক নেযামে ইসলাম পার্টি ও মুসলিম লীগের সাথেই এ ইস্যুতে যোগাযোগ করার সুযোগ ছিলো।

নেযামে ইসলাম পার্টির সভাপতি মাওলানা আতহার আলীর সাথে ১৯৫০ সাল থেকে পরিচয় ছিলো। গণপরিষদের মারীতে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে ও যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে জামায়াতের উর্দু ও বাংলায় প্রকাশিত পুস্তিকা নিয়ে বখশীবাজারে নেযামে ইসলাম পার্টির অফিসে যেয়ে দেখা করলাম। পৃথক নির্বাচনের পক্ষে সকল যুক্তি বই আকারে পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন এবং আরো কপি দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি পরের দিনই তা পৌছে দিলে তিনি আন্তরিক শুকরিয়া জানালেন এবং জামায়াতে ইসলামীর কর্মতৎপরতার প্রশংসা করলেন।

এ পুস্তিকা নিয়ে দৈনিক আজাদ পত্রিকার কম্পাউন্ডে অবস্থিত মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খানের বাসভবনে দেখা করতে গেলাম। আমার শ্বশুর সাহেব মাওলানা মীর আবদুস সালামের মুখে মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খানের কথা বহু শুনেছি। দু'জনই আহলে হাদীস এবং বড় আলেম হিসেবে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আমি যেয়ে প্রথমেই শ্বশুর সাহেবের পরিচয় দিলাম। তিনি অত্যন্ত স্নেহময় আবেগসহকারে আমাকে জড়িয়ে ধরে পাশে বসালেন। বললেন, তুমি আমার বন্ধুর জামাই আমারও জামাই। তুমি কি জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যাপক গোলাম আযম?

আমার সম্মতিসূচক জওয়াব পেয়ে আরও খুশি হয়ে বললেন যে, তিনি পত্রিকায় ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে ইতঃপূর্বে আমার বিবৃতি পড়েছেন এবং সম্প্রতিও পৃথক নির্বাচনের পক্ষে বিবৃতি পড়ে খুশি হয়েছেন।

তিনি অত্যন্ত স্নেহের সুরে বললেন, "তুমি তো নিশ্চয়ই জানো যে, আমি মাওলানা মওদূদীকে কতো ভালোবাসি। ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে মাওলানার ভূমিকার কারণে জামায়াতে ইসলামীকেও আমি ভালোবাসি। জামায়াতের প্রাদেশিক নেতা হিসেবে তোমাকে 'আপনি' সম্বোধন করাই উচিত। কিন্তু আমার বন্ধুর জামাই হিসেবে তুমি না বললে যে আদর লাগে না।" তাঁর এ কথায় আমি অভিভূত হয়ে বললাম, "তুমি সম্বোধনেই আমি গৌরববোধ করি।"

পৃথক নির্বাচন সংক্রান্ত বই দিলাম। খুব খুশি হয়ে বললেন, আমি জামায়াতে ইসলামীকে 'ইসলামী কমিউনিস্ট পার্টি' বলে থাকি। করাচীতে আমি দেখেছি, জামায়াতের কর্মীরা পার্লামেন্ট মেম্বারদের হোস্টেলে যেয়ে বই বিলি করে। কোলকাতায় কমিউনিস্ট কর্মীদেরকেও এ কাজ করতে দেখেছি। এ পদ্ধতিটা খুবই কার্যকর। সর্বত্র কমিউনিস্টরা তাদের আদর্শের জন্য যেমন নিষ্ঠার সাথে কর্মতৎপর, ইসলামের জন্য জামায়াতে ইসলামীকে তেমনি তৎপর দেখে আমি অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করি। ইসলামের জন্য আর কোন সংগঠনকে এ সুন্দর কর্মপদ্ধতিটি অবলম্বন করতে দেখি না। "পৃথক নির্বাচনের পক্ষে এ পুস্তিকাটির আরও কতক আমার কাছে রেখে যাও, আমি যথাস্থানে বিলি করবো।" আমি যা নিয়ে গিয়েছিলাম তা দিয়ে এলাম। ফিরে আসবার সময় বলে দিলেন, মাঝে মাঝে এসো, খুব খুশি হবো।

নির্বাচনী ইস্যুতে আওয়ামী লীগ আমাদের বিরোধী শক্তি। তাই ঐ সময় মাওলানা ভাসানী বা শেখ মুজিবের সাথে দেখা করার পরিবেশ ছিলো না। মাওলানা তো বড় নেতা। তাঁর সাথে দেখা করা সহজ ছিলো না। শেখ মুজিবের সাথে পরিচয় থাকলেও দেখা করা সমীচীন মনে করিনি। জনাব তাজুদ্দীন আহমদ দলের বড় গুরুত্বপূর্ণ পদে না থাকলেও নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে গণ্য ছিলেন। তাঁর সাথে স্কুল জীবন থেকেই ঘনিষ্ঠতা জন্মে। আমরা পাশাপাশি দুটো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কাউট ট্রুপ লীডার হিসেবে জয়দেবপুর রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত স্কাউট জাম্বুরীতে প্রথম পরিচিত হই। তিন দিনের অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমাদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। তিনি আমার এক ক্লাস জুনিয়র ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা এক হলের ছাত্রই ছিলাম। তবে তিনি হলে থাকতেন না, হলের এটাচট ছিলেন।

যা হোক, তিনি আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে তার সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি জানতাম না যে, তিনি কোথায় থাকেন। ঘটনাক্রমে কারকুনবাড়ী লেনে দেখা হয়ে গেলো। পুরানা বন্ধু হিসেবেই তিনি আলিঙ্গন করলেন। সাক্ষাতে আলাপ-আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। তেমন সাড়া পেলাম না বলে আর আমিও উদ্যোগ নিলাম না।

তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি

১৯৫৫ সালে যুক্তফ্রন্ট বিযুক্ত হবার ফলে আইনসভায় 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার' ৭২ জন অমুসলিম সদস্যের হাতে চলে গেলো। আওয়ামী মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিত্ব লাভ করার জন্য তাদের দ্বারস্থ হলো। '৪৬ সালে শেরে বাংলা পাকিস্তান ইস্যুর বিরুদ্ধে নির্বাচন করায় তারা যুক্তফ্রন্টের সাথে কোয়ালিশন করে আবু হোসেন সরকারকে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ দেন।

হিন্দু দলগুলো আওয়ামী মুসলিম লীগকে জানিয়ে দেয় যে, দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক দল হলে তাদের সমর্থন পেতে পারে। আরও জানিয়ে দেয় যে, যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি সমর্থন করতে হবে।

১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসেই আওয়ামী মুসলিম লীগ সদরঘাটের রূপমহল সিনেমা হলে দলের কাউন্সিল অধিবেশন ডেকে হিন্দুদের ঐ দুটো দাবি মেনে নেয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ পরিবর্তনে প্রথমে সম্মতি না দিলেও মাওলানা ভাসানীর চাপে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে বাধ্য হন। আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা এডভোকেট আবদুস সালাম খান আইনসভার জনবিশেক সদস্য নিয়ে এর বিরোধিতা করে যুক্তফ্রন্টেই থেকে যান এবং আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এরপরও বড় ধরনের মতবিরোধ ছিলো। ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের সাথে হিন্দু দলগুলোর কোয়ালিশনে জনাব আতাউর রাহমান খান প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হন। সরকার যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা মেনে চলছে না বলে মাওলানা ভাসানী অভিযোগ তুললেন।

গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তন আনার ব্যবস্থা করলেন। পার্লামেন্টে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগের মাত্র ১২ জন সদস্য ছিলো। ইস্কান্দার মির্জার তৈরি রিপাবলিকান পার্টি, কংগ্রেস ও তফসিলী হিন্দুদের এক কোয়ালিশন গঠন করে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ১২ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির পক্ষে আইন রচনা করার 'মহান' উদ্দেশ্যে সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়।

পশ্চিম-পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আর পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান। গোটা পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাতে। পূর্ব-পাকিস্তানের আইনসভায় যুক্তফ্রন্টের হাতে বিরোধী দলের নেতৃত্ব। যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব কৃষক-শ্রমিক পার্টির হাতে। তাদের দুর্বল নেতৃত্বের কারণে আওয়ামী লীগ দাপটের সাথেই রাজত্ব করতে থাকলো।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের জন্য মাওলানা ভাসানীই সমস্যা হয়ে গেলেন। তিনি প্রাদেশিক সরকার যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ২১ দফা কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ করছে না বলে মাঝে মাঝে বিবৃতি দিতে থাকলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট স্বায়ত্তশাসনের জোর দাবি জানাতে লাগলেন।

১৯৫৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারিতে যে শাসনতন্ত্র গৃহীত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি পূরণ না হওয়ার অজুহাতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ আওয়ামী লীগ সদস্যগণ স্বাক্ষর দেননি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রয়োজনে সোহরাওয়ার্দী দস্তখত করতে বাধ্য হন। তখনো আওয়ামী অন্য সদস্যগণ দস্তখত করেননি। তাই মাওলানা ভাসানীর স্বায়ত্তশাসন দাবি পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যুক্তিসঙ্গত দাবি।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে মাওলানা ভাসানীর মতপার্থক্যের দুটো প্রধান বিষয়ই ছিলো, পররাষ্ট্রনীতি ও স্বায়ত্তশাসন। এ মতবিরোধ মীমাংসার জন্য ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কাগমারীতে (সন্তোষ-টাঙ্গাইল) আওয়ামী লীগ কাউন্সিল

অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্বয়ং হাজির হন। কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্বে ৬ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্কিং কামিটির মিটিং-এ সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনা হয়। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা (SEATO) ও বাগদাদ চুক্তি সংস্থা (NATO)-সমূহে পাকিস্তান সদস্য ছিলো। এ সব চুক্তি রুশবিরোধী হিসেবে পরিচিত ছিলো। মাওলানা ভাসানী আমেরিকা বিরোধী ও রুশপন্থি ভূমিকায় সোচ্চার ছিলেন। ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৭) আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে ঐ সব আমেরিকাঘেঁষা সংস্থা থেকে পাকিস্তানের সদস্যপদ প্রত্যাহারের দাবিতে প্রস্তাব পেশ করা হবে কিনা সে বিষয়ে ৬ ফেব্রুয়ারিতে ওয়ার্কিং কমিটিতে সিদ্ধান্ত হবার কথা। সোহরাওয়ার্দীর দীর্ঘ বলিষ্ঠ বক্তব্যের পর ওয়ার্কিং কমিটিতে ৩৫-১ ভোটে কোন প্রস্তাব আনয়ন না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাউন্সিল অধিবেশনের পর ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী বৈঠকে প্রস্তাব না আনার পক্ষে সমঝোতা হয়ে যায়। এভাবে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কৌশলে মাওলানা ভাসানীকে পরাজিত করলেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্পর্কেও শহীদ সোহরাওয়ার্দী আরেক কৌশল অবলম্বন করে জয়ী হন। তিনি পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভা আহ্বানের নির্দেশ দেন এবং তিনি স্বয়ং তাতে বক্তৃতা করবেন বলে জানান। জনসভায় পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি জোরদার করা হবে বলেই ব্যাপক প্রচার চলে। ১৯৫৭ সালের ১৪ জুন মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে জনসভা শুরু হয়। এক পর্যায়ে শেখ মুজিব যখন স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আবেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে হাজির হয়েই মাইক হাতে নিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন। বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করলেন যে, শাসনতন্ত্রে শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন রয়েছে। বাকি সামান্য যা আছে এর দায়িত্ব আমি নিলাম।

মাওলানা ভাসানী 'থ' হয়ে চেয়ে রইলেন এবং শেখ মুজিব চুপসে গেলেন। সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতার পর শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই মঞ্চ থেকে 'সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ' শ্লোগানে জনসভা মেতে উঠলো এবং জনসভা সমাপ্ত হয়ে গেলো।

মাওলানা ভাসানীর দলত্যাগ ও নতুন দল গঠন

১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই সদরঘাটের রূপমহল সিনেমা হলে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এক সম্মেলন হয়। সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার খান, পাঞ্জাবের মিয়া ইফতিখারুদ্দীন আহমদ, সিন্ধু জাতীয়তাবাদী নেতা জিএম সৈয়দ ও বেলুচিস্তানের খান আবদুস সামাদ আচাকজাই ঐ সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সম্মেলনে পশ্চিম-পাকিস্তানের ন্যাশনাল পার্টি, পূর্ব-পাকিস্তানের মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আস্থাশীল আওয়ামী লীগ অংশ ও মাহমুদ আলীর নেতৃত্বে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দলের সমন্বয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (NAP) নামে নতুন একটি পাকিস্তানভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।

আতাউর রহমান সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিব গুণ্ডাবাহিনী ব্যবহার করে উক্ত সম্মেলন বানচাল করতে ব্যর্থ হলেও এ নতুন দলটিকে পল্টন ময়দানে জনসভা করতে দেয়নি। এ জাতীয় ফ্যাসিবাদী পন্থায় রাজনৈতিক বিরোধী শক্তির উপর হামলা করা আওয়ামী লীগের স্থায়ী নীতি।

এ সময় থেকেই মাওলানা ভাসানী বামপন্থী হিসেবে পরিচিত রাজনৈতিক মহলের অবিসম্বাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

ইতোমধ্যে গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বরখাস্ত করার ভয় দেখালে তিনি ১৯৫৭ সালের ১১ অক্টোবর পদত্যাগ করেন। ১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনকে গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ অন্যায়ভাবে পদচ্যুত করলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী তা সমর্থন করেন। ঐ একই তলোয়ারে তাকেও হত্যা করা হলো। ইতিহাস কাউকেই ক্ষমা করে না।

সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগের পর মুসলিম লীগ নেতা আইআই চুন্দ্রিগড় প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে যুক্ত নির্বাচন আইন বাতিল করে আবার পৃথক নির্বাচন আইন চালুর চেষ্টা করেন। রিপাবলিকান পার্টির বিরোধিতায় তার এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি পদত্যাগ করেন। রিপাবলিকান পার্টির নেতা মালিক ফিরোজ খান নুন প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেই ৭ অক্টোবর (১৯৫৮) সেনাপতি আইয়ূব খান মার্শাল ল' জারি করেন।

৭৭.

আওয়ামী লীগ সরকারের ইসলামবিরোধী পরিকল্পনা

১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ ও কংগ্রেসসহ হিন্দু দলগুলোর কোয়ালিশন সরকার কায়েম হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দ ত্যাগ, দলের গঠনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ ও যুক্ত নির্বাচন প্রথা সমর্থন করার পর আওয়ামী লীগ কংগ্রেস ও হিন্দু দলগুলোর আস্থা অর্জন করায়-ই এ কোয়ালিশন সরকার গঠন সম্ভব হয়।

আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে।

আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আতাউর রহমান খান প্রধানমন্ত্রী হন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার মহৎ উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সবাই আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় পারদর্শী বা আধুনিক শিক্ষিত কোন ইসলামী চিন্তাবিদও ছিলেন না। এটাই ছিলো ইসলামের বিরুদ্ধে কার্যকর পরিকল্পনা।

গত শতাব্দীর ৪০-এর দশকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতা গান্ধী ও নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের বিরুদ্ধে আল্লামা ইকবাল ও কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী

জিন্নাহর নেতৃত্বে সে সময়কার ১০ কোটি ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম লীগ বলিষ্ঠ অবস্থান নেয়। ১৯৪৫ ও ৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম জনগণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগকে বিজয়ী করে। ইসলামী আদর্শে মুসলিম জাতিকে গড়ে তোলার দোহাই দেবার ফলেই এ বিজয় সম্ভব হয়।

কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও হিন্দু-মুসলিম এক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে মুসলিম জাতির এ বিজয়ের ফলেই ভারত বিভক্ত হয় এবং পাকিস্তানের জন্ম হয়। সেই পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাই ছিলো পূর্ব-পাকিস্তান। আর সেই পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগই সর্বপ্রথম কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে দলীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে।

এ অবস্থায় আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিশনে স্বাভাবিক কারণেই ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগের আদর্শে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষাব্যবস্থাকে যেভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন সে ধরনের সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করার জন্যই ঐ কমিশন গঠন করা হয়। উক্ত কমিশনে কিছু ইসলামী ব্যক্তিত্বকে শামিল করার দাবি সরকার দাপটের সাথে অগ্রাহ্য করে।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও সমালোচনা

কমিশন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ও কঠিন পরিশ্রম করে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের সুপারিশমালা পেশ করে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট পত্রিকায় যেটুকু প্রকাশ পায় তাতেই প্রদেশের সর্বত্র সভা-সমিতি, বিবৃতি ও বিভিন্নভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। আলেম সমাজ কমিশনের রিপোর্টকে ইসলামবিরোধী বলে সুস্পষ্ট রায় দেন। সরকার সমর্থক পত্রিকা এ সব প্রতিবাদকে প্রগতির দোহাই দিয়ে মোল্লাদের বাজে চিৎকার বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

আমি কমিশনের রিপোর্টের যুক্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক সমালোচনা লিখিত আকারে তৈরি করে দৈনিক আজাদের মালিক মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খানের সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার লেখাটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। বিভিন্ন সাবহেডিং ও লেখার কিছু কিছু অংশ পড়ে খুশি হয়ে বললেন ঃ

তোমার লেখাটা খুবই চমৎকার হয়েছে। এটা দৈনিক আজাদে প্রকাশ করা হবে। ঐ সময় দৈনিক আজাদের সমকক্ষ আর কোন বাংলা পত্রিকা ছিলো না। সাপ্তাহিক ইত্তেফাক তখন নতুন দৈনিক হিসেবে চালু হয়।

আমার লেখাটা পত্রিকায় এক পৃষ্ঠায়ও স্থান সংকুলান হয়নি। যে দিন লেখাটা প্রকাশিত হয় এর পরদিনই আজাদ সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন এক উপ-সম্পাদকীয়তে এ সমালোচনার প্রশংসা করে মন্তব্য করেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকের কলম থেকে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে এমন স্বচ্ছ ধারণা পেয়ে আমরা তাঁকে মুবারকবাদ জানাই।"

চিন্তাধারা গ্রন্থে সমালোচনার কিঞ্চিৎ আভাস

আধুনিক প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'চিন্তাধারা' নামক আমার লেখা ৩৬টি প্রবন্ধের মধ্যে এ লেখাটি রয়েছে। ঐ সংকলন থেকে এখানে কিছু ধারণা দিচ্ছি ঃ

ভূমিকায় বলেছি, জাতির ভবিষ্যৎ শিক্ষাব্যবস্থার উপরই প্রধানত নির্ভরশীল। তাই শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহকে ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে সুধী সমাজের নিকট পেশ করছি।

আলোচনার ধারা

১. প্রথমে কমিশনের গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পেশ করবো। কেননা কমিশনের সদস্যদের নির্বাচনের উপরই সুপারিশের ধরন অনেকখানি নির্ভর করে।

২. কমিশনের চেয়ারম্যানের উদ্বোধনী বক্তব্য ও রিপোর্টের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করা হবে যে, শিক্ষাব্যবস্থা কোন্ আদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা হবে সে বিষয়ে কমিশনের কোন স্পষ্ট ধারণাই নেই।

৩. বর্তমান মাদরাসা শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের ধারণা কী এবং এর সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে সুপারিশ করা হয়েছে তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য।

৪. আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ দেশে কোন্ ধরনের নাগরিক গড়ে তুলবে।

৫. কমিশনের সুপারিশ থেকে ইসলাম সম্পর্কে কমিশনের কিরূপ ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় এবং ঐ সুপারিশকৃত শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামের স্থান কোথায়।

৬. কমিশনের সুপারিশে কী কী ইসলাম বিরোধী বিষয় রয়েছে।

৭. শিক্ষার পুনর্গঠন সম্পর্কে আমাদের পরামর্শ।

উপরিউক্ত আলোচ্য বিষয়সূচি থেকেই মোটামুটি আভাস পাওয়া যায় যে, সমালোচনার ধরন কী ছিলো। মাদরাসা শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের নিষ্ঠুর মন্তব্যটি ছিলো নিম্নরূপ ঃ

"It will not be an exaggeration to say that Madrasa Education is a total waste." অর্থাৎ মাদরাসা শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে অপচয় বললেও অত্যুক্তি হবে না।

কমিশনের ঐ মন্তব্যের প্রতিবাদ

ইংরেজ রাজত্ব স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শাসকরা এ দেশীয়দের মধ্যে তাদের মন, মগজ ও চরিত্রের লোক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার ফলে কিভাবে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার দুর্দশা হলো এর বিবরণ দিয়ে আমি কমিশনের মন্তব্যের জওয়াবে লিখেছিলাম ঃ

কমিশনের বিবেচনা করা উচিত ছিলো যে—

১. মুসলিম জনগণের দানে অতি দীনহীনভাবে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা কোন রকমে অস্তিত্বের কঙ্কালটুকু বাঁচিয়ে রেখেছে।

২. শুধু গরীব ছেলেরাই মাদরাসায় পড়ে বলে শিক্ষকগণ সামান্য জীবিকায় সন্তুষ্ট থেকে এ শিক্ষাকে জীবনের সাধনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

৩. সমাজে মাদরাসা শিক্ষিতদের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা না থাকায় তাদের পক্ষে ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করা ও আধুনিক যুগের উপযোগী চিন্তাধারা গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়নি।

৪. সরকারের ইচ্ছা, সাহায্য ও সহানুভূতি ছাড়াই একটি শিক্ষাব্যবস্থা শুধু চাঁদার সাহায্যে দু'শ বছর পর্যন্ত চালু রাখা অলৌকিক ব্যাপার। অশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের প্রতি যে ঈমানটুকু এখনও টিকে আছে তা শুধু মাদরাসা শিক্ষারই অবদান।

৫. ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষা মুসলমানদের মধ্যে একদল বে-ঈমান সৃষ্টি করেছে এবং তারা ইংরেজদের শেখানো জীবনধারাকে ইসলামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে ইসলামকে এ দেশ থেকে উৎখাতের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তাতে মাদরাসা শিক্ষার ক্ষীণ আলোটুকু না থাকলে ইসলামের নামটুকুও বাকি থাকতো না।

৬. মাদরাসা শিক্ষা যদি কুরআন ও হাদীসের শুধু শব্দগুলোকেও বাঁচিয়ে রেখে থাকে তাহলে যথেষ্ট করেছে বলে স্বীকার করা উচিত। এ শিক্ষা না থাকলে কুরআন পড়ার লোকও সমাজে পাওয়া যেতো না।

এ সব কথা বিবেচনা করলে মাদরাসা শিক্ষাকে অপচয় বলার মতো ধৃষ্টতা দেখানো সম্ভব হতো না। এ কথা সত্য যে, মাদরাসা শিক্ষা অনুন্নত। বর্তমান যুগের দাবি পূরণ করে না। মাদরাসা শিক্ষাকে পুনর্গঠিত করতে হবে, যাতে আধুনিক বিশ্বের উপযোগী ইসলামী নেতৃত্বের যোগ্য লোক তৈরি হয়। এ দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাই বরং অপচয়। এ শিক্ষায় নৈতিক জীব হিসেবে মানুষকে গড়া হয় না। ফলে সমাজে দুর্নীতি ও অন্যায় অবিচার বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষার পুনর্গঠন সম্পর্কে আমাদের পরামর্শ

১. এমন একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করুন, যেখানে পুরাতন মাদরাসা শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে, যাতে উভয় দৃষ্টিভঙ্গিকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যের পথে অগ্রসর করা সম্ভব হয়।

২. জাতিকে কোন্ আদর্শে গঠন করা এবং কোন্ ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করা শিক্ষা-সংস্কারের উদ্দেশ্য তা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে।

৩. নীতিগতভাবে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা একটিই থাকবে। বর্তমানে একাধিক শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা শিক্ষিতদের মধ্যে বিপরীতমুখী মনোভাবের মানুষ তৈরি হচ্ছে। জাতির আদর্শ যা নির্ধারিত হবে, গোটা শিক্ষাব্যবস্থা তা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। জাতির চিন্তাধারায় ঐক্য ছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য গড়া সম্ভব নয়।

৪. মুসলিম জাতির আদর্শ যদি ইসলামই হয়ে থাকে, তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে একই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে সাজাতে হবে। আমরা মসজিদে মুসলমান হবো, রাজনীতিতে গণতন্ত্রী বনবো, আর অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রী সাজবো—এমন কার্টুন মার্কা মানুষ তৈরি করা হাস্যকর।

৫. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে প্রতিভাবান লোকদেরকে মুসলিম বৈজ্ঞানিক, মুসলিম দার্শনিক, মুসলিম অর্থনীতিবিদ, মুসলিম ঐতিহাসিক, মুসলিম ডাক্তার ও মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র শিক্ষা দিয়ে সে সঙ্গে একটু দীনীয়াতের লেজুড় লাগালে তা মগজে স্থান পাবে না। ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার তুলনায় কুরআনের ইতিহাস দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধির যোগ্য বানাতে হবে। গোটা শিক্ষাবৃক্ষকে স্রষ্টা-নিরপেক্ষ রেখে এর কোন শাখায় ইসলামী শিক্ষার কলম লাগালে তা পরিত্যাজ্য বলে গণ্য হবে। মোটকথা হলো, জ্ঞান-সাধনার পূর্ণ ইসলামীকরণ প্রয়োজন।

মাদরাসা অঙ্গনে আলোড়ন

দৈনিক আজাদ পত্রিকায় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর মাদরাসা শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষক ও ছাত্র মহলে নব জাগরণের সঞ্চার হয়। ঐ রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নতুন মাত্রা যোগ হয়। সরকার ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী মাদরাসার ব্যাপারে বাস্তব কোন পদক্ষেপ নিতে আর সাহস করেনি।

সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানার অন্তর্গত হামীদপুর আলীয়া মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল দক্ষিণবঙ্গের জনপ্রিয় ওয়ায়েয মাওলানা মুইযুদ্দীন হামীদী আমাকে চিঠি লিখে আমার লেখাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার অনুমতি চাইলেন। আমি সানন্দে অনুমতি দিলাম। তিনি বই আকারে ছাপিয়ে সারাদেশের মাদরাসায় পৌঁছাবার ব্যবস্থা করেছেন। জামায়াতের পক্ষ থেকেও পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হয়।

বেসরকারি শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদ চলাকালেই মাওলানা আকরাম খান ও মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর উদ্যোগে মাওলানা আকরাম খানের বাসভবনে এক বৈঠক ডাকা হয়। পনের জনের মতো বৈঠকে হাজির হন। বৈঠকের আহ্বায়ক দু'জন ছাড়া উপস্থিত যাদের নাম মনে পড়ে তারা হলেন, মাওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ও মাওলানা মুফতী দীন মুহাম্মদ খান।

মাদরাসা শিক্ষার উপর সরকার যাতে কোন অন্যায় হস্তক্ষেপ না করে সে উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেশ করার উদ্দেশ্যে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। মাওলানা আকরাম খানকে কমিটির সভাপতি এবং আমাকে সেক্রেটারির দায়িত্ব দেওয়া হয়। কমিটির পক্ষ

থেকে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে প্রস্তাবনা প্রণয়নে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন, মাওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী। এ কমিটির কার্যক্রমের মাধ্যমেই মাওলানার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। মাত্র তিন মাস সময়ের মধ্যেই কমিটির সুপারিশমালা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। কমিটির প্রস্তাবনা শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে প্রধানমন্ত্রী আতাউর রাহমান খানের নিকট পৌছাবার দায়িত্ব মাওলানা আকরাম খান নিলেন। আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভা মাত্র দু'বছর স্থায়ী হয়। মাদরাসা শিক্ষা যেভাবে চলছিলো সেভাবেই চলতে থাকলো।

পূর্ব-পাকিস্তানে বার বার মন্ত্রিসভার নাটকীয় পরিবর্তন

১৯৫৮ সালের মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত আতাউর রাহমান খান ও আবু হোসেন সরকারের মধ্যে কয়েকবার প্রধানমন্ত্রিত্বের পদটির রদবদল হয়, যা রাজনৈতিক ময়দানে হাস্যকর ও লজ্জাকর বলেই গণ্য ছিলো।

৩০ মার্চ গভর্নর শেরে বাংলা এ যুক্তি দেখিয়ে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানকে পদচ্যুত করেন যে, আইনসভায় তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা নেই। গভর্নর তাঁর দলের নেতা আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান।

ঐ দিকে কেন্দ্রে বিরোধী দলীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নূন শেরে বাংলাকে পদচ্যুত করে চীফ সেক্রেটারিকে ভারপ্রাপ্ত গভর্নর নিয়োগ করেন। ভারপ্রাপ্ত গভর্নর ১ এপ্রিল আবু হোসেন সরকারকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করেন।

১ এপ্রিলই আতাউর রহমান খানকে মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৮ জুন ন্যাপ সদস্যগণ সমর্থন প্রত্যাহার করলে সরকারের পতন হয়। আবার আবু হোসেন সরকার প্রধানমন্ত্রী হন। ২২ জুন সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হলে এ মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ন্যাপ-এর ২৯ জন সদস্যের হাতে ব্যালেন্স অব পাওয়ার ছিলো এবং তাদের খামখেয়ালিতেই বারবার সরকারের পতন হয়। গভর্নর সুলতানুদ্দীন খান কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান যে, পূর্ব-পাকিস্তানে কোন স্থিতিশীল সরকার কায়েম করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই ২৫ জুন কেন্দ্রীয় শাসন চালু হয়।

২২ জুলাই আবার আতাউর রহমান খান প্রধানমন্ত্রী হন। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নূন ও বিরোধী দলীয় নেতা সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে অনুষ্ঠিত এক চুক্তিতে ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনকালে এক প্রদেশে কেন্দ্রীয় শাসন থাকা উচিত নয় বলে আতাউর রহমান খানকে নির্বাচন পর্যন্ত সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

শাহেদ আলী হত্যা

ঐ সময় প্রাদেশিক আইনসভায় আবদুল হাকীম স্পীকার ছিলেন। আওয়ামী লীগ তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করলে স্পীকার তা নাকচ করে দেন। আওয়ামী লীগ সরকার স্পীকারের সভাপতিত্বে সংসদ অধিবেশন পরিচালনায় অস্বীকৃতি

জানালে গভর্নরের নির্দেশে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী ভারপ্রাপ্ত স্পীকারের দায়িত্ব পালন করেন।

২০ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) প্রাদেশিক আইনসভার অধিবেশন শুরু হয়। শাহেদ আলী আওয়ামী লীগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগ তুলে আইনসভায় বিরোধী দল তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। বিরোধী সদস্যগণ ২৩ সেপ্টেম্বর পেপার ওয়েট, মাইকের স্পীকার, মাইকের ডাণ্ডা, চেয়ারের পায়া ও হাতল শাহেদ আলীর উপর নিক্ষেপ করতে থাকলেন। স্পীকারের মঞ্চে আরোহণ করেও আক্রমণ অব্যাহতভাবে চললো। আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ২৬ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৭ অক্টোবর সামরিক অভ্যুত্থান

যে তিন কুচক্রীর ষড়যন্ত্রের ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পাকিস্তানে শুরু থেকেই দানা বাঁধতে পারেনি, তাদের ক্ষমতার উৎস ছিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ূব খান। অপর দু'জন হলেন মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ও গোলাম মুহাম্মদ। এদের সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৫৫ সালে গভর্নর জেনারেল থাকা অবস্থায়ই গোলাম মুহাম্মদের মৃত্যু হলে ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর জেনারেল হন। মির্জার ক্ষমতার উৎস ছিলো সেনাপ্রধান। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত এ দু'জনই পাকিস্তানের প্রধান হর্তা-কর্তা হিসেবে দেশের সর্বত্র অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। যখন পরিস্থিতি জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো তখনই সামরিক শাসন জারি করা হলো। এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সামরিক অভ্যুত্থানের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য তারা সুপরিকল্পিতভাবেই যাবতীয় ষড়যন্ত্র করেছেন।

৭ অক্টোবর গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা করাচীতে তাঁর বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নূনের মন্ত্রিসভাকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করেন। অথচ ঐ রাতেই তিনি সামরিক শাসন ঘোষণা করেন। ঐ ঘোষণায় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল, রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত, সংবিধান রহিত করে গণতন্ত্রকে চূড়ান্তভাবে হত্যা করা হয়।

পাকিস্তান কায়েমের ৯ বছর পর কুচক্রিদের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও একটি শাসনতন্ত্র শেষ পর্যন্ত প্রণীত হলো। ১৯৫৯-এর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতো। জনগণের সরকার কায়েম হয়ে গেলে সেনাপতির স্বৈরশাসন কায়েম করা কঠিন হবে বলে নির্বাচনের আগেই সামরিক শাসন জারি করা হলো।

ঐ ঘোষণায় সামরিক আইন জারি করার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য যেসব কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

পূর্ব-পাকিস্তানের আইনসভায় স্পীকার হত্যা, পশ্চিম-পাকিস্তান প্রদেশকে ভেঙে সাবেক প্রদেশগুলোকে পুনর্বহালের জোর আলোচনা, প্রাদেশিক পরিষদগুলোতে

মন্ত্রিত্ব লাভের সীমাহীন নির্লজ্জতা, জাতীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা, পরিষদ সদস্য ও দলীয় কর্মীদের বল্গাহীন দুর্নীতি, আততায়ীর ছুরিকাঘাতে ডা. খান সাহেবের মৃত্যু, মুসলিম লীগ কর্তৃক সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি গোটা দেশে অরাজকতা কায়েম করায় গভর্নর জেনারেল জননিরাপত্তার স্বার্থে ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে বাধ্য হয়ে সামরিক শাসন জারি করলেন।

সেনাপতি আইয়ূব খান প্রধান সামরিক শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এক সপ্তাহের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনী গোটা দেশের নিয়ন্ত্রণভার হাতে তুলে নেয়। গভর্নর জেনারেলের পদ তখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ২৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। কুচক্রীরা এভাবেই একজনের হাতে আর একজন প্রতারিত হয়। ইস্কান্দার মির্জা লন্ডনের এক হোটেলে চাকরি করে বাকি জীবন অতিবাহিত করেন।

৭৮.

জামায়াতের সাংগঠনিক তৎপরতা

মাওলানা মওদূদীর ৪০ দিন ব্যাপী সফরে জামায়াতের জন্য ময়দান যথেষ্ট প্রশস্ত হওয়ায় এর সাংগঠনিক সুফল অর্জনের উদ্দেশ্যে চারটি বিভাগের প্রতি জেলায়ই আমার সফর জরুরি বলে সাব্যস্ত হলো। চার বিভাগীয় আমীরের মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের আমীর জনাব আবদুল খালেককে আমি সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসতাম। প্রথমত, তিনি ইসলামী আন্দোলনের পথে আমার পথপ্রদর্শক। দ্বিতীয়ত, সাংগঠনিক টেকনিক্যাল জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি অভিজ্ঞ ও অগ্রসর। আমি জামায়াতে যোগদানের পর রংপুরে প্রথম যখন সংগঠন কায়েম হয় তখন প্রতি সপ্তাহে তিনি সাপ্তাহিক বৈঠক পরিচালনার উদ্দেশ্যে রংপুর যেতেন। তাঁর কাছ থেকেই সাংগঠনিক শিক্ষা শুরু হয়। তাঁর দারসে কুরআন এবং বৈঠক পরিচালনার পদ্ধতি আমাকে আকৃষ্ট করে। সাংগঠনিক ব্যাপারে তাঁকে আমি অন্যদের চেয়ে বেশি যোগ্য মনে করতাম বলেই তাঁর বিভাগে প্রথম সফর করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

জনাব আবদুল খালেককে সফর প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য চিঠি লিখলাম। তিনি নোয়াখালি থেকে সফর শুরু করার পরামর্শ দিলেন। আমি ঢাকা থেকে এবং তিনি চট্টগ্রাম থেকে রেলযোগে আখাউড়া জংশনে মিলিত হয়ে এক সাথে নোয়াখালী গেলাম। রেলগাড়িতে আমাদের সফর প্রোগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা হলো। জানতে পারলাম, প্রথমে মহকুমা শহর লক্ষ্মীপুর যাচ্ছি। সেখানে প্রথমে জনসভা হবে। পরদিন সকালে কর্মী সম্মেলন। মান্দারী হাইস্কুলের হেড মাস্টার শফীকুল্লাহর মতো একজন সম্ভাবনাময় ব্যক্তি লক্ষ্মীপুরে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করায় সেখানেই পয়লা গেলাম।

১৯৫৬ সালের নভেম্বর বা ডিসেম্বরে এ সফর হয়। এক হাইস্কুল (সামাদ একাডেমী)

প্রাঙ্গণে জনসভায় প্রচুর জনসমাগম ছিলো। আসরের পর জনসভা শুরু হয়। প্রথমে স্থানীয় একজন বক্তব্য রাখলেন। এরপর জনাব আবদুল খালেক জামায়াতের দাওয়াতের তিন দফার চমৎকার ব্যাখ্যা করলেন এবং এ দাওয়াত কবুল করে জামায়াতে যোগদান করার আহ্বান জানালেন। প্রধান বক্তা হিসেবে আমার বক্তৃতা মাগরিব পর্যন্ত শেষ করে জনসভা মাগরিবের নামাযের জন্য মুলতবি করা হলো। এ কথা ঘোষণা করা হলো যে, নামাযের পর আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হবে। জনসভায় প্রশ্নের জওয়াব দেওয়ার রীতি দেশে প্রচলিত ছিলো না। শ্রোতারা বেশ উৎসাহের সাথে নামাযের পর আবার জমে বসলো।

জনসভার স্টেজ মাঠের পূর্ব পাশে। নামাযে আমাকে ইমামতী করার জন্য মাঠের পশ্চিম প্রান্তে জনগণের ভেতর দিয়েই যেতে হলো। নামাযের পর স্টেজে ফিরে আসার সময় আমার গায়ের জামা সম্পর্কে তীর্যক মন্তব্য শুনলাম। মন্তব্যটি আমার শার্টের কলার সম্পর্কে। ছাত্রজীবন থেকে শার্ট পরে এসেছি। মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী (র)-এর সাথে নবম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকাল থেকে সম্পর্ক। তিনি কোন দিন শার্টের ব্যাপারে আপত্তি করেননি। তাবলীগ জামায়াতেও কেউ আপত্তি তুলেনি। আজ প্রথম আপত্তি শুনলাম। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, কলার বাদ দিয়ে ব্যান্ড কলারের শার্ট পরবো। মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য, "কলারওয়ালা শার্ট পরে ইমামতী করা উচিত হয়নি।"

জনসভায় প্রশ্নোত্তর পর্ব

মাগরিবের নামাযের পর স্টেজ থেকে ঘোষণা করা হলো যে, যারা প্রশ্ন করতে চান তাদের জন্য কাগজের টুকরা বিলি করা হচ্ছে। হাত বাড়িয়ে কাগজ নিয়ে প্রশ্ন লিখে পাঠান। বেশ কিছু প্রশ্ন জমা হয়ে গেলো। জনাব আবদুল খালেক সাহেব প্রশ্নগুলো দেখে একটা প্রশ্ন আমার হাতে তুলে দিলেন জওয়াব দেওয়ার জন্য।

প্রশ্নটি ছিলো, আপনাদের দল কি ধর্মীয় দল, না রাজনৈতিক দল তা বুঝতে পারলাম না। কালেমা-নামায দিয়ে বক্তৃতা শুরু করে স্পষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাধারা পেশ করলেন। ইতঃপূর্বে এ জাতীয় বক্তৃতা শুনিনি। তাই জানতে চাই, জামায়াতে ইসলামী ধর্মীয় দল না রাজনৈতিক দল। এ প্রশ্নের জওয়াবে বললাম, ইসলাম শুধু ধর্ম নয়। ইসলাম আল্লাহর দেওয়া একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের সবটুকুই ইসলামের বাস্তব রূপ। তাঁকে পূর্ণরূপে অনুকরণ ও অনুসরণ করলেই সত্যিকার মুসলিম হওয়া যায়। তিনি নামাযের ইমামতী করার সময় যেমন রাসূল ছিলেন, মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালনের সময়ও তিনি রাসূল ছিলেন। এমনকি বদর-উহুদ যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করার সময়ও রাসূলই ছিলেন। রাসূল (স)-এর সবটুকু জীবনই ইসলাম।

জামায়াতে ইসলামী রাসূল (স)-এর জীবন থেকে পূর্ণ ইসলামকে গ্রহণ করেছে। তাঁর জীবনের শুধু ধর্মীয় দিকটুকু গ্রহণ করলে রাসূলকে আংশিক মানা হয়। তাঁকে পূর্ণরূপে মানতে হবে। তিনি নবুওয়াত লাভের পর ১৩ বছর পর্যন্ত এমন একদল লোক তৈরি

করলেন, যারা আল্লাহর আইন অনুযায়ী দেশ গড়ার যোগ্য। এ লোকদেরকে নিয়েই তিনি মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে মানুষের মনগড়া আইন ও সমাজব্যবস্থা উৎখাত করে আল্লাহর আইন অনুযায়ী নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুললেন।

জামায়াতে ইসলামী রাসূল (স)-এর শেখানো পদ্ধতি অনুযায়ীই আল্লাহর দীনকে এ দেশে কায়েম করতে চায়। তাই জামায়াতে ইসলামী শুধু ধর্মীয় বা রাজনৈতিক দল নয়; জামায়াতে ইসলামী এমন একটি ইসলামী দল, যা ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সকল দিকে ইসলামকে কায়েম করতে চায়।

আবদুল খালেক সাহেব একের পর এক প্রশ্ন আমার হাতে দিতে লাগলেন এবং আমি জওয়াব দিতে থাকলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, প্রশ্নোত্তরের সময় শ্রোতারা বক্তৃতার চেয়েও বেশি উৎসাহ প্রদর্শন করছে। আমার ধারণা ছিলো যে, আসরের পর থেকে জনসভায় উপস্থিত লোকেরা মাগরিবের পর হয়তো সবাই থাকবে না। প্রায় ৪০/৪৫ মিনিট আমি প্রশ্নের জওয়াব দিলাম। আরও অনেক প্রশ্ন জমা ছিলো। শ্রোতাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সভা শেষ করা হবে, না প্রশ্নোত্তর আরো চলবে। চিৎকার করে শ্রোতারা বলে উঠলো যে, সব প্রশ্নের জওয়াব শুনবো।

আমার অভিজ্ঞতা এই যে, শ্রোতারা বক্তৃতা শুনবার চেয়েও প্রশ্নোত্তর শুনতে বেশি আগ্রহী। বক্তৃতা দীর্ঘ হলে শ্রোতারা ক্লান্ত হয়ে যায়। প্রশ্নোত্তরের সময় বক্তা ক্লান্ত হয়; কিন্তু শ্রোতারা ক্লান্ত হয় না। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন হয় বলে অনেক বিষয় জানা যায়। তাই প্রশ্নের উত্তর শুনবার আগ্রহ বেড়েই চলে। জামায়াতে ইসলামীর জনসভা ও সুধী-সমাবেশে প্রশ্নোত্তর পর্বটি বড়ই আকর্ষণীয়। সভার সময় শেষ হয়ে যায়, প্রশ্ন শেষ হতে চায় না। এটা জামায়াতে ইসলামীর একটি বৈশিষ্ট্য।

লক্ষ্মীপুরের ঐ জনসভায় অবশিষ্ট প্রশ্নগুলোর জওয়াব আবদুল খালেক সাহেব দিলেন। তাঁর জওয়াবে শ্রোতারা আরও বেশি উৎসাহী হলো। আমি লক্ষ্য করলাম যে, সংক্ষেপে এমন চমৎকার জওয়াব দিচ্ছিলেন, যা প্রশ্নকর্তার মুখ বন্ধ করার জন্য মোক্ষম। তাঁর এ টেকনিক শ্রুতিমধুরও বটে। কিন্তু আমার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। প্রশ্নকর্তা ও শ্রোতাদেরকে প্রশ্নের মূলে জ্ঞানের যে অভাব রয়েছে তা আমি দূর করতে চাই। জ্ঞানের যে অভাবের কারণে মনে প্রশ্নের সৃষ্টি হয় সে কারণটি দূর করার জন্য যে পরিমাণ জ্ঞান দান করা প্রয়োজন এর জন্য চুটকী জওয়াব যথেষ্ট হয় না। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যে টেকনিক তিনি অবলম্বন করতেন তা বেশ জনপ্রিয় ছিলো। তাঁর কৌশলে আমিও মুগ্ধ হতাম। কিন্তু আমার পদ্ধতি বদলাইনি।

আবদুল খালেক সাহেবের সাথে বিতর্ক

জনসভা মুনাজাতের মাধ্যমে শেষ হলো। যেখানে আমরা অবস্থান করছিলাম সেখানে ইশার নামায ও খাওয়া শেষে আমি আমার শার্টের কলার নিয়ে কথা তুললাম। আমি বললাম, শার্টের কলারকে আমি নাজায়েয মনে করি না। কিন্তু এটা যদি দাওয়াতে দীনের কাজে সমস্যা সৃষ্টি করে তাহলে এটাকে ত্যাগ করাই কর্তব্য

মনে করি। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, কলারবিশিষ্ট শার্ট আর বানাবো না।

আবদুল খালেক সাহেব আমার এ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত না হওয়ায় বিতর্ক সৃষ্টি হলো। তাঁর মতে, শরীআতে যা হারাম নয় মানুষের চাপে তা ত্যাগ করা উচিত নয়। জায়েয ও নাজায়েযের ফায়সালা আল্লাহর দেওয়া শরীআতের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। শরীআতে হারাম বলে সাব্যস্ত নয় এমন বিষয়কে কতক লোকের আপত্তির কারণে ত্যাগ করা শরীআতসম্মত নয়। তাঁর এ যুক্তি উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমার যুক্তি হলো, মানুষকে দীনের দাওয়াত দেওয়া হলো আমার সবচেয়ে বড় ফরয কাজ। কলারওয়ালা শার্ট পরার কারণে যদি কোন লোক আমার দাওয়াতকে গ্রহণযোগ্য মনে না করে তাহলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। কলারওয়ালা শার্ট জায়েয হলেও এটা পড়া সওয়াবের কাজ নয়। জায়েয প্রমাণ করাও আমার আসল কাজ নয়। আসল কাজে এটা বাধা হওয়ায় আমি এটা ত্যাগ করা সঠিক মনে করি।

আবদুল খালেক সাহেবের ধূমপানের অভ্যাস ছিলো। গাইবান্ধার দায়িত্ব পালনকালে কর্মীরা আপত্তি তুললেন। কর্মীদের মধ্যে আলেমদের সংখ্যা বেশ ছিলো। তাদের আপত্তির জওয়াবে আবদুল খালেক সাহেব বললেন ঃ 'ধূমপান হারাম' এ ফতোয়া যদি শরীআতের দলীলসহ দেখাতে পারেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেবো। আপনাদের আপত্তির কারণে ধূমপান ত্যাগ করা আমি সঠিক মনে করি না। কেউ ফতোয়া যোগাড় করেননি, তিনিও ধূনপান ত্যাগ করেননি। সফরে তাঁর সাথে এক ঘরে আমি বহু রাত কাটিয়েছি। ধূমপান করার কারণে কিনা জানি না, তিনি ঘুমেও কাশিতে কষ্ট পেতেন। তার কাশির কারণে আমার ঘুম ভেঙে যেতো। আমি বিস্মিত হতাম যে, এতো কাশি সত্ত্বেও তার ঘুম ভাঙতো না। আইয়ূব খানের আমলে '৬৪ সালে জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা করে পূর্ব-পাকিস্তানে জামায়াতের যে ১৫ জন নেতাকে বিনাবিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, তন্মধ্যে আবদুল খালেক সাহেবও ছিলেন। তিনি প্রায় ৭ মাস জেলে থাকাকালে এক সময় ধূমপান ত্যাগ করেন।

জামায়াতের কর্মী সম্মেলন

পরদিন সকাল ৯টায় কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আবদুল খালেক সাহেব জানালেন যে, প্রথমে বিভিন্ন ইউনিটের কাজের রিপোর্ট পেশ হবে। এরপর তিনি রিপোর্টসমূহের পর্যালোচনা করে রিপোর্ট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক বক্তব্য রাখবেন। এরপর কর্মীদের প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হবে। সবশেষে প্রধান অতিথি হিসেবে আমার ভাষণ হবে। তিনি আরো জানালেন যে, সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সম্মেলন চলবে। আমার কাছ থেকে জানতে চাইলেন যে, আমি সম্মেলনের কোন্ পর্যায়ে উপস্থিত হওয়া পছন্দ করবো। এ বিষয়ে যেটুকু ইঙ্গিত পেলাম তাতে বুঝলাম যে, আমার ভাষণের পূর্বে হাজির হলেই চলবে। প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া পছন্দ করলে আরো একটু আগে যেতে হবে। এর পূর্বে সাংগঠনিক কার্যক্রমের সময়টা আমি বিশ্রাম নিতে পারি।

আমি বললাম, ইতঃপূর্বে এ জাতীয় কর্মী সম্মেলনে আমার উপস্থিত হবার সুযোগ হয়নি। তাই আমি শুরু থেকেই হাজির থাকতে চাই। আপনি প্রোগ্রাম পরিচালনা করবেন, আমি স্থানীয় দায়িত্বশীল যারা রিপোর্ট পেশ করবেন তাদের কতটুকু যোগ্যতা তা দেখতে চাই। তাদের নাম ও পরিচয় জানতে চাই। কর্মীদের প্রশ্নের উত্তরতো আপনিই দেবেন। আমার বিশ্রামের কোন প্রয়োজন নেই। আমি কর্মীদের মাঝেই থাকবো।

তিনি শুনে খুশি হলেন। সম্মেলন ঠিক নির্ধারিত সময়েই শুরু হলো। প্রথমে আবদুল খালেক সাহেব দারসে কুরআন পেশ করলেন। আমি তো রংপুরেই তাঁর দারস শুনে অভিভূত হই। এ দারসটিও তৃপ্তির সাথে শুনলাম। জামায়াতের পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমে তিলাওয়াত, এরপর অনুবাদ, এরপর তিলাওয়াতকৃত অংশ নাযিলের পটভূমি (শানে নুযূল), এরপর আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা এবং সবশেষে আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা শুনলাম। বেশ কয়েকজন আলেমকে দারস চলাকালে অত্যন্ত উৎফুল্ল দেখলাম। মনে হলো যে, তারা খুবই পছন্দ করছেন।

এরপর রিপোর্ট পেশ করা শুরু হলো। এক-একজন দায়িত্বশীল লিখিত রিপোর্ট নিয়ে মঞ্চে হাজির হলে আবদুল খালেক সাহেব তাঁর সম্পর্কে কতক তথ্য জেনে নেন। তার নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, জামায়াতে কবে যোগদান করেছেন, বর্তমান সাংগঠনিক কোন্ দায়িত্বে আছেন ইত্যাদি। সম্মেলনের রিপোর্ট পর্ব শুরু হবার পূর্বেই আবদুল খালেক সাহেব বলে দিলেন যে, রিপোর্টে কী কী তথ্য থাকবে, কিভাবে রিপোর্ট তৈরি করতে হবে সে বিষয়ে আগেই দায়িত্বশীলদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, রিপোর্ট ঐ নিয়মেই তৈরি করা হয়েছে।

যথানিয়মে রিপোর্ট পড়ে শুনানো হলো। আমি লক্ষ্য করলাম যে, আবদুল খালেক সাহেব কাগজে কিছু লিখছেন। ৬/৭টি রিপোর্ট পেশ হলো। এতে আধা ঘণ্টা সময় লাগলো।

আবদুল খালেক সাহেব এ সব রিপোর্টের পর্যালোচনা শুরু করলেন। তাঁর নোট করা কাগজটি হাতে নিয়ে রিপোর্টের ত্রুটি-বিচ্যুতি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ধরিয়ে দিলেন এবং রিপোর্টের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও সুফল বুঝিয়ে বললেন। সম্মেলন শুরু করার আগে ফজরের পর থেকে তিনি ব্যক্তিগত রিপোর্টগুলো দেখে যে নোট তৈরি করেছেন এর ভিত্তিতে কর্মীদেরকে রিপোর্ট রাখার পদ্ধতি সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা দিলেন।

আমি আগেই বলেছি যে, এ জাতীয় কর্মী সম্মেলনের কোন অভিজ্ঞতা আমার ছিলো না। আমার মনে হলো যে, সাংগঠনিক টেকনিক্যাল জ্ঞান যা পেলাম তা অমূল্য। এ সব শিক্ষা হাতে-কলমেই শিখতে হয়। বই পড়ে এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়। এক সময় আবদুল খালেক সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম যে, সাংগঠনিক এত খুঁটিনাটি বিষয় তিনি কোথায় শিখলেন। জওয়াবে বললেন যে, চৌধুরী আলী আহমদ খান (পূর্ব-পাক জামায়াতের প্রথম আমীর), উত্তরবঙ্গে জামায়াতের

সংগঠক জনাব আসাদ গিলানী ও ঢাকা শহর জামায়াতের আমীর অধ্যাপক মোহাম্মদ ওযাইর সাহেবদের থেকে বিভিন্ন কর্মী সম্মেলনে এ সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

এরপর কর্মীদের প্রশ্নের জওয়াব দেওয়ার দায়িত্ব পালনের জন্য আবদুল খালেক সাহেবকেই অনুরোধ করলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর কাছ থেকে আমার আরো শিখতে হবে। কর্মী সম্মেলনে আমি প্রধান অতিথির ভাষণ দিলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে, কর্মীদের হেদায়াতের জন্য যা বলা প্রয়োজন সে বিষয়েও তাঁর কাছ থেকে শেখার জন্য পরবর্তী কর্মী সম্মেলনে তাকেই বিদায়ী ভাষণ দিতে বলবো।

যতটুকু মনে পড়ে, ঐ সফরে নোয়াখালী সদর, ফেনী ও কুমিল্লায় একইভাবে জনসভা ও কর্মী সম্মেলন হয়। এ সব জায়গায় জনসভায় প্রশ্নোত্তর ও কর্মী সম্মেলনে প্রায় সবটুকু প্রোগ্রামই তাঁকে দিয়ে করাবার ব্যবস্থা করি। প্রধান অতিথির বক্তব্য অবশ্য সংক্ষেপে আমিই পেশ করি। এ সফরে ৪টি স্থানে যে প্রোগ্রাম হলো, তা থেকে সংগঠন গড়ে তোলা ও পরিচালনার বাস্তব শিক্ষা পেলাম, যা সারা জীবনই কাজে লেগেছে।

আমি তখন প্রাদেশিক সেক্রেটারি আর আবদুল খালেক সাহেব বিভাগীয় আমীর। সাংগঠনিক দিক দিয়ে আমি 'বস' আর তিনি আমার অধীনস্থ পদে আছেন। আমি যদি পদমর্যাদার পরওয়া করে তাঁর কাছ থেকে শিখবার ব্যাপারে সংকোচ বোধ করতাম তাহলে আমার অজ্ঞতা নিয়ে পরে পদে পদে অযোগ্যতার প্রমাণ দিতাম। আমি অনুভব করলাম যে, শেখার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করা মারাত্মক ক্ষতিকর। যা আমার জানা প্রয়োজন তা অধীনস্থ থেকে জানতে লজ্জার কোন কারণ নেই। এ লজ্জা আত্মঘাতী।

আমার জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর দু'বছর জামায়াতের সাহিত্য ব্যাপক অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে জানা ও বুঝার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু জামায়াতের সাংগঠনিক টেকনিক্যাল জ্ঞানার্জনের সৌভাগ্য হলো আবদুল খালেক সাহেবের সাথে সাংগঠনিক সফর উপলক্ষে। আমার মনে হলো, এদ্দিনে জামায়াতকে ঠিক মতো বুঝলাম। আলহামদু লিল্লাহ।

অস্বাভাবিক পদোন্নতি কল্যাণকর নয়

আমি ১৯৫৪ সালের এপ্রিলের ২২ তারিখ জামায়াতে যোগদানের পর ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত রংপুরে সহযোগী সদস্যদের একটা ইউনিটের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করি। রংপুরে এপ্রিলের শেষ দিকে ইউনিট গঠন করা হয়। মে ও জুন এ দু'মাসে প্রতি শুক্রবার ইউনিট বৈঠক পরিচালনার জন্য আবদুল খালেক সাহেব গাইবান্ধা থেকে রংপুর যেতেন। ইউনিট পরিচালনা তাঁর কাছেই শিখেছি। ৭ মাস পর ফেব্রুয়ারির (১৯৫৫) ৬ তারিখে ভাষা আন্দোলনের অপরাধে গ্রেপ্তার

হয়ে জেলে চলে যাই। আগেই বলেছি যে, মার্চের মাঝামাঝি সময়ে জেলে জনাব আসাদ গিলানী দেখা করে জানালেন যে, আমি রুকন হয়ে গেছি। জেলে থাকাকালেই রংপুর কলেজের চাকরি হারাই। ১৯৫৫ সালের এপ্রিলের প্রথম দিকে হাইকোর্টের নির্দেশে আমাকে মুক্তি দেবার পর রংপুরে আর সংগঠনের কাজ করা সম্ভব হয়নি।

মাসখানেক আসাদ গিলানী সাহেব আমাকে নিয়ে রাজশাহী বিভাগের কয়েকটি জেলা ও মহকুমা শহরে সফর করেন। জনসভায় তিনি জামায়াতের দাওয়াতী বক্তব্য উর্দু ভাষায় পেশ করতেন এবং আমি তা অনুবাদ করতাম। এ সব জায়গায় কিছু লোক জামায়াতে যোগদান করতেন এবং প্রাথমিক ইউনিট শুরু হতো। নতুন নতুন সংগঠন কায়েম হওয়ায় জামায়াতের প্রসার হতে লাগলো। কোথাও লক্ষ্মীপুরের মতো কর্মী সম্মেলন করার অবস্থা তখনো সৃষ্টি হয়নি। তাই বেশি কিছু শেখারও সুযোগ পাইনি।

জুনের প্রথম দিকেই প্রাদেশিক আমীর আমাকে ঢাকায় ডেকে পাঠান। জানা গেলো, আমাকে পশ্চিম-পাকিস্তান যেতে হবে। গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে লবি করার টিমের সদস্য আমাকেও করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ইতঃপূর্বে দিয়েছি।

১৯৫৫ সালের নভেম্বরে করাচী থেকে ঢাকা ফিরে এলে আমাকে প্রাদেশিক সহকারী সেক্রেটারির দায়িত্ব দেওয়া হয়। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি (১৯৫৬) পূর্ব-পাকিস্তানে মাওলানা মওদূদীর সফরে সর্বত্র তাঁর উর্দু বক্তৃতার বাংলা অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করলাম। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসেই আমাকে প্রাদেশিক সেক্রেটারি পদে উন্নীত করা হয়। এ বিবরণ থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, আমি কয়েক মাস ইউনিট পরিচালকের দায়িত্ব পালন করা ছাড়া আর কোন সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের সুযোগই পাইনি। স্থানীয় জামায়াত ও জেলা জামায়াতের পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা ছাড়াই অত্যন্ত অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রাদেশিক সেক্রেটারি হয়ে গেলাম। প্রাদেশিক আমীর চৌধুরী আলী আহমদ খান পশ্চিম-পাকিস্তানে চলে যাবার কারণে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন এবং আমি মাওলানার পদে নিয়োগ পেলাম।

এ অস্বাভাবিক পদোন্নতি আমার জন্য মহাবিপদে পরিণত হলো। চট্টগ্রাম বিভাগের আমীর আবদুল খালেক সাহেবের সাথে ৩/৪টি সফর করে সাংগঠনিক অজ্ঞতা থেকে অব্যাহতি পেলাম এবং প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। যেসব বিষয় আগেই জানা দরকার ছিলো তা পদোন্নতির পর জানতে হলো। এটা আমার জন্য অত্যন্ত বিব্রতকর ব্যাপার ছিলো।

সদ্য পাস করা কোন গ্রাজুয়েট বা এমএ পাস মেধাবী লোককেও প্রথমেই হাইস্কুলের হেড মাস্টারের পদে বসিয়ে দিলে অভিজ্ঞতার অভাবেই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

অভিজ্ঞতার কোন বিকল্প নেই। পিএইচডি ডিগ্রিধারী লোককেও হঠাৎ করে স্কুলের হেড মাস্টার বানিয়ে দিলে তার অগাধ বিদ্যা-বুদ্ধি কোন কাজে আসবে না। শিক্ষক হিসেবে কয়েক বছর কাজের সুযোগে যে অভিজ্ঞতা হয়, তারপর সহকারী হেড মাস্টার হলে সে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। এরপর হেড মাস্টার হলে সহজেই সফল হতে পারে। এ কারণেই নামকরা হাইস্কুলে হেড মাস্টারের পদ খালি হলে বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয় যে 'হেড মাস্টার হিসেবে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারাই শুধু দরখাস্ত করতে পারেন।' সরকারি অফিসারদের বেলায়ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পদোন্নতি হতে থাকে। সর্বক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতার এ গুরুত্ব রয়েছে। শুধু আমার বেলায়ই অস্বাভাবিক পদোন্নতি হলো।

৭৯.

সংগঠক মাওলানা মওদূদী

আবদুল খালেক সাহেবের কাছ থেকে চট্টগ্রাম বিভাগের কয়েকটি জেলায় সফর করে সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা হাসিলের সাথে সাথে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে মতবিনিময়ও করতাম। সাংগঠনিক অনেক খুঁটিনাটি বিষয় যে আমি তাঁর কাছ থেকে শিখছি তা অকপটে প্রকাশ করতাম।

তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, জামায়াতে ইসলামীর রোদাদ (সাংগঠনিক কার্য বিবরণী) কয়েক খণ্ড পড়লে সাংগঠনিক অনেক মূল্যবান শিক্ষা সংগ্রহ করা যাবে। ১৯৪১ সালে যখন লাহোরে জামায়াত প্রথম সাংগঠনিক রূপ লাভ করে এর বিবরণ নিয়ে রোদাদ প্রথম খণ্ড রচিত। সারা ভারতবর্ষ থেকে মাত্র ৭৫ জন লোক প্রথম সমবেত হয়ে জামায়াতে ইসলামী নামে সংগঠন শুরু করেন। ঐ প্রতিষ্ঠা সম্মেলনের বিবরণ বিস্তারিতভাবে ঐ খণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনি আমাকে রোদাদ তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত পড়ার পরামর্শ দিলেন। এ সব খণ্ডে জামায়াতের সাংগঠনিক কার্যাবলির বিবরণ রয়েছে। এ থেকে সাংগঠনিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যাবে।

তিনি কর্মী সম্মেলনে সর্বত্র মাওলানা মওদূদী (র)-এর 'ইসলামী আন্দোলন-সাফল্যের শর্তাবলি' বইয়ের উল্লেখ করে ঐ বই থেকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অপরিহার্য ৪টি ব্যক্তিগত গুণ ও ৪টি সাংগঠনিক গুণের কথা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বুঝাতেন।

রোদাদগুলো পড়ে আমি এত মুগ্ধ ও অভিভূত হলাম যে, ইসলামী চিন্তাবিদ মওদূদীর চেয়ে সংগঠক মওদূদীকে আমার নিকট বেশি বড় মনে হলো। চিন্তাবিদ হিসেবে কুরআন, হাদীস, রাসূল (স)-এর জীবন ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে তিনি সে সব থেকে চিন্তার খোরাক নিয়েছেন। তাঁর বিরল মেধা ও মমনশীলতার গুণে এবং আকর্ষণীয় প্রকাশভঙ্গির কারণে শতাব্দীর সেরা ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি বিশ্বে স্বীকৃত।

কিন্তু তিনি সংগঠন সম্পর্কে মৌলিক বিধি ও পদ্ধতি থেকে নিয়ে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়েও যে অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা কুরআন ও হাদীস থেকে সংগ্রহের বিষয় নয়। তাঁর উন্নতমানের বিচক্ষণতা ও উদ্ভাবনী শক্তিরই পরিচয় এতে পাওয়া যায়। এ কারণেই আমি চিন্তাবিদ মওদূদী থেকে সংগঠক মওদূদীকে প্রতিভা হিসেবে বেশি বড় মনে করি।

একই ব্যক্তি একসঙ্গে চিন্তাবিদ ও সংগঠক হওয়া বিরল

বিশ্বের ইতিহাসে যারা সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে চিন্তানায়ক হিসেবে বিখ্যাত হয়েছেন, তাদের মধ্যে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, কার্লমার্কস, মহাকবি আল্লামা ইকবালের উদাহরণ যথেষ্ট। তাঁরা চিন্তার বিরাট খোরাক দিয়েছেন; কিন্তু তাদের কেউ ঐ চিন্তার ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে তুলেননি।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র) ও মাওলানা ইসমাইল শহীদ (র) তাহরীকে মুজাহিদীনের সংগঠন গড়ে তোলেন। কার্লমার্কসের চিন্তাধারার ভিত্তিতে রাশিয়ায় লেলিন ও এঙ্গেলস এবং চীনে মাওসেতুং সাংগঠনিক তৎপরতা চালান। আল্লামা ইকবাল মাওলানা মওদূদীর মাসিক তারজুমানুল কুরআন থেকে মাওলানার চিন্তাধারা জেনে মাওলানাকে হায়দ্রাবাদ রাজ্য থেকে লাহোরে আসার দাওয়াত দিয়ে লিখেন ঃ

"আমার এমন একটা সার্কল লাহোরে আছে, যারা আপনার চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ। আমার সাথে তাদের খুবই মহব্বতের সম্পর্ক। কিন্তু তাদেরকে আমি কোন কাজ দিতে পারিনি। আমি সংগঠক নই। আপনি এখানে চলে আসুন। কিছু রেডিমেড কর্মী পেয়ে যাবেন।"

চিঠি পেয়ে মাওলানা লাহোর এসে আল্লামা ইকবালের সাথে দেখা করলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হায়দ্রাবাদ থেকে কর্মস্থল পরিবর্তন করে লাহোর চলে আসবেন। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে লাহোর এসে স্থির হতে হতেই এপ্রিল মাসে কবি ইকবাল ইন্তিকাল করেন। মাসিক তারজুমানুল কুরআনের এপ্রিল সংখ্যায় মাওলানা পত্রিকার সম্পাদকীয়তে দুঃখ প্রকাশ করে লিখলেন, "যে মুরুব্বীর আহ্বানে আমি লাহোরে এলাম তিনি এভাবে চলে যাওয়ায় আমি তেমনি বেদনাবোধ করছি, আমার পিতার ইন্তিকালে যেমন অনুভব করেছি।"

ইকবালকে কবি হিসেবে জানতাম; কিন্তু তিনি ইসলামী চিন্তাবিদ বলে আমার কোন ধারণা ছিলো না। তাঁর সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামী পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম প্রাদেশিক আমীর চৌধুরী আলী আহমদ খান ও জনাব আসাদ গিলানী থেকে যা জেনেছি তা তাদের ভাষায়ই প্রকাশ করছি ঃ

"আমরা প্রায় প্রতিদিনই বিকালে বা সন্ধ্যায় আল্লামা ইকবালের নিয়মিত বৈঠকে হাজির হতাম। দূর-দূরান্ত থেকেও লোক এ বৈঠকে যোগদান করতে আসতো। তাঁর কবিতার ভক্তরাই এসে বিভিন্ন প্রশ্ন করতো। ইসলামের যে প্রেরণা কবিতায়

ছিলো, এরই ভিত্তিতে ইসলাম সম্পর্কেও অনেক প্রশ্ন করা হতো। আল্লামা এমং আকর্ষণীয় জওয়াব দিতেন, যা সবাইকে অনুপ্রাণিত করতো। এভাবে আল্লামার সান্নিধ্যে আমাদের মতো বেশ কিছু লোক চিন্তা-চেতনায় ইসলামী জযবা অনুভব করতাম। আল্লামার কবিতা আমরা আবৃত্তি করে কবিকে শুনাতাম এবং কোন কোন কথার ব্যাখ্যা চাইতাম। এভাবে কবির দরবারটি এক ইসলামী জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে পরিণত হয়। কখনো কখনো কবি হঠাৎ করে উপস্থিত রচিত কবিতা শুনিয়ে সবাইকে চমৎকৃত করে দিতেন।

মাওলানা মওদূদীর সম্পাদিত মাসিক তরজুমানুল কুরআনের সৌজন্য কপি আল্লামার কাছে পৌঁছতো। শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাওয়ায় নিজে পড়তে পারতেন না বলে বৈঠকে তাঁকে পড়ে শুনাতে বলতেন। আমরাও ম্যাঝে মাঝে পড়ে শুনিয়েছি। মাওলানার লেখা পড়ে শুনবার সময় কবি মাঝে মাঝে প্রশংসা করে মন্তব্য করতেন। একটা মন্তব্য প্রায়ই শুনা যেতো, "মালুম হোতা হ্যায় কে, ইয়ে মৌলভী কুছ কারকে দেখায়েগা।" অর্থাৎ মনে হয় এ মৌলভী কিছু করে দেখাবে।

"আমরা আল্লামা ইকবালেরই প্রিয় ও স্নেহের শাগরেদ ছিলাম। আমরা কোন সংগঠন বুঝতামও না, করতামও না। মাওলানা মওদূদী থেকে সংগঠনের ডাক পেয়ে বিনা দ্বিধায় জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হয়েছি। আমাদের মতো ইকবালের আরও বেশ কতক শাগরেদ জামায়াতে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে যোগদান করেছে। তাই পাকিস্তানের পাঞ্জাবেই জামায়াতের সংগঠন অন্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশি সম্প্রসারিত।"

মাওলানা মওদূদী এক বিরল ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংগঠক। এ উভয় প্রতিভার অধিকারী হওয়ার কারণে ইসলামের দৃষ্টিতে একটি এমন নিখুঁত সংগঠন তিনি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, যা অতুলনীয়। সাংগঠনিক শৃঙ্খলা, নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব, নিষ্ঠাবান কর্মী গড়ার এ কারখানাটির বয়স বর্তমানে (২০০২) বাষট্টি বছর। হিমালয়ান উপমহাদেশের কয়েকটি দেশে একই পদ্ধতিতে সংগঠন চালু আছে।

এ সংগঠনে নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। সর্বস্তরে নির্বাচনের মাধ্যমেই নেতৃত্ব নির্ধারিত হয়। নির্বাচনে প্রার্থীতার কুপ্রথা নেই বলে নেতৃত্বের কোন্দলের কোন সুযোগ নেই। কেউ নেতা নির্বাচিত হতে চায় বলে প্রমাণ হলে তার সদস্যপদই বাতিল হয়ে যায়। ভোটারদের নিকট কারো পক্ষে ক্যানভাস করার দোষে দোষী সাব্যস্ত হলে সাংগঠনিক কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। সংগঠনে কেউ কোন গ্রুপ সৃষ্টির চেষ্টা করলে তার সদস্যপদই বাতিল হয়ে যাবে। এ পর্যন্ত সংগঠনকে দ্বিধা-বিভক্ত করার চেষ্টা যে কয়জন করেছেন, তারা সংগঠনের শতকরা দশমিক একজনের সমর্থনও যোগাড় করতে পারেননি; বরং তারা প্রত্যেকেই কনডেমন্‌ড হয়েছেন। তারা কেউ বিকল্প কিছু দাঁড় করতে পারেননি।

এমন একটি নিখুঁত সংগঠন গড়ে তুলবার কৃতিত্ব যার তিনিই মাওলানা মুওদূদী। সংগঠন পরিচালনার ৫৫ বছরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি জোর গলায় বলতে পারি ঃ

মাওলানা মওদূদী সংগঠন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত যেসব বিধান রেখে গেছেন তা যথাযথ প্রয়োগ করা হলে কোন রকম সাংগঠনিক সমস্যা সৃষ্টিই হতে পারে না। যত জায়গায় কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এর পর্যালোচনা করে এটাই দেখা গেছে যে, ঐ সব বিধির কোন না কোন একটা বা একাধিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে।

সংগঠন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিধি-বিধান পুস্তকাকারে থাকার কারণে যারাই জামায়াতে যোগদান করেন, তারা এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারেন। এর ফলে রাজনৈতিক স্বার্থ-চিন্তা বা ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার আশা নিয়ে কেউ জামায়াতে আসতে পারে না। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্যের লক্ষ্যে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে নিজকে গড়ে তুলবার নিয়তেই মানুষ জামায়াতে সক্রিয় হয়।

সংগঠনের গুরুত্ব

নবীগণের দাওয়াত যারা কবুল করতেন, তাঁদেরকে নবীগণ সংগঠিত করতেন। সূরা শুআরায় বিভিন্ন নবীর নাম নিয়ে একই ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা সংগঠনে আসার দাওয়াত কিভাবে দিয়েছেন। ঐ ভাষা হলো 'ফাত্তাকুল্লাহা ওয়া আতীউন'। অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও, আমাকে মেনে চল, আমার সংগঠনভুক্ত হও।

আল্লাহ তাআলা কোন অযোগ্য লোককে নবী নিযুক্ত করেননি; কিন্তু শত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন করার যে বিরাট দায়িত্ব তাঁদের উপর দেওয়া হয়েছে তা একা পালন করা সম্ভব নয়। সমাজ বিপ্লবের জন্য সামাজিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই সকল নবীই সংগঠনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

কুরআন, হাদীস ও রাসূল (স)-এর ইসলামী আন্দোলন থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে জামায়াতবদ্ধ হওয়া ফরয। রাসূল (স) সংগঠনের উপর এতো গুরুত্ব দিয়েছেন যে, সফরে গেলেও একজনকে আমীর হিসেবে মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। জামায়াতবিহীন অবস্থায় মৃত্যুকে জাহেলিয়াতের মৃত্যু পর্যন্ত বলেছেন। পাঁচ ওয়াক্তের নামায জামায়াতে পড়ার উপর অত্যন্ত জোর দিয়েছেন।

সংগঠনভুক্ত অল্প লোকও শক্তিশালী। বহু লোকও অসংগঠিত অবস্থায় দুর্বল। অল্প কয়েকজন সন্ত্রাসী সংগঠিত হয়ে বিরাট মহল্লার হাজার হাজার লোককে জিম্মি করে রাখতে পারে। হাট-বাজারে হাজার হাজার লোকের উপর দশজন লাঠিধারী লোক সংঘবদ্ধ হয়ে হামলা করলে সবাই জান নিয়ে পালাবে।

চোর, ডাকাত, পকেটমার ও ছিনতাইকারীরা সংগঠিত বলেই তাদের পেশা অবাধে চলছে। দুষ্ট লোকরা সংগঠিত হয়ে সমাজের নেতৃত্ব পর্যন্ত দখল করতে সক্ষম হচ্ছে।

সংগঠনের অভাবেই ইসলাম শক্তিহীন

বাংলাদেশে ইসলামের বিরাট শক্তি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। আড়াই লাখ মসজিদের ইমাম, মুয়ায্যিন ও মুসল্লীগণ, হাজার হাজার মাদরাসার লক্ষ লক্ষ শিক্ষক ও ছাত্র, শত শত পীর ও তাদের লক্ষ লক্ষ মুরীদ, বিরাট সংখ্যক ওয়ায়েয ও তাদের লক্ষ লক্ষ শ্রোতা, তাবলীগ জামায়াতের মুবাল্লিগগণ এবং টঙ্গী ইজতিমায় উপস্থিত লক্ষ লক্ষ মুসলমান মিলে এ দেশে ইসলামের বিশাল শক্তি রয়েছে। কিন্তু তারা সংগঠিত নয় বলে ইসলাম শক্তিহীন হয়ে আছে।

এ সব শক্তি বিভিন্নভাবে ইসলামের খেদমতই করে যাচ্ছে। এ খেদমতগুলো না থাকলে ইসলামের নামও থাকতো না। দীনের এ বিরাট সংখ্যক খাদিমগণ যদি ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হন তাহলে এ দেশে বেদীনদের রাজত্ব টিকতে পারে না। মানুষের মনগড়া আইনে দেশ চলছে এবং তারাই দেশ চালাচ্ছে, যারা আল্লাহর আইনের ধারই ধারে না। আল্লাহর আইন কায়েম করার চেষ্টা করা যে সব ফরযের বড় ফরয, সে চেতনাটুকুও সকল খাদেমে দীনের মধ্যে নেই। তারা দীনের যে যেটুকু খেদমত করছেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট। অথচ আল্লাহ তাআলা আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়েই রাসূল (স)-কে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর দীনই একমাত্র হক দীন। আর সব মত-পথ-আইন ও বিধি-বিধান বাতিল। বাতিল শক্তির অধীনে থেকে দীনের কিছু খেদমত করলেই চলবে এমন শিক্ষা রাসূল (স) দেননি। যারাই রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান এনেছেন, তাদের সবাইকে ইকামাতে দীনের সংগ্রামে রাসূল (স)-এর সাথী হতে হয়েছে। যারা নামায-রোযা করা সত্ত্বেও জিহাদের ময়দানে রাসূল (স)-এর সাথী হতে রাজি হয়নি, তাদেরকে কুরআনে মুনাফিক ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূল (স)-এর যুগে তাঁর আসল দায়িত্বে শরীক না হলে সত্যিকার মুমিন বলে গণ্য করা হতো না।

বাংলাদেশে জনগণের শতকরা অন্তত ৮৫ জন মুসলমান। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, রাসূল (স)-কে মহব্বত করে এবং কুরআনকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। মুসলিম হিসেবে তাদেরকে গড়ে তুলবার দায়িত্ব ছিলো সরকারের। তাদের চরিত্র উন্নত মানে গড়ার ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও ইসলামের খাদিমদের প্রচেষ্টায় তাদের মধ্যে মুসলিম চেতনা এখনো বহাল আছে। দীনের খাদিমগণ যদি আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়ে জনগণকে ডাক দেন, তাহলে দেশে বিরাট গণজোয়ার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

গত আশির দশকে বেশকিছু সংখ্যক আলেম ও পীর 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ' নামে একটি প্লাটফরমে সমবেত হওয়ায় মুসলিম জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে

গেলো। জেলাভিত্তিক সম্মেলনগুলোর জন্য জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করেছে। মানুষ ইসলামী ঐক্যের জন্য পাগল। ইসলামী নেতাদের মধ্যে ঐক্য দেখলে তারা যে কতোটা উজ্জীবিত হয়, তা 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ'র সম্মেলনগুলোতে টের পাওয়া গেছে।

সংগঠনই শক্তি। রাসূল (স) বলেছেন, 'ইয়াদুল্লাহি আ'লাল জামায়াত'। জামায়াতবদ্ধ শক্তির সাথেই আল্লাহ্ আছেন। অথচ মুসলিম জাতি বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় শক্তিহীন হয়ে বাতিলের প্রাধান্য মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছে।

সমাজের অসৎ লোকগুলো সংগঠিত হয়ে জনগণের উপর দাপটের সাথে কর্তৃত্ব করছে। সমাজে সৎলোক নেই এমন নয়। কিন্তু তারা অনেকেই সংগঠিত হওয়ার গুরুত্ব অনুভব করেন না। তারা নিরিবিলি সততাটুকু নিয়ে নিঃসঙ্গ থেকেই সন্তুষ্ট। এ কথা তাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে যে, সংগঠিত না হলে ব্যক্তিগত সততা নিয়ে আত্মরক্ষাও করতে পারবেন না।

সৎ লোকেরা সংগঠিত হলে তাদের মধ্যে যোগ্যতাও বৃদ্ধি পাবে। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সততাটুকুও কাজে লাগানো যায় না। সততা ও যোগ্যতার সমন্বয় না হলে অসৎ, অযোগ্য লোকদের নেতৃত্বের অবসান ঘটানো যাবে না। যোগ্য লোক যদি অসৎ হয় তাহলে সে যোগ্যতার সাথে অসততার কাজই করে। তাদেরকে প্রতিহত করতে হলে সৎ লোকদেরকে মযবুত সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারী হলেও তা সমাজে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না। আল্লামা ইকবাল চমৎকার একটা উদাহরণ দিয়ে এ কথাটি বুঝিয়েছেন। তিনি এক কবিতায় বলেন,

সমুদ্রে থাকা অবস্থায় প্রতিটি ঢেউ বিরাট শক্তির অধিকারী। কিন্তু কোন ঢেউ-এর জলরাশি যদি সমুদ্র থেকে আলাদা হয়ে যায়, তাহলে তা একটি স্থবির জলাশয়ে পরিণত হতে বাধ্য।

মাওলানা আজাদ ও সংগঠন

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রথম সারির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবুল কালাম আজাদের লেখা পড়ে আমার ধারণা হলো যে, ইসলামী আন্দোলনের চিন্তাধারা তাঁর মধ্যে ছিলো। তাই আমি মাওলানা মওদূদীর কাছে তার সম্পর্কে জানতে চাইলাম। মাওলানা উচ্চকণ্ঠে বললেন,

"তিনিই তো ঐ ব্যক্তি, যিনি গোটা ভারতে প্রথম ইসলামী আন্দোলনের আযান দিলেন।"

আমি প্রশ্ন করলাম ঃ তাহলে এরপর তাঁর কি হলো? জওয়াবে বললেন ঃ আযান দিয়ে নিজেই ঘুমিয়ে পড়লেন। জানতে চাইলাম ঃ এমনটা কেমন করে হলো? এর জওয়াবে মাওলানা অনেক কথা বললেন। মাওলানা আজাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

করে বললেন, মাওলানার সম্পাদিত মাসিক 'আল বালাগ' ও 'আল হিলাল' পত্রিকায় ইংরেজ রাজত্ব উৎখাত করে ইসলামী হুকুমাত কায়েমের জন্য অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় পাঠকদেরকে আহ্বান জানানো হতো। কিন্তু তিনি কোন সংগঠন গড়ে তুলবার উদ্যোগ নেননি। কেউ সাংগঠনিভাবে কোন আন্দোলন শুরু না করলে শত উদ্দীপনাময় আহ্বানও ময়দানে হারিয়ে যায়।

একটা বিশেষ ঘটনা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তিনি কয়েক বছর জেলে আবদ্ধ থাকাকালে 'তারজুমানুল কুরআন' নামে কুরআনের তাফসীর লিখেন। কারাগার থেকে মুক্তির সময় তাঁর দীর্ঘ সাধনার ফসল তাফসীরের পাণ্ডুলিপি ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। এ ঘটনা তাঁর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, ইংরেজ রাজত্ব খতম করা ছাড়া আর কোন কিছুতেই তিনি মনোযোগ দেবেন না। দৃঢ়প্রত্যয়ী এ মানুষটি ইংরেজদেরকে তাড়াবার জন্য মি. গান্ধী ও মি. নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে মনে-প্রাণে লেগে গেলেন। তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও একনিষ্ঠতার ফলে একসময়ে তিনি নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রেসিডেন্ট হন।

আফসোসের বিষয় যে, তাঁর মতো একজন বলিষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ আবেগ-তাড়িত হয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনেই হারিয়ে গেলেন।

এ সব মূল্যবান তথ্য জানার পর আমার অন্তরে মাওলানা আজাদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সহানুভূতিরও সৃষ্টি হলো। তিনি যদি সংগঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন, তাহলে তাঁর ইতিহাস হয়তো ভিন্ন হতো। তাঁর জীবনেও এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, সব চিন্তাবিদই সংগঠক হন না।

৮০.

জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার মতপার্থক্য

১৯৫৬ সালে প্রণীত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়। ১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনায় দেখা গেলো যে, বেশ কয়েকজন সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত নয় বলে মনে করেন। অধিকাংশ সদস্যই নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে গণপরিষদে আদর্শ প্রস্তাব পাস পওয়ার পর পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক শর্ত পূরণ করলো। এ রাষ্ট্রটির জন্য একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা করার দাবি জানানো ও ইসলামী সরকার কায়েমের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো জামায়াতের কর্তব্য বলে ১৯৫১ সালে করাচীতে

অনুষ্ঠিত জামায়াতের বার্ষিক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ সম্মেলনেই জামায়াতের স্থায়ী ৪ দফা কর্মসূচি পাস হয়, যার চতুর্থ দফাই হলো নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে সৎ নেতৃত্ব কায়েম করা।

যারা নির্বাচনবিরোধী ছিলেন তাদের বক্তব্য, "জামায়াতের নিকট নির্বাচনে প্রার্থী করার যোগ্য লোকের অভাব। জামায়াতের জনশক্তিকে আদর্শিক ও নৈতিক দিক দিয়ে আরও উন্নতমানে গড়ে তুলবার পর নির্বাচনে অংশ নেওয়া উচিত। তাই আগামী নির্বাচনী জামায়াতের নির্বাচন বর্জন করাই প্রয়োজন। জামায়াতের লোকদেরকে নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে গড়ে তুলবার জন্য আরও সময় দরকার।"

যারা নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন তাদের বক্তব্য, জামায়াত '৫১ সালে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে রাজনৈতিক দল হিসেবে ময়দানে পরিচিত হবার পর নির্বাচন বর্জন করলে রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য থাকবে না। নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই নির্বাচনী যোগ্যতা অর্জন করা যাবে। জামায়াত জনগণকে সৎ নেতৃত্ব কায়েমের আহ্বান জানায়। তাই সৎ লোকদেরকে নির্বাচনে জনগণের সামনে পেশ করা জামায়াতেরই দায়িত্ব। যোগ্য সাঁতারু হতে হলে পানিতে নেমে নাকানি-চুবানি খেয়েই তা সম্ভব। শুকনায় থেকে সাঁতারের যোগ্য হবার উপায় নেই। তেমনি নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ ময়দানের যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

মাওলানা মওদূদী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া মোটেই নিরাপদ মনে করতেন না। রাসূল (স) নিশ্চয়তা দান করেছেন যে, আমার উম্মত কোন ভুল সিদ্ধান্তে একমত হবে না। অর্থাৎ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলে সঠিক বলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় তিনভাগের দু'ভাগ সদস্য নির্বাচনের পক্ষে থাকা সত্ত্বেও তিনি সংখ্যার ভিত্তিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন না। আমার মনে পড়ে, একবার ৫০ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় শূরায় একজন মাত্র সদস্য ভিন্নমত পোষণ করায় তাকে কনভিন্স করার জন্য দু'ঘণ্টা সময় ব্যয় করা প্রয়োজন মনে করলেন।

নির্বাচনী ইস্যুতে শূরার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্য ভিন্ন মত পোষণ করাকে মাওলানা বিরাট সমস্যা মনে করলেন। যেহেতু শূরা সদস্যগণ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, সেহেতু বিষয়টি মীমাংসা জামায়াতের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সর্বোচ্চ বডিতেই হওয়া জরুরি মনে করলেন। রুকন সম্মেলন হলো সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তকারী সংস্থা। রুকন সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত হয় এর বিরুদ্ধে কোন মত কারো থাকলেও তা প্রচার করার অনুমতি থাকে না।

নির্বাচনী ইস্যুর গুরুত্ব অনুভব করেই মাওলানা এ সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে নির্বাচনী ময়দানে জামায়াতের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন বিতর্কের সুযোগ না থাকে। মজলিসে শূরাতে রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেবার পর মাওলানা উন্নত গণতান্ত্রিক

মূল্যবোধের আদর্শ স্থাপন করেন। তিনি মজলিসে শূরা বাতিল ঘোষণা করেন, যাতে রুকন সম্মেলনের সিদ্ধান্তের পর নতুনভাবে মজলিসে শূরার নির্বাচন হতে পারে। তিনি করাচী শাখার আমীর চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদকে ভারপ্রাপ্ত আমীর নিয়োগ করে আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। রুকন সম্মেলনে তিনি আমীরে জামায়াতের পদমর্যাদা নিয়ে বক্তব্য রাখতে চান না। যারা ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাদের পক্ষে থেকে যে বক্তব্য রাখা হবে, তা খণ্ডন করে তিনি একজন সাধারণ রুকন হিসেবেই বক্তব্য রাখতে চান।

মাছিগোট রুকন সম্মেলন

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাঞ্জাব প্রদেশের বাহাওয়ালপুর বিভাগের মাছিগোট নামক স্থানে জামায়াতের ঐ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাবী ভাষায় গোট মানে গ্রাম। বাংলাদেশের কোন শব্দের শেষে 'পুর' শব্দ ব্যবহার করে যেমন বহু স্থানের নাম রয়েছে, পাঞ্জাবে তেমনি গোট শব্দ ব্যবহার করা হয়। চাঁদপুর, ফরিদপুর, নামের মতোই মাছিগোট নাম।

ঐ সম্মেলনে মোট ৯৩৫ জন রুকন উপস্থিত হন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে মাত্র ১৪ জন্য হাজির হন। সম্মেলন তিনদিন স্থায়ী হয়। প্রত্যেক দিন দু'টো করে অধিবেশন হয়। যোহরের নামাযের পূর্বে প্রথম ও আসরের পর দ্বিতীয় অধিবেশন বসে।

যেহেতু ১৯৫১ সালের করাচী সম্মেলনে গৃহীত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মজলিসে শূরার কতক সদস্য নির্বাচন না করার প্রস্তাবনা রুকনদের সামনে পেশ করতে চান, সেহেতু সম্মেলনের প্রথমদিনেই তাদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়।

সম্মেলনে একটি ছোট স্টেজ করা হয়। স্টেজে শুধু ভারপ্রাপ্ত আমীর চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ সভাপতির আসনে বসেন। স্টেজের নিচে ফরাশে বাতিলকৃত মজলিসে শূরার সদস্যগণ সম্মেলনে উপস্থিত রুকনদের দিকে মুখ করে বসেন। মাওলানা মওদূদী তাদের সাথেই বসলেন। আমি তাঁর সবচেয়ে নিকটে বসার সুযোগ নিই। আমার বামপাশে মাওলানা মওদূদী ও ডানপাশে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী। বড় আলেম ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে মাওলানা মওদূদীর পরই ইসলাহী সাহেবের মর্যাদা ছিলো।

স্টেজে বক্তার জন্য একটা স্ট্যান্ড রাখা ছিলো। সম্মেলনের সভাপতি ঘোষণা করলেন যে, নির্বাচনে অংশ গ্রহণের বিপক্ষে যিনি বক্তব্য রাখবেন তিনি যতোটা সময় নেবেন, অপর পক্ষকে বক্তব্য রাখার জন্য সমান সময়ই দেওয়া হবে। প্রথম পক্ষে যিনি বক্তব্য রাখবেন, তাকে স্টেজে উঠার জন্য আহ্বান জানানো হলো। আমরা সবাই বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, যিনি স্টেজে আরোহণ করলেন তিনি মজলিসে শূরার সদস্যদের মধ্যে কেউ নন। তিনি করাচীর একজন বিশিষ্ট রুকন ডা. আসরার আহমদ। ছাত্র জীবনে তিনি ইসলামী জমিয়তে তালাবার সভাপতি থাকায়

রুকনদের নিকট তিনি সুপরিচিত। এতে বুঝা গেলো যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার আসল চিন্তানায়ক তিনি। তাঁর চিন্তাধারায় কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার কিছুসংখ্যক সদস্য প্রভাবিত হয়েছেন এবং তারই নেতৃত্বে তারা ঐ মতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। অবশ্য শূরা সদস্যদের যারা ঐ মতের সমর্থক তারা সম্মেলনের সভাপতিকে আগেই জানিয়েছিলেন যে, তাদের পক্ষ থেকে ডা. আসরার আহমদ বক্তব্য রাখবেন। বক্তৃতা শুরু করার পূর্বে সভাপতি এ কথা জানান।

ডা. আসরার আহমদ একাই দু'বৈঠকে মোট ৬ ঘণ্টা বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতায় মাওলানার বহু পুস্তক থেকে বিস্তর উদ্ধৃতি দেন। পাকিস্তান কায়েমের পূর্বের লেখা মাওলানার বই থেকেও যথেষ্ট উদ্ধৃতি দিলেন। তাঁর বক্তৃতার সময় মাওলানা মওদূদীর চেহারার দিকে আমি বারবার তাকিয়ে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার চেষ্টা করলাম। তিনি ধীরে ধীরে পান মুখে দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে জর্দা মুখে তুলছেন, কখনো কখনো স্টেজের দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর চেহারায় ৬ ঘণ্টার মধ্যে সামান্য ভাবান্তরও লক্ষ্য করিনি।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন

দ্বিতীয় দিন যথাসময়ে সকালের বৈঠক বসলো। সভাপতি আসন গ্রহণের পর মাওলানা ইসলাহী কিছু বলার আগ্রহ প্রকাশ করলে সভাপতি সুযোগ দিলেন। তিনি মাওলানার পদত্যাগের কথা উল্লেখ করে আবেগ প্রকাশ করে বললেন,

"মাওলানা মওদূদীর ডাকে সাড়া দিয়েই আমরা জামায়াতে ইসলামীতে শরীক হয়েছি। মাওলানাকে বলতে চাই যে, আপনি আমাদেরকে ছেড়ে কোথায় যাবেন? আমরা আপনার জামা ধরে আটকে রাখবো।"

এ কথায় সাড়া দিয়ে রুকনগণ সমর্থনসূচক আওয়াজ দিলেন। আমি ইসলাহী সাহেবের বক্তব্যকে নিছক আবেগই মনে করেছি। কারণ আমি জানি যে, মাওলানার পদত্যাগের উদ্দেশ্য কী।

মাওলানা ইসলাহীর বক্তব্যের পর মাওলানা মওদূদী মঞ্চে উঠলেন। প্রথমেই তিনি একটু কৌতুক করে হালকাভাবে মন্তব্য করলেন, আমার লেখা বিভিন্ন বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, আমার আগের লেখার কথা ভুলে গেছি এবং বর্তমানে ঐ সব লেখার বিরোধী ভূমিকা পালন করছি। আমার লেখা থেকেই আমাকে নসীহত করা হয়েছে। আমার লেখা গবেষণা করার সময় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। একটি আন্দোলন অগ্রগতির ধারায় বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেই অগ্রসর হয়। তাই প্রাথমিক স্তরের পরিবেশে যা করতে হয়, পরবর্তী পরিবেশে করণীয়ও পরিবর্তন করতে হয়। ব্রিটিশদের গোলামি যুগের আইনসভার নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিরুদ্ধে আমার লেখাকে পাকিস্তানের আইনসভার নির্বাচনে প্রয়োগ করা হাস্যকর।

যা হোক, মাওলানা তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন। তিনিও দু'বেলায় ঠিক ৬ ঘণ্টায় তার বক্তব্য সমাপ্ত করলেন। তাঁর সে ঐতিহাসিক বক্তৃতা 'জামায়াতে ইসলামীর ভবিষ্যৎ কর্মসূচি' শিরোনামে পুস্তকাকারে মওজুদ রয়েছে।

মাওলানার বক্তৃতা শেষ হলে সভাপতি ঘোষণা দিলেন যে, নির্বাচনী ইস্যুর উভয় দিক সম্পর্কে এ দু'দিনে আপনারা বিস্তারিত আলোচনা শুনলেন। আপনারা ধীরচিত্তে ও ঠাণ্ডা মাথায় উভয় বক্তৃতার মূল্যায়ন করুন। আপনাদেরকে সুবিবেচনার সাথে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সময় দেওয়া হলো। আগামীকাল সকালের বৈঠক আপনাদের রায় চাওয়া হবে। আজই বক্তৃতা শেষ হলো। আপনাদেরকে বিচার-বিবেচনার জন্য সময় না দিয়ে আজই রায় নেওয়া সঠিক মনে করি না। আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু হয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন এবং আগামীকাল রায় দিন।

সম্মেলনের তৃতীয় দিন

সম্মেলনের শেষ দিন সকালের বৈঠক যথাসময়ে শুরু হলো। সভাপতি চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ রুকনগণকে সম্বোধন করে বললেন, আল্লাহর মেহেরবানীতে জামায়াতে ইসলামীর ঐতিহ্য অনুযায়ী কোন বিষয়ে মতপার্থক্য হওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সবাই শান্তভাবে রায় দেন। কোনরকম উত্তাপ-উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না। অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত যা হয়, তা জামায়াতের সবার সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য হয়। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, নির্বাচনের মতো একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দু'রকম মতামত সবার সামনে আসার পর রুকনদের মধ্যে এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়নি। প্রত্যেকেই নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক অনুযায়ী মতামত স্থির করেছেন বলে আশা করা যায়।

এটুকু ভূমিকার পর সভাপতি ঘোষণা করলেন যে, যারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণের বিপক্ষে রায় দিতে চান তারা হাত তুলুন। দেখা গেলো যে, যারা হাত তুলেছেন তারা সবাই মঞ্চের কাছাকাছি আছে। হাতগুলো সভাপতি গুনে ঘোষণা করলেন যে, সর্বমোট ১৮ জন রুকন নির্বাচনের বিপক্ষে রায় দিলেন। এতে বুঝা গেলো যে, বাকি সবাই নির্বাচনের পক্ষে রয়েছেন। তাই তাদের হাত তোলার প্রয়োজন নেই। এ সম্মেলনে উপস্থিত ৯৩৫ জন রুকনের মধ্যে ৯১৭ জন নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে রায় দেওয়ায় এটাই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হলো।

আমি অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে লক্ষ্য করলাম যে, সম্মেলনে উপস্থিত রুকনগণ সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর এক বাক্যে আলহামদুলিল্লাহ বলা ছাড়া এমন কোন শ্লোগান দিলেন না, যা অপর পক্ষকে মনঃক্ষুণ্ন করতে পারে। কেউ কোন উল্লাসও প্রকাশ করলেন না। কোন রাজনৈতিক দলে কি এমন দৃষ্টান্ত কোথাও দেখা যায়?

পুনরায় আমীরে জামায়াতের দায়িত্বে মাওলানা

সম্মেলনের সভাপতি রুকনগণের মতামত গ্রহণ ও ফলাফল ঘোষণার পর সম্মেলনে উপস্থিত সবার পক্ষ থেকে মাওলানা মওদূদীকে অনুরোধ করেন, যেনো তিনি

জামায়াতের নির্বাচিত আমীর হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ করেন। তিনি যে কারণে পদত্যাগ করেছিলেন, এ সম্মেলনের সিদ্ধান্তের পর তার অবসান ঘটেছে। তাই পদত্যাগ প্রত্যাহার করে আমীরে জামায়াতের মর্যাদা নিয়ে সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে পরবর্তী হেদায়াত দান করুন। রুকনগণ সাথে সাথে সমর্থনসূচক আওয়াজ দিলেন। করাচীর আমীর চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছিলেন। তিনি স্টেজ থেকে অবতরণ করেন এবং মাওলানা মওদূদী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ করার পর তিনি সংক্ষিপ্ত যে ভাষণ দেন, তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিলো। প্রথমেই তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিলো, সে সম্পর্কে রুকন সম্মেলনে আমীরে জামায়াতের মর্যাদা নিয়ে আমার সভাপতিত্ব করা এবং এক পক্ষের বক্তব্য পেশ করা ইনসাফের দৃষ্টিতে মোটেই সমীচীন হতো না। তাই সম্মেলনে বিষয়টির মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আমার আমীরে জামায়াতের পদে থাকা সঠিক মনে করিনি।

এরপর বললেন,

আজ থেকে পনের বছর আগে মাত্র ৭৫ জন লোক নিয়ে যখন জামায়াত কায়েম হয়, তখন আমি জামায়াতকে শক্তিশালী অনুভব করেছিলাম। দু'দিন আগে যখন এ শামিয়ানার নিচে আমরা প্রায় এক হাজার লোক সমবেত হই, তখন আমি তেমন শক্তিশালী বোধ করিনি। কারণ চিন্তা ও মতামতের ঐক্যই জামায়াতের আসল শক্তি। সংখ্যায় বিরাট হলেও ঐক্যের অভাব হলে জামায়াত দুর্বল হতে বাধ্য। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এ সম্মেলনের মাধ্যমে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছি।

যারা ভিন্ন মত পোষণ করেছেন, তাদের মতামতের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকতে পারে। কিন্তু তারা এ জামায়াতের রুকন হিসেবে খোলামনে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন বলে আশা করি।

এরপর তিনি আগামী জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে জামায়াত যাতে ভালো ফল করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে সবাইকে দাওয়াতী কার্যক্রম ও সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশ দেন।

সর্বশেষে ঘোষণা করেন যে, শিগগিরই কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ। নবনির্বাচিত শূরা এ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জামায়াতকে পরিচালিত করবে।

সম্মেলনের পর

আমার ধারণা ছিলো যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে ডা. আসরার আহমদ অত্যন্ত বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখার পর তার পক্ষে মত পরিবর্তন করা অসম্ভব। তাই তিনি হয়তো জামায়াত থেকে বের হয়ে যাবেন। বাকি ১৭ জন কী সিদ্ধান্ত নেবেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোন ধারণা আমার ছিলো না। কয়েকদিন পরই পত্রিকায় খবর বের

হলো যে, মাছিগোট সম্মেলনে যে ১৮ জন রুকন ভিন্ন মত পোষণ করেন তারা সবাই জামায়াতের রুকন পদ থেকে ইস্তিফা দিয়েছেন। সম্মেলনে ৯৮% জন রুকন যে রায় দিলেন তা মেনে নিতে তারা ব্যর্থ হলেন। জামায়াতের আদর্শ ও উদ্দেশ্যে একমত হয়েই তারা রুকন হয়েছিলেন। কোন ইস্যুতে ভিন্ন মত পোষণ করলেই জামায়াত ত্যাগ করতে হবে কেন? যদি পৃথক জামায়াত কায়েম করেন তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।

দু'তিন মাস পরের ঘটনা

সম্মেলনের ২/৩ মাস পর জামায়াতের নবনির্বাচিত মজলিসে শূরার অধিবেশনে যোগদানের জন্য লাহোর গেলাম। ঢাকায় থাকতেই পত্রিকায় খবর দেখলাম যে, মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী জামায়াত থেকে ইস্তিফা দিয়েছেন। আমি অত্যন্ত পেরেশানী বোধ করলাম। মাওলানা মওদূদীর পরই জামায়াতে যাকে আমি যোগ্যতম নেতা মনে করতাম তিনিও চলে গেলেন বলে দুঃখবোধ করাই স্বাভাবিক ছিলো। রুকন সম্মেলনে আমি তাঁর পাশেই বসা ছিলাম। তিনি ঐ ১৮ জনের মধ্যে ছিলেন না। তিনি কেন জামায়াত ত্যাগ করলেন? এ প্রশ্ন আমার মনে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করলো।

লাহোর পৌঁছে সুটকেস সহই জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদের কামরায় ঢুকে অত্যন্ত আবেগের সাথে জিজ্ঞেস করলাম, মাওলানা ইসলাহী কেন পদত্যাগ করলেন তা জানতে চাই।

মিয়া সাহেব আমার হাত থেকে সুটকেস নিয়ে দেয়ালের পাশে রাখলেন, আমার ওভার কোর্ট খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলালেন এবং তাঁর স্বভাবসুলভ উষ্ণ কোলাকুলি করে আমাকে চেয়ারে বসালেন।

জামায়াতের অফিসে যেতে প্রথমেই জামায়াতের মেহমানখানা। স্বাভাবিক অবস্থায় আমার প্রথমে মেহমানখানায় যাওয়ারই কথা। কিন্তু মাওলানা ইসলাহীর পদত্যাগে আমি এতোটা উত্তেজিত ছিলাম যে, সুটকেস সহই মিয়া সাহেবের অফিসে ঢুকলাম এবং বসার আগেই সুটকেস হাতে রাখা অবস্থায়ই ঐ প্রশ্ন করলাম। বসার পর মিয়া সাহেব বললেন, মাওলানার ইস্তিফা দেবার পর আমি বেশি বেশি করে এ দোয়াটি পড়ছি, "রাব্বানা লা তুযিগ্ কুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা" (হে আল্লাহ! একবার হেদায়াত দান করার পর আমাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিও না।)

তিনি বললেন, আমিও আপনার মতোই বিস্মিত ও দুঃখিত। তাঁর মতো লোক কী করে জামায়াত ত্যাগ করতে পারেন, তা আমার বুঝে আসে না। রুকন সম্মেলনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও তিনি মত পোষণ করলেন না। তাহলে কেন তিনি এ কাজ করলেন তা সত্যিই রহস্যজনক।

আমি বললাম, মিয়া সাহেব! মাওলানা আপনার দীর্ঘদিনের সাথী। বিপদের দিনে দু'দুবার এক সাথে জেলে ছিলেন। কেন তিনি এতো বড় সিদ্ধান্ত নিলেন, সে বিষয়ে

আপনার নিজের মনকে বুঝ দেবার জন্য নিশ্চয় এর কোন হেতু আবিষ্কার করেছেন। আপনার মনের ঐ ব্যাখ্যাটুকু আমি জানতে চাই। আমিও আমার মনকে বুঝ দিতে চাই।

তিনি বললেন, আসল ব্যাপার তো শুধু আল্লাহই জানেন। আমার ধারণা হয়েছে যে, বাতিলের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে যে নির্যাতন সহ্য করতে হয়, তাতে তিনি হাঁপিয়ে উঠেছেন। তিনি অত্যন্ত সচ্ছল পরিবারে ছোট থেকে বড় হয়েছেন। দেশ বিভাগের পর তাঁর স্ত্রীর সম্পত্তির বিনিময়ে লাহোরে বিরাট সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। জীবনে সামান্য কষ্টও করতে হয়নি। জেলে একবার তিনি বলে উঠলেন, "মিয়া সাহেব! মুঝসে ইয়ে খেল খেলা নাহি যা রাহা হ্যায়।" (জেলের এ খেলা আমা দ্বারা হয়ে উঠছে না)। অর্থাৎ আন্দোলনের ঝঞ্ঝাট তিনি সইতে পারছেন না।

অথচ আমি তাঁর লেখা বইতে পড়েছি। "এ সংগ্রামের পথে আমাকে চলতেই হবে। যদি চলার সাধ্য না থাকে তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও চলতে থাকবো। এরও সাধ্য না থাকলে বুকে গড়িয়ে চলবো। সে ক্ষমতাটুকুও যদি না থাকে তাহলে আমার চলার পথের দিকে তাকিয়ে থাকবো, যতক্ষণ প্রাণ থাকে। তবু এ পথ ছেড়ে যাবো না। এ পথ ছাড়া আর কোন পথই নেই।" হায়! লেখায় জযবা প্রকাশ করা, আর বাস্তবে তা লালন করার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। আল্লাহ পাক যাদেরকে তাওফীক দেন তারাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে।

৮১.

মাওলানা ইসলাহীর কথা

মজলিসে শূরার অধিবেশন চলাকালেই লাহোরের নাওয়া-ই-ওয়াকাত্ পত্রিকায় খবর দেখলাম যে, মাছিগোট সম্মেলনের পর যে ১৮ জন রুকন জামায়াত থেকে বের হয়ে গেলেন তারা মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর নেতৃত্বে এক বৈঠকে আগামীকাল অমুক স্থানে মিলিত হচ্ছেন। তারা নতুন সংগঠন কায়েম করতে চান।

আসরের নামাযের পর মাওলানা মওদূদীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি এ খবরটি দেখেছেন কিনা। তিনি বললেন, "এটা খুব ভালো কথা যে, তাঁরা সংগঠিত হয়ে দীনের কাজ করতে চান। সংগঠনভুক্ত হলে পজিটিভ কাজ করতে হবে। এখন তো জামায়াতের সমালোচনামূলক নেতিবাচক কাজেই তারা ব্যস্ত। যদি সংগঠিত হয়ে জামায়াতে ইসলমীর চেয়ে উন্নত মানের জামায়াত কায়েম করতে পারেন তাহলে আমি খুশিই হবো।"

এ কথাটুকু বলে একটু থেমে জোরে 'লেকিন' শব্দটি উচ্চারণ করে আবার থামলেন। এ শব্দটির অর্থ হলো কিন্তু। কিন্তু বলে যখন থামলেন তখন পরবর্তী কথাটির জন্য আমি একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি ধীরে ধীরে পান চিবাচ্ছিলেন। তারপর বললেন ঃ

"তানযীম কুয়ি খেল নাহি হ্যায়। জো লোগ জামায়াতে ইসলামীকে সাথ নাহি চল সাকা, আওর আপনি রায় বদলনে সে কাসের হ্যায়, এ্যায়সে লোগ এক তানযীম ক্যায়সে বানায়েগা? আচ্ছা দেখা যায়ে গা।"

অর্থাৎ সংগঠন করা কোন খেলা নয়। যে সব লোক জামায়াতে ইসলামীর সাথে চলতে পারলো না এবং যারা নিজের মত বদলাতে অক্ষম, তারা এক সংগঠন কেমন করে বানাবে? আচ্ছা দেখা যাবে।

আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পরপর কয়েকদিন সব পত্রিকা ঘেঁটে মাওলানা ইসলাহীর নেতৃত্বে ঐ ১৮ জনের বৈঠকের কোন খবরই তালাশ করে পেলাম না। এরপরও আমি তাদের খবর জানার চেষ্টা করেছি। তারা কোন সংগঠন দাঁড় করাতে পারেননি। জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন এমন যুক্তিসঙ্গত ও সুস্পষ্ট বিধি-বিধান দ্বারা পরিচালিত যে, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধিতিতে বিশ্বাসীদের এ সংগঠন থেকে চলে যাওয়া স্বাভাবিক নয়। মতপার্থক্য নিয়েই সংগঠনে চলা সম্ভব। সংগঠনের সিদ্ধান্তের সাথে ভিন্নমত পোষণকারীর এ অধিকার আছে যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থার মাধ্যমে ঐ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু যতক্ষণ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না হয়, ততক্ষণ এ সিদ্ধান্তই মেনে চলতে হবে। অধিকাংশ লোকের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত না মানলে এক সংগঠনে চলা কিছুতেই সম্ভব নয়।

মাওলানা ইসলাহী বাকি জীবন 'তাদাব্বুরে কুরআন' নামে বিরাট এক মূল্যবান তাফসীর লিখে গেছেন। তিনি কোন সংগঠনের সাথে আর জড়িত হননি, জামায়াতে থাকলে মাওলানা মওদূদীর অবসর নেবার পর তিনিই যে আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হতেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ডা. আসরার আহমদ সম্পর্কে

মাছিগোট সম্মেলনে নির্বাচন-বিরোধীদের নেতা ডা. আসরার আহমদের সাথে আমার পরিচয় ছিলো না। ঐ সম্মেলনে বক্তৃতারত অবস্থায়ই আমি তাঁকে প্রথম দেখেছি। সম্ভবত ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে ২০৫ নং নওয়াবপুর রোডস্থ জামায়াত অফিসে তিনি ফোনে যোগাযোগ করলেন। বর্তমান পিজি হাসপাতাল ভবনে তখন শাহবাগ হোটেল ছিলো। ঐ হোটেল থেকেই ফোনে কথা বললেন। আমার সাথে দেখা করতে চাইলেন। আমি বললাম, "আপনি জামায়াত থেকে বের হয়ে গেলেন। আপনার পথ আলাদা। এ অবস্থায় আপনার সাথে সাক্ষাৎ অর্থহীন। যার যার পথে চলাই উচিত। আপনার সাথে আমার ব্যক্তিগত কোন সম্পর্কও নেই। তাই আমার সাথে দেখা করে আপনার সময় অপচয় করবেন কেনো?" তাকে আমি সাক্ষাতের সুযোগ দেইনি।

জামায়াত থেকে আলাদা হয়ে ইসলাহী সাহেব নিষ্ক্রিয় ছিলেন। কিন্তু ডা. আসরার এর বিপরীতে অত্যন্ত সক্রিয় হলেন। তিনি দু'ধরনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

'আঞ্জুমানে খোদ্দামে কুরআন' নামক প্রকাশনা সংস্থার মাধ্যমে কুরআন সম্পর্কে তাঁর উর্দু ও ইংরেজিতে লেখা বই প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা। অপর কাজটি হলো 'তানযীমে ইসলামী' নামে একটি সংগঠন কায়েম করা। তিনিই এ সংগঠনের আমীর। ভালো বক্তা হিসেবে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় সফরও করেন।

১৯৯৭ সালের রুকন সম্মেলন উপলক্ষে '৭১ সালে চট্টগ্রাম বিভাগের আমীর অধ্যাপক ওসমান রাময (মরহুম) ঢাকা এসেছিলেন। রুকন সম্মেলনের পর তিনি চট্টগ্রামে মাওলানা সাঈদী সাহেবের তাফসীর মাহফিলে গেলেন। করাচী ফিরে যাবার পূর্বে ঢাকায় এলেন। আমার বাড়িতে তাঁকে খাবার দাওয়াত দিলাম। ঘটনাক্রমে ঐ সময় ডা. আসরার আহমদ ঢাকা এসে আমার সাথে ফোনে যোগাযোগ করলেন। আমি তাঁকেও রাময সাহেবের সাথেই খাবার দাওয়াতে শরীক করলাম। তিনি আমাকে তাঁর লেখা এক বান্ডেল বই দিয়ে গেলেন। বইগুলো উল্টে-পাল্টে দেখার সময়ও হয়নি। আলমিরাতে রেখে দিলাম। এখন তাঁর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বইগুলো বের করে দেখলাম।

বইগুলোর মধ্যে ইংরেজিতে লেখা ৯টি এবং উর্দুতে লেখা ৬টি। ইংরেজিতে লেখা বইগুলো ইসলাম, কুরাআন, মুসলিম উম্মাহ ও রাসূল (স) সম্পর্কে। উর্দু বইগুলোর দু'টো বই তাঁর দল 'তানযীমে ইসলাম' সম্পর্কে। তাঁর এ দলের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন, "এটা কোন রাজনৈতিক দল নয়, কোন ধর্মীয় ফেরকাও নয়; বরং এটি 'ইসলামী বিপ্লবী জামায়াত।"

উর্দু ৬টি বইয়ের মধ্যে ৩টি বই-ই জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে। ইংরেজি ও উর্দু বইগুলো ১৮ থেকে ১৭৫ পৃষ্ঠার। জামায়াত সম্পর্কে একটি বই ৩২৭ পৃষ্ঠার। নাম রেখেছেন, 'জামায়াতে ইসলামীর হারানো ইতিহাস'। ৯২ পৃষ্ঠার আর একটি বইয়ের নাম 'জামায়াতে ইসলামীর তৃতীয় সংকট'। তৃতীয় বইটি ৬৩ পৃষ্ঠার। এর নাম 'মাওলানা মওদূদী ও আমি'।

ডা. আসরার আহমদ সম্পর্কে এতো কথা এ কারণে উল্লেখ করলাম যে, জামায়াত থেকে যারাই বের হয়ে গেছেন তাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সাংগঠনিক তৎপরতার চেষ্টা করেছেন। তাই কেন তিনি জামায়াত ছাড়লেন এর যৌক্তিকতা প্রমাণ করা প্রয়োজন মনে করেছেন। তার বই থেকে জানলাম যে, তিনি একটি ইসলামী বিপ্লবী সংগঠনের আমীর। তাঁর সংগঠনের কোন খবর এর আগে শুনিনি। মাওলানা মওদূদীর ঐ কথাটি বড়ই কঠোর সত্য যে, 'তানযীম কুই খেল নাহি হ্যায়।"

বাংলাদেশের উদাহরণ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর মাত্র দু'জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জামায়াত থেকে আলাদা হয়েছেন। তাঁরা বিকল্প সংগঠন খাড়া করার চেষ্টা কম করেননি। একজন তো প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবি করেছেন, তিনিই আসল জামায়াতে ইসলামীর আমীর। জামায়াতে থাকাকালে তারা সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন।

সংগঠনের সমুদ্রে তারা শক্তিশালী ঢেউ ছিলেন। সংগঠনের বাইরে স্বাভাবিক কারণেই বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়েছেন। সংগঠন গড়ে তোলা কোন খেলা নয়।

মাছিগোট সম্মেলনের পর

১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে মাছিগোট রুকন সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রাদেশিক সেক্রেটারি হিসেবে আমি এবং ৪টি বিভাগীয় শাখার আমীরগণের ব্যাপক সফর শুরু হয়। জেলা ও মহকুমা শহরে কর্মসূচির মাধ্যমে সংগঠনকে মযবুত করা, জনসভার মাধ্যমে জামায়াতের দাওয়াত জনগণের মধ্যে সম্প্রসারিত করা এবং সুধী-সমাবেশের মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজকে সংগঠনভুক্ত করাই সফরের প্রধান কর্মসূচি ছিলো। সংগঠনের বিস্তার লাভ ও অগ্রগতিতে আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পেলো এবং সফরও অব্যাহত রাখা হলো।

১৯৫৮ সালের অক্টোবরে রাজশাহী বিভাগের দিনাজপুর জেলার মহকুমা শহর ও রংপুর জেলার নীলফামারী মহকুমা শহর সফর করে ৭ অক্টোবর সকালে ট্রেনে সৈয়দপুর রেল স্টেশনে পৌছি। জামায়াতের স্থানীয় দায়িত্বশীল উর্দুভাষী জনাব আবদুল কাইয়ুম ভাই আমাকে নিয়ে রিকশায় উঠলেন। রিকশায় বসা থাকা অবস্থায়ই ঘোড়ার গাড়িতে ফিট করা মাইকে বাংলায় ও উর্দুতে বারবার ঘোষণা হতে থাকলো ঃ

গত রাত ১২টার সময় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল সারাদেশে সামরিক শাসন জারি করেছেন এবং সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ূব খানকে প্রধান সামরিক প্রশাসক নিয়োগ করেছেন। কেন্দ্রীয় ও সকল প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ও আইনসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। শাসনতন্ত্র বাতিল করা হয়েছে। সকল রাজনৈতিক দলকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে। সকল প্রকার সভা ও সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জনগণকে শান্ত থেকে নিজ নিজ কাজে নিবিষ্ট থাকতে বলা হয়েছে। এ সব নির্দেশ অমান্য করলে কঠোর শাস্তি হবে বলে সতর্ক করা হচ্ছে।

মগজে তালা লেগে গেলো

রেল স্টেশন থেকে আবদুল কাইয়ুম ভাইয়ের বাসা পর্যন্ত পৌছার আগে আমি বাকরুদ্ধ অবস্থায় ছিলাম। আবদুল কাইয়ুম সাহেব খুব আফসোস করে বললেন যে, জামায়াতের পক্ষ থেকে আয়োজিত সুধী-সমাবেশের ব্যাপারে আমন্ত্রিতদের মধ্যে বেশ সাড়া ও উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু সবই তো পণ্ড হয়ে গেলো। বাসায় সকাল সাড়ে আটটায়ই পৌছে গেলাম। আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। এখন কী হবে? আমরা কী করবো? মনে হলো যে, মগজে তালা লেগে গেছে। কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। জীবনে কখনো এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি বলে মনে পড়ে না।

নাশতা করতে করতে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, অবিলম্বে ঢাকা রওয়ানা হতে হবে।

এখানে বসে থাকা অর্থহীন। দিনাজপুর থেকে ঢাকাগামী আপ ঢাকা মেল ধরেই যেতে হবে। দু'ঘন্টা পরই ট্রেনে উঠলাম। আমি সব সময়ই ইন্টারক্লাসে যাতায়াত করতাম। এর উপরের ক্লাসে যারা চড়েন, তারা কিছুটা হামবড়া রোগে ভোগেন বলে তাদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করা সহজ নয়। ইন্টারক্লাসে মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত লোক প্রচুর পাওয়া যায়। তারা উপরের ক্লাসের যাত্রীদের মতো মুখ ভার করে চুপ করে বসে থাকেন না। তারা সহজেই মিশতে পারেন। চুপ করে কয়েক মিনিট বসে থাকাও তাদের স্বভাববিরুদ্ধ।

ট্রেনে আমার অভ্যাস ছিলো বই পড়ে সময়টা কাজে লাগানো। কিন্তু পাশে কথা-বার্তা চলতে থাকলে আমি পড়তে পারতাম না। কারণ এতে আমার মনোযোগ নষ্ট হতো। আমার সাথে বিক্রয়ের জন্য ইসলামী আন্দোলনের যথেষ্ট বই রাখতাম। যাত্রীদের কথা-বার্তা বন্ধ করার জন্য সবার হাতে বই বিলি করতাম। সবাই শিক্ষিত বলে বই হাতে নিয়েই পড়া শুরু করতেন। আর আমি নিরুপদ্রবে পড়তে থাকতাম। আমি বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য রাখতাম যে, যাত্রীরা বই পড়ছেন কিনা। দেখা যেতো যে, ৫/৭ মিনিট পরই প্রায় সব যাত্রীই বই হাতে ঘুমাচ্ছেন। ২/১ জনকে দেখা যেতো যে, মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। আমি এদের নাম, ঠিকানা সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট এলাকার সাংগঠনিক দায়িত্বশীলের নিকট পাঠাতাম, যাতে তাদের উপর দাওয়াতী কাজ করা হয়। এ জাতীয় যাত্রীদের কেউ কেউ আগ্রহের সাথে বই কিনে নিতেন। লোকের গুরুত্ব বুঝে কোন কোন যাত্রীকে বিনামূল্যেও বই দিয়ে দিতাম।

সফরে আমি এ পদ্ধতিতে দু'টো ফায়দা ভোগ করতাম। একটি হলো নিশ্চুপ পরিবেশে বই পড়ার সুবিধা, অপরটি হলো ইসলামী আন্দোলনের উপযোগী লোকের নাম-ঠিকানা যোগাড় করা। এতে আমার এ অভিজ্ঞতাও হলো যে, শিক্ষিত লোকের মধ্যে মনোযোগ ও আগ্রহসহকারে বই পড়ার অভ্যাস অনেকেরই নেই।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সৈয়দপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ট্রেনে ইন্টারক্লাসেই বসলাম বটে, কিন্তু আমি সেদিন সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে গেলাম। যাত্রীদের মধ্যে বিলি করার মতো বই-পুস্তক সাথে থাকা সত্ত্বেও বই-এর ব্যাগটি বাংকারের উপরই রইল। এমনকি নিজে পড়ার জন্যও কোন বই হাতে নিতে পারলাম না। সামরিক শাসন জারি হওয়ায় চিন্তাশক্তি এতটা বিকল হয়ে গেলো যে, ভেবে-চিন্তে কোন কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। রাজনৈতিক দলকে বেআইনী ঘোষণার পর সংগঠনের দশা কী হবে? সম্প্রসারমান সংগঠন কি স্থবির হয়ে যাবে? ২০৫ নং নওয়াবপুর রোডের অফিসের কী হবে? এ সব অগণিত চিন্তা-ভাবনা মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখলো।

ঢাকা এসে দেখলাম

ঢাকা আসার পথে ট্রেনে যাত্রীদের মধ্যে সামরিক শাসন নিয়ে কাউকে আলোচনা করতে দেখলাম না। এতো বড় একটা ঘটনা ঘটে গেলো, এর কোন বিরূপ বা

অনুকূল প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেলো না। যাত্রীরা নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতে থাকলেন। স্বভাবগতভাবেই বাঙালিরা আলাপপ্রিয়। তারা কথা না বলে থাকতে পারে না। কিন্তু গোটা দেশে সামরিক আইন জারি হওয়ার মতো বিরাট ব্যাপার ঘটা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কেউ কথা তুললো না। এটাই যথার্থ প্রতিক্রিয়া। এটা পক্ষে নয়, বিপক্ষেই। পক্ষে হলে উৎসাহের সাথে এ বিষয়ে কথা বলা হতো। কী হয় না হয় দেখার জন্য সবাই অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছে।

ঢাকায় এসে সব যাত্রীর মতো আমিও চুপচাপ রিকশায় চড়ে মগবাজারের বাড়িতে পৌঁছলাম। সেদিন ৮ অক্টোবর। আমার আরও এক সপ্তাহ পর ফিরে আসার কথা। এতো আগে কেন চলে এলাম সে কথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হলো না, যেনো সবাই জানতো যে, আমি আজই ফিরে আসবো। সামরিক আইন জারি হয়ে গেলো। এতে কোন শঙ্কার কারণ আছে কিনা, এ কথাও বাড়ির কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি।

আমি এতো সফর করতাম যে, এক বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও আমার ছোট ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্যামের সাথে খুব কমই দেখা হতো। বাড়িতে থাকা অবস্থায়ও তার অফিসে যাওয়া ও বাড়িতে ফিরে আসার সময়সূচি ও আমার সময়সূচি দু'রকম হওয়ায় দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ এতো কম হতো যে, আলাপ-আলোচনার সময়ই পাওয়া যেতো না। আব্বা কোথাও যেতেন না বলে তাঁর সাথে দেখা হতো। আমার সফর বন্ধ এবং রোজ অফিসে যাওয়ার ঝামেলাও নেই বলে বাড়ির সবাইকে খুশিই মনে হলো। বিশেষ করে আম্মা ও স্ত্রীকেই বেশি খুশি দেখলাম। আব্বাও ব্যতিক্রম নন। তখন জামায়াতের দায়িত্বশীলদের কারো বাড়িতে ফোন ছিলো না। আমার ভাই ডাক্তার হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজে জয়েন করার পর তারই প্রচেষ্টায় বাড়িতে ফোনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু যাদের সাথে যোগাযোগ করা দরকার, তাদের ফোন না থাকায় আমার বাড়ির ফোনও কাজে লাগলো না।

৮ অক্টোবর বাড়িতেই রইলাম, কোথাও গেলাম না। সর্বপ্রথম প্রাদেশিক আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীমের সাথে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে পরের দিন তার বাসায় গিয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি গতকাল গ্রামের বাড়ি চলে গেছেন। তিনি জামায়াতের কারো কাছে কিছু বলে গেলেন কিনা কে জানে! খুব বিস্মিত ও দুঃখিত হলাম। তাকে পেলে আরও ২/৪ জনকে ডেকে পরামর্শ করতে পারতাম যে, এ সময় কি করা যায়।

আমার ইচ্ছা ছিলো তাকে পেলে দু'জন একসাথে ২০৫ নং নওয়াবপুর রোডস্থ জামায়াত অফিসে যাবো। কিন্তু তাকে না পেয়ে অফিস সেক্রেটারি ফুরুগ আহমদ সাহেবের বাসায় গেলাম। তাঁকে নিয়ে নওয়াবপুর গেলাম। যেয়ে দেখি অফিসের বাইরে পুলিশ পাহারা এবং অফিসের ভেতরে আমীরের চেয়ারে এক পুলিশ অফিসার বসা। পাহারাদার পুলিশ থেকে অফিসারের পরিচয় নিয়ে জানলাম যে, তিনি পুলিশ ইনসপেক্টর। কামরার বাহির থেকেই ইনসপেক্টর সাহেবকে আসসালামু আলাইকুম বলে আমার পরিচয় বললাম। তিনি বের হয়ে এসে বললেন, ৭ তারিখ

সকালেই ডিএম (ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট) সাহেবের নির্দেশে (বর্তমানে যে পদের নাম ডিসি) এ অফিসে সিল মারা হয়েছে তারই নির্দেশে, আমরা দু'দিন থেকে অফিসের সবকিছুরই তালিকা তৈরি করছি। বললাম, আমার কিছু ব্যক্তিগত বই আছে তা কি নিতে পারি? তিনি বললেন, আমার এ বিষয়ে কোন ইখতিয়ার নেই। আপনি ডিএম-কে লিখতে পারেন। আমার দায়িত্ব হলো সব কিছুর তালিকা তৈরি করে ডিএম অফিসে জমা দেওয়া।

অফিস সেক্রেটারি ফুরুগ আহমদেরও কিছু বই ও ব্যক্তিগত জিনিস ছিলো তা-ও উদ্ধার করা গেলো না। ঢাকা শহর আমীর সাইয়েদ হাফীযুর রহমান লালবাগ রহমতুল্লাহ হাইস্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। আমরা দু'জন তার সাথে দেখা করলাম। পরামর্শ হলো যে, পরিস্থিতি কী দাঁড়ায় তা পর্যবেক্ষণের জন্য কিছুদিন একেবারেই চুপ থাকা প্রয়োজন। সামরিক আইনের হাতিয়ার কতটুকু ব্যবহার করা হয় তা এখনি বলা যায় না। এ বিষয়ে আমাদের কোন অভিজ্ঞতাও নেই। এ অবস্থায় নড়াচড়া না করাই নিরাপদ।

আরও দু'দিন পরে বাজার করা উপলক্ষে নওয়াবপুর এসে জামায়াত অফিসটা দেখার লোভ সামলাতে না পেরে দোতলায় উঠলাম। অফিসটা দোতলায়ই ছিলো। নিচতলায় দোকান। আমাকে দেখে ইনসপেক্টর সাহেব বের হয়ে এলেন। বললেন, সকল রাজনৈতিক দলের অফিসের সবকিছু তালিকা তৈরি করে দু'দিনের মধ্যেই ডিএম অফিসে জমা দেওয়া হয়ে গেছে। এ অফিসে ৫ দিন কাজ করেও তালিকা শেষ করতে পারলাম না। যারা অন্যান্য দলের অফিসে দায়িত্ব পালন করেছেন, তারা আমাদের বিলম্ব হবার কারণ জিজ্ঞেস করে।

আপনাদের অফিসে এতো ফাইল যে কোন্ ফাইলে কী বিষয় তা হিসাব করে কুলাতে পারছি না। অফিসের লাইব্রেরীর বই-এর তালিকা নিয়ে ব্যস্ত। উর্দু বই-এর জন্য উর্দুভাষী লোক আনতে হয়েছে। আপনাদের দলের অফিসের মতো অন্যান্য দলের অফিসে এ সব ঝামেলা নেই।

বেকার অবস্থায় বাড়িতে বন্দি

সদা কর্মব্যস্ত মানুষ হঠাৎ কর্মহীন বেকার হয়ে গেলে যে দশা হয়, আমার অবস্থাও তা-ই হলো। কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই। বাড়িতে একেবারেই বন্দি হয়ে পড়লাম। আমার ভাইয়ের সাপ্তাহিক ছুটির দিন সকালে আব্বাসহ দু'ভাই মিলে একসাথে নাশতা করলাম এবং দীর্ঘ সময় বসে আলাপ করতে থাকলাম। এভাবে তিনজন বহুদিন একত্রে বসিনি। কাছে থেকে আমার ভাই (ডাক্তারের চোখ দিয়ে) আমাকে দেখতে লাগলো। জিহ্বা ও চোখ দেখলো, পায়ের পাতার তলাও দেখলো। এক রকম অস্থির হয়ে বলে উঠলো, ভাই সাব! আপনি তো রোগের ডিপো হয়ে গেছেন। আপনাকে কাছে থেকে এভাবে দেখার সুযোগ হয়নি বলে এদ্দিন লক্ষ্য করতে পারিনি। আপনাকে শীঘ্রই ডা. নূরুল ইসলামের কাছে নিয়ে যাবো।

আব্বা বললেন, চিকিৎসার পরে এ অবসরে একটা কাজ করে ফেলো। বাড়িতে থাকার জায়গার তুলনায় লোকসংখ্যা বেড়েছে। তাই দেয়ালের উপর টিন দিয়ে দু'টো কামরা ও একটা বাথরুম তৈরি করে ফেলো। টাকার ব্যবস্থা আছে। এ কাজটা করাবার জন্য দায়িত্ব নেবার লোকের অভাবেই এদ্দিন বলিনি। তোমাদেরই থাকবার কষ্ট হচ্ছে।

খুব লজ্জিত হলাম। ঘর বানাবার জন্য টাকা যোগাড় তো করতে পারলামই না। আব্বা টাকা নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন, আমি সময় দিতে পারবো না বলে কাজটা পড়ে আছে। অথচ কাজটা অত্যন্ত জরুরি ছিলো।

৮২.

ডা. নূরুল ইসলামের চেম্বারে

আমার ছোট ভাই ডা. মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্যাম ও প্রখ্যাত চিকিৎসক জাতীয় অধ্যাপক ডা. নূরুল ইসলাম কোলকাতা মেডিকেল কলেজে সহপাঠী এবং দু'জন একই সাথে ১৯৫০ সালে এমবিবিএস পাস করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজে দু'জনই কর্মরত থাকা অবস্থায় ১৯৫৮ সালে রোগী হিসেবে ডা. নূরুল ইসলামের চেম্বারে গেলাম। ঐ সময় আমার ভাই প্যাথলজির অধ্যাপক আর ডা. ইসলাম মেডিসিনের অধ্যাপক এবং হাসপাতালের পেয়িং ওয়ার্ডের দায়িত্বশীল। আমার ভাই-ই ফোনে যোগাযোগ করে আমাকে নিয়ে যায়। আমার নিয়মিত অভ্যাস হিসেবে ডা. ইসলামকে দেবার জন্য কয়েকটি ইসলামী বই সাথে নিয়ে গেলাম।

ডা. নূরুল ইসলাম আমাকে সাদরে হাত বাড়িয়ে তাঁর সামনে বসালেন। দেখেই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন যে, আপনি ক্রনিক ডিসেন্ট্রিতে ভুগছেন। এ রোগ আমাদের দেশে 'মোস্ট কমন'। আমারও এ রোগ আছে। রোগের তীব্রতা ভেদে শতকরা ৯৫ জনেরই এ আমাশয় রোগ আছে। বাকি শতকরা ৫ জন মনে করে যে, তাদের এ রোগ নেই। তাদেরও আছে। সামান্য বলে গা করে না।

তিনি মুচকি হেসে বললেন, আপনার সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি তাতে 'আউট-ডোর প্যাশেন্ট' হিসেবে আপনার চিকিৎসা সম্ভব নয়। আপনাকে এরেস্ট করে হাসপাতালে ঢুকিয়েই চিকিৎসা করতে হবে।

আমি হেসে বললাম, জেল খাটার যথেষ্ট অভ্যাস আমার আছে। এরেস্টকে আমি ভয় পাই না। তিনি বললেন, সাধারণ ওয়ার্ডে বেশি ভিড় থাকে। আপনাকে পেয়িং ওয়ার্ডে ভর্তি করবো। এখন কোন বেড খালি নেই। খালি হলেই জানাবো। কথা হয়ে গেলো। যে বই ক'টা নিয়ে গিয়েছিলাম তা ডা. ইসলামের হাতে তুলে দিলাম। তিনি খুশি হয়ে নিলেন। এ সময় আমার ভাই ডা. ইসলামকে জিজ্ঞেস করলেন, রোগী দেখার ভিজিট চার্জ আপনি কত নেন?' ডা. ইসলাম একটু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আপনি আমার সহপাঠী। এ প্রশ্ন করা আপনার অন্যায় হয়েছে। আমার

ভাই একটু লজ্জিত হয়ে ডা. ইসলামের সাথে হাত মিলাবার মাধ্যমে পরিবেশটা হালকা করলো। আমরা বিদায় নিলাম।

হাসপাতালে ভর্তি

নভেম্বরের মাঝামাঝি পেয়িং ওয়ার্ডে বেড খালি হলে আমি হাসপাতালে ভর্তি হলাম। ঐ সময় প্রতি বেডের জন্য দৈনিক মাত্র ৫ টাকা দিতে হতো। সাধারণ ওয়ার্ড থেকে পেয়িং ওয়ার্ডে দুটো অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যেতো। বেডগুলো ঘন ঘন নয়, আর খাবার মান একটু উন্নত।

আমার বয়স তখন ৩৬ বছর। পাঁজড়ের হাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যেত। শরীর হ্যাংলা-পাতলা। স্কুল জীবন থেকেই আমি আমাশয়ের রোগী। ডা. ইসলাম বললেন যে, চিকিৎসার এমন এক পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে, যাতে আমাশয়ের জীবাণু বের করে ফেলা যায়। চিকিৎসাটার নাম 'রিটেনশন এ্যানেমা'। সন্ধ্যা রাতেই পায়খানার রাস্তায় সিরিঞ্জ ঢুকাবে। সারা রাতে ফোঁটা ফোঁটা ঔষধ পেটে যেয়ে জমা হবে। দীর্ঘ সময় ঔষধ পেটে থাকা অবস্থায় জীবাণু ধ্বংস করতে থাকবে। সকালে পায়খানায় গিয়ে জীবাণুসহ ঔষধ ফেলে দিতে হবে। এভাবে একটানা দশ দিন চলবে। এ ক'দিনে শরীরের ওজন কমবে। এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই।

'Retention Enema' অর্থ জেনে নিলাম। Enema মানে পায়খানার রাস্তা দিয়ে ঔষধ দেয়া। আর Retention মানে ধারণ বা অবস্থান। অর্থাৎ ঐভাবে ঔষধ পেটে দীর্ঘ সময় অবস্থান করবে এবং রোগের জীবাণু শিকার করতে থাকবে। আমি জানি না এখনও ঐ চিকিৎসা পদ্ধতি চালু আছে কিনা। আরও উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কার হয়ে থাকতে পারে।

১০ দিন আমাশয়ের চিকিৎসার পর আরও দু'একটি রোগের জন্য এক সপ্তাহ অতিরিক্ত হাসপাতালে থাকতে হলো। হাসপাতাল থেকে বের হবার সময় ওজন করে দেখা গেলো যে, ১২ পাউন্ড ওজন কমেছে। বিদায়ী উপদেশ দেবার সময় ডা. ইসলাম বললেন, "একটা বছর খাবার ব্যাপারে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। নিয়মগুলো লিখে দিলাম। আমাশয় থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। ১০/১২ বছর পর যদি আবার প্রয়োজন হয় তাহলে এ চিকিৎসা আবার দরকার হতে পারে।"

পেয়িং ওয়ার্ডের R.M.O. (Residential Medical Officer) ডা. নূরুল হকের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। অত্যন্ত সুদর্শন যুবক ডাক্তার হক। দৈনিক কয়েকবার রোগীদের খোঁজ-খবর নিতেন। হাসিমুখে দরদের সাথে কথা বলতেন। ডাক্তার এমন হলে রোগী তার ব্যবহারেই সুস্থতা বোধ করে। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার শরীরে আর কোন অসুখ আছে কিনা তা তালাশ করে বের করলেন এবং এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। ঘটনাক্রমে তাঁর বাড়ি আমাদের নবীনগর থানায় হওয়ায় সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ বোধ করলাম। গত বছরের (২০০১ সাল) প্রথম দিকে আমার হেলথের চেক-আপ হচ্ছিল ইবনে সিনা হাসপাতালে। হার্ট স্পেশালিষ্ট

হিসেবে ডা. নূরুল হক নামে এক ডাক্তার আমাকে দেখতে এলেন। নামটার আকর্ষণ তো ছিলোই। চেহারার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকালাম। যুব-বয়সের গৌর-বর্ণের সেই ঔজ্জ্বল্য না থাকলেও চেহারায় চিনে ফেললাম। জিজ্ঞেস করলাম, ৪২ বছর পূর্বের আমার ঐ প্রিয় ডাক্তার নন কী? মৃদু হেসে মিষ্টি কণ্ঠে বললেন, আপনি চিনতে ভুল করেননি। আপনি এমনভাবে স্মরণ রেখেছেন বলে শুকরিয়া জানাই।

চিকিৎসার এক বছর পর

চিকিৎসার পর বছর খানিক ঢাকার বাইরে যাবার প্রয়োজন. হয়নি। তাই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত খাবার খেতে অসুবিধা হয়নি। সফরে যে খাওয়া ও বিশ্রামে অনিয়ম হয় তা থেকেও নিরাপদে থাকা গেলো। এক বছরের মধ্যেই আল্লাহর রহমতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে মনে হলো। আয়নার সামনে খালি গায়ে দাঁড়ালে আগের মতো ভাসমান পাঁজরের হাড় তেমন দেখা যায় না। নিজ হাতে বগলের চুল কামাবার সময় গুহার মধ্যের চুল নাগাল পেতে যে সমস্যা হতো এখন তা হয় না। দু'হাঁটু একত্র করলে দু'উরুর মাঝখানে যে বিরাট ফাঁক ছিলো তা অনেক কমে গেছে।

চিকিৎসার আগে যারা আমাকে দেখে অভ্যস্ত, তারা এখন দেখলে মন্তব্য করেন,

মনে হয় আপনি একটু মোটা হয়ে গেছেন। মুরুব্বীদের কেউ দেখে বলতেন, 'তুমি মোটা হয়ে যাচ্ছো নাকি? জওয়াবে বলতাম, আমি আগে হালকা-পাতলা ছিলাম, এখন ঠিক হয়ে গেছি, মোটা হইনি।

এর ১১ বছর পর ৭ বছর বিদেশে বাধ্য হয়ে থাকতে হয়। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে দেশে আসার ৯ মাস পর ৭৯ সালের মার্চ মাসে ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে যাবার সময় মাথায় বেশ চক্কর অনুভব করলাম। ভাগ্নী ফেরদৌসের ঘরের দেয়াল ধরে ধরে মসজিদে গেলাম। নামায থেকে ফেরার পথে ফেরদৌস বললো, মামা আপনার লো ব্লাডপ্রেসার কিনা পরীক্ষা করুন। ব্লাডপ্রেসার কি তা আমার জানাই ছিলো না। রোগ হলে পরে এ সব কথা সহজেই জানা হয়ে যায়।

আমার ভাই ডাক্তার মুয়ায্যামকে জানালাম। আগের মতোই তার সহপাঠী ডাক্তার নূরুল ইসলামের চেম্বারে নিয়ে গেলো। তিনি আমার ভাইয়ের মুখে একটু শুনেই প্রেসার মাপা ছাড়াই congratulations বলে খুশি হয়ে জোরে হ্যান্ডশেক করলেন। আমি মন্তব্য করলাম, আমি বা কেমন রোগী, আর আপনিই বা কেমন ডাক্তার। রোগীকে ডাক্তার মুবারকবাদ জানাতে কোন সময় শুনিনি।

তিনি বললেন, লো প্রেসারের রোগীকে আমি সব সময়ই মুবারকবাদ জানাই। কারণ এটা এমন রোগ, যার ঔষধ হলো পুষ্টিকর খাবার। এখন আপনাকে ভালো খাবার বেশি করে খেতে হবে। অন্য অসুখ হলে অনেক কিছু খাওয়া যায় না। ডাক্তারের কাছ থেকে বেশি করে খাবার লাইসেন্স পেয়ে গেলেন। তাই Congratulate করলাম। আমার ডায়েবেটিস ও হার্ট প্রোবলেম নেই জেনে আবার

হাত মিলায়ে আরো জোরে কনগ্রেচুলেশনস বললেন। রোগীর সাথে ডাক্তার এভাবে কথা বললে বিনা ওষুধেই রোগী সুস্থতা বোধ করে।

ডা. ইসলাম রোগীকে বেশি ঔষধ দেওয়া মোটেই পছন্দ করেন না। যতো কম ঔষধ দিলে চলে তাই দেন। মাথায় চক্কর যাতে না আসে সে জন্য একটা ঔষধ লিখে দিয়ে বললেন, পুষ্টিকর খাবার খেতে থাকুন। এ কথাও বললেন যে, পুষ্টিকর খাবার মানেই দামি খাবার নয়। সবজি ও ফল বেশি খাবার পরামর্শ দিলেন।

ডাক্তার সাহেবকে জানালাম যে, আমার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু ও আত্মীয় ডায়বেটিস ও হৃদরোগের কারণে খাবার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলেন। যেসব খাওয়া পছন্দ করেন এর মধ্যেও বাছাই করতে হয়। এটা খাওয়া যাবে না, ওটা সামান্য খাওয়া যাবে ইত্যাদি মেনে চলতে হয়।

১৯৭৭ সালে হজ্জের সময় আরাফার ময়দানে বিশেষভাবে দোয়া করেছিলাম, 'হে মাওলা! আমাকে এমন অসুখ দিও না, যার কারণে তোমার অনেক নিয়ামত খাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। খাওয়ার ব্যাপারে আপনার তাগিদ পেয়ে বুঝতে পারলাম, যে আল্লাহ তাআলা আমার ঐ দোয়া কবুল করেছেন। তিনি এমন অসুখই দিলেন, যার চিকিৎসাই হলো ভালো খাওয়া ও বেশি পরিমাণে খাওয়া। মনে হয় আল্লাহ আমাকে বলছেন যে, তুই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত না করার জন্য দোয়া করেছিলি। এখন কত খেতে চাস খা।

মাবুদের রহমতে আজ পর্যন্ত অসুখের কারণে আমাকে স্থায়ীভাবে কোন খাদ্য খাওয়া বন্ধ করতে হয়নি। অসুখ অবস্থায় সাময়িকভাবে কয়েকদিন না খাওয়ার কথা ভিন্ন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কোন নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করেননি, এ মেহেরবানীর শুকরিয়া আদায়ের ক্ষমতা কারো নেই। তিনি যেন শুকরিয়ার জযবাটুকু কবুল করেন।

জনমনে সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়া

সেনাপতি আইয়ূব খান প্রধান সামরিক শাসনকর্তা হিসেবে হুংকার ছেড়ে বললেন, স্বার্থপর রাজনীতিক, দুর্নীতিপরায়ণ অফিসার ও অসৎ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম অভিযান চালাবেন। রাজনৈতিক নেতাদেরকে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানে গ্রেপ্তার করা হলো। অফিসারদের তালিকা তৈরি হতে লাগলো। অসৎ ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। চাঞ্চল্যকর খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হলো যে, অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত হচ্ছে। আরো খবর বের হলো যে, করাচীর সমুদ্র সৈকতে রাতের অন্ধকারে অসৎ লোকেরা অবৈধ সম্পদ ফেলে ফেলে স্তূপ করে রাখে, যাতে তল্লাশী হলে ধরা না পড়ে। সকালে সেনাবাহিনীর লোক সেসব নিয়ে নিলামে বিক্রয় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে।

পূর্ব-পাকিস্তানে রাজনৈতিক নেতাদেরকে গ্রেপ্তার করাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে পশ্চিম-পাকিস্তানের মতো আতঙ্ক লক্ষ্য করা যায়নি। সামরিক

আইন জারির সাথে সাথেই গভর্নর সুলতানুদ্দীন আহমদের স্থলে অবসরপ্রাপ্ত ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ জনাব জাকির হোসেনকে গভর্নর নিয়োগ করা হয়। আইয়ুব খান পূর্ব-পাকিস্তানে সেনাবাহিনী প্রধান (G.O.C) থাকাকালে জাকির হোসেনের সাথে বন্ধুত্ব থাকায় বিশ্বস্ত লোক হিসেবে তাঁকে প্রাদেশিক প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

গভর্নর জাকির হোসেন পল্টন ময়দান ও স্টেডিয়াম এলাকায় এক মহাসমাবেশের আয়োজন করেন এবং পাকিস্তানের মহান নেতা হিসেবে আইয়ূব খানকে সমাবেশে বক্তব্য রাখার ব্যবস্থা করেন। সমাবেশে এতো লোক হয়েছিল যে, স্টেডিয়াম এলাকা, পল্টন ময়দান ও চারপাশের রাস্তা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। সবাই বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলো যে, আইয়ূব খানের বক্তৃতার পর বিশাল জনতা যে খুশি হয়েছে, তা স্পষ্ট বুঝা গেলো। কেন মার্শাল ল' জারি করতে হলো তা বুঝাতে গিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতার হাস্যকর লড়াই, দুর্নীতির ব্যাপকতা, আইনসভায় জননেতাদের আক্রমণে স্পীকার শাহেদ আলী হত্যা, জনগণের ভাগ্য গড়ার বদলে সরকারি দলের লোকদের লুটপাট, জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার ইত্যাদি চমৎকারভাবে তুলে ধরতে তিনি সক্ষম হলেন। সামরিক শাসন ছাড়া দেশকে বাঁচাবার কোন উপায় ছিলো না বলে তিনি বাধ্য হয়ে এ কঠিন দায়িত্ব নিলেন বলে জানালেন।

যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ সরকারের বারবার উত্থান-পতনের ঘটনা এবং শাহেদ আলী হত্যার খবর তো সবার জানাই ছিলো। তদুপরি আইয়ূব খান দেশ গড়ার জন্য কি কি করতে চান তাও ঘোষণা করে সবাইকে আশ্বস্ত করলেন। যখন জনগণ বেসামরিক সরকারের কুশাসনে অতিষ্ঠ হয় তখনি সামরিক শাসনের জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জনগণের নির্বাচিত সরকারের শাসনে যদি জনগণ সন্তুষ্ট থাকে তাহলে সামরিক সরকার কায়েমের সাহস কারোই হতে পারে না।

ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি যে, আইয়ূবখান ও ইস্কান্দার মির্জা কিভাবে ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে লিপ্ত করেছেন এবং সামরিক শাসন জারি করার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।

ঢাকার পত্রিকায় বড় বড় হেডিং-এ মন্তব্য প্রকাশ পেলো "আইয়ূব খান ঢাকায় এলেন এবং জনগণের মন জয় করে ফিরে গেলেন।" চরিত্রহীন, অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিকদের অপকর্মের ফলেই সামরিক শাসন এলো।

মীর জাফরের বিদায়

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন কায়েম হলো। ২৪ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ১২ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে জেনারেল আইয়ূব খানকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ দান করেন এবং লে. জেনারেল মূসাকে সেনাপতির দায়িত্বে উন্নীত করেন। ২৭ অক্টোবর আইয়ূব খান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। সেদিনই

রাতে জেনারেল আজম খান, জেনারেল এমএম শেখ ও জেনারেল বাকী প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার সাথে দেখা করে তাকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। পদত্যাগপত্রে সই করার পর সস্ত্রীক লন্ডন রওয়ানা হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ ছিলেন।

সেনাপতি আইয়ূব খানের সমর্থনই ইস্কান্দার মির্জার শক্তির উৎস ছিলো। ঐ শক্তি বলেই প্রথমে গভর্নর জেনারেল হিসেবে এবং পরে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিন বছর অত্যন্ত দাপটের সাথে শাসন ডাণ্ডা ব্যবহার করেছেন। প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পর আইয়ূব খান প্রধানমন্ত্রীর পদ দখল করার সাথে সাথেই মির্জাকে এক লাথিতে লন্ডনে নির্বাসন দিলেন।

মীর জাফররা চিরকালই ক্লাইভদের নিকট এমন আচরণই পেয়ে থাকে। নবাবীর লোভ দেখিয়ে ক্লাইভ সেনাপতি মীর জাফরকে হাত করে নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। বিশ্বাসঘাতককে কে বিশ্বাস করে? ক্লাইভ মীর জাফরকেও ক্ষমতাচ্যুত করার প্রয়োজন মনে করলেন।

আইয়ূব খানের মন্ত্রিসভা জেনারেল আইয়ূব খানকে ফিল্ড মার্শাল পদবি দেবার সিদ্ধান্ত নিলো। স্বৈরশাসকরা নিজেই নিজেকে প্রমোশন দিতে লজ্জাবোধ করে না। কোন দেশ জয় করে তিনি এ উপাধি পাননি। দেশ রক্ষার দায়িত্বে ভর করে দেশ শাসনের ক্ষমতা হাতে নিলেন। সেনাপতি হয়ে নিজ দেশকে জয় করেই ফিল্ড মার্শাল হলেন। এ পদবিটি ছাড়া সেনাবাহিনীর উপর সরাসরি কর্তৃত্ব করা যায় না বলেই এ ব্যবস্থা করতে হলো। সেনাপতি তার মতোই যাতে ক্ষমতা দখল করতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে নিরাপত্তার প্রয়োজনেই তিনি ফিল্ড মার্শাল হলেন। প্রত্যেকেই নিজের মানেই অপরের মূল্যায়ন করে থাকে।

তিন মাস পর

সামরিক শাসন কায়েমের তিন মাস পর ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে আমি জামায়াতের চার বিভাগীয় আমীরকে নিয়ে বৈঠকে বসলাম। পরিস্থিতির পর্যালোচনায় আমরা একমত হলাম যে, সরকার ক্ষমতার সাথে জড়িত রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধেই অভিযান চালাচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী সরকারি টার্গেটের অন্তর্ভুক্ত নয়। জামায়াতে ইসলামীও অন্যান্য দলের মতো বেআইনীই আছে। তবু আমরা ইসলামের কিছু কাজ করতে পারি কিনা তা বিবেচনা করা উচিত। রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড বলে গণ্য নয় এমন কী কী কাজ করা যায় তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

আমরা নিম্নরূপ কর্মসূচি সম্পর্কে একমত হলাম ঃ

১. মসজিদে জুমুআর পূর্বে ইসলামকে পূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা। যারা যথাযথভাবে বক্তব্য রাখার যোগ্য তারা সবাই এ দায়িত্ব পালন করবেন। দশ দিনের আলোচ্য বিষয় ঠিক করে মসজিদে আলোচনা শেষ হলে আরেক মসজিদে আলোচনা করবেন।

২. যতো জায়গায় জামায়াতের কর্মীদের নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক হতো, সেখানে সাপ্তাহিক দারসে কুরআন চালু করা।

৩. কয়েক মাস পর ঢাকায় জেলার দায়িত্বশীলদের সপ্তাহব্যাপী তারবিয়াতী প্রোগ্রাম করা (তখন জেলার সংখ্যা ছিলো ১৭)।

এ তিন দফা কর্মসূচি চালু করার পর অবস্থা বুঝে কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হবে।

সর্বসম্মতভাবে এ কর্মসূচি প্রণয়নের পর প্রশ্ন উঠলো যে, প্রাদেশিক আমীর মাওলানা আবদুর রহীমের সম্মতি ছাড়া এ কর্মসূচি চালু করা উচিত কিনা। এ বিষয়েও সবাই একমত হলাম যে, তাঁর সম্মতি নেবার পরই কাজ শুরু করতে হবে। জনাব আবদুল খালেকের উপর দায়িত্ব দেওয়া হলো, তিনি মাওলানার বাসায় যেয়ে খোঁজ নেবেন যে, তিনি কোথায় আছেন। তাঁকে খবর দিয়ে ঢাকা আনতে হবে।

আব্দুল খালেক সাহেব খোঁজ নিয়ে জানালেন যে, সপ্তাহখানিক আগে তিনি ঢাকা এসেছেন। আমরা ৫ জন তাঁর সাথে দেখা করার জন্য তাঁর বাসায় যেতে চাইলে তিনি তা নিরাপদ মনে করলেন না। আমরা অন্যত্র মাওলানা সাহেবসহ বৈঠকে মিলিত হলাম। বৈঠকে প্রথমেই ঢাকা বিভাগীয় আমীর সাইয়েদ হাফীযুর রাহমান মাওলানা আবদুর রহীমকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সামরিক আইন জারির সাথে সাথে জামায়াতের কোন দায়িত্বশীলকে কিছু না বলে আপনি গ্রামের বাড়িতে কেনো চলে গেলেন?

আবদুল খালেক সাহেব অনুযোগের সুরে বললেন, "আপনি আমাদের আমীর, দেশে এতোবড় একটা রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার পর সবাইকে ফেলে একা পালিয়ে গেলেন কেমন করে? ঢাকায় ফিরে এসে আপনার সাথী সেক্রেটারিকেও জানালেন না যে, আপনি এসেছেন। সেক্রেটারির দাওয়াত পেয়ে আমরা ঢাকা এলাম এবং বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে একটা কর্মসূচি প্রণয়ন করলাম। আমাদেরকে ডেকে আনা আপনার দায়িত্ব ছিলো। আপনারই সভাপতিত্বে কর্মসূচি প্রণয়ন করা স্বাভাবিক ছিলো। মাওলানা লজ্জিত হয়ে বললেন, "আমার এভাবে চলে যাওয়া ঠিক হয়নি, আমি দুঃখিত।" যা হোক উক্ত বৈঠকে আমাদের প্রণীত ৩ দফা কর্মসূচি মাওলানা সাহেব অনুমোদন করলেন।

৮৩.

৩ দফা কর্মসূচি চালু

সামরিক শাসন রাজনৈতিক দল অবৈধ ঘোষণা করায় জামায়াতে ইসলামীর নামে কোন কাজই করার উপায় ছিলো না। এ পরিস্থিতিতে তিন দফা কার্যক্রমের মাধ্যমে দীনের যথাসাধ্য খেদমত করা এবং জামায়াতের জনশক্তিকে সক্রিয় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় দফার কাজ ঢাকায় শুরু হয়ে গেলো। এ নতুন কর্মসূচির খবর দেশের সর্বত্র পৌছানো সহজ ছিলো না। লিখিত আকারে জানানোও নিরাপদ

মনে করা হয়নি। বিভাগীয় আমীরগণ নিজ নিজ বিভাগীয় শহরে কাজ শুরু করলেন এবং লোক-মারফতে জেলার দায়িত্বশীলদেরকে জানান। জেলা থেকে মফস্বলে খবর পৌঁছে। এভাবে কর্মসূচি সর্বত্র জানাতে মাস তিনেক লেগে যায়।

ঢাকায় যারা জুমুআর নামাযের পূর্বে মসজিদে ধারাবাহিক বক্তব্য রাখার যোগ্য, তাদেরকে নিজের পছন্দমতো মসজিদ বাছাই করার দায়িত্ব দেওয়া হলো। মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও ইমামের সম্মতি সব জায়গায় পাওয়া গেলো না। যেখানে ইমাম নিজেই বক্তব্য রাখেন সেখানে তো সুযোগ পাওয়ার উপায়ই নেই। তবে এ রকম জায়গায় অনুমতি নিয়ে নামাযের পর বক্তব্য রাখা যায়। কিন্তু নামাযের পর খুব কম সংখ্যক লোকই থাকে।

আমি মতিঝিল এলাকায় পীরজঙ্গী মসজিদে বক্তব্য রাখার সুযোগ পাই। ওখানে অনেক সরকারি কর্মচারী উপস্থিত হতেন। মুসল্লীগণ প্রায় সবাই শিক্ষিত হওয়ায় বক্তব্য রাখায় খুব উৎসাহ বোধ করতাম। মাস দু'য়েক পর সপ্তাহে একদিন মসজিদে দারসে কুরআনের প্রস্তাব দিলাম। অত্যন্ত আনন্দের সাথে তারা সাড়া দিলেন। এক নির্দিষ্ট বারে মাগরিব থেকে ইশার মাঝখানের সময়টা সবাই পছন্দ করলেন।

যখন ১৯৬২ সালের জুন মাসে সামরিক শাসন উঠিয়ে নেওয়া হলো, তখন দারসে শরীকদের মধ্যে অনেকেই জামায়াতে ইসলামীর কর্মী হন। বেশ কয়েকজন রুকনও হয়ে যান। এভাবেই ঢাকা শহরে যে সব মসজিদে বক্তব্য রাখা ও দারসে কুরআন চালু হয়, সেখানকার মুসল্লীদের মধ্য থেকেই জামায়াতের কর্মী সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। সামরিক শাসনামলের এ কর্মসূচি ইসলামী আন্দোলনের জন্য অত্যন্ত সহায়ক প্রমাণিত হয়। জামায়াতের দায়িত্বশীল ও অগ্রসর কর্মীদের এভাবেই ইকামাতে দীনের কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালনের সুযোগ হয়।

দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি ছিলো, জামায়াতের কর্মীদের সাপ্তাহিক বৈঠক চালু করা। প্রথমে শুধু দারসে কুরআনের মধ্যেই এ কর্মসূচি সীমাবদ্ধ রাখা হয়। সপ্তাহে একবার মিলিত হওয়ার সুযোগে কর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের অভ্যাস চালু রাখার তাকিদ দেওয়া সহজ হয়। সবাই অনুভব করে যে, জামায়াতের সাইনবোর্ড না থাকলেও জামায়াত জীবিতই আছে। ধীরে ধীরে সাপ্তাহিক বৈঠকে মৌখিকভাবে কর্মীদের নিকট থেকে ব্যক্তিগত রিপোর্ট নেওয়াও সম্ভব হয়।

ঢাকা শহরের অগ্রসর কর্মীদেরকে মাঝে মাঝে কারো বাড়িতে সমবেত করে দারসে কুরআনের ব্যবস্থা করা হয়। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম দারস দিতেন। মাওলানার দারস অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিলো। আমি এতো মুগ্ধ হতাম যে, মাওলানার দারসের প্রতিটি কথা নোট করে নিতাম এবং তাঁরই অনুকরণ করে অন্যত্র দারস দিতাম। তাঁর দারসের একটি বৈশিষ্ট্য আমাকে খুবই মোহিত করতো। তিনি কুরআনের কোন কোন শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাফসীরে 'রুহুল মাআনী' থেকে

আরবী উদ্ধৃতি দিয়ে চমৎকার ভাষায় ব্যাখ্যা করতেন। মাওলানার দারস দায়িত্বশীলদেরকে সক্রিয় থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করতো।

দশ দিন ব্যাপী তারবিয়াতী ক্যাম্প

সন তারিখ সঠিক মনে নেই। ১৯৫৯ সালের শেষদিকে অথবা ৬০ সালের প্রথমদিকে ঢাকায় দশ দিন ব্যাপী একটি তারবিয়তী ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। রামাদান মাস ছিলো। মতিঝিল এলাকায় বর্তমানে যেখানে বিরাট ওয়াপদা বিল্ডিং রয়েছে, এ জায়গাটা খালি ময়দান ছিলো। ময়দানের পূর্ব কিনারায় মেঝে পাকা করা টিনের মসজিদ ছিলো। মসজিদের ইমাম এক যুবক আলেম ছিলেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক থাকায় সেখানেই আমরা ক্যাম্প করার সুযোগ পেলাম।

দশ দিন ব্যাপী ঐ শিক্ষাশিবিরে যারা উপস্থিত হয়েছিলেন, তাদের বেশ কয়েকজন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। ঐ শিবিরে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে জনাব মাস্টার মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমন কিছু তথ্য তাঁর স্মৃতি থেকে সংগ্রহ করেছি, যা আমার মনে ছিলো না। বিশেষ করে যারা ১০ দিন ব্যাপী শিবিরে অবস্থান করেছিলেন তাদের নামগুলো মাস্টার সাহেবের সাহায্য না পেলে উদ্ধার করা সম্ভব হতো না। নিম্নে তাদের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

জনাব আব্বাস আলী খান, জনাব আবদুল খালেক, মাওলানা আবদুল আলী (ফরিদপুর), মাওলানা তমীজুদ্দীন (দিনাজপুর), মাওলানা আবদুস্ সুব্হান (পাবনা), মাওলানা একিউএম সিফাতুল্লাহ (কুমিল্লা), ডা. শামসুল আলম (কুমিল্লা), মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (সুনামগঞ্জ), মাওলানা আবদুর রাহমান ফকীর (বগুড়া), মাওলানা আবদুল গফুর (গাইবান্ধা), হাফিয মাওলানা নূরুল ইসলাম (কাতলাশেন-ময়মনসিংহ), জনাব শামসুল হক (সিলেট), মাওলানা ইখলাসুল মুমিনীন (সিলেট), হাফিয মাওলানা লুৎফুর রাহমান (সিলেট), অধ্যাপক আবদুল্লাহ (নোয়াখালী), জনাব আবদুস সাত্তার (ফেনী), মাওলানা রুহুল আমীন (নোয়াখালী), মাওলানা ফযলুর রাহমান (বরিশাল), শহীদ মাওলানা হাতেম রাশেদী (খুলনা), মাওলানা অধ্যাপক হেলালুদ্দীন (ঢাকা), জনাব আবদুর রশীদ (ঢাকা, বর্তমানে কোলকাতায়), হেড মাস্টার সাইয়েদ হাফীযুর রহমান (ঢাকা), জনাব মুহাম্মদ আবদুস সালাম (ছাত্র-ঢাকা-বর্তমানে লন্ডনে দাওয়াতুল ইসলামের নেতা) প্রমুখ। মোট কতজন ছিলেন মনে নেই। মাস্টার শফীকুল্লাহ সাহেব ৭২ জন ছিলেন বলে মনে করেন। এতো বলে আমার মনে হয় না।

তারবিয়াতী শিবিরের কর্মসূচি

১. সকাল ৯ টা থেকে ১২:৩০ পর্যন্ত দারসে কুরআন, নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশিষ্টদের বক্তৃতা, গ্রুপভিত্তিক আলোচনা ও ডেলিগেটদের অনুশীলনী বক্তৃতা।

২. বিকেল ২টা থেকে আসর পর্যন্ত সুধী-সমাবেশ।

৩. তারাবীহের পর আধঘণ্টা দারসে হাদীস।

৪. সেহরীর পর ফজর পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামের জীবন থেকে শিক্ষামূলক কাহিনী ও ঘটনা আলোচনা।

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ক্যাম্পে অবস্থান করতেন না। তিনি এক বা দু'দিন দারসে কুরআন দিয়েছেন এবং সম্ভবত একদিন সুধী-সমাবেশে বক্তব্য রেখেছেন। মাওলানা আবদুল আলীই প্রধানত দারসে কুরআনের দায়িত্বে ছিলেন। সবাই তাঁর দারস তৃপ্তির সাথে শ্রবণ করতেন। মাওলানা সিফাতুল্লাহও একদিন দারসে কুরআন দিয়েছেন। দারসে হাদীস দিয়েছেন, মাওলানা নূরুল ইসলাম, মাওলানা সিফাতুল্লাহ, মাওলানা আবদুল আলী ও মাওলানা ইখলাসুল মুমিনীন।

নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য রাখার দায়িত্ব প্রধানত আমাকেই পালন করতে হয়। মাওলানা আবদুর রহীম ও জনাব আবদুল খালেক দু'দিন দুটো বিষয়ে আলোচনা রাখেন। আলোচ্য বিষয় কুরআন, ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ইত্যাদির ভিত্তিতেই বাছাই করা হতো। কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি, জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের বিভিন্ন দিক ও ইসলামকে বিজয়ী করার উপযোগী ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট ধারণা আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা চলে।

সুধী-সমাবেশে মাওলানা আবদুর রহীম, জনাব আবদুল খালেক ও মাওলানা আবদুল আলী বক্তৃতা করতেন। দশ দিনের মধ্যে ৫ দিন এ দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হয়। সুধী-সমাবেশের মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে এ ধারণাই দেওয়া হয় যে, ইসলাম শুধু অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম নয়; বরং একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলামকে জীবনে মেনে চলাই যথেষ্ট নয়; বরং ইসলামকে বিজয়ী করাই মুসলিম জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আমরা যারা ঐ তারবিয়াতী শিবিরে দশ দিন একসাথে ছিলাম, তারা সবাই উপলব্ধি করেছি যে, এ কয়টা দিন আমাদের জীবন গড়ায় বিরাট ভূমিকা রেখেছে। দীনের ভিত্তিতে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি পেয়েছে। ইকামাতে দীনের জন্য জান ও মাল আল্লাহর পথে কুরবানী দেবার জযবা বেড়েছে। কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের সংকল্প দৃঢ় হয়েছে।

রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত দশ দিনের শিক্ষাশিবির

ঢাকার উপরিউক্ত তারবিয়াতী ক্যাম্পের আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯৫৭ সালে রাজশাহী শহরে অনুষ্ঠিত দশ দিন ব্যাপী ট্রেনিং ক্যাম্পের কথা মনে পড়ে গেলো। মাওলানা মওদূদী ১৯৫৬ সালে পূর্ব-পাকিস্তান সফর শেষে আমাকে রাজশাহী বিভাগের আমীর নিয়োগ করার পর রাজশাহী শহরে গিয়ে ইসলামী আন্দোলনের এক উর্দুভাষী নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিকে পেলাম, যিনি আমার দায়িত্ব পালনে আর্থিক সহযোগিতা করতে আগ্রহী। তাঁর নাম এফআর খান (ফযলুর রাহমান খান), তিনি পুরানা রুকন। তখন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। সকল প্রকার সিগারেটের

এজেন্ট হিসেবে তার পাইকারি ব্যবসা ছিলো। কয়েক জেলার ডিলাররা তাঁর কাছ থেকেই সিগারেট নিতো।

আমি তাঁর নিকট প্রস্তাব দিলাম যে, রাজশাহী শহরে সকল জেলার দায়িত্বশীলদের দশ দিন ব্যাপী একটা ট্রেনিং ক্যাম্পের ব্যবস্থা করুন। মানুষের চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি না হলে কোন আন্দোলনের জন্য জান-মাল কুরবানী করার জযবা পয়দা হয় না। তিনি দশ দিন ২০ জন লোকের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থার দায়িত্ব নিলেন।

রাজশাহী বিভাগের সকল জেলা থেকে ২২ জন দায়িত্বশীল ঐ শিক্ষাশিবিরে যোগদান করেন। ঢাকায় দশ দিন ব্যাপী যে ক্যাম্পের বিবরণ দিয়েছি এতেও একই ধরনের কর্মসূচি ছিলো। তবে এতে সুধী-সমাবেশ ছিলো না। ঐ শিবিরে যারা এসেছিলেন তারাই বিভিন্ন জেলায় সাংগঠনিক নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন।

এরপর ঐ বছরই (১৯৫৭ সাল) রংপুরে ৭ দিন ব্যাপী শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। এতে রংপুর জেলার সব মহকুমার দায়িত্বশীলরা যোগদান করেন।

চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও পুনর্গঠন

১৯৫১ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে মাওলানা মওদূদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা পড়ে আমার মগজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ঐ বক্তৃতাটি 'মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এতে জামায়াতের ৪ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এর পয়লা দফাটির নামই হলো 'চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও পুনর্গঠন'।

মানুষের মগজ শূন্য থাকে না। পরিবেশের শিক্ষা ও প্রচলিত সমাজের চিন্তাধারা স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মগজ দখল করে নেয়। প্রতিষ্ঠিত সমাজকে ইসলামী সমাজে রূপান্তরিত করতে হলে মগজে প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ প্রয়োজন। মগজকে ইসলামবিরোধী চিন্তা থেকে মুক্ত করে ইসলামী চিন্তাধারায় পুনর্গঠিত করা অত্যন্ত জরুরি।

মাওলানা মওদূদী ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন কায়েমের আগেই আধুনিক সকল ভ্রান্ত মতবাদের বিশ্লেষণ করে সেসবকে মানব সমাজের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বলে বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন। অপরদিকে তিনি ইসলামকে পূর্ণ জীবন বিধান হিসেবেও আধুনিক শিক্ষিতদের উপযোগী আকর্ষণীয় ভাষায় মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। এ সব চমৎকার সাহিত্য অধ্যয়ন করে আমি উপলব্ধি করেছি যে, আমি বহু বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্তি পেয়েছি এবং ইসলামের সঠিক জ্ঞান আমার চিন্তাকে পুনর্গঠিত করছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, জনগণের সার্বভৌমত্বভিত্তিক গণতন্ত্র, জড়বাদ, দ্বন্দ্ববাদ ইত্যাদি দ্বারা আমি অবশ্যই প্রভাবান্বিত ছিলাম। অপরদিকে ধর্মীয় পরিবেশে শৈশবকাল থেকে গড়ে উঠায় ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মেনে নেবার ফলে ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত সংকীর্ণ ধারণা

অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছিলো।

মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য একদিকে ঐ সব ভ্রান্ত মতবাদ থেকে আমার চিন্তাকে বিশুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। অপরদিকে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে জানার ফলে চিন্তার পুনর্গঠন সম্পন্ন হতে থাকে।

জামায়াতে ইসলামীর সাথে জড়িত সবারই চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও পুনর্গঠন অপরিহার্য বিবেচনা করেই আমি ঐ সব শিক্ষা-শিবিরের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করি।

প্রকৃতপক্ষে, এ কাজ করতে গিয়ে আমি নিজে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি। যতোই এ সব চর্চা করেছি ততই চিন্তায় স্বচ্ছতা বেড়েছে, জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতে গেলে যে সিরিয়াস ছাত্র হতে হয়, তা আমি উপলব্ধি করে তৃপ্তিবোধ করেছি। শেখাবার চেষ্টা করা ছাড়া শিক্ষায় পূর্ণতা অর্জন অসম্ভব। স্কুল জীবনে কবিতায় পড়েছি 'বিদ্যা যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।'

কার্জন হলে সীরাত সম্মেলন

১৯৫৯ সালের নভেম্বর বা ডিসেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে তিন দিন ব্যাপী এক বর্ণাঢ্য সীরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দীনের এক নীরব ব্যবসায়ী খাদিম এ সম্মেলনের উদ্যোগ নেন। এর আর্থিক দায়িত্বই শুধু নয়, এর পরিকল্পনায়ও তিনি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর নাম হাজী বশীর উদ্দীন আহমদ। তিনি উর্দুভাষী ও অবাঙালি বলে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম হওয়ার পর করাচীতে থাকতে বাধ্য হন। কিন্তু তিনি এ দেশের মানুষকে ভালোবাসেন বলে আবার ফিরে আসেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে তিনি এখনও বেঁচে আছেন। ইসলামী ব্যাংকের স্পনসরদের মধ্যে তিনিও একজন।

হাজী বশীর উদ্দীন আহমদের সাথে আমার ইতঃপূর্বে পরিচয় ছিলো না। মাওলানা মুহীউদ্দীন খান হাজী সাহেবের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সীরাত সম্মেলনের আয়োজনে তাঁরা দু'জনেই আমাকে শরীক করলেন। মাওলানার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো। তিনিই আমাকে হাজী বশীর উদ্দীন আহমদের বাড়িতে নিয়ে যান। হাজী সাহেব আমাদের দু'জনকে সম্মেলনের আয়োজন করার দায়িত্ব দিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের বাইরে থেকে কাকে কাকে দাওয়াত দিতে হবে, সে পরামর্শও দিলেন। কোলকাতা থেকে প্রখ্যাত বাগ্মী সাইয়েদ বদরুদ্দোজা, লাহোর থেকে সীরাত লেখক কবি নাঈম সিদ্দিকী ও করাচী থেকে বিখ্যাত বক্তা মাওলানা মতীন হাশেমীকে দাওয়াত দেবার সিদ্ধান্ত হয়।

হাজী বশীর উদ্দীন আহমদ, মাওলানা মুহীউদ্দীন খান ও আমি যাবতীয় বিষয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর মাওলানা ও আমি সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করি। অর্থ যোগান দেবার দায়িত্ব হাজী সাহেব একাই পালন করতে থাকলেন।

উক্ত সম্মেলন সম্পর্কে অনেক জরুরি তথ্য আমার স্মৃতি মন্থন করে যোগাড় করতে না পেরে মাওলানা মুহীউদ্দীন খানকে ফোন করলাম। আমি তার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলাম। তিনি ফোনেই প্রয়োজনীয় তথ্য একটানা বলে গেলেন এবং আমি নোট করে নিলাম। যা জিজ্ঞেস করেছি, সঙ্গে সঙ্গে তিনি জওয়াব দিয়েছেন। চিন্তা করে স্মরণ করে থেমে থেমে তাঁকে বলতে হয়নি।

সম্মেলনের নাম কী হবে

আমরা তিনজন এ বিষয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, 'সীরাতুন্নবী' নামই সবচেয়ে উপযোগী ও সুন্দর। সীরাত মানে চরিত। সীরাতুন্নবী মানে নবীচরিত। নবী করীম (স)-এর জীবনী ও শিক্ষা সম্পর্কে যে সম্মেলনে আলোচনা হবে এর নাম এর চেয়ে সুন্দর হতে পারে না।

আমাদের দেশে 'মিলাদুন্নবী' পরিভাষাটি বেশি প্রচলিত। দোয়ার উদ্দেশ্যে যতো মাহফিল হয় এ সবেরই নাম দেওয়া হয় মিলাদ শরীফ। নতুন বাড়িতে উঠার আগে, দোকান চালু হওয়া উপলক্ষে, সন্তানের জন্ম ও পিতার মৃত্যু উপলক্ষে এবং অন্যান্য অনেক কারণেই মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা হয়। এ সবেরই আসল উদ্দেশ্য দোয়া করা। মিলাদ মাহলিফ না বলে দোয়ার মাহফিল বলাই অর্থের দিক দিয়ে বেশি সুন্দর। মিলাদ শব্দের অর্থ জন্মদিন। রাসূল (স)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১২ই রবিউল আউয়ালে মিলাদ মাহফিল করে রাসূল (স)-এর জীবনী ও শিক্ষা আলোচনা করা হলে মিলাদ পরিভাষাটি ব্যবহার করা সঠিক হয়। কিন্তু সব রকম দোয়ার মাহফিলকে মিলাদ বলা বেমানান। বিশেষ করে মৃত্যুদিবসে মিলাদের অনুষ্ঠান হাস্যকর।

মিলাদুন্নবী পরিভাষার অপব্যবহার যাতে সমাজে কমতে থাকে, সে উদ্দেশ্যেই আমরা 'সীরাতুন্নবী' নাম দেওয়া কর্তব্য মনে করেছি। সীরাতুন্নবী পরিভাষার প্রচলন বর্তমানে আল্লাহর রহমতে ব্যাপক হয়েছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে প্রতিবছর রবিউল আউয়াল মাসে ১৫ দিন ব্যাপী সীরাতুন্নবী অনুষ্ঠান করা হতো। আওয়ামী শাসনামলে সীরাতুন্নবীর বদলে মিলাদুন্নবী চালু করা হয়। মিলাদ শব্দের এতো শক্তি যে বর্তমান ৪ দলীয় জোট সরকারের আমলেও সীরাতুন্নবী পরিভাষা বহাল করা সম্ভব হয়নি।

কার্জন হলের কর্মসূচি

তিন দিন ব্যাপী সীরাতুন্নবী সম্মেলনের প্রথম দিন সভাপতিত্ব করেন মুসলিম বাংলা সাংবাদিকতার জনক ও পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা মাওলানা মুহাম্মাদ আকরাম খান, দ্বিতীয় দিন জ্ঞান-তাপস অভিধায় পরিচিত ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং শেষ দিন ঢাকার জনপ্রিয় মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা দীন মুহাম্মদ খান। বাইরের অতিথি বক্তা ছিলেন কোলকাতার বিখ্যাত বাগ্মী সৈয়দ বদরুদ্দোজা, লাহোরের প্রখ্যাত সীরাত লেখক বিশিষ্ট উর্দুকবি নাঈম সিদ্দীকী ও করাচীর জনপ্রিয় ওয়ায়েয

মাওলানা মতীন হাশমী। মাওলানা হাশমী করাচীতে অবস্থানের পূর্বে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে বসবাস করতেন। সৈয়দ বদরুদ্দোজা ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভায় সদস্য থাকাকালে ভারতের মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় নেতার ভূমিকা পালন করেন। বাংলা, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় তিনি অতুলনীয় বক্তা ছিলেন। তুফান গতিতে তিনি অনর্গল বক্তৃতা করতেন। তাঁর বক্তৃতার একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বক্তৃতার আলোচ্য বিষয়ের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন কোন শব্দের সমার্থক ৫ থেকে ১০টি শব্দ একাধারে উচ্চারণ করে শ্রোতাদেরকে বিমোহিত করে দিতেন।

স্থানীয় বক্তাদের মধ্যে যাদের নাম মনে পড়ছে, তারা হলেন ব্যারিস্টার এটিএম মুস্তাফা, ব্যারিস্টার আখতারুদ্দীন, প্রফেসর হাসানুয্যামান, অধ্যাপক আবুল কাসেম (তমদ্দুন মজলিস), মাওলানা সাইয়েদ মুসলিহুদ্দীন (নেযামে ইসলাম পার্টি), মাওলানা মুহীউদ্দীন খান ও আমি।

ঐ সময় পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন লে. জেনারেল আজম খান। তাকে সম্মেলনে অতিথি হিসেবে দাওয়াত দেওয়া হয়নি। সম্মেলনের দাওয়াতনামার একটা কার্ড গভর্নর হাউজের গেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। সম্মেলনের খবর পত্রিকায় ফটোসহ যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা হয়তো গভর্নর সাহেবের চোখে পড়ে থাকতে পারে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন হঠাৎ করেই তিনি হাজির হয়ে গেলেন। মঞ্চে আসন গ্রহণের অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি শ্রোতাদের সাথেই বসলেন। এতে তার গণমুখী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া গেলো। তিনি খুবই জনপ্রিয় গভর্নর ছিলেন।

এ সম্মেলন ঢাকা শহরে বেশ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। ঐ সময় রাজনৈতিক সকল দল অবৈধ থাকায় সভা-সমিতি ছিলো না বললেই চলে। সম্মেলনের পোস্টার সারা শহরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হলের চেয়ারে বসার পরও আগ্রহী শ্রোতারা দাঁড়িয়েই বক্তৃতা শুনতেন। কবি তালিম হোসেনের আবৃত্তির কথাও মনে পড়ছে।

সম্মেলনের বক্তাদের আকর্ষণীয় বক্তব্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে। বক্তারাও শ্রোতাদের উৎসাহ দেখে অনুপ্রাণিত হন। নবী করীম (স)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক ও শিক্ষার ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া ছিলো। আল্লাহর ফযলে সবার বক্তৃতাই উচ্চমানের ছিলো।

এ সম্মেলনের পর আমার মনে এ পরিকল্পনা জাগলো যে, 'ইসলামী সেমিনার' নামে ঢাকায় ও বড় বড় জেলা শহরে কয়েকদিন ব্যাপী প্রোগ্রাম করা হলে সামরিক আইনের অধীনে সমাজ জীবনে যে স্থবিরতা বিরাজ করছে, তাতে কিছুটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে। সে হিসেবে প্রথমে ঢাকায় এবং এরপর সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, ফরিদপুর, গাইবান্ধা, কুষ্টিয়া, বরিশাল, মাদারীপুর এবং আরও কতক জেলা ও মহকুমা শহরে এ কর্মসূচি অনুযায়ী ব্যবস্থা হয়।

৮৪.

দেশব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত

১৯৬০ সালের প্রথম দিকে চার বিভাগীয় আমীর ও ঢাকার দায়িত্বশীলদের এক বৈঠক মাওলানা আবদুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সামরিক শাসন সত্ত্বেও ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে সুধী-সমাবেশ ও জনগণের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যে কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে উক্ত বৈঠকে আলোচনা হয়। মতিঝিল এলাকায় মসজিদে ক্ষুদ্র আকারে সুধী-সমাবেশ সফল হওয়ার পর কার্জন হলে বিরাট আকারে সীরাতুন্নবী সম্মেলন জাঁকজমকের সাথে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হওয়ায় পরিবেশ অনুকূল বলেই ধারণা হয়।

আমরা সবাই একমত হলাম যে, সরাসরি রাজনৈতিক তৎপরতার সুযোগ না থাকলেও সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, সুধী সম্মেলন, সীরাত মাহফিল ইত্যাদির ব্যানারে ইসলামী চিন্তাধারা চর্চা করায় সরকারের পক্ষ থেকে কোন বাধার আশঙ্কা নেই। তাই দেশব্যাপী এ জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়।

জামায়াতে ইসলামী দীন ইসলামকে আল্লাহর মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে যেভাবে পরিবেশন করে এসেছে, জামায়াতের ব্যানার ছাড়াই দীনের ঐ ব্যাপক ধারণা সর্বত্র পরিবেশন করার দায়িত্ব পালন করাই এ সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য। মাওলানা মওদূদী (র)-এর ভাষায়, "বহমান স্রোতকে বাধা দিয়ে আটকানো যায় না। সে সব বাধা এড়িয়ে এদিক ওদিক দিয়ে পথ করে নিয়ে বয়ে যায়। ইসলামী আন্দোলনকেও অবস্থা ও পরিবেশ বুঝে চলার পথ নির্মাণ করতে হয়। আন্দোলন স্থবির থাকে না। গতিহীন হয়ে গেলে আন্দোলন মরে যেতে বাধ্য।"

আমরা ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হওয়ায় আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম। আমাদের ঈমানী দায়িত্ব পালনের পথ পেয়ে গেলাম।

মজলিসে তামীরে মিল্লাত প্রতিষ্ঠা

ইসলামের উপর সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান ছাড়াও আরও কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে 'মজলিসে তামীরে মিল্লাত' নামে একটি সংস্থা করা জরুরি বিবেচনা করা হয়। এ সংগঠন ঢাকা নগরীভিত্তিক করাই সমীচীন মনে করা হয়। দেশব্যাপী কোন সংগঠন করা হলে এটাকে রাজনৈতিক বলে চিত্রিত করা হতে পারে। জেলা ও মহকুমা শহরে ব্যাপকভিত্তিক সেমিনার কমিটি গঠন করলেই চলবে বলে ধারণা করা হয়।

'মজলিসে তামীরে মিল্লাত' গঠন করার সময় মাওলানা মুহাম্মদ আঃ রহীমকে সভাপতি এবং আমাকে এর সেক্রেটারি করা সাব্যস্ত হয়।

এ সংস্থারই উদ্যোগে ১৯৬৩ সালে ডেমরা থানার মীর হাজীরবাগে একটি ছোট্ট টিনের ঘরে 'তামীরে মিল্লাত মাদরাসা' শুরু হয়। হযরত মাওলানা শামসুল হক

ফরিদপুরী (র) এর উদ্বোধন করেন। আল্লাহ তাআলা এ মাদরাসাটিকে কবুল করেছেন। বর্তমানে এ দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দেশের সেরা কয়েকটি মাদরাসার মধ্যে গণ্য। এর সুনামের ফলে টঙ্গীতেও এর শাখা কায়েম হয়েছে এবং সেখানেও কামিল ক্লাস পর্যন্ত চালু হয়েছে।

ছাত্র অঙ্গনে ইসলামী আন্দোলন

সামরিক শাসন কায়েম হওয়ার কারণে ইসলামী ছাত্র সংঘের নামে সংগঠন চালু রাখা যায়নি। সংঘের ছাত্ররা 'ইসলামী ছাত্র মিশন' নামে ছাত্রদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত চালু রাখার ব্যবস্থা করে। ১৯৬২ সালের জুন পর্যন্ত এ নামেই সারাদেশে ছাত্রদের সাংগঠনিক তৎপরতা জারি থাকে। জুনের পয়লা তারিখে সামরিক আইন প্রত্যাহার করার সাথে সাথেই জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র সংঘের তৎপরতা নিজস্ব নামেই আবার চালু হয়ে যায়।

ঢাকায় ইসলামী সেমিনার

মজলিসে তামীরে মিল্লাতের উদ্যোগে ঢাকাস্থ সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুল ময়দানে ১০ দিন ব্যাপী এক ইসলামী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালের শীতকালে রমাদান মাসে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে এর আয়োজন করা হয়। ঢাকা শহরের সর্বত্র বিরাট পোস্টারের মাধ্যমে এর প্রচারণার ব্যবস্থা হয়। ঢাকার ইসলামপ্রিয় শিক্ষিত মহলে বেশ সাড়া পড়ে। প্রতিদিনই শ্রোতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সামরিক শাসনামলের পরিবেশে এতবড় একটা অনুষ্ঠান সবার মধ্যেই প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ঐ সময় এ বিরাট অনুষ্ঠানটিকে এক ঐতিহাসিক ঘটনা বলে আমি মনে করি। ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এমন গবেষণালব্ধ জ্ঞান সেখানে পরিবেশন করা হয়েছে, যা শ্রোতাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দান করেছে।

ঐ সেমিনারের গুরুত্ব অনুভব করেই আমি এর বিস্তারিত তথ্য যোগাড় করার প্রয়োজনবোধ করি। আমার স্মৃতির উপর নির্ভর করে যা সংগ্রহ করলাম তা মোটেই সন্তোষজনক নয় বলে আমি বেশ উদ্বিগ্ন হলাম। উক্ত সেমিনারের প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও দারসসমূহের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিলো। এর নাম দেওয়া হয়েছিলো 'চিন্তাধারা'। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ও জনাব মুহাম্মদ নূরুয্যামানের সম্পাদনায় চিন্তাধারা সংকলিত হয়। এর কোন কপি যোগাড় করতে পারলে বহু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে বলে আমার স্পষ্ট ধারণা ছিলো। আমার নিকট এর কোন কপি নেই। কোথা থেকে একটি কপি সংগ্রহ করা যায় এ ধান্দায়ই ছিলাম।

গত ৩ আগস্ট জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদের সরকারি বাসভবনে খাবার দাওয়াতে গেলাম। সেখানে জামায়াতের নেতৃস্থানীয় সবাই আমন্ত্রিত ছিলেন। এমনকি জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিসে কর্মরত স্টাফের সবাই ঐ দাওয়াতে শরীক ছিলেন। খাবার আগে ইশার নামায শেষে মাওলানা একিউএম ছিফাতুল্লাহকে ডেকে কাছে বসিয়ে আলাপ

করলাম। তিনি ১৯৫৯ সালের রামাদানে ওয়াপদা মসজিদে অনুষ্ঠিত ১০ দিন ব্যাপী তারবিয়্যাত ক্যাম্পে ছিলেন বলে ঐ সম্পর্কিত কিছু তথ্য জানতে চাইলাম। তার সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি জানালেন যে, সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে অনুষ্ঠিত সেমিনার সংকলনটি তিনি কোথাও থেকে ফটো কপি করে সংরক্ষণ করেছেন। আমি আনন্দে উৎফুল্ল হলাম। আজ (১৪/৯/০২) তারিখে মাওলানা আমাকে ঐ ফটো কপিটি দিলেন। আল্লাহর হাজারো শোকর যে এভাবে অপ্রত্যাশিতরূপে ঐ সংকলনটি সংগ্রহ করা গেলো। আমার এ কিস্তির লেখা এর অপেক্ষায় কয়েকদিন মুলতবি রেখেছিলাম। চিন্তাধারার কপিটি পাওয়ার পর এ লেখা শুরু করা হলো। আমি মাওলানা ছিফাতুল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি সুতা দিয়ে সেলাই করা অবস্থায় একটা ফাইলে করে সংকলনটি আমাকে দিলেন। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এটা সুন্দর বাঁধাই করে তাকে ফেরত দেবো। আমার সেক্রেটারি নাজমুল হক প্রস্তাব দিলো যে, সংকলনটির গুরুত্ব বিবেচনা করে কম্পিউটারে টাইপ করিয়ে নিলেই ভালো হয়। কারণ ফটো কপিতে সব অক্ষর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। আমি উৎসাহের সাথে প্রস্তাবটি গ্রহণ করলাম। নাজমুল হক এর দায়িত্ব নেওয়ায় নিশ্চিন্ত হলাম।

এ দেশে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে ঐ সেমিনারটি এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাই "চিন্তাধারা" নামক সংকলনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।

সেমিনার উপলক্ষে তারবিয়াতী প্রোগ্রাম

সেমিনারকে উপলক্ষ করে ১০দিন ব্যাপী এক তারবিয়াতী প্রোগ্রামও গ্রহণ করা হলো। সত্যি বলতে কি, এটাই ছিলো আসল উদ্দেশ্য। আর প্রকাশ্যে সেমিনার অনুষ্ঠান করা হলো, যাতে স্কুলে এতো লোকের সমাগম দেখে অবাঞ্ছিত ঔৎসুক্য সৃষ্টি না হয়। সকাল ৮টা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এবং সেহরী ও ফজরের জামায়াতের মাঝখানের সময়টুকু জামায়াতে ইসলামীর ঐতিহ্য অনুযায়ী তারবিয়াতী কর্মসূচি পালন করা হয়। সারাদেশ থেকে দু'শরও বেশি লোক ঐ শিক্ষা শিবিরে যোগদান করেন। ১৯৫৯ সালের রামাদানে ওয়াপদা মসজিদে শুধু জেলা দায়িত্বশীলগণকে সুযোগ দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালের শিক্ষা শিবিরে মহকুমা ও থানা পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণও শরীক হন। দশ দিন ব্যাপী এ দুটো তারবিয়াতী ক্যাম্প এ দেশে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের মধ্যে ইসলামী মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলা, ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে স্বচ্ছ ধারণা দান করা ও ইকামাতে দীনের জন্য জান-মালের কুরবানীর জযবা পয়দা করার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছে।

বর্তমানে ইংল্যান্ডে 'দাওয়াতুল ইসলাম' নামক সংগঠনের সাবেক আমীর জনাব মুহাম্মদ আবদুস সালাম জগন্নাথ কলেজে ডিগ্রি ক্লাসের ছাত্র থাকাকালে উপরিউক্ত ১০ দিন ব্যাপী দু'টো শিক্ষা শিবিরেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি লন্ডনে কয়েকবার, বিশেষ করে গত বছর অক্টোবরে বলেন, "ঢাকায় ছাত্র জীবনে দু'টো শিক্ষা শিবিরে

ইসলামের যে আলো পেয়েছিলাম, সেটাই এখনো আমার আসল পুঁজি।" আমি গত বছর দাওয়াতুল ইসলামের শিক্ষাশিবিরে দু'দিন কয়েকটি বিষয়ে বক্তব্য রেখেছি। তখন প্রসঙ্গক্রমে ঐ কথাটি তিনি আবার বললেন।

সেমিনারের কর্মসূচি

১০ দিন ব্যাপী সেমিনার প্রতিদিন যোহরের নামাযের পর শুরু হয়ে আসরের পূর্বে শেষ হতো। প্রথমে দারসে কুরআন বা দারসে হাদীস পেশ করা হতো। এরপর নির্দিষ্ট বক্তা লিখিত প্রবন্ধ বা বক্তৃতা আকারে পূর্ব ঘোষিত বিষয়ে আলোচনা করতেন। সর্বশেষে সভাপতি তার সুচিন্তিত ভাষণ দিতেন।

'চিন্তাধারা' সংকলনটিতে মজলিসে তামীরে মিল্লাতের তামুদ্দুনিক সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ নূরুয্যামানের বক্তব্যে সভাপতিগণের তালিকা পেলাম ঃ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ ইসহাক, নেযামে ইসলাম পার্টির নেতা এডভোকেট ফরিদ আহমদ, মাওলানা আবদুর রহীম, সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুলের হেড মাস্টার জনাব আমীরুল হক, রহমতুল্লাহ হাই স্কুলের হেড মাস্টার সাইয়েদ হাফীজুর রহমান ও কায়েদে আযম ডিগ্রি কলেজের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী কলেজ) অধ্যক্ষ এএমআর ফাতেমী।

'চিন্তাধারা' সংকলনের প্রকাশক মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম 'প্রকাশকের কথা' শিরোনামে লিখেছেন, "সেমিনারে দশ দিনের ১৯টি অধিবেশনে মোট ১৯টি ভাষণ, ৬টি দারসে কুরআন, ৪টি দারসে হাদীস পেশ করা হয়। এর মধ্যে লিখিত আকারে ১৩টি ভাষণ, ৪টি দারসে কুরআন ও ১টি দারসে হাদীস পাওয়া গেলো, যা সংকলনে শামিল করা সম্ভব হয়েছে।"

মাওলানা যে ১৯টি ভাষণের কথা উল্লেখ করেছেন এর ১০টি প্রকাশ্য অধিবেশনে এবং ৯টি সকালের তারবিয়াতী অধিবেশনে পেশ করা হয়।

সেমিনারে পেশকৃত বক্তৃতা ও বক্তা

১. বিশ্ব সমস্যা ও ইসলাম ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম।

২. সুন্নাতে রাসূল (স) ঃ মাওলানা আবদুল আলী।

৩. শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামী রূপ ঃ অধ্যাপক গোলাম আযম

৪. কুরআনে বিজ্ঞান ঃ ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম মোয়ায্যাম।

৫. বর্তমান বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন ঃ মাওলানা একিউএম ছিফাতুল্লাহ।

৬. বিশ্ব নবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতি ঃ অধ্যাপক গোলাম আযম।

৭. ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ঃ জনাব আবদুল খালেক।

৮. মার্কসীয় দর্শন ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম।

৯. ইসলামী সমাজে নারীর স্থান ঃ জনাব আব্বাস আলী খান।

১০. ইজতিহাদ ও ইসলামী আইন ঃ মাওলানা আবদুল আলী।

১১. ইসলামী সমাজে ব্যাংক ঃ জনাব নূর মুহাম্মদ আকন।

১২. পাকিস্তানের আদর্শ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম।

১৩. ইতিহাস দর্শন ও ইসলাম ঃ শাহ্ আবদুল হান্নান।

সেমিনারে পেশকৃত দারসে কুরআন ও হাদীস

১. ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য (সূরা রূম, ১ম রুকূ) ঃ অধ্যাপক গোলাম আযম।

২. সূরায়ে ইউসুফের পয়গাম (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৮-১১০) ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম।

৩. ইসলামী আন্দোলন ও ঈমানের পরীক্ষা (সূরা আনকাবূত ১ম দু'আয়াত) ঃ মাওলানা হেলাল উদ্দীন।

৪. ইসলামে সিয়াম সাধনার গুরুত্ব ঃ অধ্যাপক আফতাব আহমদ রহমানী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

৫. দারসে হাদীস—জিহাদ ও তার লক্ষ্য ঃ মাওলানা নূরুল ইসলাম (মোমেনশাহীর কাতলাশেন মাদরাসা)

যেসব বক্তৃতা ও দারস লিখিত আকারে পাওয়া যায়নি সেসব মূল্যবান বক্তব্য ও বক্তাগণের নাম চিন্তাধারায় উল্লেখ না থাকায় উদ্ধার করা গেলো না। উপরিউক্ত প্রবন্ধ ও দারসসমূহের গুরুত্ব বিবেচনা করে 'চিন্তাধারা' সংকলনটির পুনঃপ্রকাশ প্রয়োজন মনে করি।

জেলা ও মহকুমা শহরে সেমিনার অভিযান

ঢাকায় বিরাট আকারে সেমিনারের সাফল্য আমাদেরকে জেলা ও মহকুমা শহরে ৩ দিন ব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করায় উদ্বুদ্ধ করলো। এ অভিযান শুরু করার পূর্বে আমি উপদেশ ও সহযোগিতা পাওয়ার আশায় কিশোরগঞ্জে যেয়ে নেযামে ইসলাম পার্টির সভাপতি মাওলানা আতহার আলীর সাথে দেখা করলাম। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নেযামে ইসলাম পার্টি প্রাদেশিক আইনসভায় ২২টি আসন পেয়েছিল। বিভিন্ন জেলায় এ পার্টির সংগঠন থাকাই স্বাভাবিক। জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন সকল জেলা ও মহকুমা শহরে সমান মযবুত নয়। তাই সারাদেশে ইসলামী সেমিনার অভিযানকে সফল করতে হলে নেযামে ইসলাম পার্টির সহযোগিতা প্রয়োজন মনে করেই কিশোরগঞ্জ গেলাম।

মাওলানা সাহেবের সাথে দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে তিনি আমাকে সাদরেই গ্রহণ করলেন। আমার সাক্ষাতের উদ্দেশ্য জানাবার পর তিনি যা বললেন, তাতে আমি বিস্মিত, দুঃখিত ও হতাশ হলাম। তিনি বললেন, "যদ্দিন আমার কাছে ধান ছিলো তদ্দিন বাবুই পাখির অভাব ছিল না। এখন ধানও নেই, পাখিও নেই।"

ইঙ্গিতে আমাকে সুস্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি যখন এমএনএ ছিলেন এবং তার নেতৃত্বে যখন ২২ জন এমপিএ ছিলেন তখন সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য যারা ভিড় জমাতো এখন কোন সুযোগ নেই বলে আর কেউ তার কাছে আসে না। তাই আমার সাথে সহযোগিতা করার মতো কাউকে নির্দেশ দেবার কোন সাধ্য তার নেই। আমার মনে বিরাট প্রশ্নের সৃষ্টি হলো। নেযামে ইসলাম পার্টির সভাপতি হিসাবে ইসলামী নেযাম কায়েমে নিবেদিতপ্রাণ কোন লোকই তিনি যোগাড় করতে পারেননি? শুধু দুনিয়ার স্বার্থ লাভের আকাঙ্ক্ষী লোকই তাঁর পাশে জড় হয়েছিলো? দীনের মুখলিস কোন লোকই এখন তাঁর সংস্পর্শে নেই? এটা কি সত্যিই সঠিক কথা?

আমি বললাম, "নেযামে ইসলাম পার্টির প্রাদেশিক সেক্রেটারি মাওলানা আশরাফ আলী ধরমণ্ডলীকে একটু বলে দেন, যেন এ পরিবেশে ইসলামের যতটুকু খেদমত করা যায়, সে বিষয়ে আমাকে সহযোগিতা করেন।" তিনি জওয়াবে বললেন," সে তো ইতোমধ্যে বেশ জমি-জমার মালিক হয়ে সুখেই আছে। আমার সাথে কোন যোগাযোগ রাখে না।"

নেযামে ইসলাম পার্টিতে সবাই দুনিয়ার স্বার্থে শরীক হয়েছিলেন কিনা আল্লাহ তাআলাই জানেন। মাওলানার কথা থেকে এ ধারণা হওয়ারই কথা। এ বিষয়ে আমার কোন ধারণা পোষণের প্রয়োজন নেই। আমি শেষ পর্যন্ত এটুকুই বুঝলাম যে, মাওলানা সাহেব ইসলামের জন্য সাংগঠনিকভাবে নিজেতো কিছুই করছেন না, আমাকে সহযোগিতা করাতো দূরে থাক, সামান্য উৎসাহও দিলেন না।

সেমিনার অভিযানের মাধ্যমে নেযামে ইসলাম পার্টির কুষ্টিয়া জেলা সভাপতি মাওলানা মিসবাহুর রহমান জামায়াতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং দীর্ঘদিন কুষ্টিয়া জেলায় আমীরের দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলামী আন্দোলনে সেমিনার অভিযানের বিরাট অবদান

বহু জেলা ও মহকুমা শহরে ১৯৬১ ও ৬২ সালে ইসলামী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা ও সিলেট শহরে ৫ দিন ব্যাপী এবং অন্যান্য শহরে ৩ দিন ব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার সেমিনারে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে এর ভিত্তিতে বাইরের সেমিনার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করা হয় ঃ

১. সেমিনারের এন্তেজামিয়া কমিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান এলাকার গণ্যমান্য ও জনপ্রিয় লোকদেরকে করতে হবে। সেক্রেটারীর দায়িত্ব জামায়াতের দায়িত্বশীলদের হাতে থাকবে। এলাকার ইসলামপন্থী সব মহলের লোককে কমিটির সদস্য হিসাবে সম্পৃক্ত করতে হবে।

২. প্রতিদিন সকাল, বিকাল ও সন্ধ্যায় তিনটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

৩. প্রতি অধিবেশনে স্থানীয় প্রভাবশালী আলেম, এডভোকেট, কলেজের অধ্যক্ষ, জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রমুখকে সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত করা হবে।

৪. নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা করার দায়িত্ব শুধু জামায়াতে ইসলামী থেকেই বাছাই করতে হবে এবং তাদেরকে প্রধান বক্তা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।

৫. জামায়াতের বাইরের জনপ্রিয় বক্তাদেরকে প্রধান অতিথি হিসাবে রাখতে হবে। তবে তাদেরকে নির্দিষ্ট বিষয় না দিয়ে স্বাধীনভাবে বক্তৃতা করতে দিতে হবে। কারণ তারা নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা করায় অভ্যস্ত নন।

এ সব নীতি অনুযায়ী সেমিনার অনুষ্ঠিত হওয়ার উপকারিতা সেমিনার চলাকালেই উপলব্ধি করা গেল ঃ

১. জামায়াতের নামে অনুষ্ঠান না হওয়ায়, এন্তেজামিয়া কমিটির চেয়ারম্যান কোন দলের না হওয়ায় এবং সকল মহলের লোক কমিটিতে থাকায় ইসলামপ্রিয় সবারই আর্থিক সহযোগিতাসহ সব রকম সহানুভূতি পাওয়া গেলো।

২. আধুনিক শিক্ষিত ও আলেম সমাজের অনেকেই সেমিনারে শ্রোতা হিসেবে উৎসাহের সাথে শরীক হয়েছেন।

৩. প্রধান বক্তারা নির্দিষ্ট বিষয়ে যে তথ্যপূর্ণ মূল্যবান বক্তৃতা পরিবেশন করেছেন তা শ্রোতাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। সভাপতিগণ, প্রধান বক্তাগণ এবং এন্তেজামিয়া কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে এ জাতীয় বক্তৃতা শুনাবার সুযোগ পাওয়ায় আমরা অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করেছি। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা, রাসূল (স)-এর কায়েম করা সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা, বিশ্ব নবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিসহ সুন্দরভাবে গুছিয়ে পরিবেশিত বক্তৃতা লোকদের তন্ময় হয়ে শুনতে দেখেছি। প্রধান অতিথি ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপর এর যে নৈতিক প্রভাব পড়তো তা তাদের আচরণ থেকে টের পাওয়া যেতো। সভাপতির ভাষণে মূল বিষয়ে প্রদত্ত বক্তৃতার প্রশংসায় কেউ কার্পণ্য করেননি।

সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর জামায়াতে ইসলামী ১৯৬২ সালের জুন মাসে নতুন করে যখন সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করে তখন ঐ সব সেমিনারের সুফল অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে। আগে যারা জামায়াতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছেন তাদেরকেও যথেষ্ট নমনীয় দেখা গেলো। সেমিনারের আয়োজনে বিভিন্নভাবে যারা শরীক ছিলেন তাদের মধ্যে বেশ কিছু লোক সংগঠনভুক্ত হয়ে গেলেন।

সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনা ইত্যাদি ওলামাপ্রধান শহরগুলোতে সেমিনার অভিযানের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলহামদুলিল্লাহ। সামরিক শাসনামলে জামায়াতের ব্যানারে কাজ করা সম্ভব না হলেও ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হয়েছে। সেমিনারসমূহ একদিকে জামায়াতে ইসলামীর চিন্তাধারা অনেক শিক্ষিত লোককে প্রভাবিত করেছে, অপরদিকে জামায়াতের সাংগঠনিক কাজ সম্প্রসারণে সহায়ক হয়েছে।

৮৫.

সামরিক শাসন প্রত্যাহারের সূচনা

১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর সেনাপতি জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ূব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে অপসারণ করে প্রেসিডেন্ট পদ দখল করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি ফিল্ড মার্শাল পদবি গ্রহণ করেন। কয়েক ডজন জেনারেলের কর্তা হিসেবে ঐ পদবি তাঁর ক্ষমতার উচ্চ মর্যাদার জন্য তিনি জরুরি মনে করেন। ঐ বছরই রাজধানী করাচী থেকে রাওয়ালপিণ্ডির নিকট স্থানান্তর করে ইসলামাবাদ নামকরণ করেন। সেনাবাহিনীর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখার উদ্দেশ্যেই যে রাজধানী স্থানান্তর করা হয়, তা বুঝতে কারো বেগ পেতে হয়নি।

আইয়ূব খান ক্ষমতায় স্থিতিশীল হওয়ার উদ্দেশ্যে জনসমর্থন হাসিলের ফন্দিতে বুনিয়াদী গণতন্ত্রের (Basic Democracy) প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে, পাকিস্তানের জনগণ সরাসরি ভোটে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচিত করার যোগ্য নয়। তাই জনগণকে গণতন্ত্র শেখাবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে বুনিয়াদী গণতন্ত্র চালু করেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। তাদেরকে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের ক্ষমতা দেবার ব্যবস্থা করেন।

ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর জেনারেল থাকাকালে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের পরিভাষা (Controlled Democracy) চালু করা প্রয়োজন বলে দাবি করেন। তখনও যেটুকু গণতন্ত্র চালু ছিল তাতে তার নতুন শ্লোগান কোন পাত্তা পায়নি। সামরিক শাসনের দাপটে আইয়ূব খান বুনিয়াদী গণতন্ত্র চালু করেন। এ নতুন গণতন্ত্রের পৃথক সুফল ভোগ করার জন্য তিনি ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ইউনিয়ন কাউন্সিলের ৮০ হাজার সদস্যদের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রহসন করেন। ঐ নির্বাচনে আর কাউকেও প্রার্থী হতে দেওয়া হয়নি। আইয়ূব খানই একমাত্র প্রার্থী। ৮০ হাজার ভোটারের ইখতিয়ার হলো 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বোধক ভোট দেওয়া। ভোটাররা জানতেন যে, 'না' ভোট দিলেও আইয়ূব খানই ক্ষমতায় থাকবেন। 'না' ভোট বেশি হলে সামরিক আইন অব্যাহত থাকবে। 'হ্যাঁ' ভোট দিলে হয়তো বেসামরিক শাসনের সূচনা হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই বিপুল সংখ্যায় 'হ্যাঁ' বোধক ভোটে তিনি জনগণের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হবার মহাগৌরব অর্জন করলেন।

নতুন শাসনতন্ত্র ও নতুন পার্লামেন্ট

বুনিয়াদী গণতন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের মর্যাদা লাভের পর তিনি একটি শাসনতন্ত্র কমিশনের মাধ্যমে প্রণীত নতুন শাসনতন্ত্র ১৯৬২ সালের পয়লা জানুয়ারি জারি করেন। ১৯৫৬ সালে জনগণের নির্বাচিত গণপরিষদ যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে এবং যে শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিলো, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর

সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ঐ শাসনতন্ত্র বাতিল করা হয়। ১৯৬২ সালে ঐ শাসনতন্ত্র বহাল না করে আইয়ূব খান নিজের মর্জিমতো শাসনতন্ত্র তৈরি করে তা চালু করেন।

এ নতুন শাসনতন্ত্রে বুনিয়াদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রাখা হয়েছে। সে মোতাবেক ১৯৬২ সালের ২৮ মার্চ জাতীয় পরিষদের (National Assembly) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর মে মাসের ৬ তারিখ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়।

এ নির্বাচনে শুধু ইউনিয়ন কাউন্সিল মেম্বাররাই ভোটার ছিলেন। রাজনীতিবিদগণ সকলে নির্বাচনে অংশ নেননি। যারা অংশ নিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, প্রথম গণপরিষদের সভাপতি মৌলভী তমীজুদ্দীন খান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলী (বগড়া), সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রমীজুদ্দীন আহমদ, ফযলুল কাদির চৌধুরী, আবদুস সবুর খান, আবদুল মোনায়েম খান প্রমুখ।

আইয়ূব শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করে যারা বিবৃতি দেন তারা হলেন, সাবেক তিন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন, আবু হোসেন সরকার ও আতাউর রহমান খান এবং হামীদুল হক চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া) ও মাহমুদ আলী প্রমুখ। বিবৃতিতে তারা দাবি করেন যে, জনগণের ভোটে নতুন গণপরিষদ গঠন করে নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে। তারা ১৯৫৬ সালে প্রণীত শাসনতন্ত্র পুনর্বাহালের দাবি তুলেননি। অথচ সে দাবি তোলাটাই বেশি যুক্তিপূর্ণ ছিল। কারণ সে শাসনতন্ত্র বাতিল করাটাই অন্যায় ছিল।

২৮ এপ্রিল (১৯৬২)-এর নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর অংশগ্রহণ

রাজনৈতিক দলসমূহ তখনও বেআইনীই ছিল। তাই দলের পক্ষ থেকে নমিনেশন দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। তবে জামায়াতের দায়িত্বশীলদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, যেখানে যেখানে সম্ভব জামায়াতের লোক প্রতিযোগিতা করবে। আল্লাহর রহমতে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে জামায়াতের নেতৃস্থানীয় ৩ জন এবং একজন অগ্রসর কর্মী নিজ নিজ এলাকা থেকে নির্বাচিত হন। জয়পুরহাট থেকে জনাব আব্বাস আলী খান, খুলনা থেকে জনাব শামসুর রহমান ও বাগেরহাট থেকে মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ এবং বরিশাল থেকে ব্যারিষ্টার আখতারুদ্দীন আহমদ।

জামায়াতের আর কে কে প্রতিযোগিতা করেছিলেন এ বিষয়ে মাওলানা ইউসুফের সাথে আলোচনা করে আমি ছাড়া আর মাত্র একজনের কথাই নিশ্চিতভাবে জানা গেলো, যিনি নির্বাচিত হননি। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম পিরোজপুর থেকে এবং আমি ঢাকা শহর, কেরানীগঞ্জ ও সিরাজদিখান থানা এলাকা থেকে। ঐ ৪ জনের মত মাওলানা আবদুর রহীমও নির্বাচিত হবেন বলে আশা করা হয়েছিল, কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি। ঢাকা থেকে নির্বাচিত হবার কোন আশা না থাকলেও জামায়াতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাকে দাঁড়াতে হল। ঢাকা থেকে ঢাকার নওয়াব

হাসান আসকারী নির্বাচিত হন।

১৯৬২ সালের ৬ মে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন হয়। এ নির্বাচনে পাবনা থেকে মাওলানা আবদুস্ সুব্হান এবং ফরিদপুর থেকে মাওলানা আবদুল আলী নির্বাচিত হন। মাওলানা আবদুস্ সুব্হান বিরোধী দলের ডেপুটি লিডার মনোনীত হন।

বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নির্বাচন বিধি

একটি নির্বাচন-বিধি উল্লেখ করছি। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে রিটার্নিং অফিসার এক একটি নির্বাচনী এলাকার ভোটার (ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য)-দেরকে এক বা একাধিক জায়গায় সমবেত করে নির্বাচনের প্রার্থীদেরকে বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দিতেন। এর নাম ছিলো পরিচিতি সভা।

আমার নির্বাচনী এলাকায় দু'টো পরিচিতি সভার ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকা শহরের পরিচিতি সভা হয় কোর্ট এলাকায় অবস্থিত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড হলে। ঢাকার বাইরের দু'থানার ভোটারদেরকে কেরানীগঞ্জ হাইস্কুলে সমবেত করা হয়। আমরা তিনজন প্রার্থী ছিলাম। একজন আজীজুর রহমান নামে এক লঞ্চ ব্যবসায়ী।

ঢাকার সমাবেশে আমি ও আজীজুর রহমান মঞ্চে বসা থাকা অবস্থায় ঢাকার সরদারগণ একদল ভোটারসহ ঢাকার নওয়াবকে সামনে নিয়ে নওয়াবের নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে হলে প্রবেশ করেন। ভাবখানা এই যে, নওয়াব ছাবকেই সবার ভোট দিতে হবে।

রিটার্নিং অফিসারের পক্ষ থেকে একজন সরকারি কর্মকর্তা সভাপতিত্ব করেন। প্রথমে আজীজুর রহমান বক্তব্য রাখেন। তিনি খুব হালকা কতক কথা বললেন। এর একটা কথা মনে আছে, "আমার নাম আজীজুর রাহমান। এর অর্থ হল আল্লাহর প্রিয়। আশা করি আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিকে ভোট দেবেন।" আমি ১৫/২০ মিনিট যা বললাম সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শান্তভাবে শুনলেন। সব শেষে নওয়াব সাহেব দাঁড়াবার সাথে সাথেই যারা তাঁকে মিছিল করে নিয়ে এলেন, তারা সবাই হাত তালি দিতে থাকলেন। সভাপতি সবাইকে চুপ করে শুনতে অনুরোধ জানালেন। নওয়াব সাহেব একটি মাত্র কথা বলেই বসে পড়লেন, "আমি নিশ্চিত হলাম যে, আপনারা সবাই আমাকেই ভোট দেবেন।"

তাঁর বক্তৃতা করার অভ্যাসই ছিল না। ঐটুকু কথাও আড়ষ্টভাবেই উচ্চারণ করলেন। সরদারগণ নওয়াবের নামে জিন্দাবাদ শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল করেই সভাস্থল ত্যাগ করলেন। নওয়াব সাহেব জাতীয় পরিষদে কোনদিন একটি কথাও না বলার দিক দিয়ে রেকর্ড স্থাপন করলেন।

জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন

১৯৬২ সালের ১ জুন সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয় এবং ৮ জুন রাওয়ালপিণ্ডিতে নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশন

শুরু হওয়ার পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত এমএনএ (Member National Assembly)-গণ মুহাম্মদ আলী বগড়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হন। তারা পূর্ব-পাকিস্তানের স্বার্থকে কেন্দ্র করে ৭ দফা দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হন। এ ঐক্য বহাল থাকলে আইয়ূব খান ঐ সব দাবি মেনে নিতে বাধ্য হতেন। চতুর আইয়ূব খান ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভ দেখিয়ে ঐক্যে ফাটল ধরাতে সক্ষম হন।

৮ জুন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। ফরিদপুরের মৌলভী তমিজুদ্দীন খান স্পীকার নির্বাচিত হন। পশ্চিম পাকিস্তানের নেযামে ইসলাম পার্টির নেতা জাস্টিস আফজাল চীমা সিনিয়র ডেপুটি স্পীকার এবং পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতা কুড়িগ্রামের আবুল কাসেম জুনিয়র ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন।

খুলনার আবদুস সবুর খান, চট্টগ্রামের ফযলুল কাদের চৌধুরী, মোমেনশাহীর আবদুল মোনায়েম খান, গোপালগঞ্জের ওয়াহিদুজ্জামান, বগুড়ার মুহাম্মাদ আলী প্রমুখ মন্ত্রিসভার সদস্য হন।

পূর্ব-পাকিস্তানী এমএনএ-গণের ঐক্য ভঙ্গ করে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সমালোচনা করে মাওলানা ইউসুফ এমএনএ পূর্ব-পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর বহু জনসভায় ঐ সময়কার ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলতেন, "পূর্ব-পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত এমএনএ-দের ঐক্য বহাল থাকলে পূর্ব-পাকিস্তানের ৭ দফা দাবি আদায় করা নিশ্চিত ছিলো। সবুর খানেরা যদি অন্তত আর একটা সপ্তাহ সবর করতেন, তাহলে আইয়ূব খান সব দাবি মেনে নিতে বাধ্য হতেন।"

জাতীয় পরিষদে আবদুস সবুর খান লিডার অব দি হাউজ নির্বাচিত হন। আর আইয়ূব খানের আপন ছোট ভাই কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা সরদার বাহাদুর খান লিডার অব দি অপজিশনের পদে নির্বাচিত হন।

জাতীয় পরিষদে জামায়াতে ইসলামীর ৪ জন, নেযামে ইসলাম পার্টির ৪ জন এবং মুফতী মাহমুদের জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের ২ জন মিলে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি ইসলামী পার্লামেন্টারি পার্টি গঠিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের নেযামে ইসলাম পার্টির নেতা মিয়া আবদুল বারী এর লিডার নির্বাচিত হন এবং জনাব আব্বাস আলী খান সেক্রেটারির দায়িত্ব পান।

আইয়ূব খানের একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন

সামরিক শাসনকর্তা ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খান বুনিয়াদী গণতন্ত্র কায়েম করে প্রথমে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হলেন। এরপর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন করে কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে তাঁর অনুগত বেসামরিক সরকার কায়েম করতে সক্ষম হলেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দাবি পূরণের জন্য এখন তাঁর একটি রাজনৈতিক দল প্রয়োজন। আইন পরিষদের সদস্যদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাঁরই সমর্থক। তাদেরকে একটি রাজনৈতিক দলের পরিচয় দিলেই ঐ দাবি পূরণ হয়। তিনি নতুন কোন নামে দল গঠন না করে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পাকিস্তান মুসলিম

লীগের যে মর্যাদা রয়েছে, সে নামটিই দখল করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের আনুগত্য করাই মুসলিম লীগের ঐতিহ্য। গোলাম মুহাম্মদ ও ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর জেনারেল থাকাকালেই এ মহান ঐতিহ্য কায়েম হয়। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে করাচীতে আইয়ূব খান মুসলিম লীগের এক কনভেনশন (সম্মেলন) আহ্বান করলেন। নামকরা মুসলিম লীগ নেতাদের শতকরা ৯০ জন ঐ কনভেনশনে যোগদান করেন। এ মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট হন আইয়ূব খান। অবশ্য প্রথমে কিছুদিন চৌধুরী খালিকুজ্জামান প্রেসিডেন্ট হিসেবে নামকাওয়াস্তে দায়িত্ব পালন করেন। যারা আইয়ূব খানের ডাকে সাড়া দিয়ে কনভেনশনে যাননি তারা দলের কাউন্সিল অধিবেশনের আয়োজন করেন এবং পাঞ্জাবের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মমতাজ মুহাম্মদ খান দৌলতানা এ মুসলিম লীগের সভাপতি হন। এভাবে সরকারি মুসলিম লীগ কনভেনশন লীগ নামে এবং অপর মুসলীম লীগ কাউন্সিল মুসলিম লীগ অভিধায় পরিচিত হয়।

আইয়ূব খান ক্ষমতায় মযবুত হয়ে বসলেন

আইয়ূব খান একই সাথে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও সশস্ত্র বাহিনী প্রধান ছিলেন। পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট হবার পর তিনি সরকারি দলেরও প্রধান হলেন। জাতীয় ও প্রাদেশিক আইসভায় মুসলিম লীগের সরকারি পার্লামেন্টারি পার্টি গঠিত হল। এভাবে আইয়ূব খানের স্বৈরশাসন পূর্ণতা লাভ করে এবং তিনি ক্ষমতার মসনদে মযবুত হয়ে বসলেন।

পূর্ব-পাকিস্তানে ছাত্র বিক্ষোভ ও রাজনৈতিক নেতাদের আইয়ূব বিরোধী আন্দোলকে দমন করার উদ্দেশ্যে লেফটেনেন্ট জেনারেল আযম খানকে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। গভর্নর জাকির হোসেন ইতোমধ্যেই ছাত্র মহলে ও রাজনৈতিক মহলে নিন্দনীয় হয়ে উঠেন । আইয়ূব শাসনকে মযবুত করার উদ্দেশ্যে সামরিক আইন প্রশাসক যে দমনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা অনুমোদন করা ছাড়া গভর্নরের কোন উপায়ও ছিল না।

লে.জে. আযম খান ১৯৬০-এর ১৫ এপ্রিল গভর্নর হয়ে এসেই দমন-পীড়নের বদলে ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি উদার আচরণ শুরু করেন। তিনি শাসকের ভূমিকার বদলে সেবকের ভূমিকা পালন করে পূর্ব-পাকিস্তানে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯৬০ সালে ১০ ও ৩১ অক্টোবরে উপর্যুপরি দুটো প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে বন্দর নগর চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকা যখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় তখন গভর্নর আযম খান দুর্গতদের প্রতি ত্রাণ-তৎপরতায় স্বয়ং হাজির হয়ে যে আন্তরিকতা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন তাতে সর্বস্তরের মানুষ তাকে ভালোবাসতে বাধ্য হয়। ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে গভর্নর পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁর বিদায়ের খবর শুনে সর্বসাধারণ রীতিমতো কান্নাকাটি করে গভর্নর হাউজে সমবেত হয়েছিলো। তিনিও কেঁদে বিদায় নিয়েছেন।

তিনি এক অদ্ভুত শাসক ছিলেন। আন্তরিকভাবে তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন। তাঁর ঐ সেবাধর্মী মনোভাব আইয়ূব খানের শাসনকে পূর্ব-পাকিস্তানে সংহত করেছে। আযম খানের এ বিপুল জনপ্রিয়তাতে আইয়ূব খান শঙ্কিত হয়েছিলেন বলেই অনেকের ধারণা। শাসন ক্ষেত্রে আইয়ূব খানের সাথে মতপার্থক্যের কারণেই আযম খান ১৯৬২ সালের এপ্রিলে পদত্যাগ করেন। প্রখ্যাত কেন্দ্রীয় আমলা গোলাম ফারুক গভর্নর হন। কয়েক মাস পরই স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি পদত্যাগ করলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবদুল মোনায়েম খান গভর্নর হন।

৮৬.

ঢাকায় আমার কর্মব্যস্ততা

১৯৫৯ ও ৬০ সালে ঢাকার বাইরে কোন সেমিনার অনুষ্ঠিত না হওয়ায় আমার কর্মব্যস্ততা ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৬১ সালে প্রথমে ঢাকায়, এরপর সারাদেশেই সেমিনার অভিযান চলে। প্রতি শুক্রবার ঢাকার বাছাই করা মসজিদে খুতবার আগে বক্তৃতার কর্মসূচি নিয়মিতই চলছিল। জুমআয় খুতবা শুরু হবার বেশ আগেই মসজিদে মুসল্লীগণ সমবেত হতে থাকেন। এ রেওয়াজ আগে থেকেই দেশে চালু ছিলো যে, খুত্‌বার আযানের ৫/৭ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় ওয়ায জাতীয় বক্তৃতা হয়। মসজিদের ইমাম আরবী খুতবার আলোচ্য বিষয় মুসল্লীদেরকে অবহিত করার জন্য বক্তব্য রাখেন। ঐ সময়টায়ই ইমাম সাহবে রাজি থাকলে বক্তৃতা করার সুযোগ হয়। ফরজের আগের ৪ রাকাআত সুন্নাত নামাজের জন্য খুতবার আযানের আগে সময় দেওয়া হয়।

মাওলানা মওদূদী (র)-এর হাকীকত সিরিজের বইগুলোতে ঈমান, ইসলাম, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ও জিহাদ সম্পর্কে যে স্বচ্ছ ধারণা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে তাই ধারাবাহিকভাবে আমি পেশ করতাম। মুসল্লীদের চেহারা ও ভাবভঙ্গি দেখে মনে হতো যে, তারা তৃপ্তির সাথে শুনছেন।

সপ্তাহে দুদিন দুটো মসজিদে দারসে কুরআন পেশ করতাম। একটি মতিঝিল পীরজঙ্গী মসজিদ ও অপরটি আজীমপুর কলোনীর ছাপড়া মসজিদ।

১৯৬০ সালে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব

আমার আব্বা মাওলানা কাযী গোলাম কবীর রমনা থানাসহ ঢাকা শহরের এক এলাকার ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ও কাযী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গোটা দেশের কাযী সমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন। আব্বা বললেন, "তোমার যখন অবসর আছে তখন আমি ৪ মাসের ছুটি নিয়ে তাবলীগে চিল্লায় যাই। এ কয় মাস তুমি একটিং ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করো। আমি সরকারি অনুমতির ব্যবস্থা করি।"

আপত্তি করার কোন কারণ ছিল না। আব্বা কুমিল্লার চান্দিনা থানায় ১৭ বছর কাযী থাকাকালে আমরা কয়েক ভাই ছুটিতে বাসায় গেলে আব্বার অফিসে কেরানীর

কাজ করেছি। বিবাহ রেজিস্ট্রি করা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা তো ছিলই। শুধু বিবাহ পড়াবার দায়িত্ব নতুন করে পালন করতে হবে।

আমাদের বাড়িতেই কাযী অফিস। কিছু সংখ্যক বিবাহ অফিসেই রেজিস্ট্রি করতে হতো এবং রেজিস্ট্রির পূর্বে বিয়ে পড়াতে হয় বলে এটাও করতাম। বেশি সংখ্যক বিয়ে কনের বা কনে পক্ষের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হতো। তখন বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য বর্তমানের মতো এত কমিউনিটি সেন্টার ছিলো না। আমাকে সেখানে যেতে হতো এবং বিয়ে পড়ানোর পর রেজিস্ট্রি করতে হতো। এসব বিয়ের অনুষ্ঠানে বর ও কনে পক্ষের যারা উপস্থিত হতেন তারা প্রায় সবাই শিক্ষিত লোক। অশিক্ষিতদের মধ্যে বিয়ে রেজিস্ট্রি কমই হতো।

আমি বিবাহের অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমবেত লোকদের মধ্যে দীন ইসলামের কিছু বুনিয়াদী কথা বলার সুযোগ নিতাম। বিয়ের খুতবা আরবীতে পেশ করার পর বর ও কনের উকিলের মধ্যে ইজাব-কবুল অনুষ্ঠান হয় এবং সর্বশেষে দোয়া করা হয়। আমি দোয়ার পূর্বে ৫/৭ মিনিট বিয়েকে উপলক্ষ করে কিছু বক্তব্য পেশ করতাম, যা লোকেরা পছন্দ করতেন। ৪ মাস তো কাযী সাহেবের দায়িত্ব হিসেবেই বিয়ে পড়িয়েছি। কিন্তু বিয়ে পড়াবার দায়িত্ব এখনো আমাকে পালন করতে হয়। আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব পালনকালে জামায়াতের লোকদের অনেক বিয়েতে আমাকে বিয়ে পড়াতে হয়েছে। এখনো এ ধারা অব্যাহত আছে। বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতে হলে অনেক সময় খরচ হয়ে যায় বলে আমি অক্ষমতা প্রকাশ করতে বাধ্য হই। দীনী ভাইয়েরা আমাকে বিয়ের পাকা মোল্লা বানিয়ে ছেড়েছেন। আমি যেতে রাযী না হলেও আমার মহল্লার মসজিদে জুমুআ, আসর বা মাগরিবের নামাজের পর বিয়ে পড়াতে বাধ্য হই। এমনকি জামায়াতের নেতৃস্থানীয়দের ছেলে-মেয়ে বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বিয়েও এ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

বিয়ে উপলক্ষে আমার বক্তব্য

প্রথম কথা হলো, সকল জাতির মধ্যেই বিবাহের প্রথা চালু আছে। ইসলামে বিয়ে শুধু প্রথা নয়, বিয়ে ইবাদত হিসাবে গণ্য। ইবাদত অর্থ দাসত্ব। আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মতো করলে দুনিয়ার সব কাজই ইবাদত। আর তা না হলে নামায-রোযাও ইবাদত বলে গণ্য হবে না। কালেমায়ে তাইয়েবার মাধ্যমে আমরা জীবনের পলিসি ঘোষণা করি যে, আমরা সব কিছু আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মতো করব এবং আল্লাহর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুম মানবো না ও রাসূল ছাড়া আর কারো তরীকা গ্রহণ করবো না। তাই শরীআতের বিধান অনুযায়ী বিয়ে করাও ইবাদত।

দ্বিতীয় কথা হলো, আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মতো সব কাজ করতে হলে কুরআন ও হাদীসের ইলম দরকার। যার উপর যে দায়িত্ব আসে তা ঐ ইলম বা জ্ঞান অনুযায়ী পালন করতে হয়। তাই ইলম হাসিল করা ফরয। এইমাত্র যে

দুজনের মধ্যে বিয়ে হলো, তাদের উপর দাম্পত্য জীবন যাপন সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের ইলম অর্জন করা ফরয হয়ে গেলো। বিয়ের আগে ফরয ছিল না। এ ইলম হাসিল না করলে মুসলিম স্বামী-স্ত্রী হিসাবে জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে না। যখন তাদের সন্তান হবে তখন পিতা-মাতার দায়িত্ব সম্পর্কেও কুরআন-হাদীসের ইলম অর্জন করা ফরয হয়ে যাবে।

যার উপর যাকাত ও হজ্জ ফরয নয় তার উপর এ বিষয়ের ইলম অর্জন করাও ফরয নয়। যার উপর দেশ শাসনের দায়িত্ব আসে তাকে মুসলিম শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই এ বিষয়ের ইলম হাসিল করা তার উপর ফরয। তা না হলে সে কাফির শাসকের মতোই দায়িত্ব পালন করবে।

তৃতীয় কথা হলো, আল্লাহ তাআলা সূরা রূমের ২১ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা এবং পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া সৃষ্টি করেন। স্ত্রী দাসী নয়, বন্ধুর মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ্ পাক এটাই চান যে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে বন্ধু হিসেবে ভালোবাসবে এবং তাদের মধ্যে দয়া-মায়ার আদান-প্রদান চলবে। তারা যদি আল্লাহর দেওয়া এ সম্পর্ক কায়েম রাখে এবং উভয়ে সত্যিকার মুসলিম দম্পতি হিসেবে জীবন যাপন করে তাহলে এ বিবাহের বন্ধন দুনিয়ায়তো স্থায়ী থাকবেই, আখিরাতেও কায়েম থাকবে। দুজনেই বেহেশতে গেলে সেখানেও স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই সুখে থাকবে।

এ বক্তব্য রাখার পর এর আলোকেই নব দম্পতির জন্য দোয়া করা হয় যেন, তাদেরকে আল্লাহতাআলা খাঁটি মুসলিম দম্পতি হিসেবে জীবন যাপনের তাওফীক দান করেন। আরো দোয়া করা হয়, যেন আল্লাহ পাক সুসন্তান দান করেন এবং বর-কনে ও উভয় পক্ষের আত্মীয়দের মধ্যে যেন মধুর সম্পর্ক কায়েম রাখেন।

একটি বিয়ের ঘটনা

১৯৬০ সালেরই কথা। তখন লে.জে. আযম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট (D.M – তখনো D.C পরিভাষা চালু হয়নি) ছিলেন জনাব আলী আহমদ। মিন্টু রোডে তাঁর সরকারি বাসভবন ছিল। প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান পূর্ব-পাকিস্তান সফরে এলেন। এ সময়ই ডিএম সাহেব তাঁর মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান করলেন। মিন্টু রোডস্থ সরকারি বাসভবনের প্রশস্ত অঙ্গনে বিশাল প্যান্ডেল বানালেন। এলাকার কাযী সাহেব হিসাবে আমাকে বিয়ে পড়ানো ও রেজিস্ট্রি করাবার জন্য নেবার ব্যবস্থা করলেন। বরের জন্য তৈরি মঞ্চে বসে লক্ষ্য করলাম যে, সামনেই আইয়ূব খান ও আযম খান পাশাপাশি বসে আছেন। মঞ্চের সামনে, ডানে ও বাঁয়ে হাজার খানেক মেহমান। উচ্চপদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, কূটনীতিক ইত্যাদি মেহমানদের অন্তর্ভুক্ত। বিয়ে পড়ালাম। আরবীতে বিয়ের খুতবা দিয়ে বর ও কনের উকিলের মধ্যে ইজাব কবুল করালাম। দোয়ার আগে আমার অভ্যাস অনুযায়ী বক্তব্য রাখলাম অতি সংক্ষেপে। প্রেসিডেন্ট

আইয়ূবসহ যারা বাংলা ভাষা বুঝবেন না তাদের কথা বিবেচনা করে ইংরেজিতেই বক্তব্য পেশ করলাম। দোয়াতে আরবী ও বাংলা মিলিয়েই দোয়া করে থাকি। সেখানে আরবী ও ইংরেজিতে দোয়া করলাম। দোয়ার শেষে মেহমানরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে যেভাবে ভাব বিনিময় করলেন তাতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তারা এ অভিনব পদ্ধতিতে বিয়ে পড়ানো পছন্দই করেছেন।

দু'দিন পর ডিএম সাহেবের বাসা থেকে তাঁর পিএ ফোনে জানালেন যে আমার জন্য গাড়ি পাঠাচ্ছেন। ডিএম সাহেব কথা বলতে চান। গেলাম। ডিএম সাহেব আসন থেকে উঠে এসে আমার হাত ধরে বসালেন। খুব খুশি হয়ে বললেন, " আপনাকে মুবারকবাদ। বিয়ে উপলক্ষে দেয়া আপনার ইংরেজি বক্তব্য শুনে প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, 'এমন মৌলভী কোথায় পেলেন'। আপনার বক্তব্য ও দোয়া সবাই খুব পছন্দ করেছেন। আপনার সাথে ভালোভাবে পরিচিত হবার জন্যই আপনাকে ডেকে কষ্ট দিলাম।"

আমি আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বললাম, "আমি এভাবেই বিয়ে পড়াই এবং নব-দম্পতির জন্য উপদেশমূলক কিছু কথা বলি। লোকেরা তা পছন্দ করেছেন জেনে খুব খুশি হলাম। আমাকে মুবারকবাদ জানাবার জন্য শুকরিয়া জানাই"।

তিনি বললেন, "রমনা এলাকার কাযী সাহেব তো একজন বেশ বয়স্ক আলেম। কয়েকটি বিয়েতে তাঁকে দেখেছি। আপনি কবে থেকে কাযীর দায়িত্ব পেলেন?" আমি তাঁকে আমার কাযী হবার রহস্য জানালাম। আমি কাযী সাহেবেরই ছেলে জেনে খুব খুশি হলেন। আমার বিস্তারিত পরিচয় জানতে চাইলেন। পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি বললাম যে, আমি কয়েকবার সিমেন্টের পারমিশন নেবার জন্য আপনার অফিসে গিয়েছি। বললেন, আবার দরকার হলে বাসায়ই চলে আসবেন।

সেকালে ডিএম-এর নির্দেশ অনুযায়ী সিমেন্ট বিক্রয় হতো। যে কয় ব্যাগের অনুমতি দিতেন এর বেশি কেনার উপায় ছিল না। টিনের জন্যও ডিএম-এর অনুমতি প্রয়োজন হতো।

ঈদুল ফিতরে ইমামতী

১৯৬০ সালেরই কথা। রমাদানের শেষ দিকে ডিএম আলী আহমদ সাহেব গাড়ি পাঠিয়ে বাসায় নিলেন। বললেন, "পল্টন ময়দানে আসন্ন ঈদুল ফিতরের জামায়াতে আপনাকে নামায পড়াবার জন্য অনুরোধ করছি।" আমি ঈদের নামায এলাকার মসজিদে পড়া পছন্দ করতাম না বলে পল্টন ময়দানের জামায়াতেই শরীক হতাম। ইমামতী করতেন ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসার হেড মাওলানা মুফতি আমীমুল ইহসান। তাই ডিএম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম আগের ইমাম কি নেই? ঐ ঈদে তিনি ইমামতী করবেন না বা করতে পারছেন না বলে জানালেন।

পল্টন ময়দানে ডিএম সাহেবের তত্ত্বাবধানে মিউনিসিপ্যালিটিই ঈদের নামাযের

ব্যবস্থা করতো। গভর্নর, মন্ত্রী ও অনেক সরকারি কর্মকর্তা ঐ জামায়াতে শরীক হতেন। ওটাই সরকারিভাবে আয়োজিত বলে সবাই জানতো। আজকালও জাতীয় ঈদগাহতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়। ভেবে চিন্তে ডিএম সাহেবের প্রস্তাবে রাযী হলাম।

ঈদের জামায়াতে ঘোষিত সময়ে নামায শুরু হবার বেশ আগে থেকেই মুসল্লীরা ময়দানে জমা হতে থাকে। জুমুআর মতো ঈদেও নামাযের আগে সমবেত মুসল্লীদের সামনে ওয়াযের প্রচলন আছে। আমি প্রায় আধঘণ্টা মাওলানা মওদূদী (র)-এর 'নামায রোযার হাকিকত' নামক বই থেকে শেখা বক্তব্য পেশ করলাম। নামায, খুতবা ও দোয়া শেষ হলে মুসল্লীদের মধ্যে ঈদের কোলাকুলি চললো।

গভর্নর আযম খান দ্রুত এসে মিম্বরে উঠে মাইকে বললেন, আমি গভর্নর হাউজের মসজিদে ঈদের নামায না পড়ে এখানে আপনাদের সাথে মিলিত হতে এলাম। এ কথা বলেই তিনি মুসল্লীদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোলাকুলি করতে লাগলেন। বিস্মিত হয়ে আমি লক্ষ্য করলাম যে, গভর্নর আযম খান কোলাকুলি করতে করতে ময়দানের প্রায় মাঝখানে পৌঁছে গেছেন। শত শত লোক তাঁকে ঘিরে আছে। তিনি সিকিউরিটির ধার ধারতেন না। জনগণের মাঝে তিনি মিশে যেতেন। আমার সাথে কোলাকুলি করার জন্য এত লোক ভিড় না করা সত্ত্বেও আমি ক্লান্তি বোধ করলাম। অথচ আযম খান হাজার লোকের সাথে কোলাকুলি করার পরও অব্যাহতভাবে করেই চলেছেন দেখে পুলকিত হলাম। এভাবেই তিনি জনগণের অন্তর জয় করেন। জনগণ বিরাট কিছু চায় না। নেতাদের উদার মন ও মিষ্টি ব্যবহারেই তারা খুশি হয়।

আমার সাথে যারা কোলাকুলি করলেন এর মধ্যে একজন হলেন সাবেক প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। তিনি কোলাকুলির পর হাত মিলিয়ে বললেন, "রোযার এমন সুন্দর ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে কোথাও শুনিনি। আপনাকে ধন্যবাদ।"

দু'মাস ৯দিন পর পল্টন ময়দানেই ঈদুল আযহার জামায়াতেও আমাকেই ইমামতী করতে হলো। নামাযের পূর্বে কুরবানীর তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাইলের অত্যন্ত আবেগময় আত্মত্যাগের জযবার ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ সবাইকে অশ্রুসজল করে তুললো। আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণের জযবাই আল্লাহ ভালোবাসেন। পশু কুরবানীর পেছনে এ জযবা না থাকলে যে কুরবানীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায় সে কথার উপর আমি গুরুত্ব আরোপ করলাম।

এ ঈদের সময় গভর্নর আযম খান পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন। তাই এবার আগের ঈদের তুলনায় আমাকে বেশি লোকের সাথে কোলাকুলি করতে হয়েছে।

মুসাফাহা ও মুয়ানাকা

সারাবিশ্বে এটা কমন ঐতিহ্য যে কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে হ্যান্ডশেক করতে হয়।

বাংলায় করমর্দন বলা যায়। কিন্তু এটা পরিভাষা হিসেবে জনগণের মধ্যে পরিচিত নয়। সাধারণভাবে সবাই হাত মিলানো বলে। মুসলমানদের মধ্যে 'মোসাফা' শব্দটিও প্রচলিত আছে। আরবীতে আসল শব্দটি হলো 'মুসাফাহা'। 'সাফ্হ' অর্থ ক্ষমা করা। এ থেকেই মুসাফাহা শব্দটি গঠিত। এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় একে অপরকে ক্ষমা করা। দু'জনের হাত মিলানো দ্বারা বুঝা গেলো যে, তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, দু'জনেই একে অপরকে মাফ করে দিয়েছে। অর্থের দিক দিয়ে মুসাফাহা শব্দটি খুবই চমৎকার।

মুয়ানাকা শব্দটির মূল হলো 'উনুক'। এর অর্থ হলো গলা। হাদীসে আছে যে, হিজরতের পর যখন রাসূল (স)-এর প্রিয় চাচাতো ভাই জাফর বিন আবি তালেব হাবশা (ইরিত্রিয়া) থেকে মদীনায় পৌঁছে রাসূল (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন তখন অত্যন্ত আবেগের সাথে দু'জন মুয়ানাকা করলেন। অর্থাৎ এমন ঘনিষ্ঠভাবে এক অপরকে জড়িয়ে ধরলেন যে, একজনের গলা অপরজনের গলার সাথে মিলে গেলো। এ হিসাবে মুয়ানাকা মানে দাঁড়ায় গলাগলি।

আমাদের সমাজে যে কোলাকুলি চালু আছে তাতে আলিঙ্গনটা গলাগলির মতো ঘনিষ্ঠ হয় না । বুকে বুকে একটু মিশানো হয় মাত্র। মুয়ানাকার জযবা হলো ভালোবাসার পাত্রকে পেয়ে আবেগের সাথে জড়িয়ে ধরা।

দু'জনের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও মিল-মহব্বত দেখলে মন্তব্য করা হয় যে তাদের মধ্যে একেবারে গলায় গলায় মিল। এ হিসাবেও কোলাকুলির চেয়ে গলাগলিই ঘনিষ্ঠতা প্রকাশের জন্য অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তাই শুধু বুকে বুকে নয়, গলায় গলায় মিলিয়ে মুয়ানাকার হক আদায় করা উচিত।

ঈদের ইমামতিতে সঙ্কট

১৯৬০ সালের শেষদিকে ডিএম আহমদ আলী বদলি হয়ে গেলেন। তিনি যোগ্য ডিএম হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। একবার রাত দু'টার সময় গভর্নর আযম খান ফোন করার সাথে সাথে ডিএম সাহেব ধরলেন। গভর্নর বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি এখনও ঘুমাননি?" জওয়াব দিলেন, "আমার গভর্নর সাহেব যখন জেগে আছেন, তখন আমি ঘুমাই কেমন করে"? এর পর থেকে গভর্নরের প্রিয় ডিএম ছিলেন তিনি। অথচ ব্যাপার ছিলো ভিন্ন। ডায়াবেটিসের কারণে পেশাব করতে রাত দু'টায় উঠেছিলেন বলে ফোন ধরতে পারলেন। এ কথা তিনি একান্ত সাক্ষাতে হালকা পরিবেশে আমাকে জানালেন।

'৬১ সালের শুরুতে নতুন ডিএম এলেন। তাঁর সাথে আমার কোন পরিচয়ই ছিল না। '৬১ সালের রমাদানের ২৯ তারিখ তারাবীহ্ নামাযের পর মিন্টু রোডস্থ তার বাসায় ডাকলেন। যেয়ে দেখি আমার শ্রদ্ধেয় মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ও আরও কয়েকজন আলেম উপস্থিত। ডিএম সাহেব জানালেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামীকাল ঈদ হবে। মাওলানা ফরিদপুরী বললেন,

পূর্ব-পাকিস্তানে কোথাও চাঁদ দেখা যায়নি বলে কাল ঈদ হতে পারে না। ডিএম বললেন, পশ্চিম-পাকিস্তানে চাঁদ দেখা গেছে। একই রাষ্ট্রে একই দিনে ঈদ হওয়াই উচিত। এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হলো। আমরা সবাই একসাথে মত প্রকাশ করলাম যে, ধর্মীয় বিষয়ে আলেমদের সিদ্ধান্তই মানা প্রয়োজন। সরকারের পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়। ডিএম সাহেব উঠে গিয়ে পাশের কামরায় কার সাথে যেন ফোনে কথা বললেন। আমরা ডিএম-এর আওয়াজ শুনতে পেলাম। তিনি ফিরে এসে বললেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত যে, আগামীকাল ঈদ হবে। আপনারা যেতে পারেন। আমি সরকারের হুকুম মানতে বাধ্য।"

মাওলানা সাহেবগণ কোন কথা না বলে বিরক্তির সাথে উঠে গেলেন। আমি মাওলানা শামসুল হককে হাত ধরে বললাম, "আমাকে সিদ্ধান্ত দিয়ে যান যে আগামীকাল ইমামতী করবো কিনা।" তিনি আমাকে কিছুই না বলে চলে যাওয়ায় সমস্যায় পড়লাম। একা বসে ভাবতে লাগলাম। ডিএম এবার এলেন। অনুরোধের সুরে বললেন, "আপনি পল্টনের ঈদের জামায়াতের ইমাম। আমাকে ঈদের নামাযের আয়োজন করতেই হবে। হঠাৎ নতুন ইমাম যোগাড় করা সম্ভব নয় বলে আপনাকেই ইমামতী করতে হবে।"

আমাকে কোন সিদ্ধান্ত না দিয়ে মাওলানা ফরিদপুরী চলে যাওয়ায় খুব বিব্রতবোধ করলাম। শেষ পর্যন্ত পরদিন ঈদের নামাযে ইমামাতী করলাম। বিগত দু'ঈদের তুলনায় মুসল্লীর সংখ্যা কম ছিল। মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে নামায পড়াতে গিয়ে দ্বিতীয় রাকায়াতে ভুলে তাকবীর না করেই রুকুতে চলে গেলাম। তাই সালাম ফিরায়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলাম যে, " নামায আবার পড়তে হবে।" এভাবে নামায সমাপ্ত হলো। কিন্তু মনে ঈদের আনন্দ বোধ হলো না। ঈদের কোলাকুলিও তেমন জমলো না।

দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ঐ দিনই আলিমদের বিবৃতি বের হলো। নামাযের পর বাড়িতে যেয়ে বিবৃতি পড়লাম ঃ "পশ্চিম পাকিস্তানে চাঁদ দেখা গেলেও পূর্ব-পাকিস্তানে চাঁদ দেখা না গেলে একই দিনে ঈদ করা শরীয়ত সমর্থন করে না। তাই যারা সরকারি সিদ্ধান্তে আজ ঈদ করেছেন তাদেরকে একটি রোযা কাযা আদায় করতে হবে।" সরকারি চাপ অগ্রাহ্য করতে পারলাম না বলে অনুতপ্ত হলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ভবিষ্যতে ফাঁসিতে ঝুলতে হলেও সরকারি চাপ মেনে নেবো না।

পরের দিন লালবাগ শাহী মসজিদে ঈদের জামায়াত শেষ হবার পর সকাল ১০টার সময় মাওলানা শামসুল হক সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। একটা বিবৃতি তৈরি করে নিয়ে গেলাম। বিবৃতিতে অকপটে স্বীকার করলাম যে, আলিমগণের সিদ্ধান্ত ছাড়া সরকারি চাপে পূর্বদিন ঈদের নামাযে ঈমামতী করা আমার স্পষ্ট ভুল কাজ হয়েছে। এর জন্য আল্লাহর নিকট আমি তওবা করছি। আমার সাথে যারা ঈদের নামায আদায় করেছেন তাদের কাছেও ক্ষমা চাই এবং একটি রোযা কাযা

হিসেবে আদায় করার জন্য অনুরোধ জানাই।

মাওলানা ফরিদপুরী আমাকে দেখেই হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে সাদরে গ্রহণ করলেন। উপস্থিত দু'এক ছাত্র বিরূপ মন্তব্য করলে মাওলানা সাহেব ধমক দিয়ে থামালেন। বিবৃতিটি মাওলানা সাহেবের সামনে পড়ে শুনালাম। খুশি হয়ে তিনি বললেন, গতকাল ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গ করা হয়নি? তাই কাযা করাই যথেষ্ট।

সেখান থেকে আমি মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খানের বাড়িতে যাই। তিনিও সাদরে আমাকে আলিঙ্গন করে পাশে বসালেন। আমি বিবৃতিটি তাঁর হাতে দিলাম। পড়ে তিনি খুব খুশি হয়ে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলেন, "ভুল স্বীকার করার সৎ সাহসের জন্য মুবারকবাদ জানাই। আর হাদীসে আছে যে, তাওবাকারী ঐ ব্যক্তির মতোই যে গুনাহ করেনি। তোমার এ বিবৃতি দৈনিক আজাদে প্রথম পৃষ্ঠায়ই প্রকাশিত হবে।" দু'মুরব্বীর সাথে সাক্ষাতের পর পূর্বদিনের গ্লানি ও মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেলাম। বলা বাহুল্য যে, ঈদের ব্যাপারে সরকারি চাপের বিরুদ্ধে আমার বিবৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর ডিএম-এর সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর আর পল্টনের ময়দানে ইমামতী করার ডাক আসেনি।

এ অভিজ্ঞতা হলো যে, সরকার ইসলামী না হলে সরকারের তত্ত্বাবধানে ধর্মীয় দায়িত্ব পালনেও সমস্যায় পড়তে হয়। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাইতুল মুকাররমের খতীব সাহেবকেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সরকার মাওলানা উবায়দুল হককে খতীবের পদ থেকে অপসারণ করে। কিন্তু মুসল্লী ও সংগ্রামী ইসলামী জনতা তাঁকে খতীব হিসেবে বহাল রাখতে সক্ষম হলেও সরকার তাঁকে সব রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। অবশ্য চারদলীয় জোট সরকার তাঁর সব সুযোগ-সুবিধা পুনর্বহাল করে দেয়।

৮৭.

নয় নেতার শাসনতন্ত্র আন্দোলন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তা আইয়ূব খান ১৯৫৬ সালে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রণীত শাসনতন্ত্র বাতিল করে সাড়ে তিন বছর স্বৈরশাসন চালু রাখেন। বেসামরিক শাসনে উত্তরণের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৬২ সালের ১ মার্চ নতুন এক শাসনতন্ত্র জারি করেন।

১ জুন (১৯৬২) সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয় এবং ৮ জুন রাওয়ালপিণ্ডিতে নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। ২৪ জুন পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৯ জন নেতা এক বিবৃতিতে আইয়ূব খানের জারিকৃত শাসনতন্ত্র গ্রহণীয় নয় বলে ঘোষণা করেন। তারা দাবি করেন যে, জনগণের সরাসরি ভোটে (বুনিয়াদি গণতন্ত্র নয়) নতুন গণপরিষদ নির্বাচন করে শাসনতন্ত্র

প্রণয়নের দায়িত্ব দিতে হবে। ঐ নেতাদের নাম ঃ

পূর্ব-পাকিস্তানের সাবেক প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী সর্বজনাব নূরুল আমীন, আবু হোসেন সরকার, আতাউর রহমান খান, প্রখ্যাত আইনজীবী হামিদুল হক চৌধুরী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ভাগ্নে সৈয়দ আযীযুল হক নান্না মিয়া, সাবেক মন্ত্রী ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), পীর মুহসিনুদ্দীন আহমদ (দুদু মিয়া), মাহমুদ আলী ও শেখ মুজিবুর রহমান।

এ ৯ নেতা ১৯৬২ সালের ৮ জুলাই ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় ঐ দাবির পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানীর মুক্তি দাবি করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী পশ্চিম-পাকিস্তানে কারাবন্দি ছিলেন। ১৯ আগস্ট কারামুক্ত হয়ে ৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা আগমন করলে বিমানবন্দরে এক বিরাট জনতার দল তাকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানায়। প্রথমে তিনি ৯ নেতার বিবৃতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের নেতাদের দাবির সাথে পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতাদেরকে শরীক করা না হলে আন্দোলন জোরদার হতে পারে না বলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী অভিমত প্রকাশ করেন।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পশ্চিম-পাকিস্তানে সফর

ঐ ৯ নেতার পরিচিতি পূর্ব-পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ ছিলো। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভিন্ন মর্যাদা ছিলো। তাছাড়া তিনি উর্দুভাষী হওয়ায় পাকিস্তানের জনগণের নিকট সুবক্তা হিসেবেও জনপ্রিয় ছিলেন। তাই তারই নেতৃত্বে ৯ নেতার এক প্রতিনিধি দল পশ্চিম-পাকিস্তান সফরে যান।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী পশ্চিম-পাকিস্তানে সর্বপ্রথম মাওলানা মওদূদীর বাড়িতে যেয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাৎ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর নিকট থেকে সরাসরি আমি যা অবগত হয়েছি, তা উল্লেখ করছি ঃ

শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৯ নেতার প্রতিনিধি হিসেবে হাজির হলেন। জনগণের ভোটে নতুন গণপরিষদ গঠনের দাবি সম্পর্কে মাওলানা অবহিত ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ৯ নেতার পক্ষ থেকে উত্থাপিত দাবি সম্পর্কে মাওলানার মতামত জানতে চাইলেন। মাওলানা বললেন ঃ

জনগণের নির্বাচিত গণপরিষদের প্রণীত ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আইয়ূব খান বাতিল করে দিলেন। আমরা রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদ করতে পারলাম না। দেশ রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাপ্রধান অন্যায়ভাবে দেশ শাসনের ক্ষমতা দখল করলেন। আমরা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হলাম না। E.B.D.O (ইলেকটিভ বডিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডিন্যান্স-এবডো) জারি করে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে আপনিসহ সকল রাজনৈতিক নেতাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করলেন। এরও কোন প্রতিকার করা সম্ভব হলো না।

তথাকথিত বুনিয়াদী গণতন্ত্র চালু করে আইয়ূব খান নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের মর্যাদা হাসিল করলেন। মনগড়া শাসনতন্ত্র কমিশন গঠন করে নতুন শাসনতন্ত্র চালু করে সে অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্বাচনও করিয়ে নিলেন। আমরা নির্বাচন প্রতিরোধ করার চেষ্টাও করলাম না। কেন্দ্রে ও প্রদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকারও গঠন করে ফেললেন। আমরা কোথাও এ স্বৈরশাসকের গতিরোধ করতে কিছুই করতে পারলাম না। আমাদের ব্যর্থতার এ বিরাট তালিকা নিয়ে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন গণপরিষদ গঠন ও নতুন শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করা কি বাস্তবসম্মত?

১ জুন থেকে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করার পর আমরা বিবৃতি দিতে সক্ষম হলাম। আমরা সরকারের সমালোচনা করার সুযোগটুকু পেলাম। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা ও গণ-আন্দোলনের সূচনা করার পরিকল্পনা নেবার সময় এসেছে। এখন আমরা যদি রাজনৈতিক আন্দোলন করতে চাই, তাহলে আইয়ূব খানের জারি করা শাসনতন্ত্রকে সংশোধন করার দাবি জানাতে পারি।

মাওলানার এ দীর্ঘ বক্তব্যের পর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মাওলানার যুক্তির সাথে একমত হলেন। ৯ নেতার দাবি যে অবাস্তব সে কথা তিনি উপলব্ধি করলেন। তিনি ৯ নেতার মধ্যে উপস্থিত নেতাদের সাথে মতবিনিময়ের জন্য একদিন সময় চাইলেন। পরদিন আবার বৈঠক করার সময় নির্ধারণ করে সোহরাওয়ার্দী সাহেব বিদায় নিলেন।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৯ নেতার প্রতিনিধিদেরসহ আসলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব জানালেন যে, পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ৯ নেতার দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে সম্মত না হলে তারা ঐ দাবি মুলতবি রাখতে রাযি আছেন। আর শাসনতন্ত্রকে গণতন্ত্রসম্মত (Democratisation of the Constitution) করে সংশোধনের দাবিতে পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সাথে মিলে আন্দোলন করতে প্রস্তুত আছেন। মাওলানা মওদূদী তাদের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মুবারকবাদ জানালেন। শহীদ সাহেব ও মাওলানা মওদূদীর প্রচেষ্টায় পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ দেশে গণতন্ত্রের পুনর্বহালের উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করার জন্য সম্মত হন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অবিরাম প্রচেষ্টায় পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মোট ৫১ জন নেতার স্বাক্ষর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। পশ্চিম-পাকিস্তানি দস্তখতকারী নেতাদের মধ্যে প্রথমেই মাওলানা আবুল আলা মওদূদী ও মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদের নাম রয়েছে। ৫১ জনের মধ্যে পশ্চিম-পাকিস্তানি নেতাদের সংখ্যাই বেশি। সেখানে ৪টি প্রদেশের সব দলের নেতার দস্তখত রয়েছে।

পূর্ব-পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে যাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয় তারা হলেন, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুস সালাম খান, খাজা

খায়রুদ্দীন, মুহাম্মদ সুলাইমান (কেএসপি), সৈয়দ আযীযুল হক (নান্না মিয়া), ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), ফজলুর রহমান ও আবুল কাসেম।

নেতাদের এ তালিকা জনাব অলি আহাদের "জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫" নামক বই থেকে সংগৃহীত।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী সর্বপ্রথম মাওলানা মওদূদীর নিকট কেন গেলেন

পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীই সামরিক শাসন প্রত্যাহারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুনর্বহাল হয়। মুসলিম লীগতো আইয়ূব খানই দখল করে নেন। এ দলের যারা ঐ সংগঠনে যোগদান করেননি তাদের নতুন করে সংগঠিত হতে স্বাভাবিকভাবেই বিলম্ব হয়। অন্যান্য দলের মধ্য থেকেও আইয়ূব খান কিছু নেতাকে ভাগিয়ে নিতে সক্ষম হন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজের দল আওয়ামী লীগকে পুনর্বহাল না করে অন্যান্য দলের সাথে মিলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার পক্ষে ছিলেন। পাকিস্তানভিত্তিক আর কোন দলই তখন উল্লেখযোগ্য ছিলো না। তাই শহীদ সোহরাওয়ার্দী আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য মাওলানা মওদূদীর উপরই সবচেয়ে বেশি আস্থা পোষণ করতেন। তাই পশ্চিম-পাকিস্তান সফরে গিয়ে মাওলানার সাথেই প্রথম সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সাথে মতবিনিময়ের পরই দু'জনে একমত হয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দী ১৯৬২ সালের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতের কন্টিনেন্টাল হোটেলে নিঃসঙ্গ অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন। তার মতো এক গতিশীল নেতার অভাবে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন সাংগঠনিক রূপ পেলো না।

জামায়াত ইসলামীর পুনর্জীবন

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সেনাপতি আইয়ূব খান পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করে সকল রাজনৈতিক দলকেই বেআইনী ঘোষণা করেন। সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে ১৯৬২ সালের ১ জুন থেকে বেসামরিক সরকার কায়েম করেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক দল পুনর্বহাল করার সুযোগ ১ জুন থেকে শুরু হয়। মাওলানা মওদূদী এর এক সপ্তাহ আগেই প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দকে নির্দেশ দেন যে, ১ জুনই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যেনো জেলা, থানা ও নিম্নপর্যায় পর্যন্ত জামায়াতের সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হয়ে যায়।

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর হিসেবে মাওলানা মওদূদী ১৯৬২ সালের ১ জুন এক ঐতিহাসিক বিবৃতির মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনকে পুনর্বহাল করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, "সামরিক সরকার জামায়াতকে বেআইনী করায় আমরা জামায়াতের তৎপরতা মুলতবি করেছি মাত্র। আমরা সংগঠনকে ভেঙে দিইনি। আজ থেকেই আবার সংগঠন চালু হলো।" চলন্ত রেলগাড়ির সাথে তিনি

তুলনা করে বিবৃতিতে বললেন, "ইসলামী আন্দোলনের গাড়ি ১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর চলন্ত অবস্থায় বাধ্য হয়ে থেমে গেলো। গাড়ি লাইনচ্যুত হয়নি। গাড়ির ড্রাইভার ও গার্ড গাড়ি ফেলে চলে যায়নি। গাড়ির আরোহীরাও গাড়ি থেকে নেমে যায়নি। তাই গাড়ির চলার পথ উন্মুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই গার্ড সিগন্যাল দিলে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করে দিলো। এটাই জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য।"

এতে স্পষ্ট বুঝা গেলো যে, জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামো পৌনে চার বছর একই অবস্থায় ছিলো। জামায়াতের সাইন বোর্ড ও অফিস ছিলো না; কিন্তু সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ জনশক্তির সাথে সাংগঠনিক যোগাযোগ নিয়মিতই রাখতেন। এ সময় সংগঠনের কোন পর্যায়েই আমীর ও মজলিসে শূরার কোন নির্বাচন হয়নি। যারা যে পদে ছিলেন তারা এ সময় দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্যক্তি পর্যায়ে দীনের দাওয়াতী দায়িত্ব পালনের কারণে ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক সংখ্যা বেড়েছে। জামায়াত বহাল হবার পর তারা সংগঠনের কর্মী হিসেবে সক্রিয় হয়েছে। ঐ সময় জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের দাওয়াত দেওয়া মুলতবি ছিলো বটে, কিন্তু দীনের দাওয়াত চালু ছিলো।

হাজী বশীরের আকর্ষণীয় অফার

১৯৬১ সালে কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সীরাতুন্নবী সম্মেলন সম্পর্কে পূর্বের আলোচনায় হাজী মুহাম্মদ বশীরুদ্দীন নামক এক দীনদার ব্যবসায়ীর কথা উল্লেখ করেছি। ঐ সম্মেলনের আর্থিক ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। ঐ সম্মেলন উপলক্ষেই তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সম্মেলনের কিছুদিন পর তিনি অত্যন্ত মহব্বতের সুরে বললেন ঃ

"আযম সাহেব, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছে তাদের মধ্যে মুসলিম চেতনার বিরাট অভাব দেখছি। আপনি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। আমার ধারণা আদর্শবান শিক্ষকগণ কোন ডিগ্রি কলেজে সমবেত প্রচেষ্টা চালালে বর্তমান শিক্ষা-কারিকুলামেও উচ্চশিক্ষিত খাঁটি মুসলিম বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব।"

আমার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি তার কথার সাথে একমত হয়ে বললাম, এমন কলেজ কোথায় পাওয়া যাবে?

তিনি বললেন, "চালু কোন কলেজের মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য সফল হবে না, সে কথায় আমিও আপনার সাথে একমত। এ মহান উদ্দেশ্যে আমি ঢাকা শহরের বাইরে নিকটবর্তী কোন স্থানে কয়েক একর জমি কিনে একটি ডিগ্রি কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় বিল্ডিং এবং আবাসিক ছাত্রদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করতে চাই।"

আমি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে তাকে মুবারকবাদ জানালাম এবং এটা আল্লাহর পথে ব্যয় বলে অভিমত প্রকাশ করলাম। তার কলেজের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক বাহিনী

যোগাড়ে আমি পূর্ণ সহযোগিতা করার ওয়াদা দিলাম। অবিলম্বেই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, এ বিষয়ে আপনার সাথে আলোচনার আসল উদ্দেশ্যটি এখনো প্রকাশ করিনি। এ বিরাট পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবো কিনা তা আপনার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। আমি ঔৎসুক্য প্রকাশ করে বললাম, আমার উপর কেমন করে নির্ভর করে? তিনি হেসে বললেন, আপনি এ কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব নিলে আমি এ কাজ এক্ষুণি শুরু করবো।

আমি চরম বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, আমি মিশনারি জযবা নিয়েই শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ইকামাতে দীনের আন্দোলনের স্বার্থে ঐ পেশা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি। আবার ঐ পেশায় ফিরে যাওয়া কী করে সম্ভব?

তিনি বললেন, আমি সবদিক বিবেচনা করেই এ অফার দিয়েছি। দেশে সামরিক শাসন চলছে। আপনার আন্দোলন ও সংগঠন এখন বন্ধ হয়ে গেছে, কবে আবার তা শুরু করা যাবে জানা নেই। কে জানে আদৌ আন্দোলন আবার করা যাবে কিনা? যদি আবার সে সুযোগ আসে আপনি কলেজের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাইলে আমি আপত্তি করবো না। আপনি কলেজটা চালু করে দিলে কিছু দিনের মধ্যেই আরো লোক তৈরি হয়ে যাবে।

আমি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আমার নিকট শিক্ষকতাই সবচেয়ে প্রিয়। কলেজ ছেড়েছি আজ ৪৭ বছর হয়। এর মধ্যে অগণিত বার স্বপ্নে শিক্ষকতার পেশায় নিজেকে নিয়োজিত দেখে তৃপ্তি বোধ করেছি। ঘুম থেকে জাগার পরও ঐ তৃপ্তিবোধ অনুভব করেছি। বৃহত্তর দীনী কর্তব্য মনে করেই কলেজ জীবনে ফিরে যাইনি। হাজী বশীরের শেষ কথাটি আমাকে দুর্বল করে ফেললো। ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। যদি সুযোগ আসে তাহলে কলেজের দায়িত্ব ছেড়ে চলে আসতে পারবো জেনে তাঁর প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য বলে ভাবলাম। প্রস্তাবটি আমার নিকট রীতিমতো আকর্ষণীয় বলে মনে হলো। আমি প্রস্তাবটি বিবেচনা করার জন্য তিন দিনের সময় চেয়ে নেবার সময় তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন, আপনি দায়িত্ব না নিলে আমি এ কাজ কিছুতেই শুরু করবো না।

হাজী বশীরকে শেষ সিদ্ধান্ত জানালাম

প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য তিন দিন সময় নিলাম। প্রথম দিনটি কাউকে কিছু না বলে নিজে নিজেই গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলাম। ইসলামী আন্দোলনের চিন্তাধারাকে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান পরিবেশে সেমিনারের মাধ্যমে যা কিছু করা যাচ্ছে এবং সেমিনারের আবরণে সংগঠনের জনশক্তিকে ট্রেনিং দেবার যে সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এ কাজ আমার অবর্তমানে কেউ চালিয়ে নিতে পারবে কিনা। এ কর্মসূচি অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এবং দায়িত্বশীলদের বৈঠকে গ্রহণ করা হয়েছে। এর সুদূরপ্রসারী সুফলের আশা নিয়ে শুরু করা হয়েছে।

এ ভাবনায় পড়ে আমি চরম দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে লাগলাম। ইকামাতে দীনের

দায়িত্ববোধ একদিকে আমাকে ঐ প্রস্তাব গ্রহণে তীব্রভাবে বাধা দিচ্ছে। অপরদিকে এ আকর্ষণীয় প্রস্তাবটিও আমাকে প্রচণ্ডভাবে ধাওয়া করছে। বিষম টানাপড়েনে পড়ে গেলাম। আমি বর্তমানে আন্দোলনের যে দায়িত্ব পালন করছি তা চট্টগ্রাম বিভাগের আমীর জনাব আবদুল খালেক চালিয়ে নিতে পারবেন বলে মনে হওয়ায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে আশার আলো দেখতে পেলাম।

এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো সংগঠনের দায়িত্বশীলগণই নেবেন। তাদের কাছে প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য পেশ করার চিন্তাও করতে পারছিলাম না। জনাব আবদুল খালেক বর্তমান কর্মসূচি চালিয়ে নিতে সক্ষম মনে হওয়ায় সর্বপ্রথম সংগঠনের আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীমের নিকট পরদিনই গেলাম। অনেক ভনিতা করে মাওলানাকে রাযি করার জন্য হাজী বশীরের প্রস্তাবটির সুদূরপ্রসারী সুফলের আশা প্রকাশ করে সংগঠনের দায়িত্বশীলগণের বৈঠক আহ্বান করার প্রস্তাব দিলাম।

মাওলানা ধৈর্য ধরে আমার গোছালো বক্তৃতা শুনলেন বটে, কিন্তু 'পত্র পাঠ বিদায়ের' মতোই তিনি বক্তব্য রাখলেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, "বর্তমান কর্মসূচি আপনার মগজ থেকে বের হয়েছে। দায়িত্বশীলগণ ভালোভাবে বিবেচনা করে তা গ্রহণ করেছে। এ পর্যন্ত যেটুকু কাজ হয়েছে তাতে সবার মধ্যে আস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যার মগজে কর্মসূচি গজায় তার হাতেই সঠিকভাবে তা বাস্তবায়িত হয়। সংগঠনের কেউ আপনাকে এভাবে ছেড়ে দিতে রাজি হবেন না বলে আমি নিশ্চিত। তাই আমি কোন বৈঠক ডাকারও প্রয়োজন মনে করি না।"

আমার আমীর থেকে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত পেয়ে গেলাম। মনের দ্বিধা নিমিষেই কেটে গেলো। পরম প্রশান্তি বোধ করলাম। ওখান থেকেই সরাসরি হাজী বশীরের বাড়িতে গেলাম। তিন দিন সময় নিয়েছিলাম।

দ্বিতীয় দিনই তাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানালাম। তিনি শুনে মুচকি হাসলেন এবং দীনকে প্রাধান্য দেবার জন্য মুবারকবাদ জানালেন। হাজী বশীর ইসলামী আন্দোলনের একজন সুধী। সেদিন মেহেরবানী করে আমার বাড়িতে এসে করাচী থেকে আনা কয়েকটি উর্দু বই এবং দেয়ালে ঝুলাবার জন্য বাঁধাই করা কুরআনের আয়াত দিয়ে গেলেন। বর্তমানে (২০০২ সালে) তাঁর বয়স ৭৭ বছর।

৮৮.

আমার ভাই-বোনদের কথা

আমরা ৪ ভাই ও ৫ বোন। আমি সবার বড়। দু'ভাইয়ের পর এক বোন, এরপর ১ ভাইয়ের পর দু'বোন আবার এক ভাইয়ের পর দু'বোন। প্রথম ও দ্বিতীয় বোন আব্বা-আম্মা জীবিত থাকাকালেই মারা যায়। এখন আমরা ৪ ভাই ও ৩ বোন জীবিত।

আমাদের লেখাপড়ার ব্যাপারে আব্বার এ নীতি ছিলো যে, আমাদেরকে আধুনিক

শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হবার সাথে সাথে নিষ্ঠাবান মুসলিমও হতে হবে। আমার ব্যাপারে দাদার নির্দেশ ছিলো যে, বাংলা ইংরেজি ও আরবী ভাষা ভালোভাবে শিখতে হবে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ঐ নির্দেশ অনুযায়ীই আমাকে নিউ স্কীমে পড়তে হয়। আমার ছোট ৩ ভাইকে আব্বা ম্যাট্রিক পর্যন্ত নিজের কাছেই রেখেছেন। তখন ব্রিটিশ শাসনামল হলেও ম্যাট্রিক কোর্সে আরবী ছিলো। আব্বা স্কুলের শিক্ষকের উপর নির্ভর না করে নিজেই বাড়িতে আরবী পড়াতেন, যাতে কুরআন বুঝবার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। মসজিদে নামাযের জামাআতে সাথে করে নিয়ে যেতেন। তার এ বিশ্বাস ছিলো যে, ১৫/১৬ বছর বয়স পর্যন্ত মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে উচ্চশিক্ষিত হলেও দীনদারী কায়েম থাকবে। তার এ বিশ্বাস অসত্য প্রমাণিত হয়নি।

আমার ছোট ভাই ডা. মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্যাম কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৫০ সালে এমবিবিএস পাস করে (গোল্ড মেডেলসহ), তৃতীয় ভাই মুহাম্মদ গোলাম মুকাররাম ও চতুর্থ ভাই ড. মুহাম্মদ মাহ্‌দীউযযামান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে যথাক্রমে ১৯৫৫ ও ১৯৬১ সালে। আব্বা খবর নিতেন যে, কোলকাতা ও ঢাকায় হোস্টেলে থাকাকালে আমরা নিয়মিত জামাআতে নামায আদায় করি কিনা। ছুটিতে কুমিল্লা জেলার চান্দিনায় (যেখানে আব্বা কর্মরত ছিলেন) গেলে ধর্মীয় ব্যাপারে আমরা সামান্য অবহেলা করারও সাহস পেতাম না। এমনকি আমরা ছাত্রজীবনে কেউ আব্বার অসন্তুষ্টির ভয়ে কখনো প্যান্ট পরিনি এবং দাড়িও কামাইনি। আব্বার ধর্মীয় শাসনের প্রভাব আমাদের জীবনে স্থায়ীভাবে কায়েম রয়েছে। এদিক দিয়ে তিনি একজন সার্থক পিতা।

আমার বোনদের লেখাপড়া

এটা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, চান্দিনায় বালিকা বিদ্যালয় না থাকায় আমার বোনেরা মেধাবি হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেলো। চান্দিনা হাই স্কুলে যদি মেয়েদেরও পড়ার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে পর্দার সাথে আমার বোনরা স্কুলে পড়তে পারতো। মুসলিম সমাজে মেয়েদের শিক্ষার প্রচলন তখনো ভালোভাবে শুরু হয়নি। আব্বা নিজেই আমার বোনদেরকে কুরআন পড়া ও বাংলা লেখাপড়া শেখান। আমার দ্বিতীয় বোন নূরুননাহার এতো মেধাবি ছিলো যে, আমি ছুটিতে বাসায় গেলে বাংলা বই নিয়ে আমার কাছে হাজির হতো এবং কঠিন শব্দের অর্থ জেনে নিতো। ওর আগ্রহ দেখে আমি ঢাকা থেকে ওর জন্য গল্পের বই নিয়ে যেতাম। সে আমার হাতের লেখা অত্যন্ত নিপুণতার সাথে নকল করতে সক্ষম হলো। আব্বা ১৯৫৩ সালে ঢাকায় বদলি হয়ে আসায় আমার ৪র্থ বোন জাহান আরা কামরুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করে। আইএ পড়ার পূর্বেই ওর বিয়ে হয়। বিয়ের পরই সে আইএ ক্লাসে ভর্তি হয়। আল্লাহর মেহেরবানীতে স্বামীর সহযোগিতায় ইডেন কলেজ থেকে বাংলায় অনার্স ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে এমএ পাস করে। বেশ কয়েক বছর যাবৎ সে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করছে।

আমাদের বিয়ের ব্যাপারে আব্বার নীতি

আমাদের ভাই-বোনদের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে আব্বা আগাগোড়া একই নীতি অবলম্বন করেছেন। তিনি প্রথমে তার বেহাই বাছাই করতেন। আর এ বাছাইয়ের ভিত্তি ছিলো উচ্চশিক্ষা ও দীনদারী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বেহাই যদি নিষ্ঠাবান মুসলমান হয় তাহলে তার সন্তানরা অবশ্যই দীনদার হবে। তাই তিনি হবু বেহাইর সাথে আগে প্রাণখুলে আলাপ করার সিদ্ধান্ত নিতেন। অনেক ধার্মিক পিতাও সন্তানদের দীনদারীর ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হয় না। তাই তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংগ্রহ করে সিদ্ধান্ত নিতেন।

সর্বপ্রথম আমার এক নম্বর বোনের বিয়ে হয় ১৯৪২ সালে। তখন আমি আইএ প্রথম বর্ষের ছাত্র। বোনদের মধ্যে সবার বড় ছিলো শামসুননাহার। আমার ভালোভাবেই মনে আছে যে, কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার চিউরা হাই স্কুলের হেড মাস্টার জনাব আবদুস সুবহান তার বড় ছেলে আবদুল হাই-এর সাথে আমার এ বোনের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে চান্দিনায় আসলেন। রাতের খাওয়ার পর তারা দু'জন আলাপ শুরু করলেন। আমি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে বোনের বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা শুনবার জন্য পাশেই বসলাম। ঘণ্টাখানিক বসার পর আমার ঘুম পেলো। তাদের আলাপ-আলোচনায় আমি কোন আগ্রহ বোধ করলাম না। তাদের কথাবার্তার সাথে বিয়ের কোন সম্পর্কই আমি তালাশ করে পেলাম না। দু'জনেই ধর্মীয় বিষয়ে ভাবের আদান-প্রদান করতে থাকলেন, যার সবকথা আমার বোধগম্য হয়নি। তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখে আব্বা আমাকে ঘুমাবার জন্য উঠে যেতে বললেন। ফজরের নামাযের জন্য আম্মা আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমার আব্বা তো ঘুমাতে আসেননি। মেহমানের সাথে এখনো আলাপ করছেন।"

বৈঠকখানায় যেয়ে উভয়কে আলাপরত দেখে বিস্মিত হয়ে আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা সারারাত ঘুমাননি?" আব্বা বললেন, "মেহমান আলাপ করছেন। তাকে রেখে কেমন করে ঘুমাতে যাই?" মেহমান বললেন, "আপনিও তো ঘুমাবার প্রস্তাব না দিয়ে আলাপ করতে থাকলেন।" বুঝলাম যে, দু'জনের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বিয়ে হয়ে গেলো। যিনি ভগ্নিপতি হলেন তিনি গ্রাজুয়েট ও স্টেনোগ্রাফার। কোলকাতায় রেল বিভাগের কর্মচারী। ৭ ভাইয়ের মধ্যে সবার বড়।

১৯৫০ সালে আমার সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোমেনশাহীর এডভোকেট মাসিহুর রহমানের সাথে তৃতীয় বোন আনওয়ারার বিয়ের কথা হয়। আব্বার পলিসি অনুযায়ী এ বিয়ে ঠিক হবার আগে পাত্রের পিতার সাথে আলাপ করলেন। ঘটনাক্রমে তিনি কুমিল্লায় ইনকাম ট্যাক্স অফিসে হেড ক্লার্ক ছিলেন। সৎ কর্মচারী

হিসেবে সুনাম শুনে আব্বা তাকে চান্দিনায় বেড়াবার দাওয়াত দিলেন। সহপাঠী থাকাকালেই কয়েকবার মোমেনশাহী বেড়াতে গিয়েছি। মাসিহুর রহমানের বড় ভাই মুখলিসুর রহমানও এক ক্লাসে পড়ায় এ দু'ভাই-ই আমার সহপাঠী। তাদের পিতাকে দেখে পোশাকে ও আলাপে আলেম মনে হলো। এ সব কথা আমার কাছে শুনা সত্ত্বেও আব্বা নিজে না দেখে বেহাই হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন না। আব্বার বেহাই পছন্দ হয়ে গেলো। দীনদার ও আরবীতে এমএ পাস পাত্র পেয়ে আব্বা খুবই খুশি হলেন। বেহাই ও জামাই আব্বার এতো পছন্দ হলো যে, ১৯৫০ সালে এ বোনটিকেই আমার বন্ধুর সাথে বিয়ে দিলেন।

দু'বোনের বিয়ের পর ১৯৫১ সালে আমার বিয়ে হয়। ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি যে, আমার অজান্তেই আব্বা বেহাই বাছাই করে নিলেন। নওগাঁ কলেজের আরবীর অধ্যাপক মাওলানা মীর আবদুস সালাম স্বয়ং চান্দিনায় গেলেন। পাত্রপক্ষের লোক পাত্রীর বাড়িতে বিয়ের পয়গাম নিয়ে যাবার রেওয়াজই প্রচলিত। আমার শ্বশুর সাহেব রেওয়াজের পরওয়া না করেই আব্বার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আব্বা আমাকে রংপুরে চিঠি দিয়ে জানালেন, "আমার বেহাই পছন্দ হয়েছে। মেয়েকে তিনি আলেম পাস করিয়েছেন। তাই মেয়েকেও পছন্দ করলাম। তুমি নওগাঁ যেয়ে মেয়ে দেখে পছন্দ হলে আমাকে জানাও।" আমি দেখতে গেলাম না। বিয়ে হয়ে গেলো।

আব্বার উস্তাদ এবং দাদার বন্ধু, সহকর্মী ও মিতা (উভয়ের একই নাম) আরমানিটোলার বিখ্যাত সুবহান মনযিলের মরহুম মাওলানা আবদুস সুবহানের দ্বিতীয় ছেলের কন্যার সাথে আমার দ্বিতীয় ভাই ডা. মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্যামের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। এখানেও বেহাই বাছাইয়ের নীতিই বহাল রইলো। পরবর্তীতে মুয়ায্যামের শালীর সাথে আমার তৃতীয় ভাই ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ গোলাম মুকাররামের বিয়ে হয়।

আমার ৪র্থ বোন জাহান আরার বিয়েতে বেহাই বাছাই করার প্রয়োজন হয়নি। এর বিয়ের প্রস্তাবক ছিলেন বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তা অধ্যাপক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ। তিনি আমার বড় ভগ্নিপতির আপন চাচাতো ভাই। পাত্র হলেন বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তা মাওলানা আলাউদ্দীন আল আযহারী। পাত্র পছন্দ হয়ে গেলো এবং ১৯৫৯ সালে বিয়ে হয়ে গেলো।

৪র্থ ভাইয়ের বিয়েতেও আব্বা প্রথমে বেহাই পছন্দ করলেন। তিনি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হলেও পোশাকে ও কথাবার্তায় আলেম বলে মনে হয়।

সবচেয়ে ছোট বোন জান্নাত আরার জন্য সুবহান মনযিলের আত্মীয়তার ভিত্তিতেই পাত্র বাছাই করা হয়। ভগ্নিপতির নাম পীরযাদা মাওলানা সাইয়েদ শরীয়তুল্লাহ। তিনি বর্তমানে কাযী সাহেব ও বাংলাদেশ কাযী সমিতির সভাপতি হিসেবে আব্বার স্থলাভিষিক্ত।

আমাদের পরিবারে মৃত্যু

আব্বা ১৯৭৩ সালে এবং আম্মা ১৯৮৮ সালে ইন্তিকাল করেন। তারা দু'মেয়ের মৃত্যুর দুঃখ-বেদনা ভোগ করেন। ২য় বোনটি ১৯৪৭ সালে মারা যায়। আর ১ম বোনটি ৫ম সন্তানের জন্মের ৪০ দিন পর মারা যায়। এ বোনটি বেঁচে থাকলে মগবাজারে যে পরিমাণ জমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেতো আব্বা তা তার ৫ সন্তানের নামে দান করেন। ৪০ দিনের কন্যা সন্তানটিকে আমার ৪র্থ বোন জাহান আরা লালন-পালন করে। জাহান আরার বিয়ের পর মেয়েটিকে ওর পিতা নিয়ে যান। কিন্তু মেয়েটি জাহান আরাকে ছাড়া থাকতে রাযি হয়নি। জাহান আরার স্বামী মাওলানা আযহারী ওকে আপন মেয়ের মর্যাদা দেন এবং তার প্রিয় ছাত্র মাওলানা মুফাযযাল হুসাইন খানের সাথে এ মেয়ের বিয়ে দেন। মাওলানা আযহারী ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় আরবীর অধ্যাপক ছিলেন। নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে ইন্তিকাল করেন। আমার বিধবা নিঃসন্তান বোনটি তার পালক-মেয়েকে অবলম্বন করেই আছে। আল্লাহ্ তাআলারই এ পরিকল্পনা ছিলো বলে মনে হয়।

আমার ভাই-বোনদের বর্তমান অবস্থা

আল্লাহর রহমতে আমরা ৪ ভাই-ই এখনো (২০০২) বেঁচে আছি। আমার বয়স ৮০ বছর, দ্বিতীয় ভাইয়ের ৭৮, তৃতীয় ভাইয়ের ৭৩ এবং চতুর্থ ভাইয়ের ৬৪ বছর।

প্রথম বোন ৫৭ সালে মারা যাবার পর আমার ভগ্নিপতি আবার বিয়ে করেন। তার এ স্ত্রীর নাম আমার দ্বিতীয় বোনের নাম হওয়ায় আত্মীয়তার সম্পর্ক আগের মতোই বহাল ছিলো। এ স্ত্রীও দু'ছেলে ও দু'মেয়ে রেখে মারা যায়। আমার ভগ্নিপতি কুমিল্লা শহরে বাস করেন। এখন তার বয়স ৮৭। আমার দ্বিতীয় ভগ্নিপতি ২০০১ সালের অক্টোবরে ইন্তিকাল করেন। বোনটি মোমেনশাহী শহরে ছেলেদের সাথেই আছে। ছোট বোনটিও মগবাজারেই স্বামীর বাড়িতে আছে।

আমার দ্বিতীয় ভাই ডা. মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্যাম সিলেট ও রংপুর মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলো। ১৯৭৯ সালে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে। বেশ কয়েক বছর বিদেশে চাকরির পর ১৯৮২ সাল থেকে ইবনে সিনা ক্লিনিকে প্যাথলজি বিভাগের ডাইরেক্টরের দায়িত্ব পালন শেষে এ বছর (২০০২) অবসর নেয়। সে ইংল্যান্ড থেকে কয়েকটি মেডিক্যাল ডিগ্রি অর্জন করে পিজিতে প্যাথলজি ও মাইক্রোবাইওলজির প্রফেসর ছিলো। তৃতীয় ভাই ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ গোলাম মুকাররাম ইংল্যান্ডে দু'বছরে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি নেয়। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার থাকাকালে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে। গত ২৬ জানুয়ারি (২০০২) তার স্ত্রী হৃদরোগে মারা যায়।

চতুর্থ ভাই ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মাহদীউযযামান ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার থেকে ১৯৭১ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করে। সে অনেক প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করে।

ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, পাকিস্তান এটমিক এনার্জি কমিশন, ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি, ব্রিটিশ এয়ারক্রাফট কর্পোরেশন, বুয়েট, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (গাজীপুর) ও ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চিটাগাং-এ কর্মরত ছিলো। বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি চিটাগাং-এ ফেকালটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজির ডিন-এর দায়িত্বে আছে।

আমি আজকাল কী করছি

সর্বশেষে আমার কথা। ২০০০ সালের ডিসেম্বরে জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর ইসলামী আন্দোলনের খিদমতের উদ্দেশ্যে কিছু কাজ করছি। রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনেই আমার সকল সময় খরচ হয়ে যেতো। এখন যে কাজ করছি এর জন্য সময় বের করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না। তাই অব্যাহতি নিলাম।

আল্লাহর রহমতে বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছাত্র-ছাত্রী এবং নারী-পুরুষের সংখ্যা বিরাট। তাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মান আরো উন্নত হওয়া প্রয়োজন। ইসলামী ছাত্রশিবির ও ইসলামী ছাত্রী সংস্থার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং জামায়াতে ইসলামীর জেলা ও থানা পর্যায়ের নেতৃস্থানীয়দের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে স্টাডি সার্কেলের মাধ্যমে আমি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তিকে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে যে সব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান দান করা প্রয়োজন তা সহজ ভাষায় ও বোধগম্য যুক্তিসহ চটি চটি বইয়ের আকারে লিখে অল্প মূল্যে পরিবেশন করা আমার দ্বিতীয় কর্মসূচি। সংগঠনের দায়িত্বমুক্ত হবার পর এ জাতীয় ৬টি বই প্রকাশিত হয়েছে। ১. আসুন আল্লাহর সৈনিক হই, ২. মযবুত ঈমান, ৩. জীবন্ত নামায, ৪. আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব ও পদ্ধতি, ৫. রাষ্ট্র-ক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহ তাআলার ভূমিকা, ৬. সৎ লোকের এতো অভাব কেন।

আমেরিকা থেকে প্রকাশিত Muslim World নামক এক কুয়ার্টারলি ম্যাগাজিনের ফরমায়েশ অনুযায়ী গত বছর Political Thoughts of Abul Ala Maududi শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছি। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী এ প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করছে। 'ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ঃ মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা' নামে আমার লেখা একটা পুস্তিকাও মওদূদী একাডেমী প্রকাশ করেছে।

মাওলানা মওদূদী বিপুল ইসলামী সাহিত্য রেখে গেছেন বলেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া সত্ত্বেও তাঁর মূল্যবান সাহিত্য আল্লাহর পথে আমাদের অপরিহার্য পাথেয় হয়ে আছে। ইসলামী আন্দোলনের জন্য যেসব বিষয় প্রয়োজনবোধ করছি তা আমিও যথাসাধ্য লিখে রেখে যেতে চাই।

ইসলামী আন্দোলনের জন্যই আমার সময়, শ্রম ও আবেগ কাজে লাগাবার চেষ্টা করছি। আমার আর কোন পেশা, নেশা ও শখ নেই। যে কটা দিন বেঁচে আছি তা ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যেই যেন ব্যবহার করতে পারি এ কামনাই করি। এর জন্য সবার কাছে দোয়া চাই। 'জীবনে যা দেখলাম' নামে ধারাবাহিক লেখাটির জন্যও আমার যথেষ্ট সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়। এটাও ইসলামী আন্দোলনের জন্য সহায়ক মনে করেই লিখছি।

ভাইদের দীনী অবস্থা

আব্বা আমার ভাইদেরকে ম্যাট্রিকের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী আরবী ভাষা শিক্ষার উপরে যে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছিলেন তা সার্থক হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের ঢেউ আমাদের পরিবারে এসে লাগার পর ইসলামী সাহিত্য ও তাফহীমুল কুরআন অধ্যয়নের আগ্রহ আমার ভাইদের মধ্যেও শুরু হয়ে গেলো। আমার দ্বিতীয় ভাই ডা. মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্‌যাম রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক থাকাকালে সাহেববাজার জামে মসজিদে নিয়মিত দারসে কুরআন দিতো। সে আমাদের মহল্লার মসজিদ কমিটির সভাপতি। প্রতি শুক্রবার আযানের পর থেকে কমপক্ষে আধাঘণ্টা কুরআনের ধারাবাহিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পেশ করে যাচ্ছে। সে ১৯৯৩ সালে আমার জেলে থাকাকালে জামায়াতের রুকন হয়। বেশ কয়েক টার্ম জামায়াতের ঢাকা মহানগর শূরার সদস্য নির্বাচিত হয়।

তৃতীয় ভাই ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ গোলাম মুকাররাম স্বাস্থ্যগত কারণে দীনের কাজে সাংগঠনিকভাবে জড়িত না হলেও দাওয়াতে দীনের উদ্দেশ্যে সক্রিয়। আত্মীয় ও পরিচিত মহলে ইসলামী বই বিলি ও দাওয়াতী উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা করে থাকে।

চতুর্থ ভাই ড. মুহাম্মদ মাহদীউয্‌যামান সিরিয়াসলি কুরআন অধ্যয়ন করে। বুয়েটের অধ্যাপক থাকাকালে ওখানকার মসজিদে দারসে কুরআন দিতো। বর্তমানে চট্টগ্রামে বিভিন্ন মসজিদে দারস পেশ করে।

৮৯.

আমার সন্তানদের কথা

আল্লাহ তাআলা মেহেরবানী করে আমাকে ৬টি ছেলে সন্তান দান করেছেন। কোন কন্যা সন্তান দেননি। সূরা আশ-শূরার ৪৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

"তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র দেন, অথবা যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন, এবং যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান করেন।" আল্লাহ যে অথরিটি নিয়ে এ কথা বলেছেন তাকে চ্যালেঞ্জ করার সাধ্য কারো নেই।

বাংলাদেশে সৌদী আরবের প্রথম রাষ্ট্রদূত আমাকে বললেন, "You may be

father of six sons, but as you have no daughter, you are not full father, you are only half father." (আপনি ৬ ছেলের পিতা হতে পারেন, কিন্তু আপনার কোন মেয়ে নেই বলে আপনি পূর্ণ পিতা নন, অর্ধেক পিতা)। এ মন্তব্য সর্বপ্রথম তাঁর মুখেই শুনলাম। কথাটি এতো চমৎকার মনে হয়েছে যে, যারা শুধু ছেলে বা শুধু মেয়ের পিতা তাদের উপর রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল খাতীবের নাম উল্লেখ করে ঐ মন্তব্যটি প্রয়োগ করে তৃপ্তিবোধ করি।

আমার প্রথম ছেলে মামূন আব্বার বড় নাতি। বিগত এক কিস্তিতে উল্লেখ করেছি যে, আব্বা আমার দাদাকে স্বপ্নে নামের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। দাদা নাকি বললেন, "তুমি জানো না যে, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, সব চাইতে ভালো নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান?" সুতরাং নাম রাখা হলো আবদুল্লাহ। প্রশ্ন উঠলো যে, ডাক নাম কী রাখা হবে? আব্বা আমনুন শব্দ থেকে গঠিত ৪টি শব্দ বললেন, "মামূন, আমীন, মুমিন ও আমান।" 'আমন' শব্দের অর্থ নিরাপত্তা ও শান্তি। মামূন ও মুমিন শব্দের অর্থ বিশ্বস্ত (যার নিকট আমানত রাখা নিরাপদ)। আমান অর্থ নিরাপত্তা, শান্তি, আশ্রয় ইত্যাদি।

আমার ভাই-বোনরা তাদের প্রথম ভাতিজার নাম রাখার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলো। সবাই ঐ চারটি শব্দের মধ্যে মামূন শব্দটি পছন্দ করলো। এভাবে পুরা নাম দাঁড়ালো আবদুল্লাহিল মামূন। আবদুল্লাহ মামূনও রাখা যেতো। বিচ্ছিন্ন দুটো শব্দে নাম রাখার রেওয়াজ আছে। আমার ফুফা-শ্বশুর মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী ও তাঁর ছোট ভাই জমিয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী'র নাম আমার নিকট খুব শ্রুতিমধুর মনে হতো। তাই ঐ পদ্ধতি নকল করে নাম রাখা হলো আবদুল্লাহিল মামূন।

১৯৫৪ সালের আগস্টে দেড় বছর পরই দ্বিতীয় ছেলে পয়দা হলো। আব্বা বললেন, "ঐ চার শব্দের বাকি তিন শব্দ থেকে একটি বেছে নাও।" আমীন শব্দটি বাছাই করা হলো। এর পূর্ণ নাম হলো আবদুল্লাহিল আমীন।

আমি রংপুর কলেজে থাকাকালেই এ দু'ছেলে আমার শ্বশুর বাড়ি নওগাঁয় জন্মগ্রহণ করে। ১৯৫৫ সালে চাকরি থেকে অব্যাহতি পেয়ে ঢাকায় চলে এলাম। বাড়ির অতি নিকটে হলি ফেমিলি হাসপাতালে আমার বাকি ৪ ছেলের জন্ম হয়। ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে তৃতীয় ছেলে হলে ঐ ৪টি শব্দের তৃতীয় শব্দ নিয়ে নাম রাখা হলো আবদুল্লাহিল মুমিন। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে চতুর্থ ছেলে হলো। ঐ ৪ শব্দের শেষ শব্দটি নিয়ে নাম রাখা হলো আবদুল্লাহিল আমান।

১৯৬২ সালের অক্টোবরে যখন পঞ্চম ছেলে পয়দা হলো তখন নাম রাখার ব্যাপারে সমস্যা সৃষ্টি হলো। আব্বার দেওয়া ৪ শব্দ শেষ হয়ে গেলো। আগের ৪ ছেলের নামের সাথে মিল রেখে কোন শব্দ আব্বা যোগাড় করতে পারলেন না। এ সঙ্কটের সমাধানের জন্য আমার শ্বশুর সাহেব আব্বার সাথে বসলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত দিতে

সক্ষম হলেন না। বাধ্য হয়ে আমাকেই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হলো। একজন সাহাবীর নাম হিসেবে নোমান রাখার প্রস্তাব দিলাম। এ শব্দের অর্থ তালাশ না করেই সাহাবীর নাম হওয়ায় সবাই মেনে নিলেন। পরে আরবী অভিধান খুলে অর্থ পাওয়া গেলো 'রক্ত'।

১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে আমার ৬ নম্বর ছেলে হওয়ার খবর টেলিফোনে হাসপাতাল থেকে নার্স জানালো। আব্বার কামরায়ই ফোন ছিলো। তিনি কামরা থেকে বের হয়ে এলেন। পাশের ঘরে মামূনরা ৪ ভাই ছিলো। আব্বা ওদেরকে ডেকে বললেন, "তোমরা সবাই আস, সুখবর আছে!" সবাই দৌড়ে এলো। আব্বা বললেন, "তোমাদের আরও এক ভাই হয়েছে।"

যে কোন সময় হাসপাতাল থেকে খবর আসতে পারে বলে সবাই অপেক্ষায়ই ছিলো। আমি লক্ষ্য করলাম যে, ভাই হবার খবর পেয়ে তাদের মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়াই দেখা গেলো না। শুনে নীরবে ঘরে ফিরে গেলো।

আব্বা জিজ্ঞেস করলেন, বোন হবার খবর পেলে কি খুশি হতে?

সবাই হ্যাঁ-বোধক মাথা নাড়লো।

৫ম ছেলে নোমানের বয়স তখন মাত্র ৪ বছর। এর বড় ৪ জনই স্কুলে পড়ে। তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত ছোট ভাইটির নাম রাখায় সমস্যা দেখা দিলো। সবার নামের সাথে নাম মিলিয়ে নাম যোগাড় করাই সমস্যা। এবারও আমাকেই সমাধান দিতে হলো। আর এক সাহাবীর নাম প্রস্তাব করলাম—সালমান। প্রথম ৪টি নামের সাথে নোমান ও সালমানের ঘনিষ্ঠ মিল না হলেও শেষ অক্ষর নুন্ হওয়ায় কোন রকমে চলে। তাই এ নামটিও সবাই পছন্দ করলো।

ফ্যামিলি নেইম

বংশগত পরিচয় বহন করার মতো কোন শব্দ নামের শুরু বা শেষে ব্যবহার করার রীতি সব দেশেই চালু আছে। শেখ, সরদার, চৌধুরী, খান, খোন্দকার, মির্যা, ভূঁইয়া, মৃধা, মজুমদার, তালুকদার, পাঠান, সৈয়দ, মোল্লা, কাযী, মুন্শী ইত্যাদি বহু পারিবারিক নাম আমাদের দেশে প্রচলিত আছে।

আমার দাদার আব্বার নাম ছিলো শায়খ শাহাবুদ্দীন মুন্শী। তাঁর ৪ পুরুষ পূর্ব পর্যন্ত নামের শুরুতে শায়খ শব্দ ছিলো বলে জানা যায়। কিন্তু দাদা এ শব্দটি নিজের নামে ব্যবহার করেননি। তিনি ব্যবহার করলে এটাই আমাদের ফ্যামিলি নেইম হিসেবে গণ্য হতো।

আমরা দেশে ফ্যামিলি নেইমের কোন অভাব অনুভব করিনি। কিন্তু আমার ছেলেরা বিদেশে এর প্রয়োজন বোধ করায় এ বিষয়ে আমাকে সিদ্ধান্ত দিতে হলো। এক দেশ থেকে আর এক দেশে গেলে ইমিগ্রেশন কার্ড পূরণ করতে হয়। তাতে ফ্যামিলি নেইমের কলাম অবশ্যই থাকে। চাকরির দরখাস্তের ফরমেও এ কলাম

পূরণ করতে হয়। আইডেনটিটি কার্ড এবং হেলথ কার্ড করতেও এর দরকার হয়।

শেষ পর্যন্ত আমি ছেলেদেরকে পরামর্শ দিলাম যে, আমার নামের শেষ শব্দ আযম অবলম্বনে তোমরা 'আযামী' লিখতে পারো। ছেলেরা সবাই একই বানান লিখছে না। কেউ আল-আযামী, কেউ আযামী, আবার কেউ আযমী লিখে। এর অর্থ দাঁড়ায় আযম-এর সাথে সম্পর্কিত।

আসল নাম ও ডাক নাম

আমাদের দেশে নাম রাখার ব্যাপারে রেওয়াজ আছে যে, আসল নামটা আরবীতে রাখা হয়। আর ডাকার জন্য আলাদা নাম বাছাই করে। ডাক নামের কোন অর্থের প্রয়োজন বোধ করা হয় না। বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফারসি শব্দ ছাড়াও অর্থহীন বহু শব্দ ডাক নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ডাক নাম এমন যে, তা থেকে ছেলেটি মুসলমান কিনা বুঝবার উপায় নেই। ছোট বয়সের সব ছেলেকেই 'খোকা' এদিকে আস বলা যায়। কিন্তু এটা যদি ডাক নাম হয় তাহলে বাবা বা দাদার বয়সেও খোকা বলেই ডাকতে হয়।

আমি লক্ষ্য করেছি যে, কোন ছেলেকে তার নাম জিজ্ঞেস করলে সাধারণত সে ডাক নামটাই বলে। ছেলেটির বাপ-মা সাথে থাকলে তারা বলেন, ভালো নামটাও বলো। তখন আমি ছেলেটিকে বলি, "এটা যদি তোমার ভালো নাম হয়, তাহলে ঐ নামটাকে কি খারাপ নাম মনে কর?" তখন ছেলে বিব্রতবোধ করে। তাই 'ভালো নাম' না বলে 'আসল নাম' বলাই উচিত। এর পরও প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একটা আসল হলে অন্যটা কি নকল? সেদিন এক ছেলে ডাকনামকে ছোটনাম বলে উল্লেখ করলো।

এ সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে আমার ছেলেদের আমি দু'নাম রাখিনি। আসল নামের একটি শব্দকেই ডাক নাম হিসেবে ব্যবহার করা সবচেয়ে নিরাপদ। আবদুল্লাহিল মামূনকে মামূন বলে ডাকি।

দু'নামের বড় সমস্যা হলো যে, আত্মীয়-স্বজনরা শুধু ডাক নামেই চেনে। আসল নাম জানার সুযোগ হয় না। তাই ঐ নাম শুনলে চিনতেই পারে না। মনে পড়ে, ফজলুল হক মুসলিম হলে যখন ছিলাম তখন গ্রাম থেকে এক কৃষক পিতা হলের গেটে এসে দারোয়ানকে বললেন, "আমার ছেলে হলে থাকে, তাকে ডেকে দিন" দারোয়ান ছেলের নাম জানতে চাইলে তিনি যে নাম বললেন, তা ডাক নাম। আসল নাম বলতে না পারায় দারোয়ান তাকে হল অফিসে নিয়ে গেলো। হলের কেরানী সাহেব তাকে নিয়ে হলের প্রতি কামরায় তার ছেলেকে তালাশ করতে করতে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেলো।

নামের শুদ্ধ উচ্চারণ

আরবী নামের সঠিক উচ্চারণ বাঙালি মুখে কমই হয়। বিশেষ করে নামের মধ্যে

আইন, গাইন, কাফ, তোয়া, যোয়া, দোয়াদ ইত্যাদির উচ্চারণ করা কঠিনই বটে। আমি এ সব অক্ষর বাদ দিয়ে ছেলেদের নাম রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, নোমানের বেলায় 'আইন' অক্ষর রয়েই গেলো। আইনের সম-উচ্চারণের কোন অক্ষর বাংলায় নেই। তাই আইনের উচ্চারণ ছাড়া সবাই নোমানই ডাকে।

ইংল্যান্ডে যখন তাকে স্কুলে ভর্তি করা হলো তখন নাম লেখা হলো Noman. ক্লাসের শিক্ষক বললো, you are no man. তখন বানান লেখা হলো Numaan.

মাওলানা মওদূদীর এ অঞ্চলে সফরের সময় নামের উচ্চারণ নিয়ে তিনি মজার মন্তব্য করলেন। তিনি কারো কারো মুখে আমার নামের উচ্চারণ শুনলেন আযমের বদলে আজম (জীমের উচ্চারণ)। আবার আবদুল জলীলের উচ্চারণ শুনলেন জীমের বদলে 'যা' অক্ষরের উচ্চারণ যালীম।

তিনি মন্তব্য করলেন, "বাঙালি বড় আজব। জীম-এর উচ্চারণ করতে না পারলে মাফ করে দিতাম। কিন্তু উচ্চারণ করে উল্টা, এটা কী করে মাফ করা যায়!"

আমার কাছে নবজাত শিশুর নাম রাখার আবদার নিয়ে যারা আসেন তাদেরকে অনেক নামের একটি বাংলা বই দেই। কয়েকটি পছন্দের নাম বাছাই করতে বলি। এর পর সহজ উচ্চারণের নামটি রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকি। বইটিতে আরবী নামের বাংলা অর্থ লেখা থাকায় অর্থপূর্ণ সুন্দর নাম বাছাই করা সহজ হয়। ইংরেজি ভাষায়ও অনুরূপ একটি বই আছে।

ভালো নাম রাখা পিতা-মাতার একটি পবিত্র দায়িত্ব। অর্থহীন বা মন্দ অর্থবোধক নাম রাখা মোটেই শোভন নয়। আমাদের দেশে আরবীতে এমন সব নামও রাখা হয়, যার কোন অর্থই হয় না। কুরআন থেকে শব্দ নিয়ে নাম রাখার রেওয়াজ আছে। তাই বলে কুরআনের যে কোন শব্দই নাম হিসেবে গ্রহণ করা চলে না। কুরআনে যুলুমাত শব্দ আছে। এর মানে অন্ধকার। যুলমত আলী নামও রাখা হয়।

আমার ছেলেদের লেখাপড়া

আমার তো ছেলেদের দিকে তাকাবার ফুরসতই ছিলো না। মাসের অধিকাংশ দিনই সাংগঠনিক সফরে কাটতো। ঢাকায় থাকলে সকালে নাশতা করে ৮ টায় জামায়াত অফিসে চলে যেতাম। যোহরের পর বাড়িতে এসে খেয়ে আবার অফিসে যেতে হতো। রাত ১০ টার আগে কম দিনই বাড়িতে ফিরে আসা যেতো। নাশতা ও খাওয়ার সময় আব্বাই নাতিদেরকে সাথে নিয়ে খেতেন। আব্বার সাহচর্য পেয়ে ওরা মুখে মুখেই অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেলো। আব্বা তাঁর কাযী অফিসের জন্য কেরানী হিসেবে একজন ভালো কারী যোগাড় করলেন। মোমেনশাহীর কারী আলতাফ হুসাইনকে আব্বা বাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এভাবেই আল্লাহর রহমতে আমার ছেলেরা প্রথম থেকেই বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শেখার সৌভাগ্য লাভ করলো। প্রথমে যদি শুদ্ধ পড়া না শেখে তাহলে পরে আর সহজে শুদ্ধ করা সম্ভব হয় না।

যখন স্কুলে যাবার বয়স হলো তখন সমস্যায় পড়লাম। বর্তমানে ঢাকায় তামীরুল মিল্লাত মাদরাসায় যেমন আরবী, বাংলা ও ইংরেজি, এমনকি বিজ্ঞান পর্যন্ত পড়ানো হয়, সেকালে এমন কোন মাদরাসা ছিলো না। ১৯৫৬ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সরকার কায়েম হবার পর নিউ স্কীম মাদরাসা উঠিয়ে দিয়ে হাই স্কুলে পরিণত করলো। জামায়াতের লোকদের উদ্যোগে একটি প্রাথমিক স্কুল শুরু করা হলেও টেকানো গেলো না। সেগুন বাগিচা হাই স্কুলের হেড মাস্টার জনাব শহীদুল হক ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় জেনে বড় দু'ছেলেকে ঐ স্কুলেই ভর্তি করলাম। কয়েক বছর পর বাড়ির নিকটবর্তী সিদ্ধেশ্বরী হাই স্কুলের হেড মাস্টার হিসেবে জনাব আমীরুল হক দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ছেলেদেরকে এ স্কুলেই নিয়ে এলাম।

জনাব অমীরুল হকের সাথে আমার পূর্বেই পরিচয় ছিলো। তিনি লালমনিরহাটের অন্তর্গত পাটগ্রাম হাইস্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। আমি তখন রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনা করি। ঐ স্কুলের বার্ষিক মিলাদে অতিথি হিসেবে গিয়েছিলাম। তাঁকে মযবুত ঈমান বিশিষ্ট মুসলিম বলে আমার ধারণা হলো। তাই তিনি সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের হেড মাস্টার হওয়ায় আমার ছেলেদেরকে তাঁরই অভিভাবকত্বে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

বড় ছেলে মামূন যখন ক্লাস নাইনে উঠলো, তখন জানা গেলো যে, সব ছাত্রই আরবীর বদলে উর্দু পছন্দ করে। আমি হেড মাস্টারের সাথে দেখা করে জানতে পারলাম যে, আরবীর শিক্ষকরা উর্দু পড়ানো সহজ মনে করে বলে ছাত্রদেরকে উর্দু নিতে উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া উর্দু মাত্র ১০০ নম্বরের পেপার, আর আরবী নিলে ২০০ নম্বরের দু'পেপার। আমি জানতাম হেড মাস্টার সাহেব আরবীতে এমএ। ব্রিটিশ আমলে তিনি পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কলেজে আরবীর অধ্যাপক ছিলেন। আমি তাঁর নিকট দাবি জানালাম যে, আমার ছেলেকে আরবী নেবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ওকে পড়াবার দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। তিনি রাজি হলেন বটে, কিন্তু একজন মাত্র ছাত্রের জন্য রুটিনে সময় নির্দিষ্ট করা গেলো না। তিনি উর্দু ক্লাসের সময় অবসর থাকলে অফিসে মামূনকে ডেকে পড়াতেন। আব্বা বাড়িতে তাকে আরবী পড়াবার কষ্ট স্বীকার না করলে আরবী শেখার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতো। আব্বা যে কতোদিক দিয়ে আমাকে ঋণী করে গেছেন, এর হিসাব করার সাধ্যও আমার নেই। ক্লাস নাইনের বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্টে সন্তুষ্ট হতে না পেরে মামূনকে খিলগাঁও সরকারি হাই স্কুলে ভর্তি করলাম। আল্লাহর রহমতে ম্যাট্রিক ভালোই করলো। দ্বিতীয় ছেলেকেও এ হাই স্কুলেই নিয়ে গেলাম।

১৯৬৯ সালে বড় ছেলে ঢাকা সরকারি কলেজে আইএ ক্লাসে এবং ২য় ছেলে ঐ কলেজেই '৭০ সালে আইএসসি-তে ভর্তি হলো। '৭১ সালে বড় ছেলে আইএ পাস করলো বটে, কিন্তু নতুন বাংলাদেশ সরকার ঐ পরীক্ষা বাতিল করে দিলো।

বড় ছেলে ম্যাট্রিক পাস করার পর আব্বা আমাকে বললেন, "সারাদেশ হেদায়াত করে বেড়াচ্ছো, ছেলেদেরকে সময় দিচ্ছো না, পরে পস্তাতে হবে।"

ঢাকা কলেজের ইসলামী ছাত্র সঙ্ঘের দায়িত্বশীলকে ডেকে ছেলেকে তার হাতে তুলে দিয়ে বললাম যে, সে যদি সংগঠনে সিরিয়াস না হয় তাহলে কলেজে পড়াবোই না। ইসলামী ছাত্র সংগঠন যে আল্লাহ্ তাআলার কতো বড় নিয়ামত তা আমি উপলব্ধি করলাম। বিবাহযোগ্য কন্যার পিতা-মাতাকে কন্যাদায়গ্রস্ত বলা হয়। যাদের ছেলেমেয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তাদেরকেও আমি সন্তান দায়গ্রস্ত মনে করি। বর্তমানে ইসলামী ছাত্রশিবির ও ইসলামী ছাত্রী সংস্থা সন্তান দায়গ্রস্ত পিতামাতার সন্তানদের অত্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্তানদেরকে উচ্চশিক্ষিত করার সাথে সাথে যারা সন্তানদেরকে সৎ ও চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলতে চান তাদের জন্য এ দুটো সংগঠন একমাত্র আশ্রয়।

শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত একাডেমিক শিক্ষার সাথে সাথে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় দীনদার হেড মাস্টার তালাশ করে ছেলেদেরকে ভর্তি করতে বাধ্য হয়েছি। এ সমস্যা তুলে ধরার জন্যই আমার ছেলেদের লেখাপড়ার সমস্যা নিয়ে এতো দীর্ঘ আলোচনা করলাম।

স্বাধীন বাংলাদেশে আমার ছেলেদের নিরাপত্তা সঙ্কট

১৯৭১ সালে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে স্বাধীনতা আন্দোলন হওয়ায় এবং ভারতের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতার পরিণামে তাদের আধিপত্য কায়েম হবার আশঙ্কায় আমি মুক্তিযুদ্ধে শরীক হতে পারিনি। ১৯৭১-এর ৩ ডিসেম্বর আমি করাচি থেকে পিআইএ বিমানযোগে ঢাকা রওয়ানা হই। ঐ তারিখেই ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকা বিমানবন্দরে বোমা ফেলে। আমার বিমান ঢাকার কাছে এসেও ফিরে যেতে বাধ্য হয়। আমার বিমান জেদ্দায় আশ্রয় নেয়। তাই ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের সময় আমি দেশে ছিলাম না।

আমার ছেলেদের জন্য মহাসঙ্কট সৃষ্টি হলো। আমার আব্বা ও স্ত্রী ছেলেদের হেফাযতের জন্য যে চেষ্টা করেছেন আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানীতে তা সফল হয়েছে। আরমানিটোলার বিখ্যাত তারা মসজিদের নিকটস্থ সোবহান মনযিলে আমার দু'ভাইয়ের শ্বশুর ও শাশুড়ি ২ মাস তাদের বাড়িতে আমার বড় ছেলে মামূনকে লুকিয়ে রেখেছেন। এরপর ৬ মাস সে সিলেটে ওর বড় চাচার আশ্রয়ে ছিলো। ছোট দুটো ছেলে ছাড়া তিন ছেলেকে গ্রামাঞ্চলে আত্মীয়দের আশ্রয়ে রাখা হয়। এভাবে আল্লাহ্ তাআলা ওদেরকে হেফাযত করেছেন।

তখন আমার ভাই ডা. মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্যাম পিজিতে প্যাথলজি ও মাইক্রোবাইউলজির অধ্যাপক। নেতাদের প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমার ভাই বলে তার উপর নির্ভর করা নিরাপদ মনে না করে সরকার তাকে সিলেট মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব দেয়। এ বদলিটাকে আমার ভাই শাস্তিমূলক মনে করলেও আল্লাহ্ তাআলা এটাকে রহমতে পরিণত করেন। সে কথা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

ছেলেদের সঙ্কট নিরসন

আমাদের সর্বকনিষ্ঠ ভাই মাহদী বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টে লেকচারার থাকাকালেই পিএইচডি ডিগ্রির জন্য ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে যায়। ১৯৭১ সালেই সে ডিগ্রি হাসিল করে। দেশে স্থিতিশীলতা কায়েমের অপেক্ষায় সে ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নেয় এবং বাড়ি কিনে সপরিবারে অবস্থান করে।

আব্বা এবং আমার ডাক্তার ভাই মাহদীর সাথে যোগাযোগ করে ডাক্তারের বড় ছেলে সোহাইল এবং আমার বড় দু'ছেলে মামূন ও আমীনকে মাহদীর কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। ডাক্তার সিলেট মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল এবং কলেজ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট হওয়ায় সহজেই ডিসির সাহায্যে তাদের পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। সিলেটের বিরাটসংখ্যক মানুষ ইংল্যান্ডে থাকে বলে সেখানে আগে থেকেই পাসপোর্ট অফিস ছিলো। এভাবেই ডাক্তারের সিলেট বদলি হওয়াটা রহমত বলে প্রমাণিত হয়। হাসপাতালের প্রধানের নিকট ডিসি'রও ঠেকা থাকে। এভাবে পাসপোর্ট হাসিল করতে পারার কারণেই সহজে বিদেশে পাঠানো সম্ভব হলো।

আমার ভাই ম্যানচেস্টারে না থাকলে আমাদের দু'ভায়ের বড় তিন ছেলের নিরাপত্তার কোন বিকল্পই ছিলো না। আমার ভায়ের অভিভাবকত্বে ওরা সেখানেই লেখাপড়া করার সুযোগ পেলো। এ জন্য আমি এ ভাইটির নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তার এ ঋণ আমি কোন দিনই শোধ করতে পারবো না। আমার ভাইয়ের বাড়িতে ছেলেদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হওয়াটাই বিরাট ব্যয়বহুল ব্যাপার। তাদের পড়ার খরচের বোঝা তার উপর চাপানো যায় না বলেই ছেলেদেরকে চাকরি করেই পড়ার খরচ যোগাড় করতে হয়েছে। পার্ট টাইম চাকরি করে পার্ট টাইম ছাত্র হিসেবেই তাদেরকে এগুতে হয়েছে। আমি তাদেরকে সামান্য আর্থিক সাহায্যও করতে পারিনি।

ছেলেরা '৭২ সালের মধ্যেই ম্যানচেস্টার পৌঁছে যায়। আমি বাধ্যতামূলক নির্বাসিত জীবন কাটাবার উদ্দেশ্যে ১৯৭৩-এর এপ্রিল মাসে সৌদী আরব থেকে লন্ডন পৌঁছি। সে কাহিনী পরে এক সময় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

বড় ছেলে মামূন চাকরি করেই অর্থনীতিতে অনার্স পড়া শুরু করলো। তৃতীয় বর্ষ অনার্সের সময় চাকরি বাদ দিয়ে ৬ মাস পড়াশুনায় সময় দিতে বাধ্য হওয়ায় ধার করার প্রয়োজন হয়। তার বড় চাচা ডা. গোলাম মুয়ায্যাম থেকে ৫০০ পাউন্ড ধার নেয়। অনার্স পাস করার পর মাস্টার্স পড়ার সময় চাকরি করে পার্ট টাইম ছাত্র হিসেবে পড়েছে। আমার ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি হাসিলের জন্য আমি সামান্য সাহায্যও করতে পারলাম না। আল্লাহর মেহেরবানীতে সে চাকরি করেও সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পেলো।

আমীন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানে অনার্স পড়ছিলো। ছাত্র জীবন মুলতবি করাটা বড়ই বিপজ্জনক। সে একটা নিটিং ফ্যাক্টরিতে পার্ট টাইম চাকরি করতো। যখন সে ফুল টাইম চাকরির ইচ্ছা প্রকাশ করলো তখন মালিক খুব খুশি হলো। কারণ ওর কাজ তার খুব পছন্দ ছিলো। কিছুদিনের মধ্যেই কারখানার মালিক তাকে ক্যাশের দায়িত্বসহ ম্যানেজারের পদে বসিয়ে দিলো। তার বিশ্বস্ততা, যোগ্যতা ও আন্তরিকতায় মালিক এতোটা মুগ্ধ ছিলো যে, ফ্যাক্টরির পূর্ণ কর্তৃত্ব তার হাতে তুলে দিলো। সততা ও বিশ্বস্ততার মূল্যায়ন সবাই করে থাকে। সে তার সময়, শ্রম, আবেগ ও নিষ্ঠা প্রয়োগ করে কাজ করতে গিয়ে ছাত্র জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। দু'বছর পর যখন মামূনের মাস্টার্স ডিগ্রি হয়ে গেলো তখন আমীনের ছাত্র জীবন আবার শুরু করার কথা ছিলো। ইতোমধ্যে সে একজন অভিজ্ঞ সফল ব্যবসায়ী হিসেবে টেক্সটাইল মহলে পরিচিত। কিন্তু ব্যবসার মালিক সে নয়। চাকরি ছেড়ে নিজে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মালিকের পরামর্শ চাইলো। মালিক তাকে এতো ভালোবাসতো যে, তার মতো একজন নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে আটকে রাখার চেষ্টা না করে তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য সহযোগিতা করলো। তখন থেকে সে একজন ব্যবসায়ী।

আমাদের পরিবারে সেই প্রথম ব্যবসায়ী। তার ডিগ্রি নেওয়া হলো না বলে আমি দুঃখবোধ করেছি। আমার কনিষ্ঠ ছেলে সালমান আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বছর অনার্স ও দুই বছর মাস্টার্স অধ্যয়নকালে আমীনই প্রধানত ওর যাবতীয় খরচ বহন করেছে। আমীন আমার ছোট ছেলের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করলো, সেজন্য আমি তার কাছে ঋণী।

আমার তৃতীয় ছেলে মুমিন এবং ৪র্থ ছেলে আমানকেও আব্বা ম্যানচেস্টারে পাঠালেন। দেশে এদের নিরাপত্তা সমস্যা না থাকলেও শিক্ষা ও নৈতিক পরিবেশ সন্তোষজনক নয় বলেই আব্বা এ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করলেন। ১৯৭৬ সালে আমার স্ত্রী ছোট দু'ছেলেকে নিয়ে লন্ডন পৌঁছলে সাড়ে চার বছর পর স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ হলো। বছরখানিক পরই ৫ম ছেলে নোমানকে দেশে পাঠিয়ে দিলাম। আমি যখন ১৯৭৮ সালের জুলাইতে দেশে ফিরলাম তখন ৩য় ছেলে ও কনিষ্ঠ ছেলেকে সাথেই নিয়ে এলাম। ৪র্থ ছেলেও কয়েক মাস পরে চলে এলো। শুধু বড় দু'জনই সেখানে রয়ে গেলো।

৯০.

বর্তমানে ছেলেদের অবস্থান

১৯৯৬-এর মার্চ থেকেই বড় ছেলে মামূন জেদ্দাস্থ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে (IDB) উচ্চ পদে কর্মরত। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সে লন্ডনে সরকারি উচ্চ কর্মকর্তা ছিলো। আমি তাকে দেশে আনার উদ্যোগ নিলাম। ওখানকার ইসলামী সংগঠন 'ইসলামী ফোরাম ইউরোপ'-এ সে তারবিয়াতের দায়িত্বশীল ছিলো। ফোরামের নেতৃবৃন্দ তাকে দেশে আসতে দিলো না। আমি চাপ প্রয়োগ করলে তারা বললেন, "সে যে পদে চাকরি করছে তাতে এমন অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পেয়েছে, যা সরকারের সচিবালয়ে কাজে লাগবে। তাই তাকে আরও অভিজ্ঞ হতে দিন।"

১৯৯৩ সালে জেলে থাকাকালে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় দীর্ঘ চিঠি লিখে তাকে দেশে আসার নির্দেশ দিলাম। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মুখে শুনেছি যে, লন্ডনে সে মাওলানাকে আমার চিঠি পড়ে শুনিয়ে কেঁদে কেঁদে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে যে, দেশে চলে আসবে। আমার সাথে রেখে ইসলামী আন্দোলনের দিক দিয়ে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যেই তাকে আসতে বাধ্য করলাম। ১৯৯৪-এর অক্টোবরেই সে সপরিবারে চলে এলো। ৯৫ সালেই ঢাকা মহানগরী শাখার রুকন হয়ে গেলো। বিদেশে আমাদের ইসলামী সংগঠন থাকলেও কোন প্রবাসীকে জামায়াতে ইসলামীর রুকন করা হয় না।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর ট্রেনিং একাডেমীতে সে চাকরি পেলো। চাকরিতে তাকে এতো সময় দিতে হয় যে, আমি যে আশা নিয়ে ওকে আনলাম সে উদ্দেশ্যে সে সময়ই দিতে পারছিলো না। বিকাল থেকে রাত প্রায় ১০ টা পর্যন্ত আমি সাংগঠনিক দায়িত্বে ব্যস্ত থাকি। দুপুরের আগে আমি তাকে সময় দিতে চাইলেও তখন সে অফিসে থাকতে বাধ্য। আমি খুব বিব্রতবোধ করলাম।

মামূন জেদ্দাস্থ ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে (IDB) বেশ কয়েক বছর আগেই দরখাস্ত দিয়ে রেখেছিলো। ১৯৯৫ সালে সপরিবারে সরকারি মেহমান হিসেবে সৌদী আরব গেলাম। ১৯৯৪-এর জুনে সুপ্রিমকোর্ট আমার নাগরিকত্ব বহাল করে রায় দেবার পর এটাই প্রথম বিদেশ সফর। মামূনও সাথে গেলো। এ সুযোগে সে IDB-তে যোগাযোগ করলে কর্তৃপক্ষ তার ডিগ্রি, লন্ডনে সরকারি চাকরির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন দেশের ছাত্রদেরকে নিয়ে বহু বছরের কর্মতৎপরতার ভিত্তিতে তাকে উচ্চ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়।

IDB-তে সে যে দায়িত্ব পেয়েছে তাতে ইসলামী আন্দোলনের খিদমতের সাথে সাথে ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে জেনে আমি আর আপত্তি করলাম না।

আমার সাহচর্যে রেখে ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিতে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্য পূরণ না হলেও সে এখন দাওয়াতে দীনের যে সুযোগ পেয়েছে তাতে আমি সন্তুষ্ট। দোয়া করছি আল্লাহ পাক তাকে আমার আশার চেয়েও বড় দীনের মুজাহিদ বানান।

দ্বিতীয় ছেলে আমীন ম্যানচেস্টারে ব্যবসা নিয়ে মহাব্যস্ত থাকে। কর্মচারীদের উপর নির্ভর করা যায় না বলে ব্যবসা সম্প্রসারণ না করে নিজের যতটুকু সরাসরি তদারকি করা সম্ভব এর মধ্যেই সীমিত রেখেছে। সংগঠনে শরীক আছে। ইয়ানাত দানে অগ্রসর হলেও সংগঠনে অনগ্রসর। এ বিষয়ে আমার তাগিদ দেওয়া অব্যাহত আছে।

তৃতীয় ছেলে মুমিন ম্যানচেস্টারে চাকরি করে। আল্লাহর রহমতে সে সংগঠনে যথাযথভাবে সক্রিয়। বি-কম পাস করে দেশেও সে চাকরি করতো।

চতুর্থ ছেলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অফিসার। ১৯৮১ সালে পঞ্চম লং কোর্সে সে সোর্ড অব অনার ও গোল্ড মেডেল পায়। ১৯৯৮ সালে মেজর থেকে লেফটেনেন্ট কর্নেলে উন্নীত হবার কথা ছিলো। আমার ছেলে হবার অপরাধে ২০০১ সাল পর্যন্ত তার প্রমোশন হয়নি। ২০০২ সালে প্রমোশন পেলো।

পঞ্চম ছেলে নোমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যানেজমেন্টে অনার্স ও এম-কম পাস করে ম্যানচেস্টারে চলে গেলো। ছাত্র জীবনে সে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্যপ্রার্থী ও সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালক ছিলো। বর্তমানে ম্যানচেস্টারে সংগঠনের সাংস্কৃতিক বিভাগে দায়িত্ব পালন করছে। ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে এবং পিএইচডি করার অনুমতিও পেয়েছে।

সর্বকনিষ্ঠ ছেলে সালমান ছাত্র জীবনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য ও সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালক ছিলো। সে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে অনার্স পড়তো। ১৯৮৯ সালে ছাত্রদলের সাথে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষের পর শিবিরের ২৪ জন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আর যেতেই পারেনি। এদের মধ্যে সালমান একজন। দু'বছর পর আলীগড় ইউনিভার্সিটিতে লিংগুইস্টিকসে অনার্স ও এমএ করেছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে প্রতিটিতেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে এবং গোল্ড মেডেলও অর্জন করেছে।

সালমানের ধারণা যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ফার্স্ট ক্লাস দিতো কিনা সন্দেহ। দু'বছর শিক্ষাহীন থাকা সত্ত্বেও আলীগড়ে সেশনজট না থাকায় পুষিয়ে গেছে। বর্তমানে সে মানারাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার এ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর। আরও দুই ইউনিভার্সিটিতে পার্ট টাইম ক্লাস নেয়। একমাত্র সে-ই আমার সাথে অবস্থান করছে। বাকি ৪ ছেলে বিদেশে এবং একজন দেশে থাকলেও সপরিবারে সেনানিবাসেই থাকে।

ছেলেদের বিয়ে

আল্লাহ আমাকে কোন মেয়ে দেননি। তবে ৬ ছেলেকে বিয়ে করিয়ে ৬টি মেয়ে যোগাড় করেছি। আল্লাহর শোকর যে, বৌ-মারা হিজাব পালন করে চলে।

বড় ছেলের বিয়ের ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাস।

আমি ও আমার স্ত্রী তখন কয়েক মাস কুয়েতে ছিলাম। বড় ছেলের অনার্স পাস করার খবর পৌঁছলো। তখন তার বয়স ২৫ হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে দেশে ফিরে আসার সরকারি অনুমতি পেয়ে গেলাম। স্ত্রীকে বললাম, মামুনকে বিয়ে করালে কেমন হয়?

তিনি বললেন, পড়া তো এখনো শেষ হয়নি। বললাম, বিয়ের পরও এমএ পড়তে অসুবিধা হবে না। স্ত্রী বললেন, যদি বিয়ে করাতেই চান তাহলে আমি মেয়ে বাছাই করে রেখেছি। বিস্মিত হয়ে বললাম, এ কথা আমাকে তো বলোনি। জওয়াবে বললেন, এতো তাড়াতাড়ি বিয়ে করাবেন বলে আগে তো বলেননি। মেয়ের পরিচয় জানতে চাইলাম। পরিচয় শুনে বললাম, আমি তো এ মেয়ের চাচা হই। মেয়ের বাবা হাফেয ফয়েজ মুহাম্মদ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ছাত্র জীবনে একই হোস্টেলে ছিলাম। তিনি ঝালকাঠিতে ব্যবসা করতেন। জামায়াতের সাংগঠনিক সফরে ঝালকাঠি গেলে হাফেয সাহেবের বাড়িতেই থাকতাম। এ মেয়ের বয়স তখন ৪/৫ বছর। কোলে বসিয়ে কথা বলেছি। আমাকে চাচা ডেকে কথা বলতো। জানতে চাইলাম, এ মেয়েকে কোথায় দেখলে? এর মা হাফেযা আসমা খাতুন ঢাকায় এলে আমাদের বাড়িতে আমার খোঁজ-খবর নিতে আসতেন। আমি ঝালকাঠিতে কয়েকবার তাদের বাড়িতে গিয়েছি। আমি দেশে ফিরে আসতে পারছি না বলে জানতেন। এভাবেই হাফেযার সাথে মেয়েকেও দেখার সুযোগ হয়েছে।

১৯৭৮-এর জুলাই মাসে লন্ডন থেকে ঢাকা পৌঁছলাম। খবর পেয়ে হাফেয ফয়েজ মুহাম্মদ দেখা করতে এলেন। চাচার সাথে দেখা করার জন্য মেয়েও সাথে এলো। হাফেয সাহেব বললেন যে মুন্নী তো আইএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। ওর মা আপনার মতামত ছাড়া এর বিয়ের কোন প্রস্তাবই বিবেচনা করতে রাজি নয়। ২/৩টা প্রস্তাবের কথা জানিয়ে আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমাকে তো বিরাট সমস্যায় ফেললেন। কয়েকটি প্রস্তাবের মধ্যে একটা বাছাই করতে আমার পরামর্শ চাচ্ছেন। আমি এখন কী করি? তিন বছর আগেই এ মেয়েকে আপনার ভাবি তার ছেলের জন্য বাছাই করে রেখেছে। এ কথা শুনেই হাফেয সাহেব আমাকে জড়িয়ে ধরে বারবার আলহামদুলিল্লাহ উচ্চারণ করতে লাগলেন।

বন্ধুকে বললাম, বিয়ের সময় মেয়েকে অলঙ্কার দিয়ে সাজাবার দায়িত্ব পাত্রপক্ষের। হাত, গলা ও কানের অলঙ্কারটুকু না পেলে মেয়ের মন খুশি হতে পারে না। আমার পক্ষে হাত ও গলার অলঙ্কার দেওয়া অসম্ভব। বন্ধু হিসেবে আপনি এ দুটোর একটার দায়িত্ব নিলে আমার জন্য আসান হয়। তিনি খুশি হয়ে রাযি হলেন।

আত্মীয়-স্বজনসহ বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করার সময় আমার এক আত্মীয় ছেলের জন্য কনে পক্ষের নিকট কিছু দাবি করার প্রস্তাব দেবে কিনা আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি কঠোরভাবে নিষেধ করলাম। আমি এটাকে চরম অভদ্রতা মনে করি। আমাদের দুপক্ষের মধ্যে কোনপক্ষই বর ও কনের জন্য কোন কিছু কেউ চায়নি।

১৯৭৮-এর সেপ্টেম্বরেই অনাড়ম্বরভাবে বিয়ে হয়ে গেলো। আমাদের বন্ধুত্ব আরো মযবুত হলো। মেয়ের বাবা-মা দু'জনই জামায়াতের রুকন হওয়ায় আমি গৌরববোধ করলাম।

আল্লাহর শুকরিয়া যে, আমার কোন ছেলেই বিয়েতে কনেপক্ষ থেকে কিছু পাওয়ার সামান্য আগ্রহও প্রকাশ করার মতো ছোটলোকী আচরণ করেনি। ইসলাম স্ত্রীকে যে মর্যাদা দিয়েছে তা আমার বৌ-মারা ভোগ করছে বলে আমি ছেলেদের উপর সন্তুষ্ট। বৌ-মারা আমার মেয়ের অভাব পূরণ করেছে।

নাতি-নাতনীদের কথা

বর্তমানে (২০০২ সাল) আমার ৭ নাতি ও ১২ নাতনী। আমাকে আল্লাহ্ মেয়ে দেননি বটে, কিন্তু নাতির চেয়ে নাতনী বেশি দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছেন। আমি এখন ১৯ জনের দাদা। সরাসরি আমার নানা হবার উপায় নেই বলে আমাকে ভাই-বোনদের মেয়েদের মাধ্যমে নানার মর্যাদা ধার করতে হয়েছে।

আল্লাহর রহমতে ছোট ছেলে সালমান ছাড়া ৫ ছেলেই ফুল ফাদার। সালমানের শুধু দু'মেয়ে। আর সবাইকে আল্লাহ্ ছেলে ও মেয়ে দান করেছেন। আমার বড় নাতি নাবীল ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ফাইনালের এবং দ্বিতীয় নাতি নাযীল অনার্স ১ম বর্ষের ছাত্র। তৃতীয় নাতি ওসামা এ লেভেল শেষ করে মেডিক্যালে চান্স পেয়েছে। এরা তিন ভাই-ই বড় ছেলের সন্তান।

ইসলামী সংগঠন আল্লাহর সেরা রহমত। ম্যানচেস্টারে 'ইয়াং মুসলিম অরগেনাইজেশন'-এ এরা সক্রিয় থাকায় ঐ দেশের পরিবেশেও দীনের পথে অগ্রসর হবার সুযোগ পেয়েছে। এরা সৌদী আরব থেকে 'এ' বা 'ও' লেবেল করে গেছে। সৌদী আরবে বিদেশীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ নেই বলে এরা ম্যানচেস্টারে যেতে বাধ্য হয়েছে।

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের উদ্যোগে প্যারিসে বিদেশী ছাত্রদের আরবী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এ লেভেলের পর আমার দ্বিতীয় নাতি নাযিল এক বছর সেখানে আরবী শিখে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। তৃতীয় নাতি ওসামাও এক বছরের জন্য প্যারিস গেলো আরবী শিখতে। মেডিক্যাল কলেজ তাকে সিলেক্ট করা সত্ত্বেও এক বছরের ছুটি দিয়েছে। ওদের আরবী ভাষা শেখার আগ্রহ দেখে আমি খুবই আনন্দিত।

আমার বড় নাতনী আতিয়া ম্যানচেস্টারেই মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। পূর্ণ ইসলামী পোশাক পরে কলেজে যায়। কর্তৃপক্ষ কোন আপত্তি করে না। এটা দ্বিতীয় ছেলে আমীনের বড় মেয়ে। ওর ৪ মেয়ের পর এক ছেলে। দ্বিতীয় নাতনী আলিয়া মেয়েদের সংগঠনে অত্যন্ত সক্রিয়। দীনী দিক দিয়ে এরা সন্তোষজনকভাবে গড়ে উঠছে বলে আমি অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করছি।

গ্রীষ্মের ছুটিতে একটি ইসলামী সংগঠন এক মাসব্যাপী একটি শিক্ষা-শিবির পরিচালনা করেছে। আমার নাতি-নাতনীরা এতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে জেনে খুবই খুশি হয়েছি।

তৃতীয় ছেলে মুমিনের একমাত্র ছেলে আনাস এবার 'ও' লেভেলে (ম্যাট্রিক) পাস করলো। সেও সংগঠনে সক্রিয়।

একটি বড় আফসোস

দেশে যে দু'ছেলে থাকে ওদের ছেলে-মেয়েরা বাংলাভাষা শেখার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু বিদেশে যে ১৪ জন নাতি-নাতনি থাকে ওরা বাড়িতে বাংলায় কথা বলতে পারে বটে, কিন্তু বাংলা বইপত্র পড়তে পারে না। বাপ-মায়ের সাথে বাংলায় কথা বললেও ওরা নিজেরা যখন আলাপ-সালাপ করে, তখন শুধু ইংরেজিতেই বলে। বড় নাতিকে প্রাথমিক শিক্ষার সময় দেশে রেখেছিলাম বলে বাংলা বই কোন রকমে পড়তে পারলেও চর্চার অভাবে ক্রমেই ভুলে যাচ্ছে। ওকে আমার কাছে বাংলা চিঠি লিখতে বাধ্য করায় দু'একবার লেখার পর চিঠি লেখাও বন্ধ। প্রয়োজন হলে ফোনে কথা বলে, চিঠির আদান-প্রদান নেই।

আমি বেড়াতে গেলে সবাইকে আমার সাথে বাংলায় কথা বলতে বাধ্য করি। কিন্তু ওদের সাথে বৈঠক করে দীন ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা বাংলায় শুরু করেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজিতে বলতে বাধ্য হয়েছি। ওদেরকে দীনের ইলম দান করার উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য ইংরেজির মাধ্যমের কোন বিকল্প নেই। ওদেরকে বললাম, আমি বাংলাভাষী বা বাঙালি। কিন্তু আমার নাতি-নাতনীরা অবাঙালি। এমনকি তোমরা ইংরেজিভাষী হওয়ায় আমাকেও 'ইংরেজ দাদা' সেজে ইংরেজিতে বলতে বাধ্য হতে হলো।

ওরা সবাই ব্রিটিশ নাগরিক। কিন্তু সর্বত্রই ওদের দেশ বাংলাদেশ এবং ওদের বাড়ি ঢাকা বলে পরিচয় দেয়। ঐ দেশ ওদের জন্মভূমি হলেও সে দেশকে নিজেদের দেশ মনে করে না। আমি জানি না যে, কর্মজীবনে ওরা কোন্ দেশে থাকবে। তবে ওদের 'রুট' যে বাংলাদেশ এ ব্যাপারে ওরা সচেতন।

আমার নাতি-নাতনীদের মধ্যে যারা দেশে থাকে ওদেরকে শিশু শ্রেণী থেকে ইংরেজি শেখানো হচ্ছে। অবশ্য বাংলাও শিখছে। আমি লক্ষ্য করছি যে, ঢাকা শহরে সকল সচ্ছল পরিবারই সন্তানদেরকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াচ্ছে এবং 'ও' লেবেল বা 'এ' লেবেল পাস করার পর ধনীরা উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড পাঠায়। আমার সন্তানদের কাউকে অবশ্য এভাবে পাঠাইনি।

আমার আফসোস যে বিদেশে পড়ুয়া আমার নাতি-নাতনীরা বাংলা সাহিত্য পড়ার অযোগ্য হয়ে থাকলো। ইসলাম সম্পর্কে আমার লেখা বই থেকে আমার নাতি-নাতনীরা কিছুই শিখতে সক্ষম নয়, এ কথা মনে হলে দুঃখ বোধ করি। কিন্তু এর

কোন প্রতিকার করাও আমার সাধ্যে নেই। ইংরেজি ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে অনেক বই রয়েছে, যা থেকে ওরা শিখছে। কিন্তু আমি ইসলামী আন্দোলনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কর্মীদের জন্য যা কিছু লিখেছি ও লিখছি সে সব জ্ঞান আমার নাতি-নাতনীদের নাগালের বাইরেই রয়ে গেলো। এটা আমাকে বড়ই বেদনা দেয়। গত বছর (২০০১) ম্যানচেস্টারে কিছুদিন ছিলাম। তখন কয়েক দিন ওদের সাথে বৈঠক করে যতটুকু সম্ভব জ্ঞানদান করার চেষ্টা করেছি। আমার আফসোস যে আমি যা শিখেছি তা আমার বংশধরদেরকে শেখাতে পারলাম না। অবশ্য আমার ছেলেরা সবাই বাংলা ভাষা ভালোভাবেই বুঝে। ওরা আমার বইগুলো পড়ে ওদের সন্তানদেরকে শেখাবার সময় দিতে পারবে কিনা জানি না। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। খুশির বিষয় আমার চতুর্থ ছেলের বড় মেয়ে নাবিহা দেশে থাকার কারণে বাংলা ও ইংরেজি দুটোই ভালোভাবে শিখছে এবং সে আমার সবগুলো বই পড়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কার কদর বেশি

সাধারণত সবাই ছেলে সন্তান হলেই বেশি খুশি হয়। পরপর কয়েক ছেলে হলেও কেউ অসন্তুষ্ট হয় না। অবশ্য যাদের ছেলে আছে, মেয়ে নেই তারা অবশ্যই মেয়ে কামনা করে এবং মেয়ে হলে খুশি হয়। পরপর কয়েকটি মেয়ে হলে ছেলে না হওয়ার কারণে সবাই দুঃখও বোধ করে। এমনও শুনা যায় যে, কয়েক মেয়ের পর যখন ছেলের কামনা তীব্র হয় তখন আবার মেয়ে হলে স্বামী স্ত্রীর উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়, যেনো এর জন্য বেচারী স্ত্রীই দোষী। গরীবদের পরিবারেই সাধারণত এমনটা হয়ে থাকে।

আমার আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত মহলে একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি, ষাটোর্ধ্ব বয়সে স্ত্রী মারা গেলে বেচারা স্বামী সঙ্গীহারা হয়ে প্রায় 'এতীমে' পরিণত হয়। আর একটি বিয়ে করা সম্ভব মনে না হলে বিপত্নীক স্বামী ছেলের সাথে থাকার চেয়ে মেয়ের কাছে থাকা বেশি পছন্দ করে। মেয়েরা যে আবেগের সাথে বৃদ্ধ পিতার সেবাযত্ন করে তা সাধারণত বৌ-মাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বৃদ্ধের নিঃসঙ্গ জীবন। কেউ বৃদ্ধের পাশে বসে সঙ্গদান করে না। ছেলে ও নাতিরা তো নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। নাতনী থাকলে হয়তো কিছু সময় দাদাকে দিতে পারে। বৌ-মাতো সংসার নিয়েই কর্মব্যস্ত। কিন্তু কন্যার বাড়িতে থাকার সুবিধা থাকলে বৃদ্ধ পিতা ছেলের সাথে থাকার চেয়ে মেয়ের কাছে থাকতে পারলেই বেশি খুশি হয়।

ছেলে ও মেয়ে উভয়ই আল্লাহর দেওয়া মহানিয়ামত। তবে ছেলে হলো বংশের চেরাগ। ছেলে না থাকলে বংশের ধারাবাহিকতা থাকে না। মেয়ে তো বিয়ের পর অন্য বংশের সদস্য হয়ে যায়। সে হিসেবে পয়লা সন্তান ছেলে হলে বংশের পরবর্তী প্রজন্মের মুরুব্বীর মর্যাদা পায়। আমার ৬ ছেলের মধ্যে তিনজনের পয়লা

সন্তান ছেলে। বাকি তিনজনের মেয়ে। কনিষ্ঠ ছেলে সালমানের বড় মেয়ে নাবা'র বয়স যখন চার, তখন বৌ-মার সন্তান-সম্ভাবনার কথা শুনে আমি দোয়া করতে থাকলাম যে, বংশের চেরাগ হিসেবে এবার যেনো ছেলে হয়। কিন্তু এবারও মেয়েই হলো তবু বেজার হইনি। সালমানের শ্বশুর বাহরাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। তিনি ফোন করে জামাতাকে মুবারকবাদ জানিয়ে বললেন, মেয়ের দ্বারা যে শান্তি পাওয়া যায়, ছেলে দ্বারা তা হয় না। তিনি সান্ত্বনা দেবার মনোভাব নিয়েই এ কথা বললেন। গত গ্রীষ্মের ছুটিতে ঢাকায় আসলে বেহাই সাহেবকে বললাম, আপনাকে ছেলের জন্য দোয়া করতে বলেছিলাম। আপনি দোয়াতে আমার সাথে শরীক হননি বলে বুঝা গেলো।

পরিবারে ছোট শিশুর মূল্যায়ন

যে বাড়িতে ছোট শিশু নেই, সে বাড়িটা নিষ্প্রাণ। বিশেষ করে ছ'মাস থেকে বছর দেড়-দু'বছরের শিশু যে বাড়িতে থাকে সে বাড়ি সদা প্রাণবন্ত। সবাই এ বয়সের শিশুর সাথে এক বিশেষ সুরে ও ভাষায় কথা বলে। যারা তা শুনে তারাও আনন্দ পায়। বিশেষ করে ছোট শিশুরা বৃদ্ধ দাদা-দাদীর পরম আনন্দদায়ক খেলনা। শিশুরা নিষ্প্রাণ পুতুল নিয়ে খেলে। ছোট শিশুরা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবন্ত পুতুল।

আগেই বলেছি, একমাত্র ছোট ছেলে সালমানই আমার সাথে থাকে। ওর শাশুড়ির মারাত্মক অসুখ হওয়ায় এক মাস আগে বৌ-মাকে সেখানে যেতে হলো। ৬ বছরের নাতনী নাবা ও ১ বছরের সাফা বাড়িতে নেই। মনে হয় বাড়িতে কাজের ছেলে-মেয়েগুলোরও কোন আনন্দ নেই। আমার স্ত্রী তো দু'মাস থেকেই অসুস্থ। অসুস্থ অবস্থায়ও সাফাকে কোলে নিলে অসুস্থ মনে হতো না। আমানের ছেলে-মেয়েরা এক সপ্তাহ বেড়িয়ে গেলো। ওরা চলে যাবার সময় ছোট নাতনী রাহমাকে চোখের পানিতে বিদায় করলো। আমি তো শোবার ঘরে কম সময়ই থাকি। আমার অসুস্থ স্ত্রী ঘরে একা বিমর্ষ হয়ে শুয়ে শুয়ে বই পড়ে সময় কাটায়। সাফাকে পেলে মনে হয় সুস্থ হয়ে যেতো। আল্লাহ তাআলা এভাবে মানব বংশের লালন-পালনের জন্য শিশুর প্রতি এমন স্নেহের আবেগ দান করেছেন।

পাশ্চাত্যে বৃদ্ধ পিতা-মাতা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। ছেলেরা বিয়ের পরই আলাদা বাসায় চলে যায়। তারা নাতি-নাতনীকে কাছে পায় না। দাদা-দাদী হওয়ার কোন স্বাদই তারা উপভোগ করে না। বুড়া-বুড়ির একজন যদি মারা যায় তাহলে নিজের বাড়ি থাকলেও সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে সময় কাটাতে বাধ্য হয়। আমাদের দেশেও এমন নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সমস্যা কোন কোন পরিবারে দেখা দিচ্ছে।

শিশুদের মুখে দাদা শব্দটি সহজেই ফুটে। কথা বলা শেখা শুরু হয় দা-দা, বা-বা দিয়ে। আমার এক বছর বয়সী নাতনী সাফা এমনিতেই দাদা, দাদা বলতেই থাকে। আমাকে দেখলে হাসিমুখে একটানা জোরে জোরে যখন দাদা ডাকতে থাকে, তখন

কোলে না নিয়ে কি উপায় থাকে? এক মাস থেকে সে বাহরাইনে আছে। চেম্বার থেকে ঘরে গেলে ওকে আর দেখি না। এ শূন্যতায় প্রাণে সজীবতার অভাব বোধ করি। ওর অভাবে সবাই নিরানন্দ হয়ে আছে।

ফজরের পর আমি ও আমার স্ত্রী আবার ঘুমাই। সকাল সাড়ে আট বা ন'টায় কাজের মেয়েটি সাফাকে নিয়ে এসে ওর দাদুর পাশে বসালে সে-ই ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙায়। দাদু ওর মিষ্টি হাসিতে মুগ্ধ হয়ে বুকে জড়িয়ে যে সুখ ভোগ করে গত এক মাস এ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে আমার স্ত্রীর তৃষ্ণার্ত প্রাণ শুকিয়ে যাবার দশা।

আমার আইএ ক্লাসের বাংলা পাঠ্য বইতে কবি কিরণ ধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিশুর হাসি' নামের কবিতাটির কথা এখনও ভুলতে পারি না। "কী মধুর হাসিটি প্রভু দিয়েছো শিশুর মুখে" কবিতাটির প্রথম লাইন। কবি বিধাতাকে জিজ্ঞেস করেছেন "স্বর্গেতে আছে কি ফুল, মর্তে যার নাহি তুল, তারি মধু দিয়ে কিহে করিলে সৃজন?" দীর্ঘ কবিতাটির শেষ দিকে কবি বলছেন যে, নিশ্চয়ই স্বর্গের দেবতারা তোমার কাছে এ সম্পদটিই চেয়েছিলো। তুমি তাদেরকে এ বলে বিদায় করেছে যে, তোমাদেরকে আমি বহু কিছু সুখের উপকরণ দিয়েছি। শিশুর হাসিটুকু আমি দুঃখী মানুষের জন্য রেখেছি। আফসোস যে, কবিতাটির চমৎকার শেষ পঙ্‌ক্তিগুলো ভুলে গেছি। সার-কথাটুকু উল্লেখ করলাম মাত্র।

একবার ছুটিতে রংপুর কলেজ থেকে সপরিবারে ঢাকা আসার পথে যমুনা নদীতে ফেরির রেলিং-এর পাশে আমার ৩য় ছেলে মুমিনকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। যে বয়সে শিশু কোল বাছাই করে না, সবার কোলে যায়, যাকে দেখে তার দিকেই তাকায় ও হাত নাড়ে, মুমিন তখন ঐ বয়সের। লক্ষ্য করলাম যে, আশেপাশে দাঁড়ানো কেউ ওর হাসি ও হাত নাড়ায় সাড়া না দিয়ে পারেনি। খুব কাছে এক ভদ্রলোককে ব্যতিক্রম দেখলাম। তিনি এর দিকে তাকালেন না। এমন হৃদয়হীন মানুষ বিরল।

এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে দেখলেন যে, তিনি এক শিশুকে কোলে নিয়ে চুমু খাচ্ছেন। ঐ ব্যক্তি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ছেলে-মেয়েদেরকে এভাবে আমি কোনদিন আদর করিনি।" রাসূল (স) বললেন, "আল্লাহ তাআলা তোমার দিলে মায়া-মহব্বত না দিয়ে থাকলে আমার কী বলার আছে?"

সত্যি ছোট শিশু বড়দেরকে যে নির্মল আনন্দ দেয় এর কোন বিকল্প নেই। শিশুদের প্রতি এ আকর্ষণ না থাকলে মানুষ বাচ্চাদের জন্য এতো কষ্ট করতে পারতো না। শিশুর মিষ্টি হাসির নিকট সব কষ্ট তুচ্ছ। ওর মুখের আওয়াজ সবচেয়ে মধুর।

কামিয়াব প্রকাশন। ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।